ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্র পাঠযুক্ত (CBCS) স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ১

History : Its Nature and Purpose

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

পরামর্শদাতা

শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

ডিসেম্বর ২০১৮
মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয়

মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংর(িত। মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত(কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সং(িষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

SYLLABUS

CC-1: HISTORY : ITS NATURE AND PURPOSE

CC-1, 4 Credits, 100 Marks, 120 Hours

CC-1: History : Its Nature and Purpose

Block-1 : Meaning and Scope of History

Unit-1: Meaning and Scope of History.

Unit-2: Truth, Fact, Evidence.

Unit-3: Causation.

Block-2 : History and other disciplines

Unit-4: Objectivity of History

Unit-5: History and Sciences.

Unit-6: History and other disciplines.

Block-3 : Approaches to History

Unit-7: Theological, Orientalist, Imperialist, Nationalist.

Unit-8: Marxist, Subaltern.

Unit-9: Post-Modernist.

Block-4 : Different Theories

Unit-10: Cyclical, Historical Materialism, Sociological, Comparative.

Unit-11: Post Modernist Critiques of History.

Unit-12: Structural, Ecological.

Block-5 : Themes in Indian History

Unit-13: Economic; Labour and Peasant, Varna, Jati, Janajati and Gender.

Unit-14: Religion; Culture, Science and Technology, Environment.

Block-6 : Debates in History

Unit-15: Representative Study of Major Debates on the Social History of the World.

Unit-16: Representative Study of Major Debates on the Economic History of the World.

Contents

Blocks	Units	Authors	Titles	Pages
1	1	Prof. Amal Das	Meaning and Scope of History.	1-19
1	2	Prof. Amal Das	Truth, Fact, Evidence.	20-25
1	3	Prof. Amal Das	Causation	26-37
2	4	Shri Sukrit Mukherjee	Objectivity of History	38-40
2	5	Prof. Amal Das	History and Sciences.	41-52
2	6	Prof. Amal Das	History and other disciplines.	53-64
3	7	Prof. Balai Ch. Barui	Theological, Orientalist, Imperialist, Nationalist.	65-79
3	8	Prof. Amal Das	Marxist, Subaltern.	80-85
3	9	Prof. Balai Ch. Barui	Post-Modernist.	86-89
4	10	Prof. Balai Ch. Barui	Cyclical, Historical Materialism, Sociological, Comparative.	90-103
4	11	Dr. Sukanta Pramanik	Post Modernist Critiques of History.	104-106
4	12	Prof. Balai Ch. Barui	Structural, Ecological.	107-111
5	13	Prof. Balai Ch. Barui	Economic; Labour and Peasant, Varna, *Jati, Janajati* and Gender.	112-127
5	14	Prof. Amal Das	Religion; Culture, Science and Technology, Environment.	128-138
6	15	Prof. Balai Ch. Barui	Representative Study of Major Debates on the Social History of the World.	139-146
6	16	Dr.Sukanta Pramanik	Representative Study of Major Debates on the Economic History of the World.	147-155

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক ১

Meaning and Scope of History

বিন্যাসক্রম ঃ

উপ-একক - ১

১.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.১.১.১ ঃ সূচনা

১.১.১.১.২ ঃ ইতিহাসের সংজ্ঞা

১.১.১.১.৩ ঃ ইতিহাসের স্বরূপ ও আলোচনার পরিধি

১.১.১.১.৩.১ ঃ ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে ও পরে ইতিহাসের স্বরূপ

১.১.১.১.৩.২ ঃ ঊনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব

১.১.১.১.৪ ঃ উপসংহার

১.১.১.১.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.১.১.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

১.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.১.২.১ ঃ ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

১.১.১.২.২ ঃ উপসংহার

১.১.১.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.১.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

Meaning and Scope of History

১.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) 'ইতিহাস' কি বা 'ইতিহাস' বলতে কি বোঝায় — ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে জটিলতা ও সমস্যার কারণ।

(২) ইতিহাসের স্বরূপ ও পরিধি—যুগে যুগে এই পরিধির সম্প্রসারণ।

(৩) ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগের পূর্বে ও পরে ইতিহাসের প্রকৃতি।

(৪) উনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব।

১.১.১.১.১ ঃ সূচনা

ইতিহাস শব্দটি এসেছে 'ঐতিহ্য' শব্দ থেকে। এর অর্থ হল ঃ ''অতীতে যা ঘটেছে''। ইংরেজী 'History' অর্থে 'ইতিহাস' কথাটি ব্যবহার করা হয়। History শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রীক 'Historia' শব্দ থেকে। 'Historia' শব্দটির অর্থ হল 'সযত্ন অনুসন্ধান'। ইতিহাসের জনক বলে পরিচিত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস প্রথম 'History' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর পর থেকেই এই শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে।

লাতিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রীক 'Historia' শব্দ অর্থাৎ 'সযত্ন অনুসধান' এই দুই থেকেই 'History' শব্দটির উৎপত্তি।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের অর্থ কি?

২। 'History' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

১.১.১.১.২ ঃ ইতিহাসের সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস কি? ইতিহাস কাকে বলে? নিছক অতীতের কাহিনীকেই কি ইতিহাস বলা যাবে? ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞা বা প্রকৃতি কি? এই বিষয়ের সন্ধান মনে হয় অন্তহীন। ইতিহাসের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও উপকারিতার বলয় নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হন। তাঁদের লেখনীতে

ইতিহাস কি? ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞাই বা কি? এই সব বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোন একটি একক লেখায় পাওয়া যায় না। কারণ এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে হলে ইতিহাস নিয়ে আরো অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বিষয়টির বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ লাভ করে। এ অভিমতসমূহ পৃথক পৃথকভাবে একদিকে যেমন আমাদের বিষয়ে আংশিক ধারণা দেয়, অন্যদিকে এগুলো আবার বিষয়টির উপর সমকালীন ভাব ও চিন্তাজগতের ধ্যান-ধারণার প্রতিফলনও বটে। কিন্তু বর্তমানকালে ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তার সামগ্রিক প্রকাশ কোনো একক লেখায় পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব ইতিহাস বিষয়ে আধুনিক ধারণা নিতে হলে নানা অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যা বা নিখুঁত সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা ও অসুবিধা রয়েছে। এইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, ''To define history definitely or accurately is a preposterous proposition.''

ইতিহাসের চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণে যে অতীতে কখনো সম্ভব হয়নি বা ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা কম, তার জন্য দায়ী অনেক কারণ হয়েছে। প্রথমতঃ ইতিহাসের লক্ষ্য বা আদর্শের প্রকৃতি ঘন ঘন পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের বিষয়বস্তু, আলোচনার সীমা থেমে থাকে না, তা অনবরত সম্প্রসারিত হতে থাকে। প্রথম কারণটির ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা কখনই একমত হতে পারেননি। এর কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের লক্ষ্য ও আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আবার ইতিহাসের লক্ষ্যও বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পৃথক পৃথকভাবে ধরা দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়, ইতিহাসের বৌদ্ধিক সীমার মধ্যে যে সব বিষয় পড়ে, তাদের সংখ্যা বা আলোচ্য বিষয় কখনই অটুট থাকতে পারে না। কারণ যুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরোনো বিষয় নতুন আঙ্গিকে বা নতুন অনেক বিষয় ইতিহাসের আলোচনায় ঢুকে পড়ে এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইসব নানা সমস্যা ও জটিলতা ইতিহাসের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

যেহেতু ইতিহাসের লক্ষ্য, আদর্শ, বিষয়বস্তু ও আলোচনার সীমা সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে সেহেতু এর সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞা কি?

২। ইতিহাসের চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারার দুটি কারণ কি?

১.১.১.১.৩ ঃ ইতিহাসের স্বরূপ ও আলোচনার পরিধি

তবুও বিগত বিভিন্ন শতাব্দীতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ অতীতের নানা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তাদের যে সব মতামত ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের উপহার দিয়েছেন, সেগুলোর আলোচনা থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধরা যাবে। যদিও এই মতামতের ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে তথাপি তাদের মতামত ও সংজ্ঞাগুলিকে একত্রিত করলে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্ক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে ইতিহাসের ব্যাপক

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ইতিহাসের সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে ইতিহাসকে মূলতঃ মানুষের কাহিনী বলেই মনে করেন। কিন্তু এই সরল ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। বিষয়টি সম্পর্কে আরো গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তবেই আমরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানতে পারব।

বৈচিত্র্য সম্পর্কেও ধারণা গঠন করা সম্ভব হতে পারে। ইতিহাসের সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে তাকে মূলত মানুষের কাহিনী বলেই মনে করেছেন। কারণ তাদের মতে, মানুষই ইতিহাসের মূল নায়ক এবং তাদেরকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের যাবতীয় গঠনা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য এই সরল ব্যাখা যথেষ্ট নয়। আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বা আলোচনার বিষয়বস্তুকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ এই সংজ্ঞাগুলির সতর্ক বিবেচনার মাধ্যমেই একমাত্র জ্ঞানলাভ করা সম্ভব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কে, যার সাহায্যে ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে লক্ষ্য বা বিবেচনা করেছেন।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের মূল নায়ক কারা?

২। ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা কিভাবে সম্ভব?

কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাসের শিক্ষামূলক বা উপদেশমূলক ভূমিকাটির উপর গুরত্ব আরোপ করেছেন। ডায়োনিসিয়াস সুপ্রাচীনকালেই ইতিহাসের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ''History is philosophy drawn from examples''। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থেকে গ্রহণ করা দার্শনিক শিক্ষাই হলো ইতিহাস। ডায়োনিসিয়াস মনে করতেন ইতিহাস একান্তভাবেই শিক্ষামূলক ও নীতিবিরোধসংক্রান্ত মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আবার ফ্রান্সিস বেকন ইতিহাসের পাঠ থেকে জ্ঞানার্জন, সংযম বা পরিমিতিবোধ লাভের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ''History is a discipline which makes man wise.'' অর্থাৎ ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা বা মানুষকে জ্ঞানী করে। তাঁর মতে, এই জ্ঞান ইতিহাসের তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান নয়, এর অর্থ হল সংযম বা পরিমিতিবোধ, যা কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠ করলে অর্জন করা যায়। ইতিহাসের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে অনেকটা ফ্রান্সিস বেকনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন র‍্যালের মতে, ''সমস্ত ইতিহাসেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বিগত দিনের উদাহরণ বা ঘটনাবলী থেকে সেই শিক্ষা দেওয়া, যে শিক্ষা আমাদের ইচ্ছা এবং কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে''। র‍্যালে ইতিহাসের এই শিক্ষামূলক দিকটির উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডায়োনিসিয়াস-এর মতে দৃষ্টান্ত থেকে গ্রহণ করা দার্শনিক শিক্ষাই হল ইতিহাস। "ফ্রান্সিস বেকনের মতে ইতিহাস হল জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে। কিন্তু এই জ্ঞান ইতিহাস তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান নয়, এর অর্থ হল সংযম বা পরিমিতি বোধ, যা কেবল মাত্র ইতিহাস পাঠ করলে অর্জন করা যায়।

প্রশ্ন

১। 'History is a discipline which makes man wise' এটি কার উক্তি? এর প্রকৃত অর্থ কি?

২। ''History is philosophy drawn from examples'' এটি কার উক্তি? এর প্রকৃত অর্থ কি?

৩। ঐতিহাসিক র‍্যালে ইতিহাসের কোন দিকটির উপর বেশি জোর দিয়েছেন?

আবার লাইব্‌নিৎস (Leibnitz) বা লেকির (Lecky) মতো ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ইতিহাসের মূল ভিত্তি হলো একান্তভাবেই ধর্ম বা ধর্মসংযুক্ত নীতিবোধ। তাঁদের মতে, ইতিহাস বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের

মধ্যে, মানুষের নানা ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে ধর্মই বার বার প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তবে লাইব্‌নিৎস ইতিহাসের মূল ভিত্তি হিসেবে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানযুক্ত ধর্মের উপর জোর দিলেও (যেমন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি), লেকি কিন্তু জোর দিয়েছেন নৈতিক মূল্যবোধ বা নীতিবোধের উপর। তাঁর মতে, নৈতিক বিপ্লবই ইতিহাসে বড় বড় বিপ্লবের উদ্ভব ঘটাতে পারে।

লাইব্‌নিৎস বা লেকির মতে ধর্ম ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতন ঘটালেও নৈতিক বিপ্লবই একমাত্র বড় বিপ্লব ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের মূলভিত্তি হিসেবে কারা ধর্মের কথা বলেন?

আবার আরেক দল ঐতিহাসেক তাঁদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'Personality cult' বা ব্যক্তিত্বের পূজাবাদে অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন। এই মতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকদের মতে, পৃথিবীর বহু দেশের ইতিহাসের সিংহভাগ অধিকার করে রয়েছেন বিখ্যাত যোদ্ধা, সাম্রাজ্যবিজেতা , দক্ষ প্রশাসক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিত্ব। এই দলের ঐতিহাসিকদের মতে, ১৭৯৯ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস একান্তই ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে ইতিহাস, কারণ সে সময় ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনিই। এই মতের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন উনিশ শতকের খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (Thomas Carlye)। তাঁর মতে, এই পৃথিবীতে মানুষের অর্জিত সাফল্যের মূলে রয়েছে কয়েকজন মহান্ ব্যক্তিত্বের মহান কার্যকলাপের ইতিহাস। কার্লাইল আরো মনে করেন, একটি দেশের সামাজিক জীবনের অগ্রগতি পেছনে বিখ্যাত, মহান ব্যক্তিবর্গের সামাজিক জীবনযাত্রার সমষ্টিগত ফলাফল গুরুত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। কার্লাইলের ব্যক্তিপূজাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন আর. ডবলিউ. এমার্সন (R.W.Emmerson). তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন— ''Thers is properly no history but only biography''অর্থাৎ ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা কেবল ব্যক্তির জীবনী। একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিগণ তাঁদের অনন্য কৃতিত্ব ও জীবনাদর্শের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবন ও সমসাময়িক ইতিহাসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে গেছেন। তবে একইসঙ্গে ইতিহাসকে এই সংকীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখলে সঠিক হবে না। কারণ সমাজ গঠনে বা ইতিহাস পরিবর্তনে অনামী বৃহত্তর সাধারণ মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেক সময়েই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই ইতিহাস আমাদের ভুললে চলবে না।

টমাস কার্লাইল ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের কার্যকলাপের কথা বলেন। কিন্তু ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না কারণ সমাজ গঠনে বা ইতিহাস পরিবর্তনে অনামী বৃহত্তম সাধারণ মানুষের একটা গুরুত্বপূর্ণ বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র হিসেবে কারা 'personality cult'-এর কথা বলেন?

২। ইতিহাস পরিবর্তনে বা সমাজ গঠনে সাধারণ মানুষের কতটা ভূমিকা রয়েছে?

আবার ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে নেতিবাচক এবং নৈরাশ্যজনক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ভলতেয়ার (Voltaire), গিবন (Gibbon) বা জেমস জয়েসের (James Joyce)-এর মতো দার্শনিক-ঐতিহাসিকগণ। ভলতেয়ার বলেন,

"History is just the portrayal of crimes and fortunes" অর্থাৎ ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিবল বলেছেন যে, ইতিহাস হল মানব জাতির দুর্ভাগ্য, মূর্খতা ও অপরাধের নথিবদ্ধ বিবরণী। ইতিহাসের চরিত্র বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই হতাশার ও অন্ধকারজনিত বিবরণীর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে জেমস জয়েসের লেখায়। তিনি বলেন, "History is a nightmare from which I am trying to awaken". ইতিহাস তার কাছে এক দুঃস্বপ্ন, যা কাটাবার তিনি অনবরত চেষ্টা করে গেছেন। এইসব লেখকদের বিবরণ ও মন্তব্য থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে যে, অতীতের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা, অমানবিক নিষ্ঠুরতা, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদির ঘটনা পড়ে তাঁরা এতই বিচলিত ও মর্মাহত হয়েছেন যে ইতিহাসের কেবল মন্দ দিকটাই তাদের মনে গেঁথে গেছে, ভাল দিকটা তাঁদের লেখায় স্থান লাভ করেনি। এর ফলে তাদের ইতিহাস এক খণ্ডিত ও অর্ধসত্য উপস্থাপিত করেছে।

কিছু দার্শনিক ঐতিহাসিক অতীতের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা, নিষ্ঠুরতা অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা পড়ে এতটাই বিচলিত যে তাদের মতে ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী। এর অর্থ ইতিহাসের কেবল মন্দ দিকটাই তারা দেখেছেন, ভাল দিকটা নয়, একারণে তাদের ইতিহাসটা অর্ধসত্য ও অখণ্ডিত ইতিহাস।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে কারা নেতিবাচক এবং নৈরাজ্যজনক সংজ্ঞা প্রদর্শন করেন?

২। 'History is just the portrayal of crimes and fortunes' এটি কার উক্তি? এর অর্থ কি?

১.১.১.১.৩.১ ঃ ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে ও পরে ইতিহাসের স্বরূপ

ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে (Age of Enlightmenment) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসচর্চা প্রণালী ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাসচর্চা প্রণালীর সূচনা ঘটে। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের নেতৃত্বে একদল ঐতিহাসিক আধুনিক ইতিহাসচর্চার গোড়াপত্তন করেন। প্রধানতঃ মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক ইতিহাসচর্চার বদলে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী এক নতুন ইতিহাসচর্চা ইউরোপে বিকশিত হতে থাকে। এর ফলে ইতিহাসের স্বরূপ, বিষয়বস্তু, পরিধির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইতিহাসের পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। ভলতেয়ার ও রবার্টসন ইতিহাসকে মধ্যযুগীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চার দিকে টেনে নিয়ে যান; জ্ঞানদীপ্ত ঐতিহাসিকরা এই নতুন আলোকে তাদের ইতিহাস লেখা শুরু করেন। সাহিত্য ও ধর্মের মোড়ক থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত হল। রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস বদলে হল মানব সমাজের অগ্রগতির ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কাহিনী। ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হল।

ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অর্থাৎ ধর্ম ও সাহিত্য ভিত্তিক ইতিহাস চর্চা প্রণালী ও বিষয় বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক অর্থাৎ বিজ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর ইতিহাস চর্চা প্রণালীর সূচনা ঘটে।

প্রশ্ন

১। Enlightenment-এর যুগে ইতিহাস চর্চার কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

উনিশ শতকে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠল। তাদের মধ্যে শুরু হল বিতর্ক। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। একদল ঐতিহাসিক বললেন, ইতিহাস কেবলমাত্র ঘটনা বর্ণনা করেই তাদের কাজ শেষ করবে। তাদের মতে, মূলতঃ তথ্যের উপস্থাপনাই ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ। তবে এই তথ্য হবে পরীক্ষিত সত্য। তাই তথ্যের দিক থেকে উনিশ শতক ছিল এক মহান যুগ। 'কঠিন সময়' (হার্ড টাইমস্) উপন্যাসে গ্র্যাডগ্রিণ্ড বলেছিলেন, 'আমি যা চাই তা হলো তথ্য।... জীবনে শুধু তথ্যই চাই।' উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা মোটের পর তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। ইতিহাসকে নৈতিক রূপ দেওয়ার প্রতিবাদ হিসেবে জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে (Ranke) মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, 'আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো।' এই ধুয়ো তুলে লড়াই-এ এগিয়ে গিয়েছিলেন তিন প্রজন্মের জার্মান, ব্রিটিশ, এমনকি ফরাসি ঐতিহাসিকরা। র‍্যাঙ্কে ছিলেন জার্মানির সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ঐতিহাসিক। বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্পর্কে আগ্রহ র‍্যাঙ্কেকে উনিশ শতকের প্রধান ঐতিহাসিক করে তুলেছে। সাধারনভাবে আধুনিক ঐতিহাসিকের মধ্যে তাঁকেই প্রথম আধুনিক মনে করা হয়। র‍্যাঙ্কে তাঁর ইতিহাসচর্চায় সবক্ষণই 'objectivity of History' বা বস্তুগত বা বিষয়গুলি ইতিহাসের প্রতি ও তথ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বা ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি এক নতুন পদ্ধতি নিয়ে আসেন। এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক উপাদানগুলির যথাযথ ও সযত্ন ব্যবহ্যর। Objective ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে তিনি মৌলিক উপাদানগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ আগে করতেন। চিরাচরিত গল্পগাথাকে তিনি বাতিল করেন। যা প্রমাণিত নয়, তা অপ্রাসঙ্গিক বলেই তিনি মনে করতেন। কোনোরকম কল্পনাভিত্তিক, অনুমানভিত্তিক ইতিহাস রচনা তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ করিত্যজ্য। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তথ্যের কঠোর উপস্থাপনা। এর ফলে তাঁর ইতিহাস critical বা বর্ণহীন। তিনি কোনো ভাবাবেগ বা জাতীয়তাবাদী ঝোঁককে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর শেষ কথা হল, ''The strick presentation of facts is the supreme law of historical writing''. অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা। ঐতিহাসিক কখনও কোন ঐতিহাসিক ঘটনাক বা তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা করে আপন সিদ্ধান্ত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

উনিশ শতকে ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত পার্থক্য দেখা দেয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা বললেও ঐতিহাসিক কিন্তু কখনও কোন ঘটনার বা তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে আপন সিদ্ধান্ত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

প্রশ্ন

১। একজন Objectivitist ঐতিহাসিকের নাম কর।

২। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে Objectivitist দের মূল বক্তব্য কি?

১.১.১.১.৩.২ ঃ ঊনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব

ঊনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকের শুরু থেকে একদল ঐতিহাসিক মূল্যায়নধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। এঁর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'উপলক্ষ্যগত' মন্ময় (Subjective) ব্যাখ্যার দিকগুলির উপর জোর

Subjectivitist-দের মতে ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক সত্যঘটনার পরিবেশন নয়, বরং তার মূল্যায়ন ও সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন দরকার।

দিতে চেয়েছেন। ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয়, এমনকি তা শুধু সত্য ঘটনা হলেও নয়, বরং মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যার উপস্থাপনা। এই বক্তব্যের ও ঐতিহাসেক রচনার দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাসের নতুন নতুন সংজ্ঞা, প্রকৃতি আবার ধরা পড়ল।

প্রশ্ন ১। Subjectivitist-দের মূল বক্তব্য কি?

বিশ শতকের ইতিহাসচর্চার ও ইতিহাসদর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যুগবিভাজন সম্পর্কে ধারণা বা অনুভূতিবোধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রভৃতি যুগবিভাগগুলি সম্পর্কে সময়-সচেতনতা এবং অতীতের পুনরুদ্ধার বা পুনগঠন করতে গিয়ে ঐতিহাসেক যে অনিবার্যভাবে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটনা, সে সম্পর্কে অনুভূতি। নতুন শতকের গোড়ার দিকে এই ধ্যানধারণা ও ইতিহাস দর্শনের মশাল গিয়ে পৌঁছল ইতালিতে। সেখানে ইতিহাসের এই দর্শনের প্রস্তাবনা করলেন বেনেদেত্তো ক্রোচে (Beneditto Croce)। ক্রোচে ঘোষণা করলেন, সব ইতিহাসই 'সমসাময়িক ইতিচহাস'। ''All history is 'contemporary history'"। তার মানে ইতিহাস মূলত বর্তমানের চোখ দিয়ে ও তারই সমস্যার নিরিখে অতীতকে দেখা এবং ঐতিহাসিকের আসল কাজ নথিকরণ নয়, বরং মূল্যায়ন। তিনি যদি মূল্যায়ন না করেন তাহলে কোন্‌টা নথিবদ্ধ কররা উপযক্ত তা তিনি জানবেন কি করে? ঐতিহাসিকের চেতনায়, ধ্যানধারণায় ও মননে অতীত পুনঃসৃষ্টি হয় এবং এই পুনঃসৃষ্ট অতীতের কথাই ঐতিহাসিক লেখেন। যেহেতু একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলেও একওকজন ঐতিহাসকের মনে অতীতের পুনঃসৃজন ভিন্ন ভিন্ন, সেহেতু ইতিহাস রচনাও নানা ধরনের হতে বাধ্য। ঐতিহাসিক যেহেতু তাঁর সময়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতির থেকে মুক্ত নন, সে কারণে অতীত সম্পর্কে তাঁর রচনার সব সময়েই একটি সমসামনিকত্বের বা সমকালীনতার ছাপ থাকে।

যুগবিভাজন সম্পর্কে ঐতিহাসিকের লেখা পুরোপুরি অনুভূতিগত ব্যাপার। কেননা সময় সচেতনতা এবং অতীতের পুনরুদ্ধার বা পুণগঠন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক গণ অনিবার্যভাবে তার সময়ের পরিবেশ ও সমস্কৃতিতে এসে পড়ে।

প্রশ্ন ১। ক্রোচের মতে ইতিহাস কি?

বেনেদেত্তো ক্রোচের ইতিহাসের মূল্যায়নধর্মী, ব্যাখ্যানির্ভর মতবাদের জোরালো সমর্থন তাঁর সমসাময়িককালে ও পরবর্তীকালে অনেক লেখকের লেখার প্রতিফলিত হয়েছিল। নিছক তথ্যের উপস্থাপনা নয়, এর মূল্যায়ন—এই মতবাদের অন্যতম প্রথম সার্থক প্রবক্তা হিসেবে ক্রোচে অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ১৯১০ সালে বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক কার্ল বেকার বললেন, 'ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনো তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি তা সৃষ্টি করেন।' (''The facts of history do not exist for any historian till he creates them''.) একইভাবে মাইকেল

কার্লবেকারের মতে ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোন তথ্য থাকে না তিনি তা সৃষ্টি করেন। মাইকেল ওক্‌শট্‌-এর মতে ইতিহাস মূলত ঐতিহাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিষয় ঐতিহাসিক ব্যতীত তা কেউই তৈরি করতে পারে না।

ওক্‌শট্ (Michael Oakeshott) মত প্রকাশ করেন যে, ''History is the historian's experience, it is made by nobody save the historian, to write history is the only way of making it''. অর্থাৎ ইতিহাস মূলতঃ ঐতিহাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ঐতিহাসিক ব্যতীত কেউই একে 'তৈরি' করতে পারেন না এবং ইতিহাস নির্মাণ করার একমাত্র উপায় সেটি লিখে ফেলা।

ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনে ক্রোচে যথেষ্ট গ্রাহ্য হতে শুরু করেন ১৯২০-এর পরেই। এর কারণ হিসেবে E.H. Carr বলেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঐতিহাসিকদের দিকে তথ্যের কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে ১৯১৪-র আগের বছরগুলোর চেয়ে যেন কম উদারতা দেখা গেল। অতএব, যে দর্শন তথ্যের মর্যাদা ছোট করতে চাইল তার দিকেই লেখকদের ঝোঁক পড়ল বেশি। অক্‌স্‌ফোর্ড-এর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক R.G. Collingwood (আর.জি. কলিংউড্) এর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল ক্রোচের। তাই ব্যাখ্যানির্ভরতা বা ব্যাখ্যা প্রবণতা ইতিহাসরচনার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে কলিংউডের অসমাপ্ত রচনাবলীতে। 'Subjective history' বা 'Subjective attitude to history' তাঁর রচনায় পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কলিংউড দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ''History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian'' অর্থাৎ ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের মননে অতীত ঘটনার বা অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাভিনয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর মতে, ঐতিহাসিক যে অতীতের মানুষের বিবরণ রচনায় ব্রত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও ধারণা যদি ঐতিহাসিকের মনে জাগ্রত না হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা সম্ভব হতে পারেনা। এই কারণে যে সমস্ত গবেষক বা লেখক শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ ও সংকলন করে তার নিজের গ্রন্থটি রচনা করে দায়িত্ব শেষ করেন, তাদের তিনি 'ব্যর্থ' ঐতিহাসিক বলে মনে করেন। তাঁর কাছে 'সব ইতিহাসই চিন্তার ইতিহাস' আর 'ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনে সেই চিন্তার 'পুনঃরূপায়ণ', যার ইতিহাস তিনি চর্চা করছেন। ঐতিহাসিকের মনে অতীতের পুনগঠন ইন্দ্রয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এটি স্বয়ং কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়া নয় এবং শুধু তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে এটি গড়ে ওঠেনি। তার বদলে পুনগঠনের প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে তথ্যের নির্বাচন ও ব্যাখ্যান। এর ফলেই সেগুলো পরিণত হয় ঐতিহাসিক তথ্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে বেশি ঝুকে পড়ে। কারণ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লিখতে গেলে অতীতের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও ধারণা ঐতিহাসিকের মনে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। আসলে ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনে সেই চিন্তার পুনঃরূপায়ন যার ইতিহাস তিনি চর্চা করছেন।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতিহাস চর্চার কি পরিবর্তন দেখা গেল?

২। E.H. Carr-এর একটি বই এর নাম লেখ?

৩। R.G. Colingwood-এর একটি বই এর নাম লেখ। তিনি কোন গোষ্ঠীর সমর্থক?

ইতিহাসের 'subjectivity' মতবাদের গোষ্ঠীর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক R.G. Collingwood এর মতবাদকে অতিরিক্ত দার্শনিকতার দোষে দুষ্ট বলে অভিযুক্ত করেছেন। এই ঐতিহাসিকদের মতে এর কারণ হলো, ইতিহাস নিয়ে তিনি খুব কমই লিখেছেন এবং সে অর্থে তিনি পেশাদার ঐতিহাসিকের মধ্যে পড়েন না, বরং ইতিহাস-দার্শনিক বলাই তাঁকে যুক্তিসঙ্গত হবে। ব্যাখ্যা প্রবণতার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত গুরুত্ব

আরোপ তাঁকে একটি অবাস্তব অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে, যেখানে বলা যায়, যত অসম্ভবই হোক না কেন, উপস্থাপিত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই মূল্যের দিক থেকে সমান এবং ইতিহাসে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্য বলে কোনো কিছু থাকতে পারেনা। এই বিশ্বস বা যুক্তি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের সত্য নিরূপণের জন্য ঐতিহাসিরদের সমস্ত প্রচেষ্টার যথার্থ্যকেই বাতিল করে দেয়।

E.H. Carr তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যা ইতিহাসের মূল উপাদান মূল উপাদান হিসেবে মেনে নিলেও কতগুলি বিপদের কথাও বলেছেন। যদিও ইতিহাস একান্তভাবে ও অনিবার্য ভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যানির্ভর ও তথ্যবিশ্লেষণের ব্যাপারে, তথাপি ঐতিহাসিককে সব তথ্যের উপর মনযোগ না দিয়ে তথ্য নির্বাচন করেনিতে হয়। তা সত্বেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বা সততার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রের আদর্শকে কোন ভাবেই পরিত্যাগ করা যায় না। আসলে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য দুয়েরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ আবার ঐতিহাসক ছাড়া তথ্যেরাও মৃত ও অর্থহীন।

এর বিরোধিতার সুর লক্ষ্য করা গেছে E.H.Carr (ই. এইচ. কার) এর মন্তব্য। তিনি তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের মূল উপাদান হিসেবে মেনে নিলেও কতকগুলি বিপদের কথাও বলেছেন। যদিও ইতিহাস একান্তভাবেই ও অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যানির্ভর এবং তথ্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে ঐতিহাসিককে সব তথ্যের উপর মনোযোগ না দিয়ে তথ্য নির্বাচন করে নিতে হয়, তা সত্বেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বা সততার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আদর্শকে কোনোভাবেই পরিত্যাগ করা যায় না। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে what is history? বা ইতিহাস কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা অনুভুতি ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য দেওয়া হলো। কার-এর মতে, মানুষ কখনোই পরিবেশ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকে না ও তার নিঃশর্ত প্রভুও হয় না। মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক—ঐতিহাসিকের সঙ্গে তার বিষয়ের সম্পর্ক। ঐতিহাসিক তাঁর তথ্যের বিনীত দাস বা অত্যাচারী প্রভু—কোনোটাই নন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক—সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো গবেষণারত ঐতিহাসিক যেমন জানেন, তিনি যখন চিন্তা করেন ও লেখেন তখন যদি কী করছেন তা ভাবার জন্য থামেন, তাহলে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যানের সঙ্গে তথ্যকে গড়ে-পিটে নেওয়ার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ায় তিনি নিযুক্ত থাকেন। এটা আগে, ওটা পরে— এমন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকের কাজ আরম্ভ হয় বিভিন্ন তথ্যের তখনকার মতো বাছাই করা দিয়ে, আর তখনকার মতো একটা ব্যাখ্যান যার সাহায্যে ঐ বাছাই করা হয়েছে—অন্যরা এবং তিনি নিজেও যা বাছাই করেছেন তাই দিয়ে। তিনি যখন কাজ করতে থাকেন তখন বাছাই ও বিন্যাস—এই দুয়েরই সূক্ষ্ম ও বোধহয় আংশিকভাবে অচেতন পরিবর্তন ঘটে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান ও অতীতের মধ্যেকার পরস্পর সম্বন্ধও জড়িয়ে থাকে, কারণ ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ আর তথ্যগুলো অতীতের। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য— দুয়েরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ। ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। অতএব 'কাকে বলে ইতিহাস'? এই প্রশ্নে ঐতিহাসিক কার বলেন ''It is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the past and the present'' অর্থাৎ ইতিহাস হলো ঐতিহাসিক ও তার সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে এক অন্তহীন দেওয়া নেওয়া বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সংলাপ। এই সব কারণেই একই শ্রেণীর তথ্য একাধিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলেও তাঁদের উপনীত সিদ্ধান্তের মধ্যে এতো পার্থক্য দেখা যায়। আর এটিই হলো ইতিহাসের প্রকৃত আকর্ষণ।

প্রশ্ন ১। What is History-তে Carr-এর মূল বক্তব্য কি?

১.১.১.১.৪ ঃ উপসংহার

আগাথা ক্রিস্টি তাঁর 'The moving finger' নামক রহস্যোপন্যাসে দেখিয়েছেন—একটি ছোট মেয়ে স্কুলের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলছে, ''এত রকমের বাজে জিনিসও শেখানো হয়। ধর— ইতিহাস। প্রত্যেক বইতে আলাদা বর্ণনা।'' উত্তরে প্রবীণ অভিভাবক বলেছিলেন ''That is its real interest'' এখানেই ইতিহাসের বিশেষত্ব। এর স্বরূপ, লক্ষ্য, আদর্শ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ''It is a movement in time''. সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন থেমে নেই, এ নিয়ত প্রবহমান ও গতিশীল। এই গতিশীলতাই ইতিহাসের প্রাণ। ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে এবং ঐতিহাসিক ও গবেষকের কর্তব্য হলো ইতিহাসে প্রবহমানতা, পরিবর্তন এবং স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপ ও প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি এদের মধ্যে কিছু কিছু অস্তিত্ব বজায় রাখে, আবার কিছু কিছু বিলীন হয়ে যায়।

তবে ইতিহাসে কল্পনার কোনো স্থান নেই, নেই কবির মতো ভাবাবেগের স্থান, ইতিহাস নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যকেই প্রকাশ করে। ইতিহাস বিজ্ঞানের মতই প্রশ্ন করে কি? কেন? এবং কিভাবে? ইত্যাদি। তারপর যুক্তি, বোধ, বাস্তবতার প্রয়োগে রচিত হয় ইতিহাস।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্‌গণ ইতিহাসের অগ্রগতি বা প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন যুগে মানবসমাজের বিবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, ইতিহাস একটি লিপিবদ্ধ বিবরণী যাতে মানুষের জীবন বা সমাজের কাহিনী থাকবে। যে সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ অতিক্রম করে বিবর্তিত হয়েছে সেই পরিবর্তনের কথা থাকবে, যে সব চিন্তা বা আদর্শ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করেছে তার বিবরণ থাকবে এবং সকলের শেষে যে বাস্তব প্রেক্ষাপট বা অবস্থা সেই মানুষের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে বা বাধা দিয়েছে তার বিবরণও থাকবে। ইতিহাস বলতে বোঝায় 'total history' বা সামগ্রিক ইতিহাস। এতে মানুষের সার্বিক ক্রিয়াকলাপ ও তার সমাজের পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এসেছে সংস্কৃতির (culture) কথা। ইতিহাসের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়। সংস্কৃতি হল মানুষের সেই সব বস্তুগত এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিগত ফলাফল; যার মাধ্যমে সে তার জৈবিক ও সামাজিক জীবনের প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে।

১.১.১.১.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। What is history–E. H. Carr
কাকে বলে ইতিহাস?—(বঙ্গানুবাদ—স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত)

২। Mare Bloch—The Historian's Craft

৩। R. G. Collingwood—The Idea of History

৪। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

৫। সুশোভন সরকার, (ক) প্রসঙ্গ ইতিহাস

(খ) ইতিহাসের ধারা

৬। মমতাজুর রহমান তরফদার—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।

৭। সুকান্ত পাল—ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শন।

৮। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী—ইতিহাস নানাবিধ।

১.১.১.১.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিরূপণ করো। এক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও জটিলতার কারণগুলি উল্লেখ করো।

২। উনিশ ও বিশ শতকের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের স্বরূপ ও সীমা কিভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন?

৩। ''Historical objectivity'' বলতে কি বোঝায়? ইতিহাসকে 'objective' করতে হলে কোন পথে বা উপায়ে করা যেতে পারে?

৪। বিংশ শতকে মূল্যায়নধর্মী ইতিহাসের উদ্ভব ও গুরুত্ব বিচার করো।

৫। ঐতিহাসিকদের প্রধান সংজ্ঞার ভিত্তিতে ইতিহাসের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব আলোচনা করো।

৬। ''To define history definitely or accurately is a preposterous proposition''— তুমি কি একমত?

উপ-এককক - ২

Debate among historians about the relative importance of facts and interpretations in History

১.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

(২) 'objective' ইতিহাসের গুরুত্ব

(৩) 'subjective' ইতিহাসের গুরুত্ব

(৪) আধুনিককালে ইতিহাসচর্চা কিভাবে করা যুক্তিযুক্ত।

১.১.১.২.১ ঃ ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

ঊনিশ শতকের শেষ পর্বে এবং বিশ শতকে একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে এসে পড়েছিল। প্রশ্নটা হলো, ইতিহাসের পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে ঘটনাগত সত্যতা রক্ষা ছাড়া ঐতিহাসিকের আরও কিছু মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? বিশ শতকের শুরু থেকে একদল ঐতিহাসিক মনে করতে থাকেন যে, ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয়, এমনকি তা শুধু সত্য ঘটনা হলেও নয়, বরং এর সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা। এই চিন্তাধারা ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখা দিল বিতর্ক। বিতর্কের বিষয় ঃ ইতিহাস লেখার পদ্ধতি। প্রখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে এবং তাঁর সমর্থকগোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ বললেন, ইতিহাস কেবল তথ্য দিয়েই তার কাজ শেষ করবে। মূলতঃ তথ্যের উপস্থাপনাই ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ। তবে এই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ ও সৎ। নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করবেন, যা হবে এক পরীক্ষিত সত্য। এই মতামতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেনেদেত্তো ক্রোচে এবং তার প্রবল সমর্থকগোষ্ঠীয় ঐতিহাসিকগণ বললেন, ঐতিহাসিক শুধু তথ্য উপস্থাপন করেই তার কাজ শেষ করবে না, তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণও তার অন্যতম প্রধান কাজ।

বিশ শতকের শুরু থেকে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক দেখা দেয়। ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয় বরং এর সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার। তার সাথে ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ ও সৎ।

প্রশ্ন

১। বিশ শতকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা যায়?

২। ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিককে কি রকম হওয়া প্রয়োজন?

উনিশ শতকের প্রায় গোটা সময়টাই ইতিহাসচর্চা র‍্যাঙ্কের পথ ধরেই চলেছিল। তথ্যের দিক থেকে উনিশ শতক ছিল এক মহান যুগ। 'কঠিন সময়' (হার্ড টাইমস্) উপন্যাসে গ্র্যাডগ্রিণ্ড বলেছিলেন, 'আমি যা চাই তা হলো তথ্য। জীবনে শুধু তথ্যই চাই। উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা মোটের উপর তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে র‍্যাঙ্কে মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, 'আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো।' উনিশ শতকে এই বীজমন্ত্রই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। এর ফলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বস্তুগত বা বিষয়গত (objective) দিকের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। এই 'objective history'-এর সার্থক প্রবক্তা র‍্যাঙ্কের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ হল 'strict presentation of facts' অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা। ইতিহাস রচনায় তথ্য একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইতিহাসে কল্পনার বা আবেগের কোনো স্থান নেই। ঐতিহাসিক কেবলমাত্র সঠিক তথ্য থেকে সংগৃহীত সত্য ঘটনাবলী পাঠকদের কাছে তুলে ধরবেন। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পাঠকদের, ঐতিহাসিকদের নয়।

*উনিশ শতকের ইতিহাস ছিল তথ্যের দিক থেকে এক মহান যুগ। এই সময় র‍্যাঙ্কের মতে ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ ছিল **'Strict presentation of fact'** অর্থাৎ একনিষ্ঠা সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপন করা। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পাঠকদের ঐতিহাসিকদের নয়।*

প্রশ্ন ১। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে 'Strict Prsentation of fact' কি?

ঐতিহাসিক বিউরীও (Bury) প্রায় এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁর মতে, ''History is a Science, no less and no more'' অর্থাৎ ''ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নয়।'' ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখতে হবে, কিন্তু তা কখনও সীমা লঙ্ঘন করে যাবে না। সুতরাং তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লষণের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন, বিশ্লষণ বা মূল্যায়ন করতে গেলেই ঐতিহাসিক তাঁর সীমা লঙ্ঘন করবেন, কখনও বেশি বলবেন, কখনও কম বলবেন। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি এবং ঐতিহাসের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে।

বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যা নিভর ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধবাদী ঐতিহাসিকেরা এ ধরনের ইতিহাসচর্চার আরও নানা বিপদের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, তথ্যের বিশ্লেষণ শুরু হলে, তা কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের চোখে একই ঘটনা নানাভাবে ধরা পড়বে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক একই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবেন। এর ফলে বিভিন্ন মতাদর্শ গোষ্ঠীর বক্তব্যে তার নিজস্ব মতাদর্শ বড় হয়ে দিতে পারে। এর ফলে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতা, সততা, নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস রচনার স্বচ্ছতা থাকবে না।

বিউরির মতে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। তবে ইতিহাস লেখার সময় তার সীমালঙ্ঘন না করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন। তা না হলে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা, সততা ও স্বচ্ছতা থাকবে না।

প্রশ্ন ১। History is a science, no less and no more এটি কার উক্তি ও এর অর্থ কি?

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাতদর্শ গোষ্ঠী ইতিহাসচর্চায় গোষ্ঠীগত মতাদর্শকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একই ঘটনাকে ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ভিন্ন চোখে বিচার-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি ও অর্ধসত্য ধরা পড়েছে। খণ্ডিত ইতিহাসচর্চার রূপটিওধরা পড়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কে দায়ী এই প্রশ্নে ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে বিভক্ত। কেউ জার্মানিকে দায়ী করেছেন, কেউ রাশিয়াকে, কেউ আমেরিকাকে, আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গ-ফ্রান্স তোষণ নীতিকেই এর জন্য দায়ী বলে মতামত দিয়েছেন। এর কারণ হল, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার সময় ঐতিহাসিকেরা তার দেশ, দেশপ্রেম, তার মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে পারেন না। এর ফলেই ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি বা ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে। এইসব কারণেই বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকগণ এই বিপদের কথা ভেবে শুধু তথ্যের উপস্থাপনা করেই নিজেদের কাজ শেষ করেছেন। তাঁদের মতে, একমাত্র 'objective' দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস রচনাই এইসব বিভ্রান্তি বা বিকৃতি দূর করতে পারে।

আধুনিককালে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটা গোষ্ঠীগত মতাদর্শ বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এর ফলে একই ঘটনা বিভিন্ন গোষ্ঠীর চোখে ভিন্ন ভিন্ন দেখাচ্ছে। এ কারণে বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকরা শুধু তথ্যের উপস্থাপনা করে নিজেদের কাজ শেষ করছেন।

প্রশ্ন ১। আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন গোষ্ঠীগত মতাদর্শটা কি?

অন্যদিকে লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যানির্ভর ইতিহাসচর্চার দিকটিকে জোরালো সমর্থন করেছেন। এঁরা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'উপলক্ষ্যগত' (subjective) দিকগুলির উপর জোর দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে ঐতিহাসিক তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা না করলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরের রহস্য উন্মোচিত হতে পারে না। এই বিতর্কের সূত্র ধরে 'value judgement' কথাটি প্রযুক্ত হতে থাকে। অর্থাৎ বিতর্কটি এই ধরনের রূপ গ্রহণ করে যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের 'value judgement' বা মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি না? লর্ড অ্যাকটন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছাড়া ইতিহাসচর্চা অর্থহীন ও আকর্ষণহীন। অ্যাক্টনের মতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবদান হল মানুষের মধ্যে সুস্থির চেতনার জাগরণ ঘটানো। তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই তা একমাত্র করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে ইতিহাসকে 'নীরস শুষ্ক কাষ্ঠ' থেকে রেহাই দিতে হবে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন ছাড়া কোনো পথ নেই। তবে তারা এটাও মনে করেন যে, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে সততা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে আসল সত্য মানুষের সামনে উপস্থাপিত করার মহান দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য ঐতিহাসিকদের। ঐতিহাসিককে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হলে তাদের তথ্য বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিতে হবে বলে বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন

***Subjectivist* তথা *Lotd Action*-এর মত ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যানির্ভর ইতিহাস চর্চার দিকটিকে জোড়ালো সমর্থন করেছেন। এদের মতে ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছাড়া ইতিহাস চর্চা অর্থহীন ও আকর্ষণহীন। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবদান হল মানুষের সুস্থির চেতনার জাগরণ ঘটানা।**

জগৎ বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক থুডিডিডিস। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বিশ্লেষণ ও নৈতিকতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তথ্য উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সমাজকে নৈতিকতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'Value judgement' কথাটির অর্থ কি?

ঊনিশ শতকে ইউরোপে দৃষ্টিবাদী বা Positivist ঐতিহাসিকেরা আরও এক ধাপ এগিয়ে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেন। কোৎ, বার্কলে প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে তার থেকে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বের করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কেউ কেউ আবার বলেন, ''History is social physics'' অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল, বিজ্ঞান যেমন কতকগুলি সূত্র অনুযায়ী চলে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র দিয়ে যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি ইতিহাসেরও সূত্র বা নিয়মাবলী রয়েছে। ইতিহাসের নিয়মবিদ্যা বা সূত্র নির্ণয় করে তা দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা যায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে চালিত করা যায়। অতএব ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং তা রাষ্ট্র ও সমাজের নানা উপকার সাধন করতে পারে।

Positivitist বা দৃষ্টিবাদীদের মতে ইতিহাস হল বিজ্ঞানের সমতুল্য 'History is social physics' বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসও কতগুলি সূত্র বা নিয়মাবলী মেনে চলে যে নিয়মবিদ্যা রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস চর্চায় Positivitist ঐতিহাসিকদের যুক্তি কি?

বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চার প্রবক্তারা মনে করেন যে একমাত্র তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা মূল্যায়নের ফলেই কোনো তথ্যের গুরুত্ব ও নানা দিক উন্মোচিত হতে পারে। কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বিবরণ দিলেই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। এই বিবরণ পাঠক সমাজের কাছে অনেক প্রশ্ন জাগাতে পারে। কারণ বিপ্লব বা বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকের মনে নানা কৌতূহল সৃষ্টি হতে পারে। ঐতিহাসিকের কাজ পাঠক সমাজের সেই কৌতূহল দূর করা। কোনো ঘটনা বা বিদ্রোহ ঠিক কি কারণে ঘটেছিল তা সবার জানা দরকার। ঐতিহাসিকই কেবলমাত্র কারণের গভীরে প্রবেশ করে অন্তর্নিহিত কারণগুলি খুঁজে বের করতে পারেন। এই কারণগুলি জানতে পারলেই পাঠক সমাজের কাছে ইতিহাসের আকর্ষণ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে একসময়ে ঐতিহাসিকেরা সামরিক ও রাজনৈতিক কারণকে বড়ো করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায়

বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস চর্চার প্রবক্তাদের মতে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বিবরণ দিয়েই ঐতিহাসিকের কাজ শেষ নয়। ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ হল বিপ্লব বা বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকের মনে জাগ্রত নানা কৌতূহল দূর করা। একমাত্র তথ্যের বিশ্লেষণ বা গভীর অনুসন্ধানের ফলেই তা দূর করা সম্ভব।

আরও অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ আধুনিক ঐতিহাসিকদের ইতিহাসচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। একমাত্র তথ্য বিশ্লেষণের ফলেই এবং গভীর অনুসন্ধানের ফলেই তা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্দুদেশের রাজা দাহির আরবীয় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কি কারণে পরাস্ত হয়েছিলেন? সাধারণভাবে জানা যায় মুসলমানদের সামরিক শক্তির তুলনায় তাঁর সামরিক শক্তি দুর্বল ছিল বলে তার পরাজয় ঘটে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন যে সামাজিক দিক থেকে রাজা দাহিরের পূর্বেই পতন ঘটেছিল। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের একটা সংঘাত সবসময়েই ছিল। রাজা দাহির ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সিন্ধু দেশের বৌদ্ধরা রাজার প্রতি তাদের সমর্থন তুলে নিয়েছিল। রাজা দাহিরের পরাজয়ের এই সামাজিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই।

প্রশ্ন ১। বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস চর্চার প্রবক্তারা ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর জোর দেন?

ঐতিহাসিক কার (Carr)-এর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এই যে, কেউ যদি সত্যিই ঐতিহাসিক হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে, যে দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদরা 'প্রদান' ও 'প্রতিদান' বলেন সে দুটি একসঙ্গে চলতে থাকে এবং আসলে তারা একই প্রক্রিয়ার দুটি অংশ। আর কেউ যদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন এবং আরেকটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে সেই ঐতিহাসিক দুটি বিপ্রবণতার একটিতে পড়ে থাকেন। হয়, তিনি অর্থহীন, তাৎপর্যহীন 'কাঁচি ও আঠা' মার্কা ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার-কাহিনী বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি আরও বলেন, এর ফলে অতীতের তথ্যকে শুধু একধরনের লেখায় নক্‌শা করার কাজে ব্যবহার করা হবে, যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে, ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক— সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো গবেষণারত ঐতিহাসিক যেমন আছেন, তিনি যখন চিন্তা করেন ও লেখেন তখন যদি কি করছেন তা ভাবার জন্য থামেন, তাহলে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে তথ্যকে গড়ে-পিঠে নেওয়ার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ায় তিনি নিযুক্ত থাকেন। এটা আগে, ওটা পরে— এমন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য—দু-এরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক চলতে পারেন না, তিনি ব্যর্থ হবেন। আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন।

অর্থনীতিবিদরা যেমন দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থাৎ 'প্রদান' ও 'প্রতিদান'-কে একসাথে চলার কথা বলেন। ঐতিহাসিক তেমনি ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্যের এই দুয়ের কথা বলেন। কারণ তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যরাও মৃত ও অর্থহীন।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও তথ্যের গুরত্ব কতখানি?

১.১.১.২.২ ঃ উপসংহার

অতএব কার (Carr)-এর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তথ্যকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করার জন্য ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হয়েছে। আবার একইসঙ্গে তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক তার কাজে ব্যর্থ হবেন। তাই বিশ্লেষণপন্থী ও বিশ্লেষণবিরোধী ঐতিহাসিকদের বিতর্কের জের টেনে বলা যায়, উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধে যুক্তি থাকলেও কতকগুলি বিষয়ে উভয়েরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সত্য ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন এই মতের প্রবক্তাদের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি নীরস তথ্য পর পর উপস্থাপনা ইতিহাসের আকর্ষণ ও ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কমিয়ে দেবে। আবার বিশ্লেষণপন্থী ঐতিহাসিকদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস তথ্য বিশ্লেষণের সময় জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রাপ্ত তথ্যের বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাঁর বিশ্বাস, মতাদর্শের ঝোঁক অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হওয়ার প্রবণতা থাকবে। এই আশঙ্কার কথাই বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকেরা জোরের সঙ্গে বলে থাকেন এবং তাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। সব সত্ত্বেও বলা যায়, উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই সত্যতা আছে। আবার দুপক্ষেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সতর্ক ও সততা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসচর্চা করতে হবে। তা না হলে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হবে, আর হয়তো বা কোনো ঐতিহাসিক সত্যকে লঘু করে দেখাবার ঝোঁক দেখা দিবে। অতএব ঐতিহাসিক যে পক্ষেরই হোক না কেন, তাঁকে ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পাঠক সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তবে আধুনিক যুগে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ব্যাখা বা বিশ্লেষণই বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। একইসঙ্গে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নানা মতাদর্শের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের বিকৃতি ঘটছে। ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ; বিশ্বাস, ধ্যানধারণা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সময় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এর ফলে সেই ইতিহাসের তথ্যে বিকৃতি ধরা পড়ছে, ইতিহাসচর্চা হচ্ছে খণ্ডিত ও অর্ধসত্য। ইতিহাসের এই বিপদ সম্পর্কে সমগ্র ঐতিহাসিক সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে।

১.১.১.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — অমলেশ ত্রিপাঠী

২। প্রসঙ্গ ইতিহাস — সুশোভনচন্দ্র সরকার

৩। ইতিহাসের ধারা — সুশোভনচন্দ্র সরকার

৪। ইতিহাস নানাবিধ — লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

৫। What is History? — E. H. Carr
বঙ্গানুবাদ ঃ কাকে বলে ইতিহাস — অনুবাদক ঃ স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র দত্ত

৬। ইতিহাস ও ইতিহাসদর্শন — সুকান্ত পাল

৭। P. Geyl — Debates with Historians.

৮। G. R. Elton — The Practice of History

৯। P.L. Gardiner — The Philosophy of History

১.১.১.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

২। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছে তা আলোচনা করো। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তুমি কোন্‌টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো?

৩। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের বক্তব্য আলোচনা করো।

৪। আধুনিককালে বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চার গুণাগুণ বিচার করো।

একক ২

Collection and Selection of Data : Evidence and its Transmission

বিন্যাসক্রম ঃ

১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.২.১ ঃ সূচনা

১.১.২.২ ঃ ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহ ও নির্বাচন

১.১.২.৩ ঃ প্রামাণ্য তথ্য ও লিখন পদ্ধতি

১.১.২.৪ ঃ উপসংহার

১.১.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঐতিহাসিক তথ্য বলতে কি বোঝায়

(২) তথ্যের উৎসসমূহ ও নির্বাচন পদ্ধতি

(৩) তথ্যের লেখার নিয়মবিদ্যা — গ্রহণ ও বর্জন নীতি

(৪) বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্ব।

১.১.২.১ ঃ সূচনা

জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ইতিহাসচর্চার নিজস্ব গবেষণা ও লিখন পদ্ধতি আছে। সাধারণভাবে বলা হয় সাক্ষ্য বা প্রামাণিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেন। তবে তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণজনিত জটিলতার নিরিখে ঐতিহাসিকগণ যথোপযোগী ইতিহাস লিকন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে সকলকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

১.১.২.২ ঃ ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচন

একজন ঐতিহাসিক কিভাবে ইতিহাস লেখারা কাজে অগ্রসর হবেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সচরাচর দেখা যায় ঐতিহাসিক তাঁর কাজকে সরাসরি দুই পর্যায় ভাগ করে নেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি গবেষণাধীন বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী স্বীয় নোটখাতায় লিপিবদ্ধ করেন। এ প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর তিনি উৎসসমূহ রেখে দেন, সংগৃহীত নোট নিয়ে বসে পড়েন এবং প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত লিখে কাজ শেষ করেন।

ইতিহাস রচনার এ পদ্ধতিটি খুব একটা সুবিধাজনক বা গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। সঠিক পদ্ধতি হিসেবে নির্বাচিত বিষয়ের উপর প্রধান উৎসসমূহের গভীর অনুশীলনের পর ঐতিহাসিকের মনে যখন বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণার জন্ম নেয় তখনই লেখা আরম্ভ করা প্রয়োজন। এরপর তথ্যানুসন্ধান, পড়া ও লেখা পর্যাক্রমে চলবে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকাতালে লেখা বাড়ানো হয়, বাদ দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঢেলে সাজানো হয়। লেখা পড়াকে পথনির্দেশনাদেয় এবং নিয়ন্ত্রণও ফলপ্রসূ করে। ঐতিহাসিক যতই লেখার কাজে অগ্রসর হন ততই তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর আর কি খোঁজা দরকার এবং পাওয়া যায় তার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তার কাছে বেশি করে প্রতিভাত হয়। তথ্যানুসন্ধান ও লিখন, যে দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন (input) ও উৎপাদিত (output) দ্রব্য বলতে পারা যায় তা পর্যায়ক্রমে ঘটনা থাকে। এটা একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক মাত্র। একাজ হল 'প্রদান' ও 'প্রতিদান'। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক যাদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন বা আরেকটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে তিনি দুপ্রকারের ভ্রান্তির কোনো না কোনোটিতে পড়ে যাবেন। হয়, তিনি অর্থহীন, তাৎপর্যহীন জোড়াতালির ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার কাহিনী বা রহস্য উপন্যাস বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ ধরনের কাজে অতীতের তথ্যাবলীকে শুধু নক্শা করার কাজে ব্যবহার করা হবে যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

যেহেতু ইতিহাস উৎসভিত্তিক সে কারণে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাস গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উৎসের অনুসন্ধান করতে হয়। ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ হল তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং তা যাচাই করে ব্যাখ্যা করা। কার অতীতের সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয়।

এখন প্রশ্ন হল, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে কিকি নিয়মবিদ্যা অনুসরণ করেত হবে? কিভাবে তিনি উৎসব সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হবেন? উৎস গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ নীতি অনুসরণ করবেন? ইতিহাস গবেষণায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উৎসের (source) অনুসন্ধানে লাগতে হয়। ইতিহাস উৎসভিত্তিক, উৎস ছাড়া ইতিহাস হয় না। উৎসও আবার নানা ধরনের—(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন লিপি, মুদ্রা, জীবাশ্ম, হাড়গোড়, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবাপত্র, সৌধচিহ্ন, ইত্যাদি।(খ) মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত বিশ্বাস বা প্রথা যেমন অতিকথন, রূপকথা, কাহিনীমালা, পালা, গান ইত্যাদি, (গ) ছবি ভিত্তিক উপাত্ত যেমন নক্শা, মানচিত্র প্রভৃতি, (ঘ) দলিল, দস্তাবেজ, প্রত্নলেখ ইত্যাদি। লিখিত বিবরণ-এর মধ্যে অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভ করে সকল সন্ধি, চুক্ত, দিনলিপি, মুদ্রিত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, চিঠি এবং মহাফেজখানায় রক্ষিত আরও নানা ধরনের উৎস।

এইসব উৎস থেকে ঐতিহাসিকের কাছে নানা তথ্য আসে। তিনি সেগুলো জড়ো করেন, বাড়ি নিয়ে যান, রান্না করেন এবং তাঁর পছন্দ অনুযায়ী যে কোনোভাবে পরিবেশন করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ হলো যাচাই করা তথ্যের সংগ্রহ, এরপর তথ্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তথ্য যাচাই করে নেবার পর ব্যাখার কাজে অগ্রসর হতে হবে। কারণ অতীতের সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয় বা ঐতিহাসিকের সেগুলোকে ঐভাবে বিবেচনা করেনা না।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ কি।

১.১.২.৩ ঃ প্রামাণ্য তথ্য ও লিখন পদ্ধতি

ঐতিহাসিক তথ্য বলতে কি বোঝায়? এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। লোকচলতি মতে এমন কিছু মৌলিক তথ্য আছে যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান এবং বলা যায় যে, সেগুলো ইতিহাসের মেরুদণ্ড তৈরি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো বড় যুদ্ধের সন্ তারিখ সম্পর্কে বা কোনো বড় ঘটনার সন্ কারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকের 'নির্ভুল হওয়াটা কর্তব্য, কোনো সদ্‌গুণ নয়।' এটি তাঁর কাজের প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু মূল কাজ নয়। ঠিক এইভাবে কাজের জন্য ঐতিহাসিককে 'ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞা' বলে যা পরিচিত তার উপর নিভরশীল হতে হয়। যথা প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নলেখবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব, কালানুক্রম ইত্যাদি। মাটির বা মার্বেল পাত্রের টুকরোর উৎপত্তি ও পর্ব নির্ধারণ, কোনো দুর্বোধ্য প্রত্নলেখের পাঠোদ্ধার বা কোনো তারিখ সঠিক প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ জ্যোতিবিজ্ঞানভিত্তিক গণনা—এই সবেরই জন্য একজন বিশেষজ্ঞের যে বিশেষ দক্ষতা লাগে তা ঐতিহাসিকের থাকার দরকার নেই। যেমন পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। এটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য তথ্য। এইসব তথ্যকথিত ভিত্তিস্থানীয় তথ্য— যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান— সাধারণতঃ ইতিহাসের নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিকের কাঁচা মালের পর্যায়ে পড়ে। ঐতিহাসিকের মহান দায়িত্ব হল, বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস। তথ্য নিজেই কথা বলে এটি ঠিক নয়। তথ্যরা একমাত্র তখনই কথা বলে যখন ঐতিহাসিক তাদের ডাক দেন, তিনিই ঠিক করেন কোন্ তথ্যকে তিনি বলতে দেবেন, কোন্ ক্রমে বা কোন্ প্রসঙ্গে পলাশীতে যে ১৭৫৭ সালে যুদ্ধ হয়েছিল তা জানার পাটকদের আগ্রহী হওয়ার একমাত্র কারণঃ ঐতিহাসিক এটিকে ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা বলে মনে করেন। অধ্যাপক ট্যালকট্ পারসন্‌স একবার বলেছিলেন, বিজ্ঞান হলে 'বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানাত্মক বোধশক্তির নির্বাচনমূলক পদ্ধতি'। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসও তাই। ঐতিহাসিককে ঘটনা বাছাই করতেই হয়। ইতিহাসের তথ্য ও অতীত সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। অল্পসংখ্যক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বাছাই করে সেগুলোকে ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত করা এবং প্রচুর তাৎপর্যহীন তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে বাদ দেওয়া— এই দুই দায়িত্বই হল ঐতিহাসিকের। মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ব্যারাক্লো মন্তব্য করেছিলেন, 'যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সঠিকভাবে বলতে গেলে তথ্যবিত্তিক নয়, বরঞ্চ এক সারি স্বীকৃত অভিমত।'

ঐতিহাসিক বিউরী প্রাচীন ও মধ্যযুগ—এই দু-যুগই নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বিভিন্ন নথি নানারকম ছিদ্রে ভরা'। এর বড় কারণ হল তথ্য বাছাই-এর ক্ষেত্রে নানা ভ্রান্তি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের গ্রীস সম্পর্কে আমাদের জানা ইতিহাসে দোষত্রুটি থাকার প্রধান কারণ এই নয় যে এর অনেক টুকরো দুর্ঘটানাক্রমে হারিয়ে গেছে। আসল কারণ হল ঃ এই ইতিহাসটা তৈরি হয়েছে মোটামুটি এথেন্স শহরের ছোট একদল লোককে নিয়ে। এথেন্স-এর একজন নাগরিকের চোখে পঞ্চম শতকের গ্রীগ কেমন ছিল আমরা তার অনেক কিছুই জানি, কিন্তু স্পার্টা, করন্থ বা থিবস্-এর নাগরিকের কাছে তা ছিল সে বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। পার্সিয়া, দাস বা অন্যান্য অনাগরিক বাসিন্দাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এর কারণ এ ধরণের ইতিহাস আগের থেকেই আমাদের জন্য নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয়েছে। আর তা হয়েছে, যতটা দুর্ঘটনাক্রমে, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু মানুষের মাধ্যমে, যাঁরা সচেতন বা অবচেতনভাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে শুধু সেইসব তথ্যই সংরক্ষণযোগ্য যেগুলো তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। ঠিক একইভাবে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের তথ্য বলতে আমরা যা জানি তার প্রায় সবই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কালপঞ্জিকারেরা বাছাই করে গেছেন। পেশাগতভাবে এঁরা ধর্মের তত্ত্ব ও চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ফলে ধর্মকে তাঁরা চূড়ান্ত মনে করতেন ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ব্যাপার নথিবদ্ধ করেছেন, তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেননি। আর ঊনিশ শতকের ঐতিহাসিকেরা নীরস তথ্যভিত্তিক ইতিহাস আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তথ্যের বিষয়ে ঊনিশ শতকের লেখকদের অন্ধভক্তি পরিণত হয়েছিল দলিল দস্তাবেজের প্রতি অন্ধভক্তি। এঁদের তথ্যের মন্দিরে দলিল-দস্তাবেজ ছিল বিগ্রহস্বরূপ। কিন্তু এই সমস্ত দলিল ফতোয়া, চুক্তিপত্র, খাজনার হিসাব, সংসদীয় বিবরণ, সরকারি পত্রালাপ, ব্যক্তিগত চিঠি ও দিনপঞ্জী খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, দলিল লেখক যা ভেবেছিলেন, কোনো দলিলই তার থেকে বেশি কিছু জানাতে পারে না— যা ঘটেছিল বলে তিনি ভেবেছেন, যা হওয়া উচিত বা হতে পারে বলে তিনি ভেবেছেন। এর কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না যতক্ষণ না ঐতিহাসিক এদের বিচার করে অর্থ উদ্ধার করেন। দলিলে পাওয়া যাক বা না যাক, তথ্যকে যে-কোনোরকমে ব্যবহারের পূর্বে ঐতিহাসিককে তো তা মাপসই করে নিতে হবে। অতএব ইতিহাস লিখন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সংশ্লেষণ। গবেষণাহীন বিষয়ের উপর উৎস জোগাড় এবং উৎসের ব্যাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর যে বিপুল তথ্যের পাহাড় তখনও থেকে যায়, তার বর্জন। তার সবগুলো ইতিহাসে অন্তভুক্ত করা যায় না। শেষ ধাপে ঐতিহাসিককে তার বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী বাছাই করে নিতে হয়। নির্বাচন, তথ্য গ্রহণ-বর্জনের এ পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাধীন বিষয় যত জটিল, ব্যাপক ও বিস্তযত হবে, ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ বর্জনের পালাও তত কঠিন হয়।

ঐতিহাসিকের মহান দায়িত্ব হল বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস। ঐতিহাসিক প্রচুর পরিমাণে তথ্য জোগাড় করেন। কিন্তু তার সবগুলো ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করনে না। গবেষণাধীন বিষয়ের উপর উৎস জোগাড় এবং উৎসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর শেষ ধাপে ঐতিহাসিককে তার বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্যবলী বাছাই করে নিতে হয়।

গ্রহণ-বর্জন করে ইতিহাস প্রণয়নের সময় ঐতিহাসিককে তথ্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা দিকে নজর দিতে হবে। তথ্যের সঠিকতা ও মৌলিকত্ব যাচাই-এর মাধ্যমে উৎসের ভিতর কোনো জালিয়াতি, জুয়াচুরি, ভাঁওতাবাজি প্রভৃতি থাকলে তা খুঁজে বার করতে হবে। অনেক সময় লিপিকার, নকলনবিশ বা অনুবাদকদের গাফিলতির জন্য প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে বেশ ভুল ভ্রান্তি প্রবেশ করে। উৎস ব্যবহারের পূর্বে খুব সাবধানে ঐতিহাসিককে এ সকল অপূর্ণতা দূর করতে হবে।

উৎস বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ধাপ হল অভ্যন্তরীণ সমালোচনা। লিখিত উপাদানের মূল্যায়নে ঐতিহাসিককে সর্বদা উৎস প্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবাদর্শ ও উদ্দেশ্য (motivation) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং বর্ণিত বক্তব্য সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে। এজন্য গবেষণাধীন জনগোষ্ঠার ধ্যানধারণা, যুগধর্ম, উপাদানের ভাষা প্রভৃতি ঐতিহাসিকের আয়ত্তে আনতে হবে, বা যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিরে উৎস প্রণেতা বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তা অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন। উৎসের বভীরে প্রবেশ করে সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত এটা একান্ত দরকার। উদাহরণস্বরূপ রাজনীতিবিদদের দিনলিপির কথা বলা যায়। এসব উৎস দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে হয়, কারণ এটা অনেকটা সর্বজনস্বীকৃত যে মানুষ সহজাতভাবে নিজেদের কৃতিত্ব গাঁথা সবাধিক সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তুলে ধরে এবং অপযশ ও দুর্বল দিকগুলো যথাসম্ভব আড়ালে রাখে। সরকারি নথিপত্রের বেলায়ও ঠিক একই কথা খাটে। এসব কাগজপত্রে কিছু বিষয় গোপন ও কিছু বিষয় প্রকাশ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সরকার যখন কোনো বিষয়ে স্বীয় অবস্থায় ব্যাখ্যা, বা বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের যথার্থতা বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য দলিলাদি জনসমক্ষে প্রকাশ করে তখন ব্যাপারটি প্রকটভাবে দেখা যায়। মোট কথা, উৎস ব্যবহারের পূর্বে ঐতিহাসিককে প্রতিটি দলিল প্রণেতার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান এবং আশ্বাস, বিশ্বাস, পছন্দ, অপছন্দ ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তা না হলে উৎসের সঠিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কখনও সম্ভব হয় না।

ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে ও অতীতের মধ্যেকার এক অন্তহীন সংলাপ।

পরিশেষে ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মূল্যায়নে আমাদেরকে বাহ্যত দুই বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যায়। অনেকটা উভয় সংকট পরিস্থিতিতে ইতিহাসের তরী বেয়ে নেওয়া দুষ্কর বলেই মনে হয়। একদিকে ইতিহাসকে তথ্যের নৈর্ব্যক্তিক সংকলন বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চাইতে তথ্যের প্রাধ্যান্য বেশে। অন্যদিকে দেখানো হয় ইতিহাস ঐতিহাসিকের মানসিকতার নিরিখে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিবেদন, যেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে স্বীয় আয়ত্তে আনেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ধারণা মতে, ইতিহাসের ভরকেন্দ্র আছে অতীতে, আবার অন্য ধারণা মতে, এর ভরকেন্দ্র আছে বর্তমানে। অবশ্য উভয় ধারণার কোনোটিই এককভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের পরিস্থিতি যত বিব্রতকর বলে মনে হচ্ছে তত নয়। ঐতিহাসিকের এ বিপজ্জনক অবস্থা মানব প্রকৃতিরই প্রতিফলন। প্রথম শৈশব ও অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ছাড়া মানুষ পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে না ও নিঃশর্তভাবে তার অধীন হয় না। অন্যদিকে, সে কখনোই পরিবেশ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকে না ও তার নিঃশর্ত প্রভুও হয় না। পরিবেশের সাতে মানুষের যে সম্পর্ক, ঐতিহাসিকের সাথে তার বিষয়বস্তুর সম্পর্কও ঠিক তেমনি। ঐতিহাসিক তথ্যের হাতে ক্রীড়নক বা তথ্যের স্বেচ্ছাচারী প্রভু— এই দুই-এর কোনোটাই নন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তথ্যের সম্পর্ক— সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো কর্মরত ঐতিহাসিকই জানেন যে তার ইতিহাস লেখা চলাকালে তিনি অনবরত তথ্যের সাথে ব্যাখ্যার এবং ব্যাখ্যার সাথে তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে থাকেন। এ অবস্থায় একটি থেকে অন্যটির প্রাধ্যান্য বেশি এমনটি ভাবাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞান কি কি?

২। ইতিহাস রচনায় তথ্যের গুরুত্ব কি?

১.১.২.৪ ঃ উপসংহার

তাই ইতিহাস লিখনের সময় ঐতিহসিকের কাজ আরম্ভ হয় বিভিন্ন তথ্যের ও ব্যাখ্যার নির্বাচনের মাধ্যমে। তার কাজ যখন অগ্রসর হতে থাকে তখন পারস্পরিক প্রভাবের কারণে ব্যাখ্যা, নির্বাচন ও তথ্যবিন্যাসে সুক্ষ ও সম্ভবতঃ অচেতন পরিবর্তন এসে যায়। যেহেতু ঐতিহাসিক বর্তমানের এবং তথ্য অতীতের অংশ, তাই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তথ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বর্তমান ও অতীতের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও সংশ্লিষ্ট করে। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক শিকড়হীন ও বিফল। আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। এভাবে বলা যায়, ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং বর্তমান ও অতীতের মধ্যেকার এক অনন্তহীন সংলাপ। সচেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক না কেন ঐতিহাসিকের লেখায় সমসাময়িককালে তার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হবেই।

১.১.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। কাকে বলে ইতিহাস?—ই. এইচ. কার
(বঙ্গানুবাদ ঃস্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত)

২। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।

৩। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—অমলেশ ত্রিপাঠী।

৪। ইতিহাস ও ঐতিহাসদর্শন—সুকান্ত পাল।

৫। ইতিহাসের ধারা—সুশোভনচন্দ্র সরকার।

৬। প্রসঙ্গ ইতিহাস—সুশোভনচন্দ্র সরকার।

১.১.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাসের তথ্য ঐতিহাসিক কোন্ পদ্ধতিতে গ্রহণ করবেন?

২। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লিখনপদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

৩। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎস ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

৫। ইতিহাসের তথ্য ও তার সঙ্গে ঐতিহাসিকের সম্পর্ক আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক ৩

Causation in History

বিন্যাস ক্রম ঃ

উপ-একক-১

১.১.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.৩.১.১ ঃ সূচনা

১.১.৩.১.২ ঃ ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা

১.১.৩.১.৩ ঃ ইতিহাসের কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়া— নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের গুরুত্ব

১.১.৩.১.৪ ঃ দৈবঘটনা বা 'আপতন'-এর (Chance)গুরুত্ব

১.১.৩.১.৬ ঃ উপসংহার

১.১.৩.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.৩.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক-২

১.১.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.৩.২.১ ঃ 'ইতিহাসবাদ' কথাটার অর্থ

১.১.৩.২.২ ঃ ইতিহাসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা —বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক

১.১.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

Causation in History

১.১.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাস 'কার্যকারণ' কথাটির অর্থ।

(২) প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসে 'কার্যকারণে'র প্রভাব ও গুরুত্ব— কিছু দৃষ্টান্ত।

(৩) নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদ কথাটির অর্থ ও গুরুত্ব—নির্ধারণবাদের কিছু দৃষ্টান্ত।

(৪) ঘটনার আকস্মিকতা ও ইতিহাসে এর প্রভাব— কিছু দৃষ্টান্ত।

(৫) কার্যকারণ ও ফলাফল।

১.১.৩.১.১ ঃ সূচনা

ইতিহাসচর্চা হলো কারণ-এর চর্চা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্যকারণ খুঁজে বার করা। ঐতিহাসিক অবিরত প্রশ্ন তোলেন কেন এই ঘটনা ঘটল? কিভাবে ঘটল? আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি এর কোনো সদুত্তর পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি থামতে পারেন না।

১.১.৩.১.২ ঃ ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা

ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ খুঁজে বার করার ইচ্ছাটি অতি প্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ইতিহাসের জনক প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইতিহাস ঘটনার কার্যকারণের উপর বেশেষ জোর দেন। তাঁর রচনার গোড়াতেই তিনি নিজের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন। ''গ্রীক ও বর্বরদের কাজকর্মের স্মৃতি সংরক্ষণ, 'এবং বিশেষত, আর সব কিছু ছাড়াও, তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের কারণ দেখানো।' হেরোডোটাস গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধের কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তিনি শুধু ঘটনাবলীর বর্ণনায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে ঘটনাগুলোর সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। থুকিডিডিসের কার্যকারণ সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা ছিল না বলে অভিযোগ করা হয়। অষ্টাদশ শতকে আধুনিক ইতিহাসতত্ত্বের গোড়াপত্তন শুরুর লগ্নে ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (Montesquieu) তাঁর প্রণীত ''Considerations on the causes of the greatness of the Romans and of their Rise and Decline''

ইতিহাস চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্য-কারণ খুঁজে বার করা। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে ইতিহাসে অতীত কাহিনী পুনগঠনের অর্থই হলো পরম্পরার বর্ণনা করা। কার্য কারণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ার যুক্তি প্রদর্শনের সময় কোন কারণটি প্রাধান্য পাবে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা আবির্তিত হয়।

-নামক ইতিহাস গ্রন্থের শুরুতেই নীতি হিসাবে ধরে নেন, 'প্রতিটি রাজবংশ বা সাম্রাজ্যের উত্থান, অবক্ষয় ও পতনের মূলে কিছু সাধারণ, নৈতিক বা বাস্তব কারণ সক্রিয় থাকে, আর যত কিছু ঘটুক না কেন তা এসব কারণের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।' এরপর 'Spirit of Laws' গ্রন্থে তিনি বিষয়টি আরও বিকষিত ও বোধগম্য করে তোলেন। তাঁর মতে 'এ পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের দৃশ্যমান ফলাফল অন্ধ নিয়তি সৃষ্টি করেছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক ও অসম্ভব'। বরং সবকিছুর পশ্চাতে কারণ লুকিয়ে আছে।

মন্টেস্কুর পর দু'শতাধিক বছর ধরে ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-দার্শনিকরা ঐতিহাসিক ঘটনার কার্যকারণ খুঁজে বার করার চেষ্টায় রত হন। এ কারণগুলি কখনও অধিবিদ্যামূলক, কখনও অর্থনৈতিক, আবার কোনো সময় মনস্তাত্বিক বলে ভাবা হত। মোটের উপর ঘটনার প্রতি যে ধরনের কারণই আরোপ করা হোক না কেন এটা এখন স্বীকৃত সত্য যে ইতিহাসে অতীত কাহিনী পুনগঠনের অর্থই হলো কারণ ও ফলাফলের নিরিখে ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা কার। দার্শনিক ভলতেয়ার যথার্থই বলেন যে, ঘটনার মূলে নিহিত কারণ বিশ্লেষণ ব্যতীত শুধু বর্ণনামূলক ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য নেই। এটা আমাদের কোনো কাজে আসে না এবং আসতে পারে না।

কারণ-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে ঐতিহাসিকের এগিয়ে যাবার প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, তিনি সাধারণতঃ একই ঘটনার জন্য একাধিক কারণ নির্দেশ করবেন। অর্থনীতিবিদ মার্শাল একবার লিখেছিলেন, 'কোনো কারণের ফলের সঙ্গে অন্যান্য নানা কারণের ফল মিলেমিশে থাকে— কোনো একটি কারণের ফল বিবেচনা করার বিষয়ে লোকেদের তাই সর্ব উপায়ে সচেতন করে দেওয়া উচিত যে তাঁরা যেন সেইসব কারণকেও হিসেবে ধরেন।' ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কেন সমাজতান্ত্রি বিপ্লব ঘটে, এর উত্তরে মূলত একজন ঐতিহাসিককে ঘটনার বহু কারণ নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বলশেভিক বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা করার সময় একজন ঐতিহাসিককে রাশিয়ার উপর্যুপরি সামরিক পরাজয়, যুদ্ধের চাপে রুশ অর্থনীতিতে বিপর্যয়, বলশেভিকদের সফল প্রচার, কৃষি সমস্যা সমাধানে জারতন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতা, পেট্রোগ্রাডের কল-কারখানায় দরিদ্র ও শোষিত সর্বহারাদের সমাবেশ, আর লেনিনের কর্মদক্ষতা—সংক্ষেপে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি নানা কারণের উল্লেখ করতে হবে।

ঐতিহাসিকের কারণ উদ্‌ঘাটন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোল তাঁর সৃজনশীলতা। তাঁর কাজ হোল কারণগুলিকে কিছুটা ক্রমপরম্পরায় সাজিয়ে দেওয়া, যাতে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক স্থির হয়। কোনী কারণ বা কারণ পর্যায়কে 'শেষ বিচারে' বা 'চূড়ান্ত বিশ্লেষণে' চূড়ান্ত কারণ বা সব কারণের কারণ গণ্য করা হবে তা স্থির করার জন্যই সম্ভবতঃ এটা করতে হবে। একজন খাঁটি ঐতিহাসিক তার বিষয়টিকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিককে চেনা যায় তাঁর আহুত কারণগুলি দিয়ে। রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের কারণ হিসেবে গিবন মনে করতেন বর্বরতা ও ধর্মের বিজয়। উনিশ শতকের ইংরেজ হুইগ ঐতিহাসিকেরা ব্রিটিশ শক্তি ও সমৃদ্ধির কারণ দেখিয়েছিলেন এমন সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ যা সাংবিধানিক স্বাধীনতার নীতিঘুলিকে ধারণ করে। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গিবন ও উনিশ শতকের বৃটিশ ঐতিহাসিকদের সেকেলে বলে মনে হয়, কেননা কার্যকারণ নির্ধারণে তাঁরা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গণ্য করেননি। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অর্থনৈতিক কারণসমূহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। আসলে কার্যকারণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রদর্শনের সময় কোন্ প্রাধান্য পাবে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা আবর্তিত হয়।

আধুনিককালে বিজ্ঞান একইসঙ্গে 'বৈচিত্র্য ও জটিলাতা' একত্ব ও সরলতা'র দিকে ধাবমান। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রেও এ নিয়মটি সমভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক গবেষণার পরিধি সদা বিস্মৃত ও গভীরতর করে 'কেন' এই প্রশ্নের অধিক থেকে অধিকতর উত্তর খুঁজে বের করছে।

সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনসংক্রান্ত ইতিহাস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি রাজনৈতিক ইতিহাসে জটিলতার বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন এবং মনস্তত্ত্ব ও পরিসংখ্যানের কলাকৌশল ঐতিহাসিকের উত্তরের গণ্ডি ও সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। ঐতিহাসিক অতীতকে অনুধাবনের আগ্রহে বৈজ্ঞানিকের মতো যুগপৎভাবে তাঁর উত্তরের সংখ্যাধিক্য সরলী করতে, এক উত্তর অন্য উত্তরের অধীন করতে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটনাপ্রবাহ ও কারণাদির মধ্যে কিছু না শৃঙ্খলা উপস্থাপিত করতে বাধ্য। ঐতিহাসিককে কারণের সরলীকরণ ও বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গবেষণা কাজ চালিয়ে নিতে হয়। বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও দ্বৈত তথা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন

১। কার্য-কারণ সম্পর্কে মন্টেস্কুর মত কি?

২। ঐতিহাসিকের কারণ উদ্‌ঘাটন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি?

১.১.৩.১.৩ ঃ ইতিহাসের কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়া—নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের গুরুত্ব

এ পর্যয়ে ইতিহাসে কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়ায় দুটি আকর্ষণীয়, কিন্তু বিভ্রান্তিকর বা 'মোহন ফাঁদ' বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এদের একটি হলো (ক) নির্ধারণবাদ (Determinism)বা নিমিত্তবাদ ও অন্যটি অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা, পরিভাষায় যাকে বলে আপতন (chance) বা 'ক্লিওপাট্রার নাক'। (Cleopatras nose)

(ক) নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের সংজ্ঞার্থ হল ঃ এমন এক ধরনের বিশ্বাস যে, যা কিছু ঘটনা তার সবেরই এক বা একাধিক কারণ আছে বেং সেই কারণগুলি যদি অন্যরকম না হতো তাহলে এর চেয়ে আলাদা কিছুই হতে পারত না। আরও সহজ করে এর অর্থ বোঝালে বলা যায়, নির্ধারণবাদ অর্থ হল, তথ্যগুলো একই থাকলে, যা ঘটবেই, কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। অন্যরকম ঘটতে পারে বলে মনে করার অর্থ শুধু এই যে তথ্যগুলো আলাদা হলে তবেই অন্যরকম কিছু হতো। নির্ধারণবাদ শুধু ইতিহাসের সমস্যা নয়, সমগ্র মানবীয় আচার আচরণেরই সমস্যা। প্রত্যেক ঘটনার মূলে কোনো না কারণ নিহিত আছে বলে কথিত স্বতঃসিদ্ধটি আমাদের চারদিকে কি ঘটছে তা বোঝার পূর্বশর্ত। মানুষের াচরণ কার্যকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট এবং এ কারণগুলো সনাক্ত করা সম্ভব— অনুরূপ ধারণা ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রায় অসম্ভব।

সাধারণ মানুষের মত ঐতিহাসিকও বিশ্বাস করেন যে মানুষের প্রত্যেক কাজেরই এক বা একাধিক কারণ আছে যা নীতিগতভাবে নির্ণয় বা অবধারণ যোগ্য। অনুরূপ ধারণা না করলে দৈনন্দিন জীবনের মত ইতিহাসচর্চা ও অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঐতিহাসিকের বিশেষ কাজ ও দায়িত্ব হল এ সকল কারণ অনুসন্ধান করা। এর দ্বারা হয়তো

মনে হবে যে, তিনি মানবীয় আচরণের স্থিরকৃত (Determined) দিকটার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু এতে করে তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপারটি বাদ দেন না। কোনো ঘটনার অনিবার্যতার প্রশ্ন নিয়েও তিনি মাথা ঘামান না। সাধারণ লোকের মতো অনেক সময় ঐতিহাসিক অসার বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় কোনো ঘটনাকে অনিবার্য বলে বর্ণনা করেন। এর দ্বারা তিনি আসলে বোঝাতে চান যে বর্তমান পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন না হলে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা অত্যধিক বেশি। বাস্তবিকপক্ষে ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক তা অনিবার্য বলে ভাবেন না। ইতিহাসে কোনো ঘটনাই অনিবার্য নয়। ঐতিহাসিকদের 'অনিবার্য', 'অবশ্যম্ভাবী', 'অপরিবার্য' ইত্যাদি শব্দ পরিহার করে চলা উচিত।

ইতিহাসের কার্যকরণ উদ্ঘাটনা প্রক্রিয়ায় দুটি মতবাদ প্রচলিত—(ক) নির্ধারনবাদ বা নিমিত্তবাদ (খ) অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা পরিভাষায় যাকে বলে আপাতন যা ক্লিওপাট্রার নাক। নির্ধারণবাদের অর্থ হল, তথ্যগুলো একই থাকলে যা ঘটবেই। কিছুতেই এক অন্যথা হতে পারে না।

'অনিবার্যতা' বিষয়ক সমস্যাটি খুবই অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন বলে মনে হয়। তবুও যে প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে সমসাময়িককালে এর অনুশীলন চলছে তার জন্য বিষয়টির মূলে নিহিত উদ্দেশ্য বা প্রেরণা খুঁজে বের করা দরকার। অনুরূপ চিন্তাচেতনার প্রধান উৎস হিসাবে মানুষের আবেগপ্রবণতা বা 'যদি এমন না হয়ে তেমন হত' চিন্তাধারাকে চিহ্নিত করা যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধুমাত্র সমসাময়িক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতীত ইতিহাস যেমন 'গোলাপের যুদ্ধ' (১৪৮৫) আওমরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬) ইত্যাদির বেলায় অনুরূপ চিন্তা ভাবনা মনে জাগে না। এগুলো আমরা চূড়ান্ত বলেই ধরে নিই। এখানে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হলো— শুধু কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা। এজন্য কেউ ঐতিহাসিককে নির্ধারণবাদী বলে অভিযুক্ত করে না এবং উইলিয়াম বা আমেরিকান বিদ্রোহীরা পরাজিত হলে কি ঘটতে পারত সে বিষয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনা তুলে না ধরায় কেউ তাকে দোষারোপও করে না। কিন্তু নির্ধারণবাদী বা নিমিত্তবাদের সাথে কল্পকথার কোনো সংশ্রব নেই। আসলে ইতিহাসে অনুমানের কোনো স্থান নেই। অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে নিয়ে বা তার ফলাফলকে নাকচ করে দিতে কেহ আগ্রহী নয় বা এগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করারও কিছু নেই। এ জন্য ঐতিহাসিক, যখন ঐ সকল বিষয়ে যবনিকা টানেন তখন কেউ তার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু সামসাময়িক ইতিহাসের বড় সমস্যা হলো এই যে, প্রতিটি ঘটনা ঘটার বিকল্প পথগুলো জনগণের মনে থাকে এবং তাদের পক্ষে ঐতিহাসিকের মতামত গ্রহণ করা কঠিন হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে আবেগপ্রবণ ও অনৈতিহাসিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এ ধরণের 'মাহন ফাঁদ' বা চিন্তা-চেতনা থেকে আমাদেরকে চিরকালের মত মুক্তি পেতে হবে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের কার্যকরণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত দুটি মতবাদের নাম কি?
২। নির্ধারণবাদ কি?

১.১.৩.১.৪ ঃ দৈবঘটনা বা 'আপতন'-এর (Chance) গুরুত্ব

(খ) আপতন (Chance) বা 'ক্লিওপাট্রার নাক' (Cleopatras nose) বা অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা তত্ত্ব অনুসারে ইতিহাসকে কেবল আকস্মিক ঘটনার সংগ্রহ বা সংকলন বলে অভিহিত করা হয়। এখানে

ঘটনাপ্রবাহ দৈবক্রমে যুগপৎভাবে ঘটে যায় এবং ঘটনার কারণ হিসেবে একমাত্র অভাবিত পূর্বপ্রেক্ষিতের উপর জোর দেয় হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে একটিয়াম (Actium) যুদ্ধের ফলাফল ঐতিহাসিক বর্ণিত কারণের প্রতি আরোপ না করে ক্লিওপাট্রার প্রতি এন্টোনিওর মোহাচ্ছন্নতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ১৯২৩ সালের শরতকালে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ এবং স্টালিনের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ট্রট্স্কির পরাজয়কে কেবল হেমন্তকালে হাঁস শিকারে গিয়ে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার উপর আরোপ করা হয়। ঐতিহাসিকের পক্ষে বিপ্লব ও যুদ্ধ সম্বন্ধে আগাম বলা সম্ভব, কিন্তু হেমন্তকালে বন্য হাঁস শিকারে গিয়ে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলশ্রুতি কি হতে পারে তা পূর্বে বলা অসম্ভব। নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের সাথে এর কোনো সংযোগ নেই। ক্লিওপাট্রার জন্য এন্টোনিওর মোহাচ্ছন্নতা বা ট্রট্স্কির ঠাণ্ডা লেগে জ্বর অতি সাধারণভাবে কার্যকারণসূত্রে নির্ধারিত। রমণীর সৌন্দর্য ও পুরুষের মেহাচ্ছন্নতা বা পুরুষের সৌন্দর্য ও রমণীর মোহাচ্ছন্নতা প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ ঘটনা। তবুও বিশ্লেষণের অভাবজনিত কারণে বা বিশ্লেষণের প্রতি অনীহার জন্য অনেকের নিকট আকস্মিক বা দৈব ঘটনাগুলিই বেশি প্রাধান্য পায়। যে সব ব্যক্তি দৈবক্রম বা আকস্মিকতা বা ভাগ্যকে (Fortune) ইতিহাসে বিশ্লেষণের সময় বেশি গুরুত্ব দেয় তারা ঠিক কাজ করেন না।

ঘটনার আকস্মিকতা ইতিহাস প্রক্রিয়াকে কতটুকু প্রভাবিত করে তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। সাধারণভাবে দেখা যায় মন্টেস্কু প্রথম ব্যক্তি যিনি আকস্মিকতার অহেতুক প্রবাব থেকে ইতিহাসচর্চার রীতিনীতিকে রক্ষা করার প্রয়াস চালান। তার মতে যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপার, যেমন যুদ্ধের আকস্মিক ফলাফল একটি রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করে তবে মনে করতে হবে যে সেখানো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাতে করে একটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ই রাষ্ট্রটির অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি বর্তমান না থাকলে একটি মাত্র যুদ্ধের জয়-পরাজয় চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে সক্ষম হতো না। তাই একটি আকস্মিক ঘটনার ফলাফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে উচিত হবে না। কার্ল মার্কসের মতে আকস্মিক ঘটনা ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করে, কিন্তু ঘটনা প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারে না। আবার কোনো কোনো মতে অজ্ঞতার জন্যই আমরা ঘটনার আকস্মিকতার উপর বেশি জোর দিই। সহজভাবে যা বুঝি না তা আকস্মিক বলে আমরা চালানোর চেষ্টা করি। আবার কায়ক্লেশ সাধ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিহার করার উদ্দেশ্য অনেকে দুর্ঘটনাকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে। মোট কথা যারা ইতিহাসকে আকস্মিক ঘটনার সংকলন বলে ধরে নেয় তাদেরকে অলস বা নীচু মানের বুদ্ধিজীবী বলে আখ্যায়িত করা যায়। আন্তরিক ইতিহাস গবেষকরা তথাকথিত আকস্মিক ঘটনাবলীকে মোটেও আকস্মিক মনে করে না। তার এগুলোকে যৌক্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘটনা প্রবাহের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে পর্যলোচনা করে। অবশ্য এর দ্বারাও ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকার যথেষ্ট ব্যাখ্যা মিলে না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আপারন বা ক্লিওপাট্রার নাক তত্ত্ব অনুসালে ইতিহাসকে কেবল আকস্মিক ঘটনার সংগ্রহ বা সংকলন বলে অভিহিত করা হয়। এখানে ঘটনা প্রবাহ দৈবক্রমে যুগোপৎ-ভাবে ঘটে যায় এবং ঘটনার কারণ হিসাবে একমাত্র আভাবিত পূর্ব-প্রেক্ষিতের উপর জোর দেওয়া হয়।

গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে অনেক সময় সাধারণ ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। সকল ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। আবার ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক ঘটনার পার্থক্যও অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় নয়। যখনই কোনো ঘটনা প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় তা ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হতে পারে। কার্যকারণ বিষয়ক ঐতিহসিকের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপভাবে আবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক ও তার তথ্যের মধ্যেকার আবর্তনশীলতার মত ঐতিহাসিক কর্তৃক আরোপিত কার্যকারণ ও ঐতিহাসিকের মধ্যে দ্বৈত ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া বর্তমান আছে। কার্যকারণ ঐতিহাসিকের ইতিহাস প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার ধরণ স্থির করে, আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধরন ঐতিহাসিক দ্বারা আরোপিত কারণগুলি ঠিক করার ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করে। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সার কথা হলো কারণাদির গুরুত্ব অনুসারে ঠিক করা বা কারণাদির মধ্যে আপেক্ষিক বা পারস্পরিক তাৎপর্য নির্ধারণ। ইতিহাসে আকস্মিকতাজনিত সমস্যার সূত্র এখানে পাওয়া যায়। ক্লিওপাট্রার সৌন্দর্য, লেনিনের অকাল মৃত্যু প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনা ইতিহাসের গতিধারাকে পরিবর্তিত করেছিল, এগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ বা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। অন্যপক্ষে যেহেতু এগুলো আকস্মিক ব্যাপার, তাই তারা ইতিহাসের যৌক্তিক বিশ্লেষণে বা তাৎপর্য অনুসারে ঐতিহাসিকের সাজানো কারণাদির মধ্যে স্থান পায় না। ঐতিহাসিকের জগৎ বৈজ্ঞানিকের জগতের মতো প্রকৃতি পৃথিবীর আলোকচিত্রতুল্য প্রতিলিপি নয়, বরং এটাকে কাজ চালানোর মতো একটি প্যাটার্ণ বা আদল বলা যায়, যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক মোটামুটি কার্যকরভাবে একে বুঝতে ও রপ্ত করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ছেঁকে সিদ্ধান্ত বের করেন, অথবা নাগালের মধ্যেকার বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আওতাধীন অতীত অভিজ্ঞতাকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজে লাগান। এটা কার্যকারণ উদ্‌ঘাটনের নির্দেশক বলেও প্রয়োজনে আসতে পারে। ঠিক কি ঘটে, কেন ঘটে তা নিরূপণের জন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যাবলী স্তুপীকৃত করা হয়। তারপর গবেষণাধীন প্রতিপাদ্যের অনুকূলে ও প্রতিকূলে তথ্যাদির গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক ও বিচার বুদিধ সম্পন্ন জ্ঞানের জাল তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আত্মবাদী (subjective) ধারার বাড়াবাড়ির বিপদ থাকলেও ঐতিহাসিক এভাবেই কাজ করে থাকেন।

প্রশ্ন

১। দৈব ঘটনা বা আপাতন তত্ত্ব অনুসারে ইতিহাসকে কি হিসাবে অভিহিত করা হয়?
২। দৈব ঘটনা বা আপাতন তত্ত্বের দুটি উদাহরণ দাও।

১.১.৩.১.৫ ঃ উপসংহার

অতএব বলা যায় যে, ইতিহাস রচনা ঐতিহাসিক তাৎপর্যানুসারে ঘটনাবলীর এক নির্বাচন প্রক্রিয়া মাত্র। ট্যালকট পারসন্‌স যথার্থই বলেন, ইতিহাস শুধু বাস্তবতার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণেই নয়, কারণসম্মত সম্পর্ক নির্ধারণেও 'নির্বাচনমূলক পদ্ধতি'। অনন্ত তথ্যের মধ্য থেকে ঠিক যেভাবে ঐতিহাসিক তার প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ঘটনার তাৎপর্য অনুসারে নির্বাচন করে থাকেন, ঠিক তেমনি সংঘটিত ঘটনার কারণ ও ফলাফলের অজস্র ক্রমের মধ্য থেকে তিনি শুধু সেগুলোই নির্বাচন করেন যেগুলো তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আবার কারণগুলির প্রতি কোনো ঐতিহাসিকের গুরুত্ব আরোপের মান নির্ভর করবে সেগুলোকে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে

খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যে। অন্যান্য কার্যকারণ-পরম্পরাকে আপতন (Chance) বলে বাতিল করতে হয়, কেননা তাদের কার্যকারমের সম্পর্কই যে শুধু পৃথক তা নয়, পরম্পরাটিও অপ্রাসঙ্গিক। এখানে ঐতিহাসিকের করার কিছু থাকে না। যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে এদের কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট করা যায় না বা মেলানো যায় না এবং অতীত ও বর্তমানের ক্ষেত্রে তা অর্থবহও নয়, বরং অপ্রাসঙ্গিক। ক্লিওপাট্রার নাকের সৌন্দর্য, লেনিনের অকাল মৃত্যু প্রভৃতির কিছু না কিছু ফল ছিল। কিন্তু এর থেকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে সুন্দরীর প্রতি মোহাচ্ছান্নের জন্য সেনাপতিদের সামরিক পরাজয় ঘটে তবে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। ঠিক তেমনি ১৯২০-এর দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে সব সংঘাত হয়েছিল তার কারণ হলো, শিল্পায়নের হার বা শহরের লোকদের খাদ্য সরবরাহের জন্য আরও বেশি শস্য উৎপাদন করতে কৃষকদের উৎসাহিত করার সেরা উপায় ইত্যাদি নিয়ে আলাপ আলোচনা বা মতানৈক্য, বা এমনকি প্রতিদ্বন্দী নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষমতার লড়াই ও তাদের উচ্চাকাঙ্খা। এইসব কারণ নিয়ে তখনকার ঘটনা ব্যাখ্যাকরলে সে বক্তব্যকে যুক্তযুক্ত ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এগুলিই ছিল আসল কারণ এবং অন্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেও এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব লেনিন-এর অকালমৃত্যু এই আপতিক ঘটনাটি কারণ নয়। এটিকে রাশিয়ার দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামের কারণ বললে ভুল ব্যাখ্যা হবে। এক্ষেত্রে হেগেলের সেই বহু উদ্ধৃত বাণীটির কথা বলা যায় ঃ 'যা কিছু যৌক্তিক তা-ই বাস্তব এবং যা কিছু বাস্তব, তা-ই যৌক্তিক'। বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে বহুবার এবং ভুল বোঝাও হয়েছে বহুবার।

যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো দেশ, কাল ও অবস্থান ভেদে প্রযোজ্য হতে পারে বলে সেগুলিকে শেষ অবধি ফলদায়ী সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। অপতিক কারণ গুলোর কোনো সাধারণী করন করা যায় না। আর যেহেতু সব অর্থেই সেগুলো অনন্য তাই শেষ পর্যন্ত সেগুলো থেকে না পাওয়া যায় কোন শিক্ষা, না পৌঁছানো যায় কোনো সিদ্ধান্তে।

ইতিহাসের কারণগুলি খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ও আপতিক কারণের মধ্যে পার্থক্য করেন। যুক্তগ্রাহ্য কারণগুলো দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে প্রযোজ্য হতে পারে বলে সেগুলিকে শেষ অবধি ফলদায়ী সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। সেগুলো তাই আমাদের বোধ বিস্মৃত ও গভীর করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগে। অন্যদিকে আপতিক কারণগুলোর কোনো সাধারণীকরণ করা যায় না, আর যেহেতু সব অর্থেই সেগুলো অনন্য তাই শেষপর্যন্ত সেগুলো থেকে না পাওয়া যায় কোনো শিক্ষা, না পৌঁছানো যায় কোনো সিদ্ধান্তে। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার ধারণাটি থেকেই ইতিহাসে কার্যকারণ নির্ণয়ে আমাদের পর্যালোচনার চাবিকাঠিটি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আবার মূল্যায়নের প্রশ্নটিও অবধারিতভাবেই জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের ব্যাখ্যান, বিশ্লষণ সর্বদাই মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আর ব্যাখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কার্যকারণ নির্ণয়। এইখানেই ইতিহাসের দ্বৈত তথা পরস্পর-নির্ভর ভূমিকাটির কথা চলে আসে। আর এই ভূমিকাটি হলো, বর্তমানের আলোয় অতীতকে তথা অতীতের আলোয় বর্তমানকে আরও ভালো করে বুঝতে সাহায্য করা। যা কিছু এই দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হতে পারে না, যেমন ক্লিওপাট্রার নাকের সৌন্দর্যের প্রতি অ্যান্টনির মোহ, ঐতিহাসিকের চোখে তা-ই মৃত ও নিষ্ফল। তবে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতেরও সম্পর্ক রয়েছে। ঐতিহ্যকে এক হাত থেকে অন্য হাতে তুলে দিয়েই ইতিহাসের সূচনা। আর ঐতিহ্য বলতে বোঝায় অতীতের অভ্যাসে ও শিক্ষা ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুবিধার জন্যই শুরু হয়েছিল অতীতে

বিবরণ রেখে যাওয়ার কাজ। 'ঐতিহাসিক চিন্তা', ওলন্দাজ ঐতিহাসিক হুইৎসিঙ্গা বলেছেন, 'সর্বদাই পরিণতিমূলক'। সার চার্লস স্নো রাদারফোর্ড সম্বন্ধে লিখেছেন যে 'সব বিজ্ঞানীর মতোই... তাঁরও মজ্জায় ছিল ভবিষ্যৎ, যদিও এর অর্থ নিয়ে তিনি মাথাই ঘামাতেন না।' তেমনি ভাল ঐতিহাসিকদের মজ্জায় থাকে ভবিষ্যৎ, সে নিয়ে তাঁরা ভাবুন আর নাই ভাবুন। 'কেন?' এই প্রশ্নটি ছাড়াও ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন 'কোন্ দিকে'?

প্রশ্ন

১। ট্যালকট পারশনস-এর মতে ইতিহাস কি?

২। ঐতিহাসিক কিভাবে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ও আপতিক কারণের মধ্যে পার্থক্য করেন?

১.১.৩.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। E.H. Carr—What is History?

২। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

৩। E. Sreedharan—A Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000

৪। মমতাজুর রহমান তরফদার—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

৫। এম. দেলওয়ার হোসেন—ইতিহাসতত্ত্ব

১.১.৩.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। 'ইতিহাসচর্চা হলো কারণের চর্চা'—তুমি কি এই মত সমর্থন কর?

২। যুক্তিগ্রাহ্য ইতিহাস রচনায় কার্যকারণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। 'কার্যকারণের ইতিহাস' বলতে কি বোঝায়? কয়েকটি উদাহরণসহ ইতিহাসে কার্যকারণের ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। কার্যকারণের ইতিহাসে নির্ধারণবাদের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। কার্যকারণের ইতিহাসে আকস্মিকতাবদের কোন গুরুত্ব আছে কি?

উপ-একক - ২

Historicism

১.১.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটির এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাসবাদ কথাটির অর্থ।

(২) বিশ শতকে ইতিহাসবাদ নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক।

(৩) ইতিহাসবাদের গুরুত্ব।

১.১.৩.২.১ ঃ 'ইতিহাসবাদ' কথাটার অর্থ

'ইতিহাসবাদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ ধরলে যা বোঝায় তা হল, ইতিহাসের নানা ঘটনা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় এই বিশ্বাস বা ধারণা। ইতিহাস যে নিয়মকে অস্বীকার করতে পারেনা এই তত্ত্বের উপর এখানে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই তত্ত্বের আরও ব্যাখ্যা হল যে, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ স্বতন্ত্র এবং অনন্য। এর অর্থ হল প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের আলাদা মূল্য আছে যা অন্য যুগে আরোপ করা যায় না। এই তত্ত্ব অবশ্য এটাও স্বীকার করে নেয় যে বিভিন্ন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে 'ইতিহাসবাদ' নিয়ে বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক যত জোরদার হয়েছে ততই উপরিউক্ত সংজ্ঞার দুর্বলতা প্রকট হয়েছে।

'ইতিহাসবাদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল ইতিহাসের নানা ঘটনা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় এই বিশ্বাস বা ধারণা। এই তত্ত্বের আরও ব্যাখ্যা হল যে, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ স্বতন্ত্র ও অনন্য।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসবাদ কথাটির আভিধানিক অর্থ কি?

২। 'ইতিহাসবাদ' তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা দাও?

১.১.৩.২.২ ঃ ইতিহাসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা—বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক

'ইতিহাসবাদ' বিষয়ে অধ্যাপক পপার- এর নানা মূল্যবান লেখাগুলি দরুন শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ লুপ্ত হয়েগেছে। ১৯৩০-এর দশকে কার্ল পপারের 'দ্য লজিক অব সায়েন্টিফিক এনকোয়ারি' (The Logic of Scientific Enquiry) নামে বইটি প্রকাশিত হলে 'ইতিহাসবাদ' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। E.H. Carr সহ অনেক প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ এই শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন

করেন। এমনকি কার নিজেও স্বীকার করেন যে, এই শব্দের সংজ্ঞার্থের ব্যাপারে সর্বক্ষণ জিদ ধরাটা নেহাতই পণ্ডিতপনা। কার্ল পপার পরে আরও দুই বই লেখেন। এই বইগুলো মূলতঃ মার্কসবাদ-বিরোধিতার ভিত্তির উপর রচিত। ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব মত অধ্যাপক পপার-এর অপছন্দ, তার সবগুলোকেই একযোগে ধরার জন্য তিনি 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পপার তাঁর 'ইতিহাসের দৈন্য' (The Poverty of Historicism) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে তিনি এমন সব 'ইতিহাসবাদী' যুক্তি আবিষ্কার করেছেন, যা কোনো জানা 'ইতিহাসবাদীই' কখনও ব্যবহার করেননি। কোনো কোনো মতবাদে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে দেওয়া হয়, কোথাও আবার এ দুটিকে করা হয় সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক পপার-এর রচনায় এই দুই মতবাদই 'ইতিহাসবাদের' আওতায় পড়ে। পপার মনে করতেন হেগেলের এবং মার্কসের ইতিহাসদ্বন্দ প্রকৃতিগতভাবে নির্ধারণবাদী। হেগেলের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে পপার তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করেন। হেগেল ও মার্কস ছিলেন পপারের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। 'ইতিহাসবাদ' এই নাম দিয়ে এঁদের দুজনকে পপার সমপর্যায়ভুক্ত করেন। ভবিষ্যৎ কথনের ব্যাপারটা হেগেল এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পপারের 'ইতিহাসবাদের দৈন্য'-র ভূমিকায় ইতিহাসবাদকে বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, এ হলো 'সমাজবিজ্ঞানগুলির এমন এক পরিমার্গ, যাতে ধরে নেওয়া যায় যে, ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ কথনই তাদের মূল লক্ষ্য।'

*অধ্যাপক পপার এর নানা মূল্যবান লেখাগুলির দরুণ 'ইতিহাসবাদ' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তিনি ইতিহাসবাদ এর সঙ্গে ঐতিহাসিকতা'র তফাৎ করেন। **M.C. Darcy** তার 'ইতিহাসবোধ ঃ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়' (১৯৫৯ পৃষ্ঠা ১১) 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করলেন দর্শনের অভিন্নার্থক হিসাবে।*

পপারের রচনাগুলির পূর্বে 'ইতিহাসবাদ' (Historicism) শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হতো জার্মান 'হিস্টোরিস্মুস' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে। অধ্যাপক পপার 'ইতিহাসবাদ'(Historicism)-এর সঙ্গে 'ঐতিহাসিকতা'(Historicism)-র তফাৎ করলেন।E.H.Carr এই প্রসঙ্গে বলেন যে, এভাবে শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, তাতে পপার যোগ করলেন আরও খানিকটা বিভ্রান্তির উপাদান। ১৯৫৯ সালে অর্থাৎ এর পরবর্তী সময়ে এম,সি ডার্সি তাঁর গ্রন্থ 'ইতিহাসবোধ ঃ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়' (দ্য সেন্স অফ হিসট্রি ঃ সেক্যুলার এ্যাণ্ড সেক্রেড), (১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১১) 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করলেন 'ইতিহাসের দর্শনের অভিন্নার্থক' হিসেবে।

ইতিহাসের 'কার্যকারণ' আলোচনাপ্রসঙ্গে নির্ধারণবাদের ভূমিকার কথা সবিস্থারে বলা হয়েছে। এই নির্ধারণবাদ, কথাটির অর্থ হল, এমন কোনো বিশ্বাস যে, যা কিছু ঘটছে তার সবেরই একবা একাধিক কারণ আছে এবং সেই কারণ বা কারণগুলি যদি অন্যরকম না হতো কাহলে এর চেয়ে আলাদা কিছুই হতে পারতো না। অর্থাৎ নির্ধারণবাদের মানে হল, তথ্যগুলো একই থাকলে, যা ঘটবেই, কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। অন্যরকম ঘটতে পারে বলে মনে করার অর্থ শুধু এই যে তথ্যগুলো আলাদা হলে তবেই অন্যরকম কিছু হতো।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির ধারণাটি বা ইতিহাসের অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পর্কটি 'ইতিহাসবাদের' ধারণা থেকেই উদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ এই ধারণা থেকেই মনে কার হয় যে, অতীত কখনও লুপ্ত হয়না, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় অতীত ফিরে আসে।

প্রশ্ন

১। পপারের রচনার পূর্বে ইতিহাসবাদ শব্দটি কোন শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত?

২। পপারের আক্রমণের মূল লক্ষ্যে কারা ছিলেন?

১.১.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। কাকে বলে ইতিহাস?
What is History?—E. H. Carr

২। R.G. Collingwood—The Idea of History.

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।

৪। কার্ল পপার—The Poverty of Historicim.

৫। ইতিহাসতত্ত্ব—এম. দেলওয়ার হোসেন।

৬। এফ. স্টার্ণ (সম্পাদিত)—Varieties of History.

৭। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।

১.১.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। 'ইতিহাসবাদ' শব্দের অর্থ কি? বিশ শতকে 'ইতিহাসবাদ' সম্পর্কে যে বিতর্ক ও সমস্য দেখা গিয়েছিল তা তুলে ধর।

২। 'ইতিহাসবাদ' সম্পর্কে কার্ল পপার-এর বক্তব্য আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক ৪

Objectivity of History

বিন্যাসক্রম ঃ

১.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.২.৪.১ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু

১.২.৪.২ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা

১.২.৪.৩ ঃ উপসংহার

১.২.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.২.৪.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু কি?

(২) নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা কি কি?

(৩) ইতিহাস চর্চায় ব্যাখ্যার দিকগুলি কতটা প্রয়োজনীয়?

১.২.৪.১ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু

তথ্যের ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবনচর্চাই হল ইতিহাস। এই অতীত জীবনের চর্চার কাজটি করেন ঐতিহাসিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকে তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু হল তথ্যের ভিত্তিতে অতীত সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করা। সেক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। এই ধরনের ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি হল তথ্যের কঠোর উপস্থাপনা। জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কের মতে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হল আসলে যা ছিল তাই দেখানো। এক্ষেত্রে তথ্যসূত্রগুলি কঠোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলি প্রামাণ্য তথ্য কিনা যাচাই করে নিতে হবে। অতঃপর সেগুলির উপস্থাপনা করাই হবে ঐতিহাসিকের কাজ।

তথ্য উপস্থাপনায় ঐতিহাসিকের ভূমিকা হতে হবে নিরপেক্ষ, কোনরূপ ব্যক্তিগত আবেগ বা চিন্তাধারার প্রভাব ইতিহাস রচনার ওপর পড়লে সেই ইতিহাস আর অবিকৃত থাকবে না, এবং যথাযথ উপস্থাপনা করা যাবে না। এই ধারণা অনুসারে তথ্যগ্রহণের প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিকের চেতনা নিরপেক্ষ। তথ্য গ্রহণের পর ঐতিহাসিককে সেটির বিষয়ে ক্রিয়াশীল হতে হয়। এক্ষেত্রে কোনওরকম কল্পনা বা অনুমান সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাণভট্টের হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধন দ্বারা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির বিবরণ পাওয়া গেলেও, যুদ্ধের কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবার অন্য তথ্যসূত্র থেকে আমৃত্যু শশাঙ্ককে গৌড়ের সিংহাসনে অসীন রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও সূত্রেই হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বিবরণ বা ফলাফল পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ওপর তথ্য পাওয়া যায়নি সেই বিষয়ের ওপর ঐতিহাসিক নীরব থাকবেন। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে যদি তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন যে যুদ্ধযাত্রার বিবরণ থাকা সত্ত্বেও সভাকবির বিবরণে বিজয়ের উল্লেখ না থাকা হর্ষবর্ধনের চূড়ান্ত সামরিক বিপর্যয় ও মর্যাদাহানির ঘটনাকে লুকিয়ে যাওয়ার প্রয়াস, তাহলে নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চাকারী দের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা কেবল প্রমাণিত তথ্যকেই গুরুত্ব দেবেন। কেবলমাত্র পরীক্ষিত তথ্য হবে গ্রহণযোগ্য। সেই তথ্য পরপর সাজিয়ে উপস্থাপনাই হবে ঐতিহাসিকের একমাত্র কাজ। তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চিন্তাসমন্বিত ব্যাখ্যা ইতিহাস রচনায় প্রবেশ করলে তা পাঠকদের প্রভাবিত করতে পারে।

এই ধরনের ইতিহাসচর্চা আধুনিক ইতিহাস রচনার এক নবযুগের সূচনা করলেও এর কিছু মূলগত সমস্যা থেকে যায়। যার ফলে বাস্তব প্রয়োগে এই ধারণার সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাছাড়া কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনায় সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

১.২.৪.২ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা

নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চা সর্বদা বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তথ্যের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু তথ্য বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলি কখনই সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকতে পারে না। পাশাপাশি এই বিষয়টিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক বহু তথ্যসূত্রের মধ্যে তাঁর আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু বেছে নেন, আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি হয় Historical evidence। তাই এক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণের চেয়ে গুরত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ঐতিহাসিকের কাছে সেটির প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া।

যে-কোনো সাধারণ মানুষের গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া আর সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ দুটিকেই অতীতের তথ্য বলে মনে হলেও সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ ঐতিহাসিকের কাছে ইতিহাসের তথ্যরূপে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই গ্রহণ বা বর্জনের কাজটি করেন ঐতিহাসিক। সুতরাং object তথ্য অপেক্ষা subject ঐতিহাসিক বেশি গুরুত্ব পান। যেহেতু ইতিহাসের তথ্য কখনই অবিকৃত থাকতে পারে না তাই সেক্ষেত্রে ইতিহাসে বর্ণিত তথ্য অপেক্ষা ঐতিহাসিকই আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। এইভাবে আমরা সমাধান করতে পারি যে সভাকবি হবার কারণে বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের পরাজয় স্বীকার করতে অপারগ ছিলেন।

পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের সময় ঐতিহাসিকের মতই প্রাধান্য পায়। কার্ল বেকারের মতে, 'ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনও তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি সেগুলি তৈরি করেন।' কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ আর তার উপস্থাপনা করলেই মানুষের অতীত জীবনচর্চার সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সেই কারণে R.G. Collingwood, মনে করেন, ''History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian.''

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত অভিযান করেন এবং সেই বিজিত রাজ্যগুলিকে 'গ্রহণ মোক্ষ অনুগ্রহ' দ্বারা সেই শাসকদের হাতে ফিরিয়ে দেন, অথবা অশোক যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে ধর্ম্মনীতি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে কেবলমাত্র তথ্যগুলির বিবরণ দিলেই ইতিহাসের সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাবে না। বরং ঐতিহাসিক যদি যুক্তিগ্রাহ্য, নিজ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দুটি ঘটনার পাশ্চাতে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা বা রাজ্যশাসনের সহায়ক নীতির প্রসঙ্গটি উপস্থাপনা করেন, তবে বিষয়টি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

১.২.৪.৩ ঃ উপসংহার

তবে এক্ষেত্রেও বলা উচিত যে ঐতিহাসিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে ব্যাখা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে Subjective History-র অবতারণার অর্থ এই হওয়া উচিত নয় যে ঐতিহাসিক যাই উপস্থাপনা করবেন তাই ইতিহাস। ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভূমিকা অপরিহার্য। বিভিন্ন ব্যাখ্যা ইতিহাসের ক্ষেত্রে জীবনীশক্তির ন্যায় কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে যেমন তথ্যের যথার্থতার দিকে নজর রাখতে হবে, তেমনি যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটিকে উপস্থাপিত করতে হবে। তবেই ইতিহাস রচনা সফল হবে।

১.২.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। What is History? — E.H. Carr

২। কাকে বলে ইতিহাস?—ই. এইচ কার

৩। ইতিহাস তত্ত্ব—এম দিলওয়ার হোসেন।

৪। ইতিহাস ও সাহিত্য—অশীন দাশগুপ্ত।

১.২.৪.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু কি?

২। Objective ও Subjective ইতিহাসচর্চার মধ্যে কোন্‌টি বেশি যুক্তিগ্রাহ্য?

একক - ৫

Natural Sciences, Applied Sciences and Literature

বিন্যাসক্রম ঃ

১.২.৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.২.৫.১ ঃ ইতিহাস ও সাহিত্য

১.২.৫.২ ঃ ইতিহাস ও বিজ্ঞান

১.২.৫.৩ ঃ উপসংহার

১.২.৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.২.৫.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.২.৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক

(২) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান

(খ) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৩) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের গুরত্ব।

১.২.৫.১ ঃ ইতিহাস ও সাহিত্য

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এই দুই ধরনের মানুষই ঘটনার দর্শক। তবে ঐতিহাসিক বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা দেন আর সাহিত্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন এবং এই অধিকার তার আছে। জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা একমাত্র সাহিত্যেই সম্ভব। তবে ঐতিহাসিকদের তাদের কাজে সাহিত্যকে দরকার। ঐতিহাসিক সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারেন না। আবার সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক ঘটনার মাল-মশলা পাওয়ার জন্য ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে আসতে হয়। অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে ইতিহাসচর্চায় মানসিকতা (Mentality) ও মেজাজের বিশ্রেষণ একটি প্রধান চেষ্টা। মানুষের মন ঠিকমত বুঝতে না পারলে ঘটনাকে ঠিকমত বোঝা যায় না। ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত যেমন সুবিদিত ও সমাদৃত, ঠিক তেমনি

ইতিহাস যে সাহিত্যও বটে এ বিক্তব্যকেও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এই দুই বোধই বর্তমানের ইতিহাসচর্চায় লক্ষ্য করা যায়। তাই ঐতিহাসিকদের চেষ্টা ও সাহিত্যিকের সাধনার কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় বৈসাদৃশ্য সেই সমস্যাটি উপলব্ধি করার বিশেষ দরকার আছে।

ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক যে দিন দিন নিবিড় হচ্ছে তা সকলেরই প্রায় জানা। ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলেও ঐতিহাসিককে দার্শনিক হতে হবে। ইতিহাস আবার বুহদিন ধরেই সাহিত্যের একটি অংশ হিসেবে চলে আসছে। সেজন্য ইতিহাসের ছাত্র, গবেষক ও ঐতিহাসিককে জ্ঞানের এই সব শাখার সঙ্গে নিজের কাজ তুলনা করে দেখতে হয়। তবেই একদিন ইতিহাসচর্চা যেমন সুস্পষ্ট হবে, ঐতিহাসিকও তার কাজে সার্থক হবেন।

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস কী? বা ইতিহাস কাকে বলে? সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস। অর্থাৎ একক মানুষকে নিয়ে ইতিহাস মাথা ঘামায় না। একক মানুষের অস্তিত্ব থাকলেও যেহেতু ইতিহাসের কারবার সমাজবদ্ধ মানুষকে নিয়ে সেহেতু মানুষ সামাজিক হলেই কেবল ইতিহাস তার কথা ভাবে। আবার সামাজিক মানুষ যখন জীবনে একেবারে নিঃসঙ্গ তখন সে ইতিহাসের বাইরে থাকে। রিচার্ড কব (Richard Cobb) বলেছেন, ইতিহাস বিশেষ মানুষকে নিয়ে; তুলনায় বড়ো কাঠামো, বিশাল আন্দোলন এগুলি অনেকটাই মনগড়া কথা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'ইতিহাস ও সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের বক্তব্য যদি বিশেষ মানুষকে ছাড়িয়ে না ওঠে তাহলে সে বক্তব্য ইতিহাস হয় না। অবশ্য কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই কাঠামো বস্তুটাকে এড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষ মানুষগুলি স্থান ও কালের কাঠামোতেই ধরা থাকে। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিশারী। বিশিষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণ পরিবর্তনের স্রোতে কেমন করে পাল্টে যায় সেটা লক্ষ্য করা তাঁর কাজ। একদিকে জনসমষ্টির উপর জোর দিয়ে, বিশেষ মানুষগুলিকে বাদ দিয়ে সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসকে নৈর্ব্যক্তিক সত্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে ইতিহাসের মধ্যেই সাহিত্যের বিশাল আকর্ষণ ঐতিহাসিককে শুধু যে মানবচর্চায় ধরে রাখছে তাই নয়, বিশেষ মানুষ, একলা মানুষের খোঁজে কিছুটা বিপথেও টানছে। তবে ইতিহাস কখনই একলা মানুষের জন্য নয়, সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য।

আবার ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়েরই কাজ-কারবার মানুষকে নিয়ে। কিন্তু একক মানুষের জন্য ইতিহাস নেই। কিন্তু এই একলা মানুষটির হয়ে কথা বলার জন্য আছে সাহিত্য, ব্যক্তিমানুষের মূল্য থাকলেও ইতিহাস কিন্তু নেই। একজন ঐতিহাসিক একজন মানুষের মানসপ্রতিমা তৈরি করতে পারেন না। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই না পারাটা অক্ষমতা বা অন্যায় নয়। আসলে এ কাজ ইতিহাস পরিপন্থী। এ কাজ হল সাহিত্যেকের। একজন সাহিত্যিক একজন ব্যক্তির মানবপ্রতিমা নির্মাণ করতে পারেন। তার মধ্য দিয়ে অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে সেতু তৈরি করতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে এই না পারাটা অক্ষমতা বা অন্যায় নয়।

ইতিহাস অতীত নিয়ে কারবার করলেও ইতিহাসের অতীত কী বস্তু সে সম্পর্কে সদাসর্বদা ঐতিহাসিককে সতর্ক থাকতে হবে। সাহিত্যিক অতীতের যে কোনো ঘটনাকে তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা লেখার বস্তু করতে পারেন। কিন্তু অতীত ও ইতিহাসের অতীত এক নয়। ইতিহাসের অতীত সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত। সেজন্য অতীতের সে সামান্য অংশ। অন্যদিকে সাধারণ অতীত প্রতি মুহূর্তের সৃষ্টি। গতকালও এখন অতীত, বিগত

মুহূর্তও এই মুহূর্তে অতীত। অবশ্য ঐতিহাসিক অতীতের এই দিককার সীমা কোথায় টানবেন তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই বিতর্ক রয়েছে। তবে ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিককে হতে হয় নির্মোহ বিচারক। ইতিহাসের বিচার নিরপেক্ষ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তবে অতীতকে অগ্রাহ্য করে কি সাহিত্যিক, কি দার্শনিক তাদের কাজ করতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের সেই স্বাধীনতা নেই। তবে অতীত-আশ্রয়ী ইতিহাস কেমন করে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করবেন এ ব্যাপারে কিন্তু তিনি স্বাধীন। ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ বলেই ঐতিহাসিক বর্তমানের কোন প্রশ্ন মনে রেখে অতীতকে খোঁজ করতে পারেন। কিন্তু সেই প্রশ্নেই উত্তর কী হবে সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকের কোন স্বাধীনতা প্রায় নেই বললেই চলে। এখানেই ইতিহাসের সবচাইতে বড় জোর যে ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ। তথ্যের বাইরে এক্তিয়ার ঐতিহাসেকের নেই। কিন্তু তথ্য আবিষ্কার ও তথ্য নির্বাচন করেই ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। তথ্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দুটি দিক থাকে। একটি যুক্তির দিক, অন্যটি কল্পনার। দৃঢ় যুক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক যখন নির্বাচিত তথ্যগুলিকে সাজান, তখন তিনি মেজাজে বৈজ্ঞানিক। কিন্তু যেহেতু তাঁর তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য কাজ সেজন্য নিজস্ব সহানুভূতিতে কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে থাকেন। সেখানে ঐতিহাসিক হলেন সাহিত্যিক। কিন্তু সে কল্পনা সীমিত। কারণ মহৎ ঐতিহাসিকের কল্পনার অনুমানের কোন স্থান বা অধিকার নেই। এটি একমাত্র কবি বা সাহিত্যিকেরই আছে। তবে হেরোডোটাস থেকে ঐতিহাসিক পরম্পরায় কল্পনার বা অনুমানভিত্তিক ইতিহাস রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমে করা গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমে প্রবাদপ্রতিম্ জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে। এর ফলেই কল্পনাশ্রিত বা অনুমানভিত্তিক ইতিহাসের পরিবর্তে ক্রমে নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানধর্মী ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তবুও ইতিহাসের তথ্যে যে অসঙ্গতি আছে এ কথা আজ স্বীকৃত। ঐতিহাসিকের জীবন ব্যাখ্যার যে কল্পনা কাজ করে এই বক্তব্যও অনস্বীকার্য। শুধু ইতিহাসের কল্পনা এবং সাহিত্যের কল্পনা একজাতীয় নয়। ইতিহাস শেষপর্যন্ত ঘটনার মধ্যে থাকে। ঐতিহাসিক শেষ বিচারে দর্শক। কিন্তু সাহিত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য তুলে ধরে। এ কারণেই সাহিত্যিক স্রষ্টা। ঈশ্বরের মতই অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে।

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এই দুই ধরনের মানুষই ঘটনার দর্শন। ঐতিহাসিক বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা দেন আর সাহিত্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন দুটি যুক্তি থেকে ব্যাখ্যা করেন—একটি যুক্তির দিক, অন্যটি কল্পনার। যুক্তির মধ্যে দিয়ে তথ্যগুলির সাজালে তিনি বৈজ্ঞানিক. কিন্তু যেহেতু তাঁর তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য কাজ সেজন্য নিজস্ব সহানুভূতির কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে থাকেন। সেখানে ঐতিহাসিক হলেন সাহিত্যিক। ইদানীং ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব বাড়ছে। কিছুদিন হল ঐতিহাসিকের প্রশ্ন ইতিহাসকে মানুষের মন ও অনুভূতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সময় সচেতনতা ও পরিবর্নের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে সক্ষম ইতিহাস সেই জীবনে অবান্তর।

ইতিহাস উনিশ শতকে বেশি করে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে ছিল, কিন্তু ইদানিং ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব বাড়ছে কিছুদিন হল ঐতিহাসিকের প্রশ্ন ইতিহাসকে মানুষের মন ও অনুভূতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এর আভাস পাওয়া যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক থিওডোর জেলডিনের ফরাসী দেশের উপর লিখিত বিশাল ইতিহাস। দুখণ্ডে রচিত গ্রন্থের শিরোনামে লেখা আছে ঃ ‘উচ্চাশা, ভালোবাসা ও রাজনীতি’ এবং ‘বোধ, রুচি ও উৎকণ্ঠা’।

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যের যে সত্যের প্রকাশ, ঐতিহাসিকের সে সত্য প্রকাশের ক্ষমতা বা অধিকার নেই। সাহিত্যিকের মত অবাধ বিচরণ ঐতিহাসিকের নেই। তবে ইদানীং ঐতিহাসিক যখন মানসিকতার সন্ধান করেছেন তখন সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের কোথায় মিল এবং কোনখানে পার্থক্য তাও ভাবা দরকার।

সাহিত্যিক যখন স্থির করেন যে তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করবেন তখন তাঁকে ইতিহাসের সাহায্য নিতে হয় এবং ইতিহাস বিশদভাবে পড়তে হয়। ঐতিহাসিক তথ্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ না করে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। অধিকাংশ সময়ে সেই কাহিনী হয় অপ্রাকৃত, নয় আধুনিক। ইতিহাসের তথ্যগুলি অলঙ্কার রূপেই থাকে। সেই তথ্য ঠিক না ভুল সেই নিয়ে আলোচনা চললেই সাহিত্যিকের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের তার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে যে মেজাজ সাহিত্যিক তৈরি করেন, সে বস্তু উদ্ভট, নয় সাহিত্যিকেরই সমসাময়ি। তা সত্ত্বেও কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে। এ ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের সার্থক কাহিনী বলেই স্বীকৃতি লাভ করে এবং অভিনন্দিত হয়। কারণ এই সব উপন্যাসে কাহিনীটিই পাঠককে ধরে রাখে, অতীতের তথ্যগুলি মঞ্চসজ্জা। জর্জ লুকাচ বা ই. এইচ-কারের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এই ধরনের রচনাকে ঐতিহাসিক বলে স্বীকার করবেন না। লুকাচের মতে, বিগত যুগের পরিবেশ যখন উপন্যাসের বিশেষ চরিত্রগুলিকে তৈরি তরে তখনই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠ। এ ব্যাপারে অবশ্য একাধিরক অসুবিধা আছে। যুগের পরিবেশ ব্যক্তিকে তৈরি করলেও অনেক সময় যুগের পরিবেশ ছাপিয়েও বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে। মনে রাখা দরকার, সমাজে, একই শ্রেণীতে, একই পরিবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ থাকাটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক ঘটনাটির মর্মোদ্ধার সাহিত্য যেমনভাবে করতে পারে, ইতিহাস তা একেবারে পারে না। অবশ্য একারণে ঐতিহাসিক ইতিহাসের কাঠামোকে অবহেলা করতে পরেন না।

ঐতিহাসিক মানসিকতার পরিবর্তন স্বীকার করেন, কিন্তু যেহেতু মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার তাঁর নেহ সেহেতু ঘটনার বর্ণনার মতন করে মানসিকতার পরিবর্তন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেত পারেন, তার বেশি তিনি করতে পারেন না। এ কাজ একমাত্র করতে পারেন সাহিত্যিক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সব সাবেকী সমাজের মৃত্যু চিন্তা বস্তুটা জোরালো। কিন্তু মৃত্যুভয় বস্তুটা কী, মৃত্যুচিন্তায় পীড়িত সমাজে মানুষ ঠিক কী ভাবে, এই কথা বলার বা কল্পনীর অধিকার ঐতিহাসিকের নেই। ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং সৃজনী কল্পনার সাহায্যে সেই কাজ করেন সাহিত্যিক। মানসিকতার পার্থক্য সার্থকভাবে বর্ণনা করতে পারলে সাহিত্যে ইতিহাসের ধম৪ আছে। সাহিত্য যখনই অন্য মানসিকতার সন্ধান এনেছে তখনই সাহিত্য ইতিহাসের পরিপূরক। সে হিসেবে উইলিয়ম গোলডিং এর লেখা বই 'দি ইনহেরিটরস্' অন্য মানুসকতার এক সার্থক সৃষ্টি এবং ইতিহাসধর্মী। এই রচনা একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক আলেখ্য। এই রচনাটিতে সৃষ্ট জগৎ সম্পূর্ণ নূতন। আদিম পৃথিবীকে আমরা এখানে আদিম চোখ দিয়েও দেখতে পাই।

আবার যদি কোন বিরল সাহিত্যিক অন্যযুগের মনকে তাঁর রচনায় ধরতে পারেন, পাঠক যদি সেই মনকে পৃথক বলে চেনেন, কিন্তু স্বাভাবিক বলে মানেন তাহলে সেই সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী। তাবে এটুকুই শুধু সাহিত্যে ইতিহাসের ধর্ম নয়। অন্যভাবেও সাহিত্যে ইতিহাস আসে।

সময় সচেতনতা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে সক্ষম। ইতিহাস সেই জীবনে অবান্তর। কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক অন্য একটি সূত্রেও ভাবা

প্রয়োজন। সতীনাথ ভাদুড়ীর দুটি অনবদ্য রচনা— 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'একত্রে ভেবে নিলে উপরি উক্ত বক্তব্য বোঝা যাবে। সাহিত্যিকের একটা ক্ষমতা আছে তিনি ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন এবং 'জাগরী' উপন্যাসের সেই ক্ষমতার ব্যবহার স্পষ্ট। জাগরীর কাহিনীটির স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ী স্বয়ং, তিনি এই জীবনের ঈশ্বর। এই উপন্যাসের চারজন মানুষ— বাবা, মা ও দুই ছেলে চুড়ান্ত সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবনের তীত ঘটনাগুলিকে ব্যাকুল মনে ভেবে দেখছে। রাত ভোর হলে বড় আদরের বড় ছেলের ফাঁসি হবে তাঁরাও অপেক্ষা করছেন। এই রাত্রির প্রতীক্ষার কোনো ইতিহাস নেই, কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না। সতীনাথ এই কাহিনীর স্রষ্টা। মনের গভীরে সকলেই আমরা এই রাতটিকে সত্য বলে মানি। কিন্তু এই সত্যের অধিকার সাহিত্যের, ইতিহাসের নয়। 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' ইতিহাস, সতীনাথ ভাদুড়ী ইতিহাস বলেই লিখেছেন। 'রামচরিতমানস' যেমন রামচন্দ্রের জীবন-বর্ণনা, হিন্দুমানসের প্রথম ইতিহাস, 'ঢোঁড়াই-এর কাহিনীও সেই গোত্রের রচনা। উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চল ও নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে কাহিনী। এই কাহিনীতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা হলেও এই গল্পের জোর অন্যত্র। এখানে নিম্নজাতির মানুষদের জীবনযাত্রাই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। সতীনাথের সাবলীল রচনা সাহিত্যে দুর্লভ। 'ঢোঁড়াই' এর কাহিনীতে বর্ণনা স্বচ্ছন্দ, কারণ স্রষ্টা এখানে দর্শক। ঐতিহাসিকও ঠিক এইরকম উপাখ্যানই লিখতে চান। মালমশলা থাকলে লিখতেও পারেন। অন্যদিকে সতীনাথ ঢোঁড়াই ও রামিয়ার সম্পর্ক যেমন করে গল্পের একটি এবলম্বন হিসেবে তৈরি করেছেন, ঐতিহাসিকের আবার সেই অধিকার নেই। ঐতিহাসেক দর্শক মাত্র, স্রষ্টা নন। কিন্তু সাহিত্যিক যখন ঈশ্বরে ভূমিকা পরিত্যাগ করে দর্শকের ভূমিকাতে নেমে আসেন তখন সাহিত্য ও ইতিহাসের বিশেষ এক সাযুজ্য চোখে পড়ে। সেভাবে ভেবে দেখলে 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' ইতিহাসধর্মী সাহিত্য।

যেহেতু ঐতিহাসিক চিরকালের বাইরের লোক, সেজন্য ইতিহাস সাধারণতঃ বড় সময়ের চৌহদ্দিতেই থাকে। ছোট সময়ে নেমে আসার চেষ্টা অবশ্য ইদানীংকালে ইতিহাস রচনায় বেশ স্পষ্ট হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও সাহিত্য ও সাহিত্যিকই ঐতিহাসিকের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন। যত্রতত্র তাঁর অবাধ চলাফেরা। বড় সময়, বিশেষ মানুষের ছোট সময় ছেড়েও সাহিত্যিক একজন মানুষের ব্যক্তিগত সময়ে নেমে আসতে পারেন। টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' পড়লে মনে হয় দুই ভিন্ন ভিন্ন বই পড়ছি। তার কারণ ইতিহাসের মঞ্চসজ্জা নয়, তার কারণ, একই রচনায় দু-রকম সময়ের চমকপ্রদ ব্যবহার। টলস্টয় নেপোলিয়নের মস্কো অধিকারের কথা বলছেন, এক নিঃশ্বাসে প্রিন্স আন্দ্রের মৃত্যু বর্ণনা করছেন। দুটি ঘটনা দু রকম সময় দিয়ে তৈরি। ইতিহাসের যে অখণ্ড সময় টলস্টয় তৈরি করা চেষ্টা করেছেন, সেই সময় দিয়েও কিন্তু ঐতিহাসিক সব হিসাবে মেলাতে পারবেন না। আন্দ্রের মৃত্যুতে উত্তরণ, নাটাশার বড় হওয়া, পিয়েরের শেষ স্থিতি ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসের বাইরেই থাকে। তাই এখানে কাছে এলেও ইতিহাস কিন্তু সাহিত্য থেকে পৃথক থাকে।

সবশেষে বলা যায়, কিছু কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্কটা নিকট এবং ইদানীংকার ঐতিহাসিক রচনায় সেই নৈকট্য ঘোষিত হচ্ছে। তবে ইতিহাস দিয়ে জীবনের সবটুকু ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষের জীবনের বড় ধারা, ছোট ধারা এবং ব্যক্তিজীবন সব কিছুই সাহিত্য দেখায়। ইতিহাস সব কিছু দেখায় না। এখানেই ইতিহাসের থেকে সাহিত্যের বাস্তবতা অনেক বড় ও বেশি।

প্রশ্ন ১। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

১.২.৫.২ ঃ ইতিহাস ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক বিউরী (Bury) ১৯০৩ সালে কেম্ব্রিজের এক বক্তৃতায় বলেন, ইতিহাস 'একটি বিজ্ঞান, তার বেশিও নয়, কমও নয়।' (History is a science, no less and no more), এর অনেক আগে ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার ইতিহাস যে বিজ্ঞান একথা বলে গেছেন। সব ইউরোপীয় ভাষাতেই 'বিজ্ঞান' এর সমার্থক শব্দের মধ্যে ইতিহাসকে বিনা দ্বিধায় অন্তভুক্ত করা হয়। আঠারো শতকের শেষে, জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও তার নিজস্ব শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান— এই দুই ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যখন প্রচুর বিষয় জানা যাচ্ছিল, তখন থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে বিজ্ঞান মানুষের সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানকে আরও এগিয়ে দিতে পারে কিনা। গোটা উনিশ শতক জুড়ে আস্তে আস্তে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। ইতিহাসও ছিল তার একটি।

ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত আজ উপেক্ষণীয় নয়। এবং ইতিহাসকে বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়। বিজ্ঞানেরমত ইতিহাসও প্রশ্ন করে কী? কেন? এবং কীভাবে এবং এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করে। তাই আমাদের আলোচনা করা দরকার যে ইতিহাস কী ধরনের বিজ্ঞান এবং কতটুকু বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিল কোথায়, আবার পার্থক্যই বা কোথায়। এধরনের আলোচনার পটভূমি হিসেব বিজ্ঞান বলতে ব্যাপক অর্থে কী বুঝায় সংক্ষেপে তা তুলে ধরা দরকার। প্রথমতঃ বিজ্ঞান বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি 'বিশেষ জ্ঞান' যা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে অর্জন করা যায় এবং যা নিয়মানুভাবে সংশ্লিষ্ট। এটা কতকগুলো সত্যভিত্তিক বা কতক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ এই সত্য আমাদের সফল ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে এবং দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তৃতীয়তঃ এটা নির্ব্যক্তিক। যেকোন সংস্কারমুক্ত ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক সত্যকে সত্য বলতে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। অতএব ইতিহাস বিজ্ঞান কী বিজ্ঞান নয় তা নির্ধারণ করার প্রয়াসে এই সব উপরিউক্ত চিন্তা চেতনা মনে জাগ্রত রাখা উচিত।

যেসব পদ্ধতিতে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগৎকে অনুধাবন করে তা প্রয়োগ কার হয়েছিল নানান মানসিক বিষয়ের অনুধাবনে। এইপর্যায়ের প্রথম দিকে বজায় ছিল নিউটনীয় ঐতিহ্য। প্রাকৃতিক জগতের মতো সমাজকেও ভাবা হয়েছিল একটি যান্ত্রিক ব্যাপারে। ১৮৫১ এ প্রকাশিত হার্বার্ট স্পেন্সর এর একটি বই, 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা' (সোসাল স্ট্যাটিক্স) কে এখনও মনে রাখা হয়। এরপর আর-একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আনলেন ডারউইন। আর সমাজবিজ্ঞানীরা জীববিদ্যা থেকে তাঁদের সূত্র নিয়ে সমাজকেও সপ্রাণ বলে ভাবেত শুরু করলেন। কিন্তু ডারউইনীয় বিপ্লবের প্রকৃত গুরুত্ব হোল তিনি বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ে এলেন ইতিহাস। এবার থেকে গতিহীন ও সময়হীন কোন ব্যাপারে নয়, বরঞ্চবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় হলো পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়া। ইতিহাস প্রগতিকে সুনিশ্চিত ও পরিপুরণ করল বিজ্ঞানে বিবর্তন।

ইতিহাসচর্চা ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি হল প্রথমে তথ্য জোগাড় করা, তারপর সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানের পদ্ধটিও ঠিক এইরকমই। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তার যন্ত্ররাতি, নানা সরঞ্জাম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং অবশেষে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত উপনীতহন। এদিক দিয়ে ইতিহাসচর্চাও যে নিজস্ব পদ্ধতিতে ও কলাকৌশলের মাধ্যমে এগিয়ে যায় তাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞা বলা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ঐতিহাসিক মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডকে গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচিত করে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে।

অবশ্য সাধারণের চোখে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের যুক্তিতে কোন প্রকার পেশাগত অনুশীলন ছাড়াই ঐতিহাসিকের কাজ সাধারণের বোধগম্য হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজকর্ম জটিল এবং নানা কলাকৌশল ও কারিগরী জ্ঞানে ভরপুর। এটা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। একমাত্র যারা বিশেষজ্ঞ তারাই কেবল বুঝতে পারে। কিন্তু এ সঠিক নয়। সকলেই ইতিহাস লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারে না। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও পেশাদার ঐতিহাসিক ও অপেশাদার পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কোন সাধারণ পাঠককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ও ঘটনাপ্রবাহের উপর ইতিহাস লিখতে দিলে তিনি বিপদে পড়বেন। কারণ তথ্য জোগাড়, তথ্য গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি হিমসিম খেয়ে যাবেন। কোন্‌টি ঐতিহাসিক তথ্য, কোন্‌টি নয় তা বোঝার জন্য তাকে পেশাদার গবেষক বা ঐতিহাসিক হতে হবে। শুধুমাত্র একজন পেশাদার ঐতিহাসিকই কাজটি সঠিক ও সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারবেন। অতএব দেখা যায় ইতিহাস পঠন-পাঠন ও লিখনে বিষয়টির নিজস্ব নিয়মকানুন ও পদ্ধতি বর্তমান। ঐতিহাসিক হতে হলে এবং ইতিহাস বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে এগুলো অবশ্যই রপ্ত করতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা সমীচীন হবে।

তথ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিকেরা যেসব প্রকল্প ব্যবহার করেন তাদের অবস্থানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ব্যবহৃত প্রকল্পের অবস্থানের লক্ষণীয় মিল আছে। উদাহরণ হিসেবে মাক্‌স্ ভেবর-এর প্রটেস্ট্যান্টবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্কের বিখ্যাত লক্ষণ নির্ণয়টির কথা ভাবা যেতে পারে। আজ এটিকে সূত্র বলা কারোর পক্ষেই উচিত নয়। যদিও আগের কোন যুগে এটিকে বোধহয় সূত্র হিসেবেই স্বাগত জানানো হত। এটি একটি প্রকল্প। ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানে এটি অনুপ্রেরণা এনেছে এবং অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি খানিকটা পরিমার্জিত হলেও এর মাধ্যমে এই দুই আন্দোলন সম্পর্কেই আমাদের বোধ, ধারণা আরও প্রসারিত হয়েছে। ঠিক তেমনি মার্কসের বিবৃতি উদ্ধৃতি করে উপরিউক্ত যুক্তি দেখানো যায়। মার্কস বলেন, ''হাতে চালানো কল এনে দেয় সামন্তপ্রভু সমেত এক সমাজ ঃ বাষ্পচালিত কারখানা এনে দেয় শিল্প পুঁজিপতি সমেত এক সমাজ।'' আধুনিক পরিভাষায় এটি কোনো সূত্র নয়, যদিও মার্কস হয়তো তেমন দাবিই করতেন। কিন্তু এটি একটি ফলদায়ক প্রকল্প যা আরও অনুসন্ধান ও নতুন বোধের পথ দেখায়। এইসব প্রকল্প ভাবনার অপরিহার্য হাতিয়ার। ঠিক তেমনি ইতিহাসকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করাটা কোনো তথ্য নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয় প্রকল্প বা চিন্তার হাতিয়ার। ঐতিহাসিক যে প্রকল্প গ্রহণ করেন তাই দিয়ে তাঁর পক্ষপাত বিচার করা যায়।

ইদানীংকালে বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা আশা পোষণ করেন যে, তাঁরা একটি টুকরো প্রকল্প থেকে ক্রমেই আর একটির দিকে এগিয়ে যাবেন, তাঁদের ব্যাখ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে আলাদা করবেন ও তাঁদের ব্যাখানকে

যাচাই করবেনতথ্য দিয়ে। তাঁরা উভয়ে যেভাবে কাজ করেন তার মধ্যে মূলগত কোন তফাত নেই। একজন ঐতিহাসিক ও একজন পদার্থবিদ পরস্পর নিঃসম্পর্কিতভাবে একই সমস্যাকে প্রায় ঠিকই একসঙ্গে সূত্রবদ্ধ করবেন তা সত্যিই মনে দাগ কাটার মত।

তবে গাণিতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা এইসব পর্যায়ের নানান বিজ্ঞানের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য আছে, তেমনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। এই পার্থক্যই ইতিহাসকে ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলার ক্ষেত্রে যে সব আপত্তি তোলা হয় তা হলো ঃ (১) ইতিহাস একান্তভাবেই অনন্য নিয়ে চর্চা করে, আর বিজ্ঞান চর্চা করে সাধারণ নিয়ে। (২) ইতিহাস কোন শিক্ষা দেয় না, কিন্তু বিজ্ঞান সাধারণকে অনেক শিক্ষা দেয়। (৩) ইতিহাস ভবিষ্যদবাণী করতে পারে না। (৪) ইতিহাস মূলতঃ বিষয়নিষ্ঠ, কারণ মানুষ নিজেকেই পর্যবেক্ষণ করছে। (৫) ইতিহাসের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত নানান ব্যাপার জড়িয়ে থাকে, বিজ্ঞানে তা নেই। এখন ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই অভিযোগগুলি কতখানি সত্য তা পরীক্ষা করা যাক।

প্রথম অভিযোগটি হল ইতিহাস অনন্য ও বিশেষ নিয়ে চর্চা করে আর বিজ্ঞান চর্চা করে সাধারণ ও নির্বিশেষ নিয়ে। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে কলিংউড এবং আরও কেউ কেউ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে এই একই পার্থক্যের কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক E.H. Carr-এর মতে, এই ধারণা একটি ভুল বোঝাবুঝির উপর দাঁড়িয়ে আছে। হবস্-এর বিখ্যাত প্রবচনটি এখনও প্রয়োজন। 'নাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নির্বেশেষ নয়, কারণ যেসব জিনিসের নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও একক।' প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি নিঃসন্দেহে সত্য, কোনো দুটি ভৌগোলিক গড়ন, একই প্রজাতির কোনো দুটি প্রাণী, দুটি পরমাণুও অভিন্ন নয়। তেমনি দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাও অভিন্ন নয়। ঐতিহাসিক যে ভাষা ব্যবহার করছেন এই ব্যাপারটি তাঁকে, বিজ্ঞানীর মতোই, সাধারণীকরণের প্রতি দায়বদ্ধ করে দেয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল খুবই আলাদা ধরনের এবং দুটোই ছিল অনন্য। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা দুটোকেই যুদ্ধ বলেন। এখানে দুটি অনন্য ঘটনার সাধারণীকরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক আসলে অনন্যোর প্রতি আগ্রহী নন, বরং সাধারণের মধ্যে যা অনন্য তাতেই তাঁর আগ্রহ। বিশ শতকের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের নানান কারণ নিয়ে সাধারণীকরণের ব্যাপারটি ঐতিহাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ইতিহাসের পাঠক ও ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ করে চলেছেন। ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণকে তিনি তাঁর পরিচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেন—বা হয়তো তাঁর নিজের যুগেই। অতএব ইতিহাসের সাল সাধারণীকরণের কোন সামঞ্জস্য নেই এটা বলা ঠিক হবে না। সাধারণীকরণেই ইতিহাসের সমৃদ্ধি ঘটে। 'কেম্ব্রিজ আধুনিক ইতিহাস' (Cambridge Modern History)-এর একটি খণ্ডে Elton (এলটন) বলেছেন, 'ঐতিহাসিক তথ্যের সংগ্রাহকের থেকে ঐতিহাসিককে যা আলাদা করে দেয় তা হলো সাধারণীকরণ'।

ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত আজ উপেক্ষণীয় নয়। এবং বিভিন্ন কারণে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়। বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও প্রশ্ন করে কী? কেন? শুধু তাই নয়, ইতিহাস চর্চার ন্যায় বিজ্ঞানের পদ্ধতিও ঠিক একরকম। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান ঠিক একই রকমভাবে ঐতিহাসিকও নিজস্ব পদ্ধতি ও কলাকৌশলের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার জন্য এগিয়ে চলে। কিন্তু ঐতিহাসিকরা কখনও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হতে পারে না। তবে তাঁরা ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

অনন্য ও সাধারণের মধ্যে সম্পর্কই ইতিহাসের আলোচ্য। ঐতিহাসিক হিসেবে কেউ যেমন তথ্য ও ব্যাখানকে আলাদা করতে পারেন না, তেমনি আলাদা করতে পারেন না অনন্য ও সাধারণকে, বা এর কোনোটিকে অন্যটির তুলনায় অগ্রাধিকারও দিতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের শিক্ষা কী? এই প্রশ্নটি সাধারণীকরণের প্রশ্নটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সাধারণীকরণের আসল কথা হলো, এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাস থেকে শেখার চেষ্টা করি, একসারি ঘটনা থেকে সংগৃহীত শিক্ষা প্রয়োগ করি অন্য একসারি ঘটনাতে। সাধারণীকরণের সময় সচেতন বা অচেতনভাবে এই কাজটিই করার চেষ্টা হয়।

মানুষ ইতিহাস থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করে। প্রচুর পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করাও কঠিন নয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী সব প্রতিনিধিরা একশ বছর আগের ভিয়েনা কংগ্রেসের শান্তি সম্মেলন থেকে নানা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের ঐ সব শিক্ষাকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের, ১৮৭১-এর প্যারী কমিউনের নানান শিক্ষা রুশ বিপ্লবের নায়কদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভুরি ভুরি রয়েছে। তবে ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ কখনোই একতরফা প্রক্রিয়া নয়। অতীতের আলোয় বর্তমানকে শেখা মানে একইসঙ্গে বর্তমানের আলোয় অতীতকে দেখা। অতীত ও বর্তমানের পারস্পরিক সম্পর্কে মধ্য দিয়ে দুটির মধ্যে সম্পর্কের আরও গভীর এক বোধ সঞ্চারিত করাই ইতিহাসের শিক্ষা ও কাজ।

ইতিহাসের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ ঃ ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই পাওয়া যায় না, কারণ ইতিহাস বিজ্ঞানের মত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। তবে এক্ষেত্রেও প্রশ্নটি গভীরভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আগের মত ইদানীংকালে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বিভিন্ন সূত্র নিয়ে কথা বলতে উৎসুক নন। বিজ্ঞানের যে সব সূত্র রয়েছে এবং যে সব সূত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলো আসলে প্রবণতা সংক্রান্ত বিবৃতি, অন্যান্য অবস্থা একইরকম থাকলে বা পরীক্ষাগারের পরিবেশে কী হবে সেই সম্পর্কে বিবৃতি। বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কী হবে সেই নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার দাবি বৈজ্ঞানিক করেন না। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র দিয়ে প্রমাণ হয় না যে ঐ বিশেষ অ্যাপেলটি মাটিতে পড়বে, কেউ হয়তো সেটিকে ঝুড়িতে ধরে ফেলতে পারে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন— আলো সরলরেখায় চলে—আলোকবিদ্যার এই সূত্রটি প্রমাণ করে না যে, একটি বিশেষ আলোকরশ্মি মধ্যবর্তী কোন বস্তুর মাধ্যমে প্রতিসারিত বা বিচ্ছুরিত হতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এইসব সূত্র মূল্যহীন বা নীতিগতভাবে বৈধ নয়। আজকের দিনে বিজ্ঞান এটা মনে রাখার বেশি পক্ষপাতী যে আরোহ শুধু যুক্তির দিকে দিয়ে নানারকম সম্ভাব্যতা বা যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এবং বিজ্ঞান তার নানান ঘোষণাকে সাধারণ নীতি বা নির্দেশক—যাদের বৈধতা শুধু কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়াতে যাচাই করা যায়—সেই হিসেবে গণ্য করতে বেশি আগ্রহী। কোঁত যেমন বলেছিলেন, 'জ্ঞান থেকে আসে দূরদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি থেকে কর্ম।' সাধারণ ও বিশেষ, সর্বজনীন ও অনন্যের ভেতর এই পার্থক্যের মধ্যেই ইতিহাসে ভবিষ্যদবাণীর সূত্রটি নিহিত আছে। ইতিপূর্ব আলোচনায় বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ করতে বাধ্য; এবং তা করতে গিয়েই তিনি ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন নির্দেশকের যোগান দেন। এইসব নির্দেশক নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণী না হলেও একইসঙ্গে বৈধ ও উপযোগী।

তবে একথাও সত্যি যে, ঐতিহাসিক বিভিন্ন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদবাণী করতে পারেন না, কারণ নির্দিষ্ট মানে অনন্য এবং তার মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান এসে পড়ে। কারণ ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যদ্‌বাণী অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি একটি সাধারণীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্মের ক্ষেত্রে একটি বৈধ ও উপযোগী নির্দেশক। ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা (Prophet) নয়। তিনি কেবল কোনো ঘটনা বা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

তবে একইসঙ্গে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে তা মেনে নেওয়া প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক মূলতঃ সাধারণ সত্য উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত থাকে এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করাও তার কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক কোন ঘটনার ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেন না। কারণ তিনি পৃথক পৃথক ঘটনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তাঁর কাজকর্মের পক্রিয়ায় কদাচিৎ সর্বজনীন সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। একাকী সংঘটিত বিষয়াদির ওপর মনোযোগ নিবন্ধ থাকার জন্যই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে ব্যর্থ হয়। তবে একথাও ঠিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি মূলতঃ আলাদা নয়।

ইতিহাসসহ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে আলোচক ও আলোচ্য একই পর্যায়ভুক্ত থাকে এবং একে অপরের ওপর পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল। মানবিক আচরণের মধ্যে যে ইচ্ছে ক্রিয়াশীল থাকে সেই আচরণের বিভিন্ন রূপভেদ করার প্রয়োজন হয় সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ বা ঐতিহাসিকের, যাতে তিনি ঠিক ধরতে পারেন তাঁর অনুধাবনের বিষয়বস্তু যে মানুষ সে যখন সক্রিয় হয়েছে তখন তার কেন সক্রিয় হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। এতে পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত—অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়—এই দুই এর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় যেটা একান্তই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপার। ঐতিহাসিক যা পর্যবেক্ষণ করেন তার প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটি অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়ে; ইতিহাস আগাগোড়াই আপেক্ষিকতায় ভরা। ইতিহাস সচেতন লোকেদের মধ্যে ইতিহাস কেন কদাচিৎ নিজের পুনরাবৃত্তি করে তার একটা কারণ এই যে, নাটকের কুশীলবরা দ্বিতীয়বার অভিয়নের সময়ে প্রথমবারের পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ থাকে এবং তাদের কার্যকলাপ প্রভাবিত হয় ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে। পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিতের মধ্যে এবং ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া তা অবিচ্ছিন্ন ও অবিরতই পরিবর্তনশীল এবং এটাই ইতিহাসসহ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে মনে হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ভাষায় কথা বলেছেন তাতে বস্তুজগৎ ও ঐতিহাসিকের জগতের মধ্যে আরও বেশি লক্ষ্য করার মতো মিল পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, তাঁদের গবেষণার ফলাফলের মধ্যে নাকি একটি অনিশ্চয়তা বা অনির্ণেয়তার নীতি জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আমাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ক্ষমতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে দেশ ও কালের দূরত্ব ও অতিক্রান্তির যে পরিমাপ, তা 'পর্যবেক্ষকের' গতির ওপর নির্ভরশীল। অতএব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের ন্যায় 'পর্যবেক্ষক' ও পর্যবেক্ষণের বিষয়টি এসে পড়ে। তবে তা সত্বেও এটা বলতে হবে যে কতকগুলি পার্থক্যের দরুন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। সমাজবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁদের চর্চার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ভৌতবিজ্ঞানীর তাঁর বিষয়ে যুক্ত হওয়ার থেকে অন্য ধরণের।

ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে ইতিহাস সাধারণভাবে বিজ্ঞান থেকে আলাদা বলা হয়ে থাকে। কোনো অতি ঐতিহাসিক শক্তি তা যাই হোক না কেন, তার উপর ইতিহাসের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ভরশীল—এই বিশ্বাস ভুল। এতে ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করে না। নৈতিকতার প্রশ্নে বলা যায়— ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁর গল্পের চরিত্রদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায় ঘোষণা করার দায়িত্ব নেই। ঐতিহাসিক ও নীতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। নৈতিক চরিত্র দিয়ে যদি ইতিহাসের ঘটনা বিচার করা হত তবে ইতিহাসে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী বা রাশিয়ার স্টালিনের মূল্যায়ন অন্যবাবে করা হতো। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায়দান ঐতিহাসিকের কাজ নয়, বরং তাঁর এক্ষেত্রে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য কাজ রয়েছে। তবে ইতিহাসের এই নৈতিক রায়দানের ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি ঘটেনি তা নয়, ঐতিহাসিক অনেক সময়ই নৈতিক রায় সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। অতি-ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কাঝে অনুগত্য স্বীকার করেন। তখন ইতিহাস তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেলে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল আছে।

২। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে বিভাজনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

১.২.৫.৩ ঃ উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকের মধ্যে লক্ষ্য, পদ্ধতি নিয়ে যত বোঝাপড়া গড়ে উঠবে তত ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সব ব্যবধান ও দূরত্ব রয়েছে তার অবসান হবে। বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক—এঁরা সবাই একই চর্চার বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত, মানুষ ও তার পরিবেশ, পরিবেশের উপর মানুষের এবং মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব। চর্চার উদ্দেশ্যটি একইরকম; পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের বোঝাপড়া ও পরিবেশের উপর তার প্রভুত্ব বাড়ানো। খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক, মনোবিদ ও ঐতিহাসিকের মধ্যে পূর্বানুমান ও পদ্ধতিতে ব্যাপত পার্থক্য আছে। ব্যাখ্যা করতে চাওয়ার যে মূল উদ্দেশ্য, এবং প্রশ্ন ও উত্তরের যে মূল কার্যপদ্ধতি—তাতে ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী দুজনেই একজোট। অন্য যে কোন বিজ্ঞানীর মতোই ঐতিহাসিকও একজন ব্যক্তি যিনি সারাক্ষণই 'কেন?' এই প্রশ্নটি করে চলেন এবং তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন।

১.২.৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইতিহাস ও সাহিত্য—অশীন দাশগুপ্ত।
২। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—অমলেশ ত্রিপাঠী।
৩। ইতিহাস চর্চা—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। কাকে বলে ইতিহাস—ই. এইচ. কার।
৫। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।
৬। ইতিহাস তত্ত্ব—এম. দেলওয়ার হোসেন।

১.২.৫.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

২। ইতিহাস ও সাহিত্যের কোথায় কোথায় মিল আছে?

৩। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায় কোথায়?

৪। ইতিহাস কী বিজ্ঞান?

৫। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল আছে?

৬। কোন্ কোন্ দিক দিকে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

একক ৬

History and other Disciplines

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.২.৬.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.২.৬.১ ঃ সূচনা

১.২.৬.২ ঃ ইতিহাস ও অর্থনীতি

১.২.৬.৩ ঃ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১.২.৬.৪ ঃ ইতিহাস ও ভূগোল

১.২.৬.৫ ঃ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব

১.২.৬.৬ঃ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১.২.৬.৭ ঃ ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যা

১.২.৬.৮ ঃ ইতিহাস ও ভাষাবিদ্যা

১.২.৬.৯ ঃ ইতিহাস ও দর্শন

১.২.৬.১০ ঃ ইতিহাস ও গ্রন্থপঞ্জী

১.২.৬.১১ ঃ সহায়ক প্রশ্নাবলী

১.২.৬.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাস ও অন্যান্য নানা বিষয়ের সম্পর্ক

(২) ইতিহাসের উপর অর্থনীতির প্রভাব?

(৩) ইতিহাস ও রষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

(৪) ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব

(৫) ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

(৬) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক

(৭) ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক

(৮) ইতিহাস ও নৃতত্ত্বেবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক

(৯) ইতিহাস ও দর্শনের সম্পর্ক

১.২.৬.১ ঃ সূচনা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং যত দিন যাচ্ছে এই নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। ঠিক তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের অফুরন্ত প্রসারের ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একে অপরের পরিপুরক বা অনুপুরকের কাজ করছে। বর্তমানে জ্ঞানের কোন শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবী করতে পারে না। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংযোগের ফলে প্রত্যেকটি শাখাই পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে। বর্তমানে 'inter-disciplinary' শব্দটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, ঐতিহাসিক সকলের কাছেই সুপরিচিত। বিভিন্ন শাখার মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যমে আধুনিককালের জ্ঞানচর্চার গতি প্রসারলাভ করছে এবং সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসেবে ইতিহাসও অন্যান্য জ্ঞানের শাখাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাস তাই আজকে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞানের নানা শাখাগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। আজ ইতিহাস বলতে বোঝায় রাজা-রাজাদের কাহিনী নয়। মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন আবর্তিত হচ্ছে তা সবই ইতিহাসের অংশবিশেষ। আজ তাই ছাত্ররা 'total history' বা সামগ্রিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসেবে ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের নানা শাখাগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে।

প্রশ্ন ১। জ্ঞানের প্রতিটি শাখাই কেন পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে?

১.২.৬.২ ঃ ইতিহাস ও অর্থনীতি

অর্থনীতির আলোচনাকে বাদ দিয়ে আজ গবেষক ও ঐতিহাসিকের দল ইতিহাসিকের দল ইতিহাসকে ভাবতে পারেন না। সাধারণভাবে সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদ বিতরণ ও সম্পদ ভেআগ করায় যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকেই অর্থনীতি বলে অভিহিত করা যায়। ইতিহাসের যে বিরাট কর্মযজ্ঞ তা কখনও মানবজীবনকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। এই মানুষের জীবনধারনের জন্য একান্ত পয়োজন অর্থ। তাই মানুষের কর্মকাণ্ডের সিংহভাগই বহুমুখী প্রয়োজন মেটাবার জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহে নিয়োজিত থাকে। আবার ইতিহাস গবেষণার একটা দিক হল মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান চালানো। এ কারমে প্রাচানকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের আর্থিক চাহিদার প্রকৃতি বুঝতে পারলে একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে মানবীয় কর্মকাণ্ডের সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ সহজতর হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ (Economic determinism) দ্বারাই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব। এ তত্ত্বের উদগাতা স্বয়ং কার্ল মার্কস। তবে সকলে হয়তো

প্রাচীনকাল থেকে শুরুর করে আজ পর্যন্ত মানুষের আর্থিক চাহিদার প্রকৃতি বুঝতে পারলে একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে মানবীয় কর্মকাণ্ডের সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সহজতর হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ দ্বারই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব। ইতিহাস অর্থনিতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত গবেষকদের অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় সরবরাহ করে থাকে।

বা এ তত্ত্বের সঙ্গে একমত হবে না এবং আধুনিককালের নানা ঐতিহাসিকের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধও সুস্পষ্ট। তবে এ কথাও সত্য যে, ইতিহাসচর্চার বা দর্শনের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অর্থনৈতিক বিষয়াদিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সম্ভব নয়, বরং এই সব বিষয়াদি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে হয়। প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনাতিতে উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন উৎপাদিত দ্রব্য ও তার বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কোনো কোনো যুগে, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই অর্থনৈতিক বিষয়াদি মানুষের কর্মকামেড চুড়ান্ত নিয়ন্ত্রক ও নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে আসছে। কিছু কিছু আকর্ষনী উপাদান বাদ পড়লেও, শুধু অর্থনীতির নিরিখে আধুনিক ও সমসাময়িক সমাজের উদ্ভব ব্যাখ্যা করলে প্রায় চূড়ান্ত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব। তা ছাড়া ইতিহাসের এমন কোনো যুগ নেই— কি প্রাচীন, কি মধ্য, কি আধুনিক, যখন মানব সমাজের উপর অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হত। এ কারণেই গবেষক এবং ঐতিহাসিককে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর অধিকতর জোর দিতে হয়। আর ও কাজে মুন্সিয়ানা দেখাবার জন্য ঐতিহাসিকদের সম্পদ তৈরি ও ব্যবহার প্রক্রিয়ার সাথে ভালভাবে পরিচিত হতে হয়। অর্থনীতি সম্পর্কে তার ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি এই কাজে যত দক্ষতা দেখান, তিনি একজন দক্ষ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের খ্যাতি অর্জন করেন। জটিল আধুনিক দগতে ঐতিহাসিকের জন্য অনুরূপ দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ১। কিসের দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লষণ সম্ভব?

অবশ্য ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকও একজন অর্থনীতির ছাত্র, গবেষকের কার্যক্রম সহজ করতে অনেক অবদান রাখতে পারে। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ও চালিকা শক্তির ধরণ একমাত্র ইতিহাসই ব্যক্ত করতে পারে এবং অর্থনীতিবিদদের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসে তাদের কাজকে সহজতর করে তুলতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপট পর্যাপ্তভাবে রপ্ত করা ছাড়া বর্তমান মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এর ফলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হতে বাধা। ইতিহাসই অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত গবেষকদের অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় সরবরাহ করতে পারে। দৃষ্ঠান্ত হিসেবে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের সিন্ধুসভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বা মধ্যযুগের ভারতের মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাস, আধুনিককালে অর্থনীতির গবেষকদের নানা সুবিধা করে দেয়। তাছাড়া ইতিহাস অনেক ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রমাণাদির সাহায্যে অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের স্বরূপ অর্থনীতিবিদদের সামনে তুলি ধরে। মোটের উপর বলা যায়, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও অর্থনীতি এই বিষয় দুটি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আজ তাই 'অর্থনীতির' বহু বি,য় ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রমে অন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে ইতিহাসের অনেক কিছু অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য পাঠক্রমে ঢোকানো হয়েছে।

১.২.৬.৩ ঃ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ইতিহাসকে মূল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার ফসল বলে অভিহিত করা যায়। (History is the root, political Science is the fruit) এই কথাটি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ও এই সঙ্গে যুক্তিযুক্তও। আবার অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেন যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বিষয়টি তার নিজের লেখার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও অপরিহার্য।

দীর্ঘকাল ধরে বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজনৈতিক বিষয়াদি ইত্যাদি ইতিহাস গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক সংগঠনের মূল কাঠামো সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে ইতিহাস রচনা খুবই নিম্নমানের ও অস্পষ্ট হবে। এজন্য ইতিহাসকে মূল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার ফসল বলা হয়।

'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলতে কি বোঝায়? যে কোন রাষ্ট্র বিষয়ে জ্ঞান বা বিদ্যা হল 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' সম্পর্কে জানা। দীর্ঘকাল ধরে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজনৈতিক বিষয়াদি ইত্যাদি ইতিহাস গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছে। অথচ কমসংখ্যক ঐতিহাসিকেরই 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' সম্পর্কে নিয়মানুযায়ী ধারণা আছে। অবশ্য আইনসংক্রান্ত প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণাযুক্ত ইতিহাস প্রণেতাগণ রাজনৈতির প্রেক্ষাপটের মূল উদঘাটনে তৎপর ছিলেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ইতিহাসে অনেক অসঙ্গতি থাকত। কারণ তারা শুধু রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব বা রাজনীতিবিদদের জীবনর সংগঠিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক ঐতিহাসিকের স্বীকার করেন যে, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি বিচার বা রাজনৈতিক সংগঠনের মূল কাঠামো সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে ইতিহাস রচনা খুবই নিম্নমানের ও অস্পষ্ট হবে। এ কারণে সার্থক ইতিহাসচর্চার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত দরকার।

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র বিজ্ঞান কাকে বলে?

২। History is the root, political Science is the fruit-এই কথাটি কেন ব্যবহার করা হয়?

অন্যদিকে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখার সময়ে অনেক রাজনৈতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কাছে ব্যাপক মৌলিক উপাদান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। আর এ সব তথ্যের আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তথ্যগণ ও তত্ত্বগত আলোচনা জোরদার করতে পারেন। এর ফলে রাজনৈতিক ইতিহাস পরস্পরের সাহায্যে পরিপুষ্ট হবার সম্বাবনা থাকে।

১.২.৬.৪ ঃ ইতিহাস ও ভূগোল

ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক খুবই প্রাচীন। সূর্য এবং চাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক, এই বিষয় দুটির সম্পর্ক ঠিক একই বললে অতিশযোক্তি হবে না। উচ্চমানের ইতিহাস রচনার জন্য, বিশেষববে সামরিক ও কুটনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য মোটামুটি ভাবে ভৌগোলিক জ্ঞান এবং মানচিত্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত

প্রয়োজন। এমনকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও একটি উপযুক্ত ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

উচ্চমানের ইতিহাস রচনার জন্য ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলের মতে, ইতিহাস বিশ্লেষণ মুখ্যত ভৌগোলিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার ইতিহাসের বর্ণনা ও নানা ঘটনা থেকে ভূগোলবিদরা সংশ্লিষ্টদেশ ও এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ জানতে পারেন এবং তা নিয়ে তাদের চিন্তাধারা পুনগঠনের সুযোগ পান।

এই ভাবাদর্শ থেকেই ইতিহাসের জনক গ্রীক ঐতিহাসিক হেরেডোটাস সর্বপ্রথম মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে ভূগোল ও পরিবেশের নিবিড় সংযোগের কথা বেশ জোর দিয়ে বলেন। 'গ্রীক-পার্সিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে মিশরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি নীলনদের প্লাবন, পলিমাটি বেষ্টিত ভূমির কথা এবং এদের প্রবাবের কথা জোড় দিয়ে বর্ণনা করেন। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলের মতে, ইতিহাস বিশ্লেষণ মুখ্যতঃ ভৌগলিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টির উপর আরও জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, ভৌগলিক ভিত্তি ছাড়া ইতিহাসের মানুষের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা নিরর্থক। এতে বাস্তবতার কোন স্পর্শ থাকে না। নিদিষ্ট ভৌগলিক পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়ে থাকে। ভূমির গঠন,উর্বরতা, উৎপন্ন দ্রব্য, জলবায়ু, প্রকৃতি নানাভাবে মানুষের কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন সাধারম রূপ নিয়েছে। ভারত ও ভারতবর্ষের লোকেদের উপর প্রকৃতি, জলবায়ু, আবহাওয়া, পরিবেশের যে বিপুর প্রভাব রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস ও ভারতীয়দের জীবনযাত্রা ভূগোল ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ভারত উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাসে ভৌগলিক প্রভাব কার না জানা।

অন্যদিকে ইতিহাসের বর্ণনা ও নানা ঘটনা থেকে ভূগোলবিদেরা সংশিষ্ট দেশ ও এলাকার ভৌগলিক বিবরণ যেমন জানতে পারেন তেমনি তা নিয়ে তাদের চিন্তাধার পুনগঠনেরও সুযোগ পান। তাই ইতিহাস ও ভূগোল পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন

১। কোন ঐতিহাসিক সর্বপ্রথম মানুষের কর্মকান্ডের সাথে ভূগোল ও পরিবেশের নিবিড় সংযোগের কথা বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন?

১.২.৬.৫ ঃ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা উভয়ের মধ্যে বিষয়গত সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। আগষ্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। আবার তিনি ইতিহাসচর্চার বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। অতএব কোঁত ছিলেন একাধারে সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাস গবেষক। ঠিক একই কথা ভালভাবে প্রযোজ্য কার্ল মার্কসের ক্ষেত্রে। মার্কস ছিলেন একজন মহান সমাজবিজ্ঞানী, আবার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। অতএব সে দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি একজন মহান ঐতিহাসিকও ছিলেন।

সমাজ বিজ্ঞানের জনক আগষ্ট কোঁত ইতিহাস চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে। জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে বিরামহীন ও ফলদায়ক লেনদেন অব্যাহত।

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান এই উভয় বিষয়টি সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যলোচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে বিষয় দুটির মধ্যে পার্থক্য হল শুধু পদ্ধতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা। অবশ্য জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই দুই শাখার মধ্যে বিরামহীন ও ফলদায়ক লেনদেন অব্যাহত আছে।

অবশ্য অধুনা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য নজরে পড়ছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ দু ধরনের কাজে নিয়োজিত আছেন। কাজকর্মের প্রথম ধাপে তারা মানুষের কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলো ধরে একটা ব্যাপক ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তৈরি করেন। এ কাজে তারা ইতিহাস থেকে মাল-মশলা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানের এই যে পদ্ধতি অর্থাৎ ইতিহাসের উরপর নির্ভরশীলতা— এই কথা সমাজবিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না। অবশ্য প্রত্যুত্তরে ইতিহাসও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সুবিধা নেয়। যেমন সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে তারা অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধাপে অধুনা মানুষের সুক্ষাতিসূক্ষ কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিয়ে বিশদ ও বিস্তারিত গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই ধরনের প্রক্রিয়ার উদ্ভট ঘটে। অনুরূপ জ্ঞানচর্চায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রাধান্যলাভ করে ও ফলপ্রসূ হয়। বিশেষ করে জমি জরিপ কৌশল ও প্রশ্নমালা পদ্ধতির মধে এ প্রক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইতিহাস চর্চাকেও আরও অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ১। সমাজ বিজ্ঞানের জনক কে?

১.২.৬.৬ ঃ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

ইতিহাস ও প্রত্মতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। ইতিহাস লেখার সময়ে ঐতিহাসিক যে সব উপাদান ব্যবহার করে থাকেন তাকে সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এই দুই প্রধান শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আবার প্রকারভেদ আছে যথা লিপিতত্ত্ব বা লেখমাল, হস্তলিপি বিজ্ঞন, মুদ্রা, স্মৃতি-সৌধাদির চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা অত্যন্ত প্রামাণ্য ও গ্রাহ্যযোগ্য। সাহিত্যিক উপাদানে অনেক সময় অতিশয়োক্তি থাকে বা নানা দোষ ত্রুটি থাকে। সে দিন দিয়ে তুলনামুলকভাবে প্রত্নতাত্ত্বির উপাদন অনেক বেশি নির্ভরশীল। ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নানা চিহ্নাদি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের বিরাট সাফল্যে সম্ভব হয়েছে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের প্রচেষ্টায় এশীয় পুরতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, নানা দেশ থেকে জ্ঞানসম্পদ ও প্রত্নসংগ্রহের কাজ ত্বরান্তিত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের জদ্দ্যোগে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের সংগঠনে ফলে

প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস হয়ে উঠল যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত ও নিরপেক্ষ। ঐতিহাসিকেরা নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের মালমশলা প্রত্নতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করেন। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলেই পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসের প্রাচীন অতীত ঐতিহ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এজন্য বলা যেতে পারে, "Archaeology is the backbone of history".

সরকারি অনুদানে লুপ্ত বা বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসের নানা স্মৃতির সন্ধান শুরু হয়েছিল। তাই ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাদের উদ্যোগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল। এর পূর্বে ঐতিহাসিকরা প্রধানতঃ আদর্শবাদী, কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য, পুরোহিত সমাজের ধর্মীয় পুঁথিপত্র, পুরণ, ধর্ম কথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। তাই প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার ইতিহাসকে যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে নিয়ে এল। ইতিহাস হয়ে উঠল অনেক বেশি পরীক্ষিত সত্য, নিরপেক্ষ। ঐতিহাসিকেরা নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের মালমশলা প্রত্নতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করতে পারলেন। অতএব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় মিথিকেল ইমেজ বা কল্পনা প্রসূত আবছারূপের পরিবর্তন ঘটল। নিঃসন্দেহে পুরাতাত্ত্বিক এই ক্রিয়াকর্ম প্রত্ন আবিষ্কারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। লক্ষণীয়, জাতীয় চেতনার উন্মেষের লগ্নে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা ও জাতীয়তাবাদী ঐইতহাসিকরা অতীত ভারতীয় জীবনের গৌরবময় চিত্রটা যেন লুফে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির গর্বিত রূপটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মধ্যবিত্তদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে ফলে আমাদের ইতিহাসের রচনায় জনতত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্লেষণের প্রসার ঘটে।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিক মাল মশলাগুলি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদানমাত্র। তারা ইতিহাসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঐ উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে পরিণত করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে সব তথ্য মৃত, অর্থহীন। নির্বাচন তথ্য যখন ঐতিহাসিকের অতীত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার স্পর্শ পায় এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশেষ মূল্য ও ঘটনার সম্পর্কের ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়, তখনই তার ইতিহাস রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস আমরা প্রধানত জানতে পারি বিভিন্ন ধরনের লিপিতত্ত্ব থেকে। এই সব লিপি ব্রাহ্মী ও ঘরোষ্ঠী ভাঙা লেখা ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাদের পাঠোদ্ধার করে ইতিহস পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। ইতিহাসের অনেক মাল-মশলা আমাদের হাতে এসেছে। মৌর্য পরবর্তী যুগ থেকে শুরু করে কুষাণ যুগ পর্যন্ত অনেক ইতিহাস আমরা মুদ্রা থেকে উদ্ধার করতে পারি। এক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদন প্রায় নেই বললেই চলে। গুপ্তযুগের রাজাদের কাহিনীও আমরা লিপি ও মুদ্রা উদ্ধার করতে পারি। প্রাচীন বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রধান উপাদনগুলি প্রত্ন আবিষ্কারের ফলেই পাওয়া গেছে।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই এই উপাদানগুলিও ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় অন্য সূত্র থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। লিপি বা মুদ্রার পাঠোদ্ধার করে প্রথম যিনি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর প্রবণতা, সমসাময়িককালের মূল্যবোধ ও মানসিক গঠন এবং বর্তমানে দাঁড়িয়ে যে ঐতিহাসিক ঐ ঘটনাকে কাজে লাগাচ্ছেন, তাঁর মন ও পরিবেশ বিভিন্ন পর্যায়ের। সময়সীমার দুই প্রান্তে অবস্থিত এই দুই ব্যক্তির মানসিকতা কিছুতেই এক হতে পারে না। প্রথমে যিনি ঘটনাকে স্তম্ভে বা পাথরের উৎকীর্ণ করেছেন, তিনি হয়তো ঐ কাজটি করেছেন হয়তো বা বিশেষ কোনো তাগিদে, হয়তো প্রচারের উদ্দেশ্যে। অনেক সময় রাজ-রাজড়ারা তাদের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে লিপি বা মুদ্রার তাদের কীর্তিকলাপের কাহিনী অতিরঞ্জিত করতেন। অনেক সময় সভাকবিরাও তাদের প্রভুকে তোষণ করার জন্য প্রশস্তিমূলক লিপি বা পাথর উৎকীর্ণ

করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সমুদ্রগুপ্তের হরিষেণের 'এলাহাবাদ প্রশস্তির' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তা সত্ত্বেও একথাও সত্য যে এগুলি আমাদের মূল্যবান উপাদান। প্রত্নতত্ত্ব থেকেই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণগুলির সংশোধন ও পরিমার্জন সম্ভব নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত কোনো তুলনামূলক আলোচনার মানদণ্ডের সাহায্যে। বিশেষ ধরনের কতকগুলি তথ্যের বিকৃতিথবা ঘটনার আদর্শচয়নও এড়াতে পারা যায় সামালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই।

সবশেষে বলা যায়, প্রত্ন আবিষ্কারই ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, অনেক দেশ—নগর, সভ্যতা, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজানাকে করেছে জানা। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলেই পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসের প্রাচীন অতীত ঐতিহ্য জানা সম্ভব হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য না পেলে ঐতিহাসিক ও তার তথ্য অনেকটাই পিছিয়ে থাকত। বলা যেতে পারে 'প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের মেরুদণ্ড' (Archaeology is the backbone of history).

প্রশ্ন ১। কত সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়?

১.২.৬.৭ ঃ ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যা

নৃতত্ত্ববিদ্যা নানা দিক দিয়ে ইতিহাস লিখনে ও পাঠে সাহায্য করতে পারে। অনেক অজানা বিষয় নৃতত্ত্ববিদ্যা ঐতিহাসিকদের কাছে পরিচিত করে তুলতে পারে। এর ভিত্তিতে গবেষক ও ঐতিহাসিকরা নতুন আলোকে ইতিহাস রচনা করতে পারেন। নৃতত্ত্ববিদরা তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের এক ব্যাপক অংশের মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হন। সমাজের নানা মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যদ্রব্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তারা প্রিশ্রম করে এবং নানা মানুষের সান্নিধ্যে এসে জানতে পারেন। আবার সামাজিক মানুষের এই সমস্ত বিষয় জানা ঐতিহাসিকদের কাছেও একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিককে এই কাজে সাহায্য করেন নৃতত্ত্ববিদগণ। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের ধারণা ও ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন নৃতত্ত্ববিদরা। এরফলে ইতিহাসের ধারার কোন একটি সময়ে যে ধারণা ছিল যে আর্যদের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু হয়েছে, তা আজ ভ্রান্ত ধারণা হিসেবে প্রমাণিত। নৃতত্ত্ববিদার প্রাচীন প্রস্তরযুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যাগের মানুষদের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনেক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরস্পরের আদান-প্রদানের ফলে ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। আদিম ভারতীয় জনসমাজের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতিদের জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে নৃতত্ত্ববিদরা ঐতিহাসিকদের কাছে নানা তথ্য উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এইসব নানা তথ্য আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করেছে। ঐতিহাসিকগণ এইসব তথ্যকে নানা দৃষ্টিবঙ্গিতে বিচার করেছেন।

নৃতত্ত্ববিদরা তাদের কাজকর্মের মধ্যদিয়ে সমাজের নানা মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যদ্রব্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ জানতে পারেন। এই সমস্ত বিষয় জানা ঐতিহাসিকদের কাছেও একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিককে এই কাজে সাহায্য করে থাকেন নৃতত্ত্ববিদগণ। নৃতত্ত্ববিদদের দেওয়া তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি যে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিভাবে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আদিবাসী-উপজাতিদের ইতিহাস আজ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসের মূল্যবান বিষয়বস্তু। নৃতত্ত্ববিদরা বনভূমির সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের কিভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং বনিভূমিতে তদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ধারা কোন গতিতে এবং ছন্দে চলেছিল তার উপর নানাভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। তাদের দেওয়া তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি যে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য কিভাবে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদের ব্যবহার ও সুপ্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণালাভের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদরা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। আজ এর ফলেই ঐতিহাসিকগণ প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং ব্রিটিশদের আগমনের পর এর যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পর্কে বিচার-বিশ্লষণ ঔপনিবেশিক বাতাবরণে করবার চেষ্টা করছেন। বনভূমিকে অগ্নিদগ্ধ করবার পর সেই জমিতে যে অস্থায়ী চাষাবাদ হত তার বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন নৃতত্ত্ববিদরা। এই ধরনের গবেষণা আজ ঐতিহাসিকদের নানাভাবে সাহায্য করছে। এইসব নানা দিক বিচার করে বলা যায় যে, 'Anthropology is living history'.

প্রশ্ন ১। নৃতত্ত্ববিদ্যা কিভাবে ইতিহাসকে সাহায্য করেছে?

১.২.৬.৮ ঃ ইতিহাস ও ভাষাবিদ্যা

যথার্থ ইতিহাস লেখার জন্য ভাষাবিদ্যা আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহাসিককে ইতিহাস লেখার জন্য নানা ভাষা শিখতে হয়। আবার এ কাজে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের সাহায্য করতে পারেন ভাষাবিদগণ। বিভিন্ন ভাষায় লেখা নানা উৎসবের, লিপির পাঠোদ্ধার করা ভাষাবিদগণের পক্ষেই সম্ভব।

ইতিহাস লেখার পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হল প্রাথমিক উৎসের বা উপকরণের সন্ধান, এইসব উৎস নানাভাষায় লেখা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিপি বা লেখ একান্ত অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এইসব লিপি তামিল, তেলেগু, পালি, সংস্কৃত ও আরও নানাভাষায় লেখা রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় ভাষায়ও অনেক উৎস রচিত হয়েছে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য সেইসব লিপির ভাষা জানা আবশ্যক। এ কাজে ঐতিহাসিককে সাহায্য করেন ভাষাবিদগণ। আবার যখন কোন ঐতিহাসিক মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন তাকে সুলতানিযুগে প্রচলিত ভাষাসমূহ এবং মোগলযুগে প্রচলিত ভাষাসমূহ জানতে হবে। নচেৎ তিনি মূল উপাদানগুলির অধিকাংশ যা আরবি, ফারসি, উর্দু এবং আরও নানা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা রয়েছে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আর এগুলির পাঠোদ্ধার না করে যিনিই ইতিহাস লেখেন তার ইতিহাস মোটেই বিজ্ঞানসম্মত, প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদালাভ করতে পারবে না। অতীতে যে সব প্রথিতযশা ঐতিহাসিকগণ মারাঠা, মোগল ও সুলতানি যুগের উপর কাজ করেছেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষালাভ করেছেন। যদুনাথ সরকার বা সুরেন্দ্রনাথ সেনের মত অতীতের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা নানাভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং এর

ইতিহাস লেখার পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হল প্রাথমিক উৎসের বা উপকরণের সন্ধান, এইসব উৎস নানা ভাষায় লেখা। একাজে ঐতিহাসিককে সাহায্য করেন ভাষাবিদগণ।

ফলেই তাঁদের ইতিহাস অনেক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসসম্মত হয়েছে। আধুনিককালের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরাও একই পদ্ধতি অবলম্বন করে নানা ভাষা আয়ত্ত করে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের ভারতের ইতিহাসের নানাদিক বিচার বিশ্লেষণ করে চলেছেন। এটা শুরু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নয়, সারা বিশ্বের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং পশ্চিমের দেশগুলি ঐতিহাসিকেরা ভাষাজ্ঞানের গুরুত্বের কথা প্রথম তাদের ইতিহাস রচনায় তুলে ধরেছেন। অতএব এই দুরূহ কাজে ঐতিহাসিককে অবশ্যই সাহায্য করতে পারেন নানা ভাষায় দক্ষ ভাষাবিদগণ। অতএব ইতিহাসের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক বঘীর, একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যারা ভাষাবিদ্যা অর্জন না করে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হন তাদের প্রধানতঃ দ্বিতীয় সারির উপাদানগুলির ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। সেরকম ইতিহাস যতার্থ ইতিহাসের পরিপন্থী।

প্রশ্ন ১। ভাষাবিদ্যা অর্জন না করে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হলে ঐতিহাসিকদের কিসের উপর নির্ভর করতে হয়?

১.২.৬.৯ ঃ ইতিহাস ও দর্শন

ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রেও নানা বরিবর্তন নিয়ে আসে। অনেক সময় দর্শনের প্রভাবে বা দার্শনিকদের তত্ত্বের প্রভাবে রাজনীতি, সামাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটবার ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা গেছে। বেশ কিছুকাল ধরেই ইতিহাসের অবশ্য পাঠ্য বিষয় সূচীর মধ্যে অন্তভুক্ত করা হয়েছে ইতিহাসের দর্শন। ঐতিহাসিককে যেমন দার্শনিকদের মতাদর্শের শরণাপন্ন হতে হয়, তেমনি দার্শনিকদেরও তাদের মতাদর্শের প্রচার, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সার্থকতার জন্য ঐতিহাসিকদের দ্বারে উপনীত হতে হয়। একে অপরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ইতিহাসকে দেখা বা চর্চার জন্য একটা দর্শন রয়েছে এবং সেই প্রকৃত দর্শনের ফলেই ইতিহাসচর্চা (Historiography) সার্থকরূপ লাভ করতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকরা, দুধরেনর উপকরণের সাহায্যে তাদের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে যুক্তিবহ করে তোলেন। এক, দর্শনত্ত্ব এবং দুই, ঐতিহাসিক তথ্য বা বিষয় সমূহ। প্রথমটির জন্য ঐতিহাসিকের দরকার দার্শনিকের। দ্বিতীয়টির জন্য দার্শনিকের একান্ত প্রয়োজন ঐতিহাসিকের। কারন একজন ঐতিহাসিকই কেবলমাত্র পারে দার্শনিকের তত্ত্ব বা মতবাদকে ইতিহাসগতভাবে বিচার করতে বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাজাতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ঢেউ প্রহবমান ছিল। এই পরিবর্তন আলোকিত যুগের সূচনা করেছিল। এই নতুন চিন্তার বিশেষত্ব ছিল, দার্শনিকরা পূর্বের ভ্রান্ত দর্শন থেকে সরে এসে জনগণকে নতুন দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির যুগে মন্টেস্কু, ভলটেয়ার, রুশো ও ফিজিওক্রাটরা এমন এক যুক্তিবাদী মতবাদ নিয়ে এসেছিলেন যা মানুষকে পৌঁছে দেয় পূর্ণতায়। আগেকার দর্শন-চিন্তার মূলসূত্র ছিল মানুষ

স্বভাবত অপূর্ণ (imperfect). পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে তাঁর ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকরা তাদের লেখার প্রচার করলেন যে পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে মানবসমাজের প্রয়োজন যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং ধর্মসম্পএর্ক সংশয়াবাদ। নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠিত করল এই সভ্য যে, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। অর্থনীতি ও সমাজ আবর্তিত হল যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে। ইতিহাসের কোন ঘটনার আগমনে বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি রচনায় দার্শনিকদের দর্শনতত্ত্ব মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলো। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইউরোপের ফরাসী বিপ্লব,রুশ বিপ্লব। ইতিহাসের অনেক শাসকের শাসনকার্যের অনুপ্রেরণার পশ্চাতে দার্শনিকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কারমূলক কার্যাদি তাঁর গুরু বেন্তামের উপযোগিতাবাদ তত্ত্বের বা দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কার্ল মার্কসের দ্বন্দমূলক বাস্তুবাদ তত্ত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদী ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর সামাজির ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ কার্ল মার্কসের তত্ত্বের মূল কথা ছিল। অতএব যুগে যুগে দেখা গেছে যে দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ইতিহাসের নিয়ন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছে। তাই দর্শন ও ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সব সময়েই কাজ করে চলেছে। ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে দর্শনের বা দার্শনিকদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে।

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকরা দুধরনের উপকরণের সাহায্যে তাদের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে যুকিতবহ করে তোলেন। এক, দর্শনতত্ত্ব এবং দুই, ঐতিহাসিক তথ্য বা বিষয়সমূহ। প্রথমটির জন্য ঐতিহাসিকের দরকার দার্শনিকের। দ্বিতীয়টির জন্য দার্শনিকের একান্ত প্রয়োজন ঐতিহাসিকের।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক কি?

১.২.৬.১০ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইতিহাস অনুসন্ধান ৪ (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত)
ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা'— অমিতা রায়।

২। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস— সুনীল চট্টোপাধ্যায় (প্রথম খণ্ড)

৩। ইতিহাস চর্চা— নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। কাকে বলে ইতিহাস—ই. এইচ. কার।

৫। ইতিহাসতত্ত্ব— এম. দেলওয়ার হোসেন।

৬। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — মমতাজুর রহমান তরফদার।

১.২.৬.১১ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাসের সঙ্গে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪। ইতিহাস ও দর্শন পরস্পরকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে?

৫। 'প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের মেরুদণ্ড'—তুমি কি এই মত সমর্থন কর।

৬। ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্ক কেন নিবিড়?

৭। ইতিহাসের সঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। নৃতত্ত্ববিদ্যা কিভাবে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে?

৮। ইতিহাস লেখার জন্য ভাষাবিদ্যা আয়ত্ত করা কেন প্রয়োজন?

৯। ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

১০। ইতিহাস ও দর্শন পরস্পরকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে?

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক ৭

Orientalist, Imperiailist, Nationalist, Theological

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৩.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৩.৭.১ ঃ প্রাচ্যবাদ (Orientalism)

১.৩.৭.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহসচর্চা (Imperialist Historiography)

১.৩.৭.৩ ঃ জাতীয়তাবাদী ইতিহাদচর্চা (Theological Historiography)

১.৩.৭.৪ ঃ ধর্মতত্ত্ব বা দিব্যতন্ত্র ইতিহাস চর্চা (Theological Historiography)

১.৩.৭.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৩.৭.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৩.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাচ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

(২) প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য

(৩) এই চর্চার ফলাফল

(৪) এই চর্চর উদ্দেশ্য ও ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক

(৫) সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস বলতে কি বোঝায়

(৬) সাম্রাদ্যবাদের বিভিন্ন পর্ব

(৭) সাম্রাজ্যবাদের উত্তান ও পতনের কারণ—ঐতিহাসিক বিতর্ক

(৮) জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(৯) এই ইতিহাসচর্চার ধারা

(১০) এই ইতিহাসচর্চার ঐতিহাসিকদের নানা দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই ইতিহাসচর্চার প্রসার।

১.৩.৭.১ ঃ প্রাচ্যবাদ (Orientalism)

আঠারো শতকের অন্তিমপর্বে প্রাচ্যবিদ্যা কথাটি পণ্ডিত ও গবেষক মহলে পরিচিত লাভ করে। যারা এশিয়ার মানুষ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করতেন প্রধানত তাঁদেরই প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হত। প্রাচ্য সম্বন্ধে এই অনুসন্ধানের ভিত্তি স্থাপন করেন কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স ও বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার। এঁরা এশিয়ার সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্রতী হন। তাঁরা স্থানীয় ভাষা ও প্রাচ্যের পুরানো পবিত্র গ্রন্থগুলি ব্যবহার করেন। জ্ঞানদীপ্ত যুগের পৃথিবী সম্পর্কে আগ্রহের চিন্তাধারা তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও এশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের দুর্বলতা ছিল। প্রাচ্য সম্পর্কে তাদে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি ইতিহাস, সাহিত্য, নৃতত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞনের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, ব্রাসেল্‌স, হাইডেলবার্গ, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যায় পড়াশোনা ও গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কিন্তু ১৯৭৮ সালে এডওয়ার্ড সঈদ (Edward Said)-এর Orientalist বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য ও ফালফল সম্পর্কে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর বক্তব্য হল গবেষক, ঐতিহাসিক ও পণিততেরা যেন প্রাচ্য বা Orient সম্পর্কে কতটা জানে ও তা কেমন করে জেনেছিল শুধু তার পুনঃপরীক্ষা করবে তাই নয়, কেন তারা জানতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে ও চিন্তা করবে। সঈচ প্রাচ্যতত্ত্বের মাধ্যমে পশ্চিমী উৎকর্ষতা ও আধিপত্য প্রকাশের ধারণাকে উন্মোচিত করেন। বিদ্যাচর্চার এই মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির উপর ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা হয়ে উঠেছিল প্রাচ্যের উপর শক্তির প্রকাশ। কারণ এই চর্চার মাধ্যমে জানা যায় অ-পশ্চিমী মানুষদের কীভাবে অবদমিত করা হয়েছিল। এদেশের বিভিন্ন ভ্রামণকাহিনী, ঐতিহাসিকগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা ব্যবহৃত ও হয়েছিল। সাম্রাজ্য শেষ হবার পরও নায়। উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে তথ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় পদ্ধতি, তত্ত্ব এবং শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় ও বিজিতদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন Progress vs Stagnation, adulthood vs childhood এবং reason vs superstition এই পার্থক্যগুলির মধ্য দিয়েই ঔপনিবেশিক শাসনের যৌক্তিকতা প্রামণ করার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গদের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এই গবেষকরা বিস্তারিত ভাবে দেখানোর চেষ্টা করতে থাকেন যে Orientalism

*আঠারো শতকের অন্তিম পর্বে যারা এশিয়ার মানুষ ও সমস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করতেন প্রধানত তাঁদেরই প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হত। **Edward Said** এর **'Orientalism'** বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে বিতর্কের নতুন সূত্রপাত ঘটে। **Edward Said** তার **'Culture and Imperialism'** গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, গত শতাব্দী জুড়ে সাম্রাজ্যবাহ পসিচমী সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। রোনাল্ড ইনডেন, গৌরী বিশ্বনাথন, সারা সুলেরি, জাভেদ মজিদ, জ্ঞান প্রকাশ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যাঁরা নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে জড়িত তারা দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে ব্রিটিশ রাজ উত্থানের পথ প্রস্তুত করেছিল। আফ্রিকা, চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ঐতিহাসিকরা ও **post Orientalism** ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।*

কীভাবে ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল এবং প্রাচ্যের জ্ঞান সেখানকার আদর্শ ে মূল্যবোধকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত Culture and Imperialism গ্রন্থে সঈদ পুরানো বিতর্কে আবার ফিরে আসেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে গত দুই শতাব্দী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

পশ্চিমী পণ্ডিত মহলে সঈদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যে সব ধারণার উপর ভিত্তি করে তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা করেছিলেন সেগুলি পুনঃপরীক্ষা ও পুনঃবিবেচনা করা হতে থাকে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা ও চর্চাকে কেউ কেউ Post-Orientalism বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তবে এই শব্দটি এখনও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে Post-Orientalism ধারণাটিকে Post-syructuralism এবং new historicism প্রভৃতি সমালোচনামূলক তত্ত্বের সঙ্গে একীকরণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। হোমি ভাবা, সারা সুলেরি, মেরী লুই প্র্যাট্ এবং গায়ত্রী স্পিভাক্ প্রমুখ গবেষকরা প্রাচ্যতত্ত্বর নতুন পরিপ্রেক্ষিত, বিশে,ত্ন ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এ সম্পর্কে ব্রিটেনের থেকেও আমেরিকায়া আগ্রহ বেশি লক্ষ্য কার যা। পশ্চিমী ইতিহাসচর্চার মধ্য থেকেই Post-Orientalism এর বিরোধিতা এসেছে। জন ম্যাকেঞ্জি, ডেভিড কফ, বার্নার্ড লুইস্ প্রমুখ গবেষকরা মনে করেন কতকগুলি পছন্দের বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গেমেলাতে চেয়েছেন, যেগুলি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে মেলে না। ডেভিড ওয়াসব্রুক্ এবং রোজালিন্দ ও হ্যন্লন্ Post-Orientalism মতকে সমর্থন করে না। কারণ তাঁদের মতে, ক্ষমতার ভিত্তি বস্তুগত বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছিল।

ম্যাকেঞ্জি মনে করেন সঈদের Orientalism এবং Culture and Imperialism বই দুটি ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করেনি। ম্যাকেঞ্জির এই বক্তব্য অনেকেই সমর্থন করেননি। ১৯৮০ সালে annales-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় ফরাসী ঐতিহাসিকদের Orientalism সম্পর্কে আগ্রহ লক্ষ্য কার যায়। রোনাল্ড ইনডেন, গৌরী বিশ্বনাথন, সারা সুলেরি, জাভেদ মজিদ, জ্ঞান প্রকাশ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যাঁরা নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে জড়িত তাদের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসচর্চার নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছে। এরা দেখাতে চেয়েছেন কী ভাবে ব্রিটিশরা ভারতকে জানতে এবং তা কীভাবে ব্রিটিশ রাজ উত্থানেরপও প্রস্তুত করেছিল। আফ্রিকা, চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ঐতিহাসিকরাও Post Orientalism ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভি. ওয়াই. মুদিম্বের লেখা এবং জ্ঞান প্রকাশ সম্পর্কিত After Colonialism (১৯৯৫) গ্রন্থটি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে আরও গবেষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। সঈদের বক্তব্যের সঙ্গে হয়তো অনেকেই একমত হবেন না, তবুও তিনি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে বিতর্কের সূচনা করেছেন তার ফলে এশিয়ার ইতিহাসচর্চা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে।

প্রশ্ন

১। কাদের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বলে মনে করা হত?

২। Edward Said ওর লেখা দুটি বইয়ের নাম কী কী?

৩। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

১.৩.৭.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চা (Imperialist Historiography)

সাম্রাজবাদী ইতিহাসকে প্রকৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এর কারণ হল দুটি। প্রথমতঃ জাতীয় ইতিহাসের মত সাম্রাজ্যীয় ইতিহাসকে কোন সঠিক ভৌগোলিক বা ক্রমকাল অনুযায়ী চিহ্নিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও কাঠামোগত কোন মিল নেই। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল দেখা যায়। সেটি হল যে তাঁরা সবাই সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু সাম্রাজ্য বলতে কী বোঝায়? ধ্রুপদী ঐতিহাসিকেরা রোমান সাম্রআজ্যের কথা বলেন। যেখানে একজন সম্রাট যার হাতে ক্ষমতা থাকত এমন একটি রাজনৈতিক প্রথা। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারত, চীন ও আমেরিকার রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে কিছু মিল পাওয়া যায়। সাধারণ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাম্রাজ্য বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যরও সমস্যা আছে। কারণ দেখা যায় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর সার্বভৌমত্ব অধিকার না করেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একে অঘোষিত সাম্রাজ্যবাদ বা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলা যায়। ওয়াল্টার রডনি এবং আন্তেগুণ্ডার ফ্রাঙ্ক এবং অন্যান্যরা একে নয়া উপনিবেশবাদ বা স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজিক প্রভাব বিস্তার বলে বর্ণনা করেছেন। এজন্য সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃক একচি দুর্বল রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করা। ওকে সাম্রাজ্যবাদের একটি শিথিল ব্যাখ্যা বলে মনে করা যায়।

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস সাধারণত সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে। সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃক একটি দুর্বল রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করা। 'Economic History Review' পত্রিকায় প্রকাশিত 'The Imperialism of Free Trade' প্রবন্ধে রোল্যাণ্ড রবিনসন ও জন গ্যালাহার মনে করেন উনিশশতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র আপাত কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। কারণ ব্রিটেন তাহ স্বার্থ পরোক্ষ উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্য দখলও অব্যাহত রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্ব বে-উপনিবেশীকরণ পর্বের সূচনা হয়।

১৫০০ সালের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের কয়েকটি পর্ব চিহ্নিত করা যায়। ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং তাকে কেন্দ্র করে পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগাল ও স্পেনের, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তারকে সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পর্ব বলা যায়। এর পরের পর্বে হল্যান্ডে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বাণিজ্যিক অগ্রগণ্য দেশগুলি আধিপত্য বিস্তার করে। সূত্রপাত ঘটে মার্কেনটাইলিজম যুগের। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে তারা বিপুল সম্পদ তৈরী করে। ১৫০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দেখা যায় উপনিবেশ স্থাপন। ১৮৮০ সালের পরে সাম্রাজ্যবাদের আর একটি পর্ব শুরু হয়। একে বলা হয় নয়া সাম্রাজ্যবাদ। উইরোপের শক্তিশালী দেশগুলি আফ্রেকা ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মতো পুরনো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় জার্মানী,ইত্যালি, বেলজিয়ামের মত নতুন রষ্ট্রগুলি। এমনকি স্পেন ও পর্তুগালেরও পুনরার্বিভাব ঘটে। এই ঘটনাকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নতুন পর্ব হিসাবে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন। উনিশ শতকের প্রথমভাগের মার্কেন টাইল সাম্রাজ্য এবং ১৮৮০ দশকে নয়া সাম্রাজ্যবাদ যুগের মাঝখানে একটি অস্পষ্ট পর্বের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই সময়ে আবাধ বানিজ্য প্রভাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে সাম্যবাদের কঠোরতা হ্রাস পায়।

তাহলে কী এই সনয়ে সাম্রাজ্যাবাদ পশ্চাদ অপসারণ করেছিল? তা সত্য নয়। কারণ উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইংল্যাণ্ড autonomy দিলেও এশিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা ক্রমশ বৃদ্ধিপেতে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমস্যা সত্ত্বেও ফ্রান্স আলজিরিয়া দখল করে।

১৯৫৩ সালে 'Economic History Review' পত্রিকায় রোল্যান্ড রবিনসন ও জন গ্যালাহারের লেখা 'The Imperialism of Free Trade' প্রবন্ধটি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার একটি নতুন পথ নির্দেশ করে। এঁরা মনে করেন, উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র আপাত কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। কারণ ব্রিটেন তার স্বার্থ পরোক্ষ উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং পিরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্য দখলও অব্যাহত রেখেছিল। উইলিয়াম রজার লুই সম্পাদিত 'Imperialism' গ্রন্থে রবিনসন ও গ্যালাহারের বিতর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্ব হল বি-উপনিবেশীকরন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই এই পর্বের সূচনা হয়েছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্থাপিত ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এরপর বি উপনিবেশীকরন শুরু হয় আফ্রিকায়। ১৯৬০ -এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগীজ শাসি, মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা ছাড়া আফ্রিকার অধিকাংশ উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যায়। বি-উপনিবেশীকরনের ইতিহাস যদিও খুব পুরানো নয়, তবুও ঐতিহাসিকরা এর নানা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। রবাট হল্যাণ্ড, পিটার কেইন, এ্যান্টনি হপকিনস মনে করেন, ইউরোপের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত-রে ফলেই বিউপনিবেশীকরন সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে ডি.এ.লো.কে.ডি. হারগিবস এবং জন ডারউইন-এর বক্তব্য হল উপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারছিল না।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা সাম্রাজ্যবাদের উত্থান সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন যে ১৮৮০ সালের পর সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল এবং তৎকালীন ইউরোপের অর্থনৈতিক চাপই এর প্রধান কারণ।

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা সাম্রাজ্যের উত্থান, ভিত্তি সুদৃঢ়ীকরণ ও পতনের বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অধিকাংশরই মত হল ১৮৮০ সালের পর সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল এবং তৎকীলান ইউরোপের অর্থনৈতিক চাপই এর প্রধান কারণ। বিংশ শতকের গোড়ায় জে.এ হবসন যুক্তি দেখান যে, ধনতন্ত্রীদের প্রয়োজনেই সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল। কারণ তারা বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছিল। তারা তাদের নিজস্ব দেশের সরকারের কছে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন চেয়েছিল। হবসনের বক্তব্যকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন লেনিন ১৯১৬ সালে লেনিন তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য বলেছিলেন 'Imperialism is the highest stage of capitalism.' তিনি একথাও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, কাঁচামাল ও বাজার দখল করার জন্য ধনতন্ত্রীদের সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়োজন ছিল।

সব ঐতিহাসিকই মনে করেন না যে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণই ছিল। উনিশ শতকের কিছু চিন্তাবিদ মনে করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের পিছনে মানবহিতৈষী কারণও ছিল। তাদের মতে, দাস প্রথা বন্ধ করা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষিত ও উন্নত করার প্রয়োজনেও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। আবার অনেকে মনে করেন, মানবহিতৈষী হল সাম্রাজ্যবাদীদের একটা মুখোশ মাত্র।

আলফ্রেড ক্রস্‌বি, ফিলিপ কার্টেন, ড্যানিয়েল হেডারিক প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পরিবেশগত ও কারিগরী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণের কথাও অনেকে বলেছেন। রবিনসন ও গ্যালহার তদের Africa and the Victorians (1961) গ্রন্থে আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদে ইংল্যাণ্ডের অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতের Strategic route গুলিকে রক্ষা করার জন্যই ব্রিটেনকে এই কাজ করতে হয়েছিল। অন্যদিকে বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক হেনরী ব্রান্‌স্‌কউইগ (Henri Brunschwig) ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণের ব্যাখ্যা যারা দিয়েছেন তাদের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ অর্থনৈতিক নয়, দেশের অভ্যন্তরীম রাজনৈতিক দলাদলি। তাছাড়া ফ্রাঙ্কো প্রশিয়ান যুদ্ধের পারজয়ের অপমান ঢাকা দিতে ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহম করতে হয়েছিল। জার্মানী অবশ্য অর্থনৈতিক উদ্দেশেই আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদে অংশ নিয়েছিল।

*লেনিন যথার্থই বলেছিলেন, **'Imperialism was the highest stage of capitalism'**. আবার উনিশ শতকের কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন যে দাসপ্রথা বন্ধ করা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষিত উন্নিত করার প্রয়োজনেও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও কারিগরী ছাড়াও রাজনৈতিক ও কৌশলগত **Safety value** কারণের ব্যাখ্যও দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদেব উত্থানের এত ব্যাখা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক কারণের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক **elite**-দের প্রভাবিত করেছিল। ম্যাকেঞ্জি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।*

অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পিছনে safety-value তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। যেমন শ্রমিক শ্রেণীর তাৎক্ষণিক অভিযোগ প্রশমিত করার জন্য তাদের সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা। ক্রিস্টাল প্যালেসে ডিজরেলীর বিখ্যাত বক্তৃতা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ঐতিহাসিক জোসেফ স্কুম্‌পিটার সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের জাতিগত ও জেন্ট্রি শ্রেণি পৃথিবী ব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছিড় এবং সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে তাদের মান মর্যাদা এবং সামাজিক স্থান বজায় রাখতে চেয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সামাজিক, রাজনৈতিক, কৌশলগত ও মানবিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। ইমানুয়েল ওয়ালর স্টেইন পঞ্চাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, ইউরোপ থেকে উদ্ভুত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কীভাবে সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। ডেভিড ফিল্ডহাউস এবং ডব্লিউ. জি. হাইনস্‌ এই মত জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। সাম্প্রতিককালে পিটার কেইন ও এ্যান্টনি হপ্‌কিন্‌স্‌ তাঁদের দু খণ্ডে লেখা গ্রন্থে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্রের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত ছিল।

এ ছাড়া অনেক ঐতিহাসিক আছেন যারা আদৌ পুর্বোক্ত ব্যাখ্যাগুলি মানেন না। যেমন, জে.সি.ভ্যান.লুইর কথা বলা যায়। এই ডাচ ঐতিহাসিক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ নিয়ে কাজ করেছেন। তা ছাড়া আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ায় ইতিহাসের এলাকাভিত্তিক গবেষণা প্রকল্পগুলি থেকে জানা যায় যে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল স্থানীয় এলাকার intermediaries' এর সহযোগিতার ফলে। এরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের স্থানীয় পরামর্শ ও মূলধন দিয়ে সাহায্য করেছিল। এই মধ্যসত্ত্বভোগীদের উপর বিদেশী বণিকদের নির্ভর করতে হয়েছিল। সি,এ, বেইলী তাঁর Imperial Meridian (1989) গ্রন্থে আঠারো ও উনিশ শতকে আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠনে এই স্থানীয় সহযোগিতার কথা বলেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু এর ফলশ্রুতি হিসাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক ও উত্তর-প্রাচ্যবাদী গবেষণার ক্ষেত্রে কতগুলি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্স ফ্যানন (Frantz Fanon)মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণই হয়নি, নতুন প্রভুদের কাছে স্থানীয় মানুষদের identity ও সংকটের মুখে পড়েছিল। এর থেকে আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে, অধীনস্থ মানুষদের সম্পর্কে পদ্ধতিগত জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে কী সাম্রাজ্যবাদকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে, 'health, gender, law and nature' এর ক্ষেত্রে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং তা ঔপনিবেশিক শক্তির কার্যক্রমকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে ডেভিড আর্নিল্ড, রিচার্ড গ্রোভ, মার্ক হ্যারিসন, রামচন্দ্র গুহ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

অনেক ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? বুয়র যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগ্রহ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক elite-দের প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে এডওয়ার্ড সইদ ও জন ম্যাকেঞ্জি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। মার্গারেট স্ট্রাবেল, মৃণালিনী সিংহ, গ্রাহাম ডসন, রোনাল্ড হায়াম, ফিলিপ্পালোভিন, জে,এম, ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যবাদের ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক এবং নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ্য ইতিহাসচর্চা এক নতুন ও আকর্ষণীয় এলাকায় প্রবেশ করেছে।

প্রশ্ন

১। সাম্রাজ্যবাদ কি?
২। নয়া উপনিবেশবাদ বলতে কি বোঝায়?

১.৩.৭.৩ ঃ জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা (Nationallist Historiography)

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মনে করেন, ভারতের ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বলতে বোঝায় সেই সব রচনা যা জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসারে এবং ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদ সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। তবে তাঁর মতে, ঐতিহাসিক বা লেখকরা এই ধরনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে না লিখলেও তা ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করেছিল।

প্রাথমিকভাবে, উনিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তাঁরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথ্য অনুসন্ধান বলে মনে করতেন। ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চা রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বিশেষ করে শাসক বংশের ইতিহাসের উপর জোর দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক লেখক ও ঐতিহাসিকরা আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে ভারতের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। তাঁরা যেমন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন, তেমনি ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্বভারতায় ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হন। ঔপনিবেশিক শাসক ও ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই সময়ে পাশাপাশি চলেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসকরা আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বিভেদের উপর ভিত্তি করে 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule) করার রাজনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরাও ভারতীয়দের ধর্মীয় ও অঞ্চলিক বিভেদের উপর ভিত্তি করে ভারতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও সমগ্র ভারতের ইতিহাস লিখেছিলেন অথবা শাসকদের সম্পর্কে লিখেছিলেন যারা ভারতের বিভিন্ন অংশ শাসন করত। তবে তাঁরা ভারতীয়দের ধর্ম, জতি এবং ভাষাগত সম্বন্ধের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন এবং ভারতের রাজনৈতির ও সামাজিক অগ্রগতিকে নঞর্থকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা ক্রমাগত দিনের পর দিন একটি বাঁধা-ধরা ঔপনিবেশিক ছকে ইতিহাস রচনা করতে থাকেন। এই ধরনের দুটি প্রাথমিক পাঠ্য বই হল জেমস মিলের প্রাচীন ভারত এবং ইলিয়ট ও ডসনের মধ্যযুগের ভারত। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ও পাল্টা প্রতিবাদী ছক তৈরী করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেছিল, তেমনি ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা ও ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক কর্তৃক ভারতীয় জনগণের অবমাননা ও অমর্যাদার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয়দের মনে জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ জাগত করার কাজে নিয়োজিত হন। দু পক্ষই দিনের পর দিন তাদের বক্তব্য ও লেখার ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়। এমনকি কোন অস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে লেখার জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকরা প্রায়ই প্রথম দিকের ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতেন।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক কর্তৃক ভারতীয় জনগণের অবমাননা ও অমর্যাদার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয়দের মনে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার কাজে নিয়োজিত হন। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতে এনেছে শান্তি শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, আইনের চোখে সাম্য, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সমতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজনক ট্রাডিশনকে পশ্চিমী সভ্যতার থেকে মহৎ ও উৎকৃষ্টতর বলে মনে করেছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার মূল বিষয় ছিল, পশ্চিমী সভ্যতার ও শাসনতন্ত্রে যা কিছু ভাল তা সবই ভারতে ছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বলেন ভারতীয়দের মধ্যে কোন দেশাত্মবোধ বা জাতীয় ঐক্য ছিল না কিন্তু জাতীয়তাবাদ ঐতিহাসিকরা বলেন যে ভারতীয়দের মধ্যেও 'sense of Indian nationhood' ছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক ঔপনিবেশিক লেখক ও প্রশাসক এই ধারণা পোষণ করতেন যে ইতিহাসের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণ স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য, জাতি-গঠন, আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিদেশী আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসন তাদের এই

সবদিকে উপযুক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। উপরন্তু তারা মনে করতেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিকতার পথে ভারতের উন্নতির জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শাসকদের স্থায়ী উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল। ইউটিলিটারিয়ান ও মিশনারীরা যখন ভারতীয় সংস্কৃতির নিন্দা করছিলেন, তখন প্রাচ্যবাদীরা ভারতকে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মানুষদের জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে এ ধরনের প্রশংসাসূচক কথা বললেও তাঁরা মনে করতেন, ইতিহাসগতভাবে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগ্যতা ছিল না। সেজন্য ভারতীয়রা তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটাক ওবিস্বকে প্রভাবিত করুক এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার বিষয়গুলি ব্রিটিশদের হাতে ছেলে দিক। বস্তুতপক্ষে তাঁরা মনে করতেন, বিদেশী শাসনের অনুপস্থিতিতে ভারতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য দেখা দেবে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে, আঠারো ও উনিশ শতকের অরাজকতা থেকে ব্রিটিশরাই ভারতকে রক্ষা করেছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক ও প্রশাসকরা মনে করতেন যে ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনই তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ।

অনেক ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক এই মতও পোষণ করতেন যে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত ভারতও প্রকৃতিগতভাবে স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হবার যোগ্য। এজন্যই ভারতে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনের পত্তন হয়েছে। এই অভিমত 'প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব বা 'Theory of Oriental Despotism' নামে সর্বত্র পরিচিত। এইসব ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারত কোন শাসক শাসিতদের জন্য জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেনি। বস্তুতপক্ষে ভারতে প্রচলিত রাজনৈতিক সাম্রাজ্যগুলি প্রকৃতিগতভাবে ছিল 'monstrously cruel' সেইদিক থেকে বিচার করলে তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশরা স্বৈরতান্ত্রিক হলেও তাদের শাসন ছিল যুক্তিসম্মত ও জনকল্যাণমুখী। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা মনে করতেন, 'In contrast, with the cruel Oriental Despotism of the past, British rule was benevolent though autocratic.'

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা আরও মনে করতেন যে ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয় ঐক্যের অভাব ছিল। ভারতীয়রা সব সময়ই বিভক্ত। ভারতীয়য়দের মধ্যে গণতান্ত্রিক ট্রাডিশন অনুপস্থিত। যখন ইউরোপীয়রা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে, তখন ভারতীয় ও প্রাচ্যের জনগণ বহন করে স্বৈরতন্ত্রের ঐতিহ্য। তাছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা ও নতুনত্বের প্রবির্তনমুখীতার গুণ অনুপস্থিত। এর ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান, প্রথা, শিল্প ও কারিগরী কৌশল প্রভৃতি ভাল বিষয়গুলি বাইরে থেকে ভারতে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতে এনেছে শান্তি শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, আইনের চোখে সবাই সমান, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সমতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এইসব ধারণা ও বক্তব্য ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মানে আঘাত করেছিল। এইসব মতামতের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয় শিক্ষিত ও বুদিধজীবী মানুষদের স্বায়ত্ত্বশাসন, গণতন্ত্র, আইনগত সংস্কার প্রভৃতির দাবী ভারতের অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের প্রকৃতি অনুযায়ী গণতন্ত্রের ধারণা ভারতে বিদেশী এবং সেজন্য তা ভারতীয়দের পক্ষে সুপ্রযুক্ত নয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে জাতীয়তাবোধের উদ্বুদ্ধ অনেক ভারতীয় এবং কিছু ইউরোপীয় লেখক ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এইসব বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করেন। বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা এই কাজ করেন। এর ফলে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। কারণ ভারতীয় ঐতিহাসিকরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজে মন দেয় ও প্রাথমিক উপাদনের উপর নির্ভর করতে শেখে। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের ধারণাগুলি যে বুল তা প্রমাণ করার জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকরা একদিকে যেমন প্রচলিত ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করেছিল, তেমনি অন্যদিকে নতুন নতুন তথ্যের খোঁজ করেছিল। ভারতের জাতীয় সম্মানে আঘাতের বেদনা তাঁদের নতুন গবেষণায় প্ররোচিত করেছিল। অর্থনীতিবিদরা করলেও পেশাদারী ঐতিহাসিকরা আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাননি। কারণ, যেহেতু তাঁদের অধিকাংশই সরকারী স্কুল ও কলেজে চাকরী করতেন সেজন্য তাঁদের ভয় ছিল উপনিবেশবাদের সমালোচনা করলে তাঁদের চাকুরী-জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া তাঁরা সমসাময়িক বৃটিশ ঐতিহাসিক ধারণা গ্রহণ করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস কখনই সাম্প্রতিক ও সমকালীন যুগ সম্পর্কে চর্চা করবে না।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজনক ট্রাডিশনকে পশ্চিমী সভ্যতার থেকে মহৎ ও উৎকৃষ্টতর বলে মনে করেছিল। বিশেষ করে তাঁরা পশ্চিমী সভ্যতার 'বস্তুগত' চরিএত্রর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার 'নৈতিক গুণাবলী'র (moral values) তুলনা করেছিল। একই সঙ্গে তাঁরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা গুণসম্পন্ন এই ধারণাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা ভারতীয়দের প্রশাসনিক দক্ষতা, সাম্রাজ্যগঠন, কুটনীতি, কর কাঠামো, সামরিক সংগঠন, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের অতীত কুটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমকালীন ইউরোপের এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনা করেন। প্রাচীন ভারতীয়রা রাষ্ট্র পরিচালনার অযোগ্য ছিল— ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এই ধারণার তাঁরা তীব্র পরিবাদ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবিষ্কৃত 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরেন। এই গ্রন্থ প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয়রা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যবস্থা, কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। অনেকেই কৌটিল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে ম্যাকিয়াভেলী ও বিসমার্কের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন যে প্রাচীন ভারতায় রাষ্ট্র ছিল স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতন্ত্রমূলক। তাঁরা বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের রাজারা সকলের জন্যই সুবিচারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক এই ধারণা নাকচ করে দেন যে ভারতীয় শাসকরা মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেননি। অনেকে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্ঘে আধুনিক গণতন্ত্রের সাযুজ্য লক্ষ্য করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতে সরকার কখনই দায়িত্বহীন ও খামখেয়ালী ছিল না। শাসনব্যবস্তায় বিভিন্ন ধরনের পথ ছিল যদের মধ্য দিয়ে জনমত কার্যকরী হতে পারত। অনেক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় রাজতন্ত্র ছিল নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ এবং অনেকটাই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৌটিল্য বর্ণিত মন্ত্রি পরিষদকে ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সর্বোপরি, প্রাচীন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। অনেক লেখক চন্দ্রগুপ্ত, আকবর ও শিবাজীর আমলে 'assembly, parliament and cabinet system'-এর অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এমনকি

যুদ্ধের সময় শাসকরা 'আন্তজার্তিক আইন' মেনে চলতেন। এঁরা রাজাদের জোর করে কর আদায় করার বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছেন। ১৯১৫সালে প্রকাশিত Hindu politygrন্থে ঐতিহাসিক কে.পি. জয়সোয়াল যুক্তি দেখিয়েছেন যে 'The ancient Indian political system was either republican or that of constitutional monarchy'.

জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ঃ পশ্চিমী সভ্যতায় ও শাসনতন্দ্রে যা কিছু ভাল, তা সবই ভারতে ছিল। এজন্য ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'Corporate life in Ancient India' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Institutions which we are accustomed to look upto as of western growth had also flourished in India long ago.'

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে ভারতীয়রা ধর্ম, আঞ্চলিকতা, ভাষা ও জাতিগতভাবে বিভাজিত ছিল এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন অন্তর্হিত হলেই তাদের ঐক্য আবার বিনষ্ট হবে। এর অর্থ হল ভারতীয়দের কোন দেশাত্মবোধ বা জাতীয় ঐক্য ছিল না। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এই দাবি করে যে প্রাক-উপনিবেশেক ভারতে সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল। এমনকি 'a sense of Indian nationhood' ও বিরাজ করত। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে 'জাতীয় রাজা'র প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল।

তবে ডঃ বিপান চন্দ্র ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ঐক্যের কথা বললেও ভারতের ইতিহাস লেখার সময় বিভিন্ন সাম্রাজ্যকে আলাদাভাবে দেখানে হয়েছে এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পৃথক গুরুত্বের কথা বলা হয়েছ। তাছাড়া এইসব ঐতিহাসিকদের মতে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং আকবর বিখ্যাত এই কারণে যে তাঁরা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ডঃ বিপান চন্দ্র এখানে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন বিশেষ করে 'গান্ধীযুগ' এর ক্ষেত্রে। একদিকে এইসব ঐতিহাসিকরা অহিংসা নীতির প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদিকে বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে সম্রাটদের সামরিক শক্তির প্রশংসা করেছেন, একদিকে সম্রাট অশোককে তাঁর অহিংস নীতির জন্য প্রশংসা করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে এর জন্য তাঁর সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়া ডঃ বিপান চন্দ্র মনে করেন, এইসব ঐতিহাসিকরা ভারতের সংস্কৃতির কথা বললেও জাতিগত অত্যাচার, নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং পুরুষ প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেননি। এঁরা বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের ভূমিকার কথা বললেও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিদেশের অবদানের কথ্য উল্লেখ করেননি। যাই হোক, প্রাচীন ভারত সম্পর্কে ইতিহাসচর্চা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল ১৯৩০-এর দশকে। পরবর্তীকালের লেখাগুলি প্রধানতঃ আগের পর্বের লেখার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়।

১৯২০-এর দশক ও তার পরবর্তীকালে মধ্যযুগের ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা প্রসার লাভ করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক অভিগমনের বিরোধিতা করা। মধ্যযুগের ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারত সম্পর্কে পূর্বসূরী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রায় সবটাই গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা উত্তর ভারতে একটি মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভবের উপর জোর দিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল

সাধারণ মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর মানুষদের স্তরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে। ভারতে স্থিতিশীল হবার পরও মুসলমান শাসকরা বিদেশী ছিল—এই ঔপনিবেশিক সাম্প্রদায়িক বক্তব্যকে অস্বীকার করেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। তাঁরা এই মতেরও বিরোধিতা করেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বসবাস করত। তবে ঔপনিবেশিক নিন্দার বিরুদ্ধে তাঁরা যদিও ভারতের অতীত ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছিল ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বপক্ষে কথা বলেছিল, তবুও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য চেষ্টা করত। প্রশ্নটি হল ঃ কীভাবে একটি ছোট বাণিজ্যিক কোম্পানী হাজার হাজার মাইল দূরের একটি দেশের সাহায্যে ভারতের মত একটি বিশাল দেশ জয় করেছিল যে দেশের অতীত সভ্যতা ছিল গৌরবজনক। এইখান থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সামাজিক কাঠামোর সমালোচনা শুরু হয়। একই সঙ্গে সামাজিক ইতিহাস ও বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা ও সমাজে নারীর স্থান বিষয়ে ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সমসাময়িক জাতীয়তাবাদীদের ঔপনিবেশিকতার সমালোচনার ফলে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক উদ্যেগ শুরু হয়। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেহেতু একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেজন্য ১৯৩০ এর দশকে ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তবে ১৯৫০-এর দশকের পর এই ধারা ফলবতী হয়। তবে সীমিত উপাদান এইসব ঐতিহাসিকদের একটি প্রধান দুর্বলতা পূরে দেখা দিয়েছিল। তাঁরা প্রধানতঃ লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করেছিল। যদিও শিলালিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না। তবে প্রত্নতাত্বিক চর্চা তখনও তার শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি এবং নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানকে ব্যবহার করা খুবই নগণ্য ছিল। একইভাবে অর্থনীতিবিদ্যাও অর্থনীতিবিদদের কুক্ষিগত ছিল।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠার আবির্ভাব ঘটে।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগকে কেন্দ্র করে। আধুনিক ভারতে-এর অস্তিত্ব খুব কমই ছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠার আবির্ভাব ঘটে। এর কারণ হল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ শিক্ষকদের পক্ষে ঔপনিবেশিক অধিকর্তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য পেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। স্বভাবতই ১৯৪৭-এর পর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য রাখা অনেকটাই নিরাপদ ছিল। এর ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ইতিহাস রচিত হয়নি। এটাও কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার অনুপস্থিতির উপযুক্ত ব্যাখ্যা নয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একটি বিস্তারিত ও বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার উদ্ভব ঘটে। এই কাজ করেছিলেন শিক্ষা জগতের বাইরের লোকেরা এবং জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবাদরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— দাদাভাই নওরোজী, বিচারপতি রাণাডে, জি.ভি. যোশী, আর.সি.দত্ত, কে.টি. তেলাঙ্গ, জি.কে,গোখেল ও ডি.ই. ওয়াচা। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন শিক্ষক অর্থনীতিবিদ এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। এঁরা হলেন—কে.টি শাহ, ভি.কে.কালে, সি.এন.ভাকিল, ডি.আর.গ্যাড্‌গিল, জ্ঞান চাঁদ, ভি.কে.আর ভি রাও এবং ওয়াডিয়া। তাঁদের সমালোচনা সেই সময়ের ইতিহাস বইতে স্থান পায়নি। অবশ্য ১৯৪৭ রে পরে এবং বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকে ও তারপরে এঁদের লেখার গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তবে এঁদের বক্তব্য ও সমালোচনা ১৯২০ সালের পর গণ আন্দোলনের যুগের জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের মর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

তিলক, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল এবং সুভাষচন্দ্র বসু এঁদের লেখার উপর ভীষণভাবে নির্ভর করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন তাঁরা হলেন আর. জি. প্রধান, এ.সি.মজুমদার, জওহরলাল নেহরু এবং পট্টভি সীতারামাইয়া। উত্তর ১৯৪৭ পর্বের ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলনকে ন্যায়সম্মত বলে মেনে নিলেও ঔপনিবেশিকতার অর্থনৈতিক সমালোচনাকে এর ভিত্তি বলে মানতে চাননি। জাতীয় সংগ্রামের অন্যান্য ধারাগুলিকেও তাঁরা প্রায় গুরুত্ব দিতে চাননি।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা এক্ষেত্রে দুভাগে বিভক্ত হয়েছেন। তারাচাঁদ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, উনিশ শতক থেকেই ভারত 'Nation-in-the-making' পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অন্য একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রাচীন যুগ থেকেই ভারত একটি জাতি হিসাবে পরিণতি লাভ করেছিল। তবে একই সঙ্গে এঁরা সবাই ভারতের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা শ্রেণি ও জাতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধিতা এবং মহিলা ও উপজাতিদের উপর অত্যাচার ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়গুলি এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা শ্রেণি ে জাতিগত পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিষয়গুলিকেও ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গভীরতর বিশ্লেষণ করেননি। ডঃ বিপান চন্দ্র বলেছেন, 'They often indulged in its blind glorification.' তাঁর মতে, তাঁরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে অবহেলা করেছেন।

প্রশ্ন

১। 'প্রাচ্যের স্বৈরাতন্ত্রের তত্ত্ব' বা 'Theory of Despotism' কি?

২। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহসিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব করে ঘটে?

১.৩.৭.৪ ঃ ইতিহাসচর্চায় ধর্মতত্ত্ব বা দিব্যতন্ত্র (Theological Historiography)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে চার্চের উচ্চপদস্থ বিশপ, ধর্মযাজক এবং পুরোহিত বা সন্ন্যাসীরা খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনা করতেন তা ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতান্ত্রিক ইতিহাসচর্চা নামে পরিচিত। এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় স্বাভাবিকভাবেই যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অ-খ্রীষ্টান ইতিহাস গ্রন্থের পরিবর্তে পুরানো বাইবেলের (Old Testament) অন্তভুক্ত ইহুদিদের পবিত্র লেখকে অত্যধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে গুণগত বিচার-বিশ্লেষণে ইতিহাস হিসাবে এগুলি ছিল অনেক নিকৃষ্ট মানের।

ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতান্ত্রিক ইতিহাসচর্চা খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়নি। চার্চের ইতিহাসমনস্ক হতে প্রায় তিন শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছিল। প্রধানত পরিস্থিতির চাপে চার্চ ইতিহাস লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কারণ, গ্রীক ও রোমান সমাজ যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে চার্চের উচ্চপদস্থ বিশপ, ধর্মযাজক এবং পুরোহিত বা সন্ন্যাসীরা খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনচা করতেন তা ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চা নামে পরিচিত। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় বা বস্তুর প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। এই ইতিহাসচর্চার মূল বক্তব্যটি হল মানবজাতির ইতিহাস ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিল, সেখানে খ্রীষ্টধর্ম ব্যক্তিস্বার্থকে অত্যাধিক মূল্য দিতে শুরু করে। আত্মার চিরন্তন মুক্তিতে জীবনের অন্যান্য মুক্তি আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হতে থাকে। ইহলৌকির জীবনের চেয়ে পারলৌকিক জীবনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। খ্রীষ্টধর্ম নিজেই যে ইতিহাস সৃষ্টি করছিল, তার ঐতিহ্য ও ইতিহাস লিখে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। চার্চ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে চার্চের উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করে। তাঁদের কাছে ইতিহাস হল এমন অক প্রণালী যাতে ঈশ্বর ও মানুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে।

প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত ক্যামেরিয়ার বিশপ ইউসেবিয়াস পেম্পিলাসকে (২৬০-৩৪০) ধর্মতাত্ত্বিক বা চার্চ ইতিহাস চর্চার জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বইটির নাম হল The Church History এবং The Chronicle. দ্বিতীয় বইটিতে তিনি খ্রীষ্টান জগতের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসের রূপরেখা তৈরী করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি থেকে খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট কালক্রম পাওয়া যায়। তিনি ইহুদি জাতিসংক্রান্ত ঘটনাগুলি ও তারিখকে বেশী গুরুত্ব দেন। তাঁর রচনায় ইহুদি-খ্রীষ্টান ইতিহাস অধিকাতর গুরুত্ব পায়। তাঁর The Church History গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ওবিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের অনুকুলে মতামত প্রকাশ করেন। ইতিহাসের প্রত্যেকটি বর্ণনায় তিনি যীশুর দেবত্বর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তবে চার্চ বা ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন সেন্ট অরেনিয়াস অগষ্টাইন (৩৫৪-৪৩০ খ্রীঃ)। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম হল 'The City of God'। বইটি লিখতে তাঁর ১২ বছর সময় লেগেছিল। এই বইটিতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈশ্বর চার্চ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং চার্চ হল ঈশ্বর সৃষ্ট নগরী (City of God) ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বা দিব্যরাজ্য চার্চের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। মানুষের সৃষ্ট নগরী ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্ট নগরী বা চার্চের ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি অনেক বেশী। ঈশ্বরসৃষ্ট নগরী মানুষকে সততা, প্রেম, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া প্রদান করে। অগস্টাইন প্রচার করেন যে স্রষ্টা আগে থেকেই সব কিছু জানেন এবং ইতিহাসের ঘটান সংঘটিত হবার মূলে স্রষ্টার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজ করে। সুতরাং স্রষ্টার অধীনে থেকে মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ ঘটে থাকে।

ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতান্ত্রিক ইতিহাসচর্চার আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন পাউলাম অরোমিয়াস (৩৮০- ৪২০খ্রীঃ) তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেন্ট অগষ্টাইনের ভক্ত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম হল Seven Book of History Against the Pagans. এই বইটিতে তিনি দেখান যে অবিশ্বাসী, ইহুদি ও খ্রীষ্টান সকল সম্রাজ্যের ভাগ্য স্রষ্টার মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

ধর্মতাত্ত্বিক বা চার্চ ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এই ধরনের ঐতিহাসিকরা মানুষের কাছে ঈশ্বরলাভের উপায়গুলি ব্যাখ্যা করতেই বেশী আগ্রহী ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় বা বস্তুর প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। এই ইতিহাস চর্চার মূল বক্তব্য হল মানবজাতির ইতিহাস ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন

১। ধর্মতাত্ত্বিক বা চর্চা ইতিহাস চর্চা কাকে বলে?

২। ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চায় সেন্ট অগষ্টাইনের অবদান কি ছিল?

১.৪.১.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. A.Aloysius : Nationalism without a Nation in Indis.
2. B.Anderson : Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.
3. David Amold : The India Nation in 1942.
4. David Kopf : British Orientalism and the Bengal Renaissance.
5. Ranajit Guha : Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and its implications.
6. R.G.Collingwood : The Idea of History.
7. Jamex T. Shotwell : The History of History.

১.৩.৭.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

1. Discuss the differences between the colonial and nationalist historiography.
2. What are the specific featurec of nationalist historiography concernin ancient India?
3. Analyse the signi ficance of Orientalist Recovery of Ancient Indian History.
4. Discuss the role of William Jones in the Orientalist movement.
5. Analyse the cheif characteristics of the imperialist historiography
6. What is called the Theological or the Church Historiography?
7. What was the contribution of St. Augustine in the Theological Historiography?
8. Write a note on the Theological Historiography as far as your knowledge is concerned.

একক ৮

Subaltern Approach to History

বিন্যাসক্রম ঃ

১.৩.৮.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৩.৮.১ ঃ সূচনা (Introduction)

১.৩.৮.২ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা কি? (What is Subaltern 'Historiography')

১.৩.৮.৩ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি (Nature and approach of Subaltern Historiography)

১.৩.৮.৪ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Subaltern Historiography)

১.৩.৮.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৩.৮.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৩.৮.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা বলতে কী বোঝায়।

(২) এই ইতিহাসচর্চায় কারণ ও বৈশিষ্ট্য।

(৩) এই ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও এই গোষ্ঠীর ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গি।

(৪) এই ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব।

(৫) এই ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা।

১.৩.৮.১ ঃ সূচনা

'সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজ'-এর মুখ্য প্রবক্তা হলেন রণজিৎ গুহ। ১৯৮০ সালের পর থেকে এই 'সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজ' ভারত ও এশিয়া সহ বিশ্বের প্রায় সব আঞ্চলিক ইতিহার রচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৮০-র দশক থেকে 'সাবলটার্ণ' শব্দটি ভারতীয় ইতিহাস চিন্তায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ১৯৮২ সালে 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। ১৯৮৩ সালে সাবলটার্ন স্টাডিজের মুখ্য প্রবক্তা রণজিৎ গুহার 'Elemetay aspects of

Peasant Insurgency in Colonial India' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল এবং ঐ একই বছরে প্রথম 'সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন এই গোষ্ঠীর ইতিহাসচর্চাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেল। এরপর এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর নানা লেখকদের প্রচেষ্টায় ১১টি খণ্ডে এদের নানা সংকলন প্রকশিত হয়েছে। এই 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ' শুধু যে ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকেই প্রভাবিত করেছে তা নয়, ভাষা-সাহিত্য, চলচ্চিত্র শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, লাতিল আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সব আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী কম-বেশি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রশ্ন ১। 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ'-র মুখ্য প্রবক্তা কে? তাঁর লেখা একটি বই-এর নাম লেখো।

১.৩.৮.২ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা কী?

বাংলায় 'সাবলটার্ণ'-এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'নিম্নবর্গ'। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হতে পারে 'সাবর্ডিনেট'। Subaltern (নিম্নবর্গ) ইংরেজী ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের 'সাবলটার্ণ' বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। মার্কসীয় আলোচনায় এই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া হয় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশিচর (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত 'Prison notebooks'-এ। ('কারাগারের নোটবই')। তখন থেকেই শব্দটির ব্যবহার ছিল বহুমুখী। প্রথমে গ্রামশি শব্দটি ব্যবহার করেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে। ক্ষমতা বিন্যাসের যে ধরন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চরিত্র তৈরি করে—তার ফলেই ক্ষমতার অধিকারী 'উচ্চবর্ণ' (Elite), যারা হলেন 'Dominant class' আর ক্ষমতাহীন 'সাবলটার্ণ' বা নিম্নবর্গ। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রামশি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এই শব্দগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে এর থেকে বোঝা সম্ভব নয় এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। এই শব্দগুলিকে তিনি সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পরে তার আলোচনা যত এগিয়ে চলে তখন দেখা যায় গ্রামশি এক বিশেষ অর্থে 'সাবলটাণ' শব্দটিকে ব্যবহার করছেন। এখানে 'সাবলটাণ' শব্দটি 'প্রলেতারিয়েট'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্ণ শ্রেণী' হল শ্রমিক শ্রেণী। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরণের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাবলটার্ণ' শ্রমিক শ্রেণীর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে 'হেগেমনিক' শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি, 'বুর্জোয়াজি'। শ্রমিকশ্রেণী/বুর্জোয়াশ্রেণী, এই বিশেষ অর্থে সাবলটার্ণ/হেগেমনিক শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে গ্রামশির বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসবাদী আলোচনায় এক বিশিষ্ট অবদান। এই বিশ্লেষণে গ্রামশি

সাবলটার্ণ কথাটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নাস্থিত। গ্রামশি শব্দটি ব্যবহার করেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। গ্রামশির লেখায় অবশ্য 'সাবলটার্ণ' চেতনার এবং ক্ষমতার নানা সীমাবদ্ধতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির উপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়শ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, তৈরি করে এক সামগ্রিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেগেমনি'। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'গেগেমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে 'সাবলটার্ণ' শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়। গ্রামশির বিশ্লেষণে তাই গুরুত্ব পেয়েছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সম্পর্ক, জাতি, জনগণ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়াশ্রেণীর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। সার্বিক সাংস্কৃতিক বা ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ স্বয়ংচালিত (Self-sustaining) করে তোলে। গ্রামশির লেখায় অবশ্য 'সাবলটার্ণ' চেতনার এবং ক্ষমতার নানা সীমাবদ্ধতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। তা সত্ত্বেও এই চেতনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, এমনকি তাদের আন্দোলন প্রতিরোধের রূপ দিতে পারে তার ইঙ্গিতও রয়েছে। এই জটিল সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোচনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় ইতিহাসের সাবলটার্ণ তত্ত্ব।

প্রশ্ন ১। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা (Subaltern Historigraphy) বলতে কী বোঝ?

১.৩.৮.৩ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রামশির তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৯৮৩-তে রণজিৎ গুহ তাঁর 'Elementary aspects of Peasant Insuragency in Cononial India' গ্রন্থে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা এবং মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার আদিকল্পগুলির বা মডেলের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রশ্ন তুলবেন এবং বিকল্প খাড়া করলেন। প্রতিষ্ঠিত আদিকল্পগুলোকে কঠোর সামালোচনা করে 'তলা থেকে ইতিহাস' দেখার এবং লেখার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। এলিট নেতৃত্বের গুরত্ব অস্বীকার করে তাঁরা নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব, (গ্রামশির 'multiple elements of conscious leadership but no one of them... predominant') নিম্নবর্গের আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বকতৃত্বকে (autonomy)-কে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড়ো করে দেখাতে চাইলেন। বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের ও নিম্নবর্গীয় আন্দোলনের গুরুত্ব ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে লেগে গেলেন। Subaltern studies-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় রণজিৎ গুহ বলেছেন ''We are opposed as much of the prevailing practice in historiography and the social sciences for its failute to acknowledge the Subaltern as the maker of his own destiny''। আর এই তত্ত্ব স্থাপন করতে গেলে 'elitist paradigm' বা উচ্চবর্গীয় আদর্শ-এর প্রতিবাদী ইতিহাস লেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় Subaltern ঐতিহাসিকগণ

*খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ' এখন তার নিজ চেহারা বদল করে ফেলেছে। কারণ কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা না রেখে **Subaltern Studies**-এ সব বিষয় নিয়েই লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, তা আজও গভীরতার অনুসন্ধান করা।*

এই ঘোষণা করেন যে তারা সহজ জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার মতই (কারণ উভয়ই 'one sided and blinkered historiography') নস্যাৎ করবেন, আবার কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর মত সব আদর্শবাদের 'রাংতাওলা মোড়ক' ছিন্ন করবেন। তাদের মতে, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বা মার্কসীয় ইতিহাস— কোনটিতেই জনগণের রাজনীতিকে প্রাপ্ত যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনকে বোঝা হয়েছে নেতৃবর্গের রাজনীতির বা উচ্চবর্গের রাজনীতির অংশ হিসেবে। এমনকী, যেসব কৃষক-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে এই নেতৃ-রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টতরই প্রায় ছিল না বললেই চলে, পুরোনো ধরনের ইতিহাসে সেগুলিকেও বলা হয়েছে নেহাতই স্বতোৎসারিত, 'উপ-রাজনৈতিক' (Pre-political) আন্দোলন হিসেবে। সেখানে সত্যিকারের আধুনিক রাজনীতির কোন বোধ বা লক্ষণ দেখেননি ঐতিহাসিকেরা। রণজিৎ গুহ বললেন—এইসব কৃষক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মধ্যে অবশ্যই এক নিজস্ব সৃজনশীল ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ছিল এবং এই সঙ্গে ছিল উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে সংগ্রহ করা নানা বিক্ষিপ্ত মূল্যবোধও (inherited and uncritically absorbed material of the ruling culture) নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক গোষ্ঠী বলতে চাইলেন যে এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নিম্নবর্গের ভাবনাচিন্তায় আর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল এক সম্পূর্ণ অধরা সামাজিক ইতিহাস। এর ফলেই তৈরি হয়ে উঠল সাবলটার্ণ স্টাডিজ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, শাহীদ আমিন, জ্ঞান পাণ্ডে, ডেভিড আর্নল্ড ও আরও অনেকের নানা রচনায় দেখা গেল এক স্বতন্ত্র ধরনের ইতিহাসচর্চা। এই ইতিহাসচর্চার মূল বিষয় হল নিম্নবর্গের কার্যকলাপ ও আন্দোলনকে তুলে ধরা এবং উচ্চবর্গের আন্দোলনের থেকে এর পৃথকীকরণ। তাদের মতে, জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বিদেশি ও স্বদেশি এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের লড়াই। এই প্রসঙ্গে বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন ঃ ... 'This (Subaltern) approach is characterised by a generally 'a historical glorification of all forms of popular militancy and consciousness...'

প্রশ্ন ১। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী?

১.৩.৮.৪ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা

এ কথা ঠিক নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস, তাদের তত্ত্ব, নতুন উপাদান (Source) আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করেছে। কিন্তু এইসঙ্গে এই কথাটিও সত্যি যে তাদের মতাদর্শে ও রচনায় অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। সাবলটার্ণ স্টাডিজ—এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক-এর প্রবন্ধে। ১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে স্পিভ্যাক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য', এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গে অপর হিসেবে নিম্নবর্গেকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা।

মোটামুটিভাবে পঞ্চম-ষষ্ঠ খণ্ড থেকে সাবলটার্ণ স্টাডিজ-এ প্রকাশিত গবেষণায় নতুন ঝোঁক ও পুরোনো আদিকল্পের বা মডেলের সংশোধন, পরিবর্তন বা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আগের

সাথে এই পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, এই অতি সরল ধারণাটি এখন পরিত্যক্ত হল। আশির দশকের শেষে এসে দেখা গেল সাবলটার্ণ স্টাডিজের প্রাথমিক ধারণাটির আপাত অবলুপ্তি, নতুন এক ব্যাখায় 'আধিপত্য' বলতে কেবলই বোঝানো হচ্ছে এক সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আবহকে। নিম্নবর্গ সেখানে নানা ধরণের গ্রস্ত সাংস্কৃতিক ভুবন। আগেকার সমাজ অর্থনৈতিক আলোচনা থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন নব্যপন্থীরা, কেননা ঐ অর্থনৈতিক আলোচনার ভিত্তি স্পষ্টতরই মার্ক্সীয় দর্শন যা কিনা ঐ ধরনের পাশ্চাত্য 'সর্বজনীনতার' (Universalism) বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এখন দেখা যাচ্ছে, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না। সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। পূর্বে 'চাষা-ভুষো কুলিনকামিন নিয়ে' তারা লিখছিলো। এখন হঠাৎ বঙ্গিম-গান্ধী-জওহরলাল, বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তাঁরা লেখা শুরু করেছে। এখন নজর গিয়ে পড়েছে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর, যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চারিত মতাদর্শ এবং আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ওপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে তার জাল বিস্তার করেছে। অর্থাৎ স্কুল-কলেজ, সংবাদপত্র, প্রকাশনাসংস্থা, হাসপাতাল-ডাক্তার-চিকিৎসা ব্যবস্থা, জনসংখ্যা গণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্প উৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রমসংগঠন, বিজ্ঞান-সংস্থা, গবেষণাগার—এইসব প্রতিষ্ঠানের বিশদ ইতিহাসও এবার 'সাবলটার্নস্টাডিজের' বিষয় হয়ে পড়ল। এই চেহারা বদল খুব অপ্রত্যাশিত নয়। তবে এই ধারার আলোচনায়ও নানা দুর্বলতা রয়েছে। সাংস্কৃতিক আধিপত্যের আলোচনায় কেবলই ঢাকা পড়ে যায় অর্থনৈতিক সামাজিক ভেদাভেদরে বাস্তব।

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মূল বিষয় ছিল নিম্নবর্গের কার্যকলাপের ও আন্দোলনকে তুলে ধরা এবং উচ্চবর্গের আন্দোলন থেকে এর পৃথকীকরণ। এ কারণে তাঁরা এলিট নেতৃত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করে, নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব, আন্দোলনের স্বাতন্ত্র, স্বকীয়তা ও স্বকর্তৃত্বকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। তাদের মতে জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বেদিশে ও স্বদেশি এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের লড়াই।

প্রশ্ন

১। কয়েকজন নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ঐতিহাসিকের নাম লেখো।

২। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মূল বক্তব্য কি?

১.৩.৮.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। নিম্নবর্গের ইতিহাস (সম্পাদন)—গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২। 'Subaltern Studies : Deconstructing Historiography' in R. Guha (ed) Subaltern Studies IV. (Gayatri Chakraborty Spivak)

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—অমলেশ ত্রিপাঠী

৪। নিম্নবর্গের ইতিহাস—রণজিৎ গুহ, 'এক্ষণ' পত্রিকা—পঞ্চদশ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, বর্ষ ১৩৮৯

১.৩.৮.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো। এদের ইতিহাসচিন্তার প্রকৃতি কি?

২। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের পশ্চাতে গ্রামশির রচনার কোনো ভূমিকা আছে কি?

৩। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো।

৪। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কি?

৫। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কি?

একক ৯

Post-Modernist Approaches to History

বিন্যাসক্রম ঃ

১.৩.৯.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.৩.৯.১ ঃ ইতিহাসের উত্তর আধুনিক মতবাদ

১.৩.৯.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.৩.৯.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৩.৯.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) উত্তর আধুনিকতাবাদ কথাটির অর্থ

(২) ফোকোর উত্তর আধুনিকতাবাদের তত্ত্বের প্রসারে ভূমিকা ও তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য

(৩) উত্তর আধুনিকতাবাদের সমালোচনা

১.৩.৯.১ ঃ ইতিহাসের উত্তর-আধুনিক সমালোচনা

পোস্টমর্ডারনিজম্ শব্দটির অর্থ কী? "Modern-day Dictionary of Received Ideas" গ্রন্থে বলা হয়েছে "This word has no meaning. Use it as possible" অর্থাৎ এই শব্দটি কোন প্রকৃত অর্থ নেই। এই শব্দটি কোন কিছু থেকে কোন কিছুকে বোঝায়। ধারণার জগতে পোস্টমডারনিজম এক গোলকধাঁধা। এর দুর্বোধ্য বিষয়বস্তু পাঠকদের বিহ্বল করে তোলে। অধ্যাপক Arran Gare মনে করেন, পোস্টমর্ডারনিজম একটি বিতর্কের আবহাওয়া তৈরি করে যে পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে পশ্চিমী সমাজে প্রকৃতি কোন সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটেছি, কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেটি ভাল না খারাপ? আসলে পোস্ট মডারনিজম কথাটির কোন ছোট একটি শব্দার্থ নেই। এর বিষয়বস্তু হল বর্তমান যুগ এবং কাজ হল এই যুগের মানুষের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করা। Gare-এর মতে, আধুনিকতা, উন্নতি ও জ্ঞানদীপ্ত মানবিকতায় বিশ্বাস হারানোর মধ্য দিয়ে পোস্টমডার্ণ অবস্থায় সৃষ্টি হয়। পোস্টমর্ডার্ণিস্টরা মনে করেন উপরোক্ত ধারণাগুলির জন্যই মনুষ্যত্ব আত্মহননের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের মতে, উন্নতির ধারণা চরমতম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দুটি বিশ্বযউদ্ধের দ্বারা। যার মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে ধ্বংস, দারিদ্র, পরিবেশ দূষণ এংব মানবিকতার অবনমন। সুতরাং, It may be stated in general terms that post modernism reflects this loss of faith in modernity.

Post modernism কে অনেক সময় 'Post Structuralism-এর সমার্থক বলে মনে করা হয়। যদিও দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। ১৯৬৮ সালে May আন্দোলনের সময় প্যারিসের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে Post Structuralist বা Post modern ধারণার উৎপত্তি ঘটে। কয়েকজন Post Structuralist বুদ্ধিজীবী এই মতের সমর্থন করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Barthes, Lacan, Foucault, Derrida, Guattari প্রমুখ। তবে Post modernism-এর সূত্রপাত ঘটে Nietzsche এবং Martin Heidegger-এর রচনার মাধ্যমে। প্যারিসের বুদ্ধিজীবীরা এদের অনুসরণ করেছিলেন। Ben Agger সাধারণভাবে Podt struct uralism nd post modernism এর মধ্যে একটি পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, Post-structuralism হল a theory of Knowledge এবং post modernism হল a theory of society, culture and history, তবে প্রকৃত পক্ষে দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা খুবই কঠিন। যে জন্য বিশেষ করে ইতিহাসের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে দুটি ধারণাকে একইরকমের মনে করা যায় না। বর্তমান post modemist দের আলোচ্য বিষয়গুলি হল 'Science', 'Politics,' 'Colonialism', 'Late capitalism, classessness, rece, gender,women's studies, Feminism, aesthetic theory, literary critcism, environmental pollution and history.'

পোস্ট মর্ডারনিজম এর বিষয়বস্তু হল বর্তমান যুগ এবং কাজ হল এই যুগের মানুষের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করা। পোস্ট মর্ডান নিজমরা মনে করেন উন্নতির ধারণআ চরমতম আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে দুটি বিশ্ব যুদ্ধের দ্বারা। যার মধ্যদিয়ে প্রকটিত হয়েছে ধ্বংস দারিদ্র পরিবেশে দূষণ এবং মানুবকতার অবনমন। ***Post structuralist*** *এবং* ***Post modernist-****রা জ্ঞানদীপ্ত সামাজিক চিন্তার যে সমালোচনা করেছেন তারসঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে।* ***Post mosernist*** *চিন্তাবিদ* ***foucault*** *ইতিহাসের সমালোচনা করে বলেছেন এবং কোন মানবিক বিষয় নেই এবং ইতিহাস মানবিক উন্নতির উপর জয় প্রকাশ করতে পারে না।* ***Foucault*** *ইতিহাসে প্রবাহমানতা বা পরস্পর বিশ্বাসী নন।*

Post structuralist এবং post modernistরা জ্ঞানদীপ্ত সামাজিক চিন্তার যে সমালোচনা করেছেন, তার সঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে। বস্তুতপক্ষে post modern চিন্তাধারা ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সামনে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিখ্যাত post modernist চিন্তাবিদ Foucault ইতিহাসের সমালোচনা করে বলেছেন যে এর কোন প্রতিনিয়ত মানবিক বিষয় নেই এবং ইতিহাস মানবিক উন্নতি অর্থাৎ প্রগতির উপর মানবিক বৃত্তির জয় প্রকাশ করতে পারে না। এছাড়া তিনি বলেছেন, মার্কস এবং বেগেল যা ভেবেছিলেন সেইরকম ইতিহাসের কোন প্রকৃত উদ্দেশ্য নেই। Foucault মনে করেন অতীত তার অবিকল পুরনো কাঠামোর আর নেই এবং সেইজন্য ঐতিহাসিকর অতীত থেকে যা পুনরুদ্ধার করে তা কখনোই ‘বস্তুগত সত্য’ বলে বিবেচিত হতে পারে না। সেইজন্য অতীতে তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব রচনা করা যায় না। তাঁর মতে, বস্তুগত ধরণা হল অবান্তর চিন্তা। কারণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একই ঐতিহাসিক তথ্যের একটিই সত্য বেরিয়ে আসে না, বেরিয়ে আসে অনেক ধরনের সত্য। এছাড়া Foucault 'continuity in history' অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহমানতার ধারাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'history is necessarily disconinuous'. আসলে তিনি এক নতুন ধরনের ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন। তিনি তার ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, নিয়মবিদ্যা, ব্যাখ্যা এক সিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে অতীতকে নতুনভাবে দেখাতে চেয়েছেন। তিন পশ্চিমী সভ্যতা এবং এর জ্ঞানদীপ্তিগত ভিত্তিকে কটোরভাবে সমালোচনা করেছেন। Foucauly ইতিহাসের কতগুলি অগ্রচলিত ও আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা

করেছেন যেগুলি হল—''madness, sextuality, criminality and the evolution of social attitudes towards them''. Foucault-এর প্রথম বইটির নাম হল 'Madness and Civilisation'—এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে পাগলাগারদের উৎপত্তি হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাগলামি সম্পর্কে ধারণাও কীভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল। মধ্যযুগে পাগলামিকে 'পবিত্র' বলে মনে করা হত। আবার আদি আধুনিক পাশ্চাত্যে এটিকে একটি রোগ হিসাবেই মনে করা হত। Faucault তার 'The Birth of the Clinic' গ্রন্থে ঔষধের ইতিহাস সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। Faucault-এর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'The Archaeology of Knowledge', 'The order of Things, Discipline and Punish, The History of Sextuality' ইত্যাদি। তবে অধ্যাপক J.G. Merquior বলেছেন, Faucault-র ইতিহাস সম্পর্কিত তত্ত্ব সবক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যেও অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য ছিল নির্বাচিত এবং বিকৃত। তার বিশ্লেষণের মধ্যেও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

Foucault-এর ইতিহাস চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

Foucault ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'বর্তমান'কেই প্রাধান্য দিতে চান। কারণ তিনি মনে করেন অতীতের objective বা বস্তুগত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, ''It was only in the perspective of the present that the past can be explained''. Foucault দাবী করেছেন যে, তিনি অতীতের চেয়েও বর্তমান থেকে বেশি জ্ঞানলাভ করেছেন। এর ফলে অতীতের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গুরুত্ব কমে যায় এবং বর্তমানকাল প্রভাব বিস্তার করে। Foucault ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক বুর্জোয়া প্রভাবিত সংস্কৃতির পরিবর্তে 'History of the Present'-কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

Foucault জ্ঞানদীপ্তি যুগের 'মানবিকতা', 'ব্যক্তির গুরুত্ব' ইত্যাদি ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। 'The Order of Things' গ্রন্থে তিনি মানুষ, ব্যক্তি ও মানবিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে 'death of man'-এর কথাই বলেছেন।

Foucault ইতিহাসে continuity বা প্রবাহমানতা বা পরম্পরায় বিশ্বাসী নন। পশ্চিমী দর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে যে যোগসূত্র ও পরম্পরা বা পর্যায় আছে সেগুলিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। এই 'epistome'গুলির মধ্যে কোন সাযুজ্য নেই বলে তিনি মনে করেন। পশ্চিমী দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ৪টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল ঃ

(i) Pre-classical (upto 1650AD)

(ii) Classical (1650-1800)

(iii) Contemporary age (Singe 1950)

তিনি মনে করেন এই চারটি স্তরের মধ্যে Continuity বা পরম্পরাগত যোগসূত্র নেই।

Foucault ইতিহাসে ক্ষমতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ইউরোপে জ্ঞানদীপ্ত ও উনিশ শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান আসলে জনগণের উপর ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছে।

বিজ্ঞান আসলে জনগণের উপর ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছে। বিজ্ঞান ছিল ক্ষমতা বিস্তারের মাধ্যম। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ধীরে ধীরে মানুষের উপর ক্ষমতা বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান যে 'শাশ্বত সত্য' কথা বলে তা আসলে হল শক্তির প্রকাশ তিনি বলেছেন ''all knowledge, reason and science are but instruments and tools of the will to power. The criterion of truth is might.''

Faucault-এর বক্তব্যের প্রধান বিরোধী হলেন অধ্যাপক Merquior। তিনি বলেছেন, ইতিহাসচর্চায় Foucault-এর নতুন বৈজ্ঞানিক নিয়মবিদ্যা এতদিন ধরে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। Peter Sedgwick-ও তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। এর বক্তব্য হল Foucault তাঁর আধুনিকতা ও বুর্জোয়াবিরোধী মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে কতকগুলি 'False assumption' তৈরি করেছেন। অন্তত ঔষধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এর 'discontinuity' তত্ত্বকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। Foucault-এর সমালোচনা করে David Levy বলেছেন, যদি কেউ ইতিহাসে 'Continuity'-এর তত্ত্বকে অস্বীকার করেন তাহলে ইতিহাসকে কীভাবেই বা বোঝা যাবে? তিনি বলেছেন, 'A degree of historical continuity is basic to an understanding of the past.'' সমালোচকেরা মনে করেন, ফরাসী বিপ্লবকে Faucault তাঁর ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু না করে ঠিক কাজ করেননি।

সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, Foucault তার বিদ্রোহী ও বিতর্কিত ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতি আনার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক Mark Poster তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন— ''Foucault offers historians a new framework for studying the past, a new set of methods for doing so and new notion of discontinuity.''

প্রশ্ন

১। 'পোস্টমর্ডারনিজম' শব্দটির অর্থ কী?

২। কয়েকজন পোস্টমর্ডারনিস্টের নাম করো।

১.৩.৮.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। E. Sreedharan—'A Textbook of Historiography'

২। Kelth Jenkins (ed.)—The Post-Modern history Reader.

৩। Steven Best and Doglas kellner—Post-modern theory : Critical Interrogation'.

১.৩.৯.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উত্তর-আধুনিকতাবাদ বলতে কী বোঝায়? মিশেল ফুকো কীভাবে উত্তর-আধুনিকতাবাদকে ইতিহাসের ধারণায় আলোচনা করেছেন?

পর্যায় গ্রন্থ–৪

Different Theories

একক ১০

Cyclical, Historical Materialism, Sociological

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৪.১০.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৪.১০.১ ঃ চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব (Cyclical Theory)

১.৪.১০.২ ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

১.৪.১০.৩ ঃ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসতত্ত্ব (Sociological Approaches in History)

১.৪.১০.৪ ঃ তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব (Comparative History)

১.৪.১০.৫ ঃ মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস

১.৪.১০.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৪.১০.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৪.১০.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১) চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়

২) এই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও তার ব্যাখ্যা

৩) এই তত্ত্বের প্রসারে ভিকোর অবদান আলোচনা

৪) কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

৫) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নানা সূত্র ও তার ব্যাখ্যা

৬) সামাজিক ও আর্থিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া

৭) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য

৮) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্বের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল

৯) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের অবদান

১০) মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির নিপুণভাবে প্রয়োগ

১১) তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির সমালোচনা

১.৪.১০.১ ঃ চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব (Cyclical Theory)

ইতিহাস চক্রাকার আবর্তন হল একটি নীতি যার অর্থ হল সমস্ত ঘটনাই চক্রাকার পদ্ধতিতে প্রায় একইভাবে ফিরে আসে। চক্রাকার তত্ত্বের দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল Cosmic Cycle; আর দ্বিতীয়টি হল মানুষেঔ কার্যকলাপ সম্বন্ধীয়। চক্রাকার তত্ত্ব প্রাচীন ভারত, ব্যাবিলন ও গ্রীসে প্রচলিত ছিল। জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে চক্রাকার তত্ত্ব তা প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। ভারতেও যে চারটি যুগের ধারণা প্রচলিত আছে তার মধ্য দিয়েও চক্রাকার তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন — মহাযুগ, সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদি। এই ধারণা প্রচলিত আছে যে কলিযুগের পর পৃথিবীতে আবার নতুন বছর শুরু হবে। গ্রীস ও রোমেও এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিক নিৎস্ "Eternal Recurrence"-এর কথা বলেছেন। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এমপোডোক্লিস্-ও (Empedocles) এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। হেরাক্লিটাস, এ্যারিস্টটল এই তত্ত্বকে আরও ব্যাখ্যা করেন — যেমন আগুন তার তাপ হারিয়ে বাতাসে পরিবর্তিত হয় এবং পৃথিবীতেও তার শুষ্কতা হারিয়ে জলে পরিণত হয়। স্টোয়িকরাও চক্রাকার তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। খ্রীষ্টান লেখকরা অবশ্য 'Cosmic Cycle'-এর নীতিকে গ্রহণ করেননি। তবে ঊনিশ শতকে নিৎস-এর 'Eternal Recurrence'-এর বক্তব্যের মাধ্যমে আবার Cosmic Cycle ধারণা ফিরে আসে।

প্লেটো তাঁর 'Statesman'-এ বলেছেন, "all history is advance and retrogression. These occur in cycles" অ্যারিস্টটল তাঁর Mataphysics-এ বলেছেন, "The arts and sciences have been lost and regained many times'. **Politics** গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "All ideas of any value have already been discovered and tried'. *Dr Caelo* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "The same doctrines have been discovered inmumerahle times". অবশ্য Aristotle 'periodic recurrence'-এর ধারণার সঙ্গে 'cosmic sycles' কে মেলাতে চাননি। তাঁর **On Philosophy** গ্রন্থে ধ্বংসের (deluge) পর আবার সভ্যতার পুনর্জন্মের কথা বলেছেন। তবে তিনি এই চক্রের সীমা কত বছর তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তাছাড়া বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি। অ্যারিস্টটল এবং পলিবিয়াস সরকারের অবক্ষয়ের মধ্যেও চক্রাকার তত্ত্বের সন্ধান করেছেন। পলিবিয়াস তাঁর 'History' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ছয় ধরনের সরকার বারবার নির্দিষ্টভাবে ফিরে আসে। যেমন 'monarchy, aristocracy, oligarchy, democracy এবং mob-rule পলিবিয়াস মনে করেন, এক একটি cycle বা চক্র প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তৈরি হয়।

মধ্যযুগে এই তত্ত্ব স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের চেয়ে রাষ্ট্রের নৈতিক আচরণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু রেনেসাঁসের যুগের গোড়ার দিকে পলিবিয়াসের তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটে। দিয়োভালি গিলোনির 'Chronicle of Florence' গ্রন্থে আবার চক্রকার তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভিলানি বলেছেন যে "Success engenders pride, sin and sin brings on decline'. পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলী ছিলেন পলিবিয়াসের উত্তরসাধক।

ম্যাকিয়াভেলী তাঁর Discourses গ্রন্থে পলিবিয়াসের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। এছাড়া Francesco Guicciardini তাঁর Ricordi গ্রন্থে বলেছেন, "The Future repeatsthe past and that only the names of things change."

'বিংশ শতাব্দীতে অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার মধ্যে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা বলেছেন, সমগ্র মানব ইতিহাসকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতি হিসাবে ভাগ করা যায় না। এগুলির আবার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। স্পেঙ্গলার তাঁর 'Decline of the West' গ্রন্থে বলেছেন, সংস্কৃতির পর্বের পর Rationality-র পর্ব আসে। তারপর আসে সভ্যতার পর্ব। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিশীল উৎসাহ বিনষ্ট হয়। তিনি মনে করেন 'The cycle of culture-civilization-death-culture goes for ever.' টয়েনবি তাঁর গ্রন্থে পৃথিীর ২৬টি দেশের সত্যতাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'All hae undergone the same stimuli known as challenges.' সভ্যতা এই চ্যালেঞ্জের জবাব বিভিন্নভবে দেয় এবং একেই সেইসব সভ্যতার ইতিহাস বলে ধরা হয়ে থাকে। স্পেঙ্গলার ও টয়েনবির লেখার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি সাধারণ Pattern পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তিগত ঘটনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক George Boas ইতিহাসের চক্রকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেটি বারবার একই জায়গায় ফিরে আসে। তিনি বলেছেন, "The doctrine of historical cycles is that based on the metaphor of the swingling pendulum according to which an historical movement will reach an extreme and the turn back until it reaches an opposite extreme. Thus radicalism and conservatism in politics, romanticism and classicism in art, skepticism and authoritarianism in religion have all been said to occur in this manner."

আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভিকোর অবদানগুলির অন্যতম হল তার চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, সাধারণবাবে এবং বিশেষ করে জাতিগত ইতিহাস কয়েকটি অগ্রগতির স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। যেমন উত্থান, পরিপূর্ণতা, ক্ষয় এবং পতন। ভিকো এই অভিমত পোষণ করেন যে, একটি সমাজ-জীবনের বিভিন্নধারা তাদের চলার পথে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ইতিহাসের অগ্রগতির স্তরগুলি তাদের নিজস্ব প্রথা, আইন-কানুন, অর্থনীতি, সাহিত্য এবং শিল্পের মাদ্যমে এগিয়ে চলে। ইতিহাসের এই অগ্রগতিকে ভিকো তিনটি অধ্যায় বা স্তরে বিবক্ত করেছেন। ভিকো তাঁর প্রথম স্তরটির নাম দিয়েছেন 'Age of God' বা ঈশ্বরের যুগ'। ভিকোর মতে, এই যুগের মানুষ বিশ্বাস কদ্দরত যে, তাঁরা ঈশ্বরের শাসনে বসবাস করছে। ভিকোর মতে, সমাজে আদিমতম অধ্যায় ছিল ঐশ্বরিক। কারণ সংস্কৃতিগতভাবে এইযুগ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ভিকো তাঁর দ্বিতীয় স্তরটির নাম দিয়েছেন 'Age of Heroes' বা 'বীরদের যুগ'। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিঃআক্রমণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য অলিগার্কি বা মুষ্টিমেয় শাসন প্রচলিত হয়। এই সময় সমাজ 'Patrician' এবং 'Plebian' ক্রীতদাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময় শক্তিশালী এবং সম্মানীয় যুদ্ধবাদী অভিজাততন্ত্র সমাজের আইনসম্মত পদের অধিকারী ছিল। যেহেতু বীরদের প্রতিহত করবার জন্য সমাজে কোন বাস্তব আইন ছিল না সেজন্য দ্বৈরথ সংগ্রামই ছিল যে কোন দ্বন্দ্বের মীমাংসার সহজ পদ্ধতি। ভিকোর বক্তব্য অনুসারে ক্রমশঃ মর্যাদার চূড়ায় ওঠা এই সমস্ত বীরদের স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতা আরেক ভাবে প্রতিহত হত। সেটি হল এই সমস্ত বীররা ঈশ্বরের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। যেহেতু বীরদের ক্ষমতাকে 'ঐশ্বরিক' বা 'divine' বলে মনে করা হত, সেজন্য ক্রীতদাসরা এদের তুলনায় নিচুমানের জীবনযাত্রাকে স্বাবাবিক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। ভিকো বর্ণিত তৃতীয় স্তর হল 'মানুষের যুগ' বা 'Age of men'। এই যুগে প্রত্যেকটি মানুষ সমান

মর্যাদার অধিকারী ছিল। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল প্রথম জনপ্রিয় শাসনতন্ত্র। এই শাসন ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুগ ছিল সম্পূর্ণভাবে মানবতার যুগ। এইযুগে শুভবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধের এক অপূর্ব সংমিশণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই যুগের সরকার মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই যুগে প্লেবিয়ানরা তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং তা অর্জনও করেছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় সমাজ দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ ও প্রথাগত ব্যবস্থার মধ্যে ঘটে যায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসে গণতন্ত্রের যুগ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা। পরিণামে সমাজে শুরু হয় অবক্ষয়। ভিকোর মতে, এই চক্রের শেষ হয় বৈদেশিক আক্রমণে বা গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পরিণামে আবার আসে পুরানো বর্বরতা এবং সূচনা হয় নতুন এক চক্রের। ভিকো এই চক্রের নাম দিয়েছেন 'Recorso' বা 'Recurrence'।

ইতিহাসে চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব হল একটি নীতি যার অর্থ হল সমস্ত ঘটনাই চক্রাকার পদ্ধতিতে প্রায় একইভাবে ফিরে আসে। চক্রাকার তত্ত্ব প্রাচীন ভারত, ব্যাবিলন ও গ্রীসে প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিক নিংস, এমপোডোক্লিস, হেরাক্লিটাস ও এ্যারিস্টটল এই মতের সমর্থক ছিলেন। মধ্যযুগে এই তত্ত্ব স্তিমিত হয়ে যায় কিন্তু রেনেসাঁসের যুগের গোড়ার দিকে পলিবিয়াসের তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে অসওয়াল্ড স্পেঙ্গালার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার মধ্যে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভিকোর অন্যতম অবদান হল তার চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্ব। তার তত্ত্ব অনুযায়ী অতীতে যা লঘটেছিল, তা ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে ঘটবে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভিকোর ধারণা অনুযায়ী অতীতে যা ঘটেছিল, তা ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে ঘটবে। এইভাবে তিনি ঐতিহাসিক অগ্রগতির একটি স্থায়ী চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে 'Recurrence' ঠিক অতীতের পূর্ণ প্রতিফলন নয়, এটি হল নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এক বিবর্তন।

এইভাবেই চক্রাকার পরিবর্তনের দৃঢ় সমর্থক ভিকো ইতিহাসের সমান্তরাল অগ্রগতির ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ভিকোর চক্রাকার পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ রোমান সভ্যতা। রোমান সাম্রাজ্য সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে বিশ্বের সব দেশকেই অতিক্রম করেছিল। আধুনিককালে এক প্রধান চিন্তাবিদ হিসাবে ভিকো ইতিহাসের গতিশীলতাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং অনুসন্ধানে এক নতুন পথের নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন

১। পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রাচীনকালে আবর্তন চক্র প্রচলিত ছিল?

২। এ্যারিস্টটল তার কোন কোন গ্রন্থে আবর্তন চক্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

১.৪.১০.২ ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

মনীষী কার্ল মার্কস তাঁর নব দর্শনের আলোকে ইতিহাস ব্যাখ্যার যে নতুন পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি নিহিত আছে।

(i) 'যে সকল সংঘর্ষের ফলে যুগে যুগে সমাজের রূপান্তর ঘটেছে তা মানুষের মনোরাজ্যের সৃষ্টি নয়। মানুষ নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা অন্য নিরপেক্ষ চিন্তার দ্বারা সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। ভোগ্যবস্তু উৎপাদন রীতির পরিবর্তনের ফলেই সমাজে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে সমাজব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে থাকে।'

সমাজে প্রগতির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে অনেক বড় বড় সমাজ সংস্কারকের বা চিন্তা নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের বাণী, তাঁদের প্রচার সমকালীন জনমানসের উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছে, একথাও ঠিক। ইউরোপীয় মহাদেশে গণতন্ত্র ও উদার নীতির প্রতিষ্ঠায় ইংল্যাণ্ডের জন স্টুয়ার্ট মিল, জেরেমি বেন্থাম কিংবা ফ্রান্সের রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতির বৈপ্লবিক চিন্তার প্রভাব কিংবা আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষদের চিন্তার প্রভাব স্পষ্টতই ?আমাদের অন্তরকে অভিভূত করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ সকলের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, এইসব চিন্তানায়কের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। প্রচলিত বাস্তব অবস্থার প্রবাবেই এদের আবির্ভাব ঘটেছে। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-রীতির ভিতরে তার ধ্বংসকারী প্রতিকূল অবস্থাগুলির সমাবেশের ফলে পুরানো উৎপাদন রীতি ভেঙে পড়েছে। পুরানো উৎপাদন রীতি ভেঙে না পড়লে ইউরোপ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই সম্ভব হত না। সব সময়ই প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই তৎকালীন সামাজিক সম্পর্কগুলি রূপায়িত হয়।

প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির রীতিনীতি ও সৃষ্ট সম্পদের বিলির ব্যবস্থা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফলে মানুষে মানুষে যেভাবে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে — তারই সাথে তাল রেখে মানুষের 'কৃষ্টি' ও 'বোধ' রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষ এবং পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে 'ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার প্রণালী'কে অবলম্বন করে অনাদিকাল থেকে সম্পর্ক প্রবহমান রয়েছে। এ সম্পর্ক প্রতি মানবের সহজাত। কোন মানুষই এ সম্পর্ককে পরিহার করতে পারে না।

মানবগোষ্ঠীর সাথে বস্তু সমষ্টির এই যে চিরানুসৃত সম্পর্ক রয়েছে — তারই ফলে এক মানুষ আর এক মানুষের সাথে সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ মানুষ ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক — মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার রীতির পরিবর্তনের সাথে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কেরও প্রকারভেদ ঘটে।

মানুষের ধর্মবোধ, ন্যায়-নীতি সম্পর্কীয় ধারণা বা রুচি এগুলির কোনটাই স্থিতিশীল নয়। এককালে যা 'ধর্ম' বলে বিবেচিত হয়, 'ন্যায়' বলে সমর্থিত হয় অন্যকালের মানুষের বিবেচনায় তাই আবার 'অধম' অন্যায় বলে নিন্দিত হয়ে থাকে। যে ক্রীতদাস প্রথা একালে বহু নিন্দিত, সেই ক্রীতদাস প্রথাকে এককালে অ্যারিস্টটলের ন্যায় মহাপণ্ডিতও 'ধর্মীয় বিধান' বলে সমর্থন করেছিলেন।

মানুষের সামাজিক ব্যবহার, নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, ধর্মবোধ-এ সমস্তই পরিবর্তনশীল। 'সনাতনধর্ম' কথাটাই স্ববিরোধী। কারণ সভ্যতার ইতিহাসে 'সনাতন' বা শ্বাশ্বক ধর্মের কোন হদিস্ মেলে না। উৎপাদন রীতির পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সম্পর্কের প্রকারভেদ ঘটেছে তার সেই জন্যই ন্যায়, নীতি, ধর্ম, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের পূর্বতন ধারণা পাল্টে যাচ্ছে।

মার্কসের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র হল মানুষের সামাজিক তেনা ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে ভিন্ন। এক একটি আর্থিক-রীতি কতকগুলি সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই সকল সামাজিক সম্পর্কই মানুষের সামাজিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আদিকাল থেকে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সূত্র যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সামাজিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে, সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ বন্টনের পদ্ধতির বিভিন্নতা অনুসারে মার্কস তার নিম্নলিখিত রূপ বিভাগ নির্দেশ করেছেন।

সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের সাথে যোগাযোগের ফলে। সৃষ্টির আকিাল থেকে প্রকৃতি মানুষে মানুষে এই যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। ফলমূল সংগ্রহের জন্য বনে ঘোরার সময় যূথবদ্ধ হয়ে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যূথবদ্ধ চলার রীতি বানর সমাজেও দেখা যায়। খাদ্যের জন্য বন্য পশু শিকারের কাজও দলবদ্ধ হয়েই করতে হত। কোন কোন দেশে ভল্লুক, হাতি প্রভৃতি জন্তুর মাংসও খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হত। এগুলিকে একা একা শিকার করা একেবারেই অসম্ভব। তাই আদি সমাজে জৈবিক প্রয়োজনেই যূথবদ্ধ রূপে জীনযাত্রার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এযুগে সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়নি। তাই এ সমাজে সামুহিক শ্রমে খাদ্য সংগ্রহ, হাতিয়ার প্রস্তুত, আত্মরক্ষা ইত্যাদি অপরিহার্য ছিল বলে আহৃত বস্তুর ভোগও ছিল সামুহিক। এই হল 'আদিম সাম্যবাদ'। এঙ্গেলস বলেছেন যে, এই আদিম কমুনিজমের যুগেই 'সম্পত্তির' প্রথম উদ্ভব হয়। এর ফলে যূথ জীবনে সঙ্কট আসে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রমনিয়োগ পুরাতন সামুহিক সম্পদ ও সামুহিক শ্রমের প্রথাকে পরাস্ত করে। আদিম সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মনুষ্য সমাজ মানব সভ্যতার এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

কার্ল মার্কস ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ভোগবস্তুর রীতির পরিবর্তনের সাথে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকার ভেদ ঘটে। সভ্যতার প্রতিস্তরেই প্রচলিত আর্থিক রীতির মধ্যে সঙ্কট উদ্ভুত হয় এবং উন্নততর আর্থিক রীতির সন্ধানের জন্যে মানুষের মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। যখন একদল এই উন্নতর আর্থিক রীতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। তখন তার সঙ্গে পুরানো আর্থিক রীতির আওতায় যে প্রভুশ্রেণী পুষ্ট হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে বিরোধ বাধে কারণ তারা নতুন আর্থিক রীতির প্রবর্তনকে প্রাণপণে বাধা দেয়।

নতুন সমাজে প্রাচীন 'যূথ' বা 'কম্যুনের' স্থান গ্রহণ করল — 'গোষ্ঠী'। যূথে সমষ্টির প্রাধান্য। গেষ্ঠীতে ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য। আদিম যূথ সমাজ বিধ্বস্ত হল পশুপালনস্বরূপ নতুন শ্রম কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে। এরফলে কতকগুলি পশু আর বন্য বা প্রাকৃতিক সম্পদ থাকল না — ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত হল।

মার্কস মানব সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে যে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজের উল্লেখ করেছেন—প্রাচীন ভারতের ঋষিপ্রধান সমাজ তারই নিদর্শন। গ্রীস দেশের ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজের চিত্র আরো সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। মানুষের সমাজ বিকাশের ইতিহাসে গোষ্ঠী-প্রধান সমাজ মানুষের জীবন চর্চায় অসামান্য পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মান সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম সমাজ বিপ্লব যূথ সমাজকে ভেঙে দিয়ে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজ প্রতিষ্টা করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতেই এই সমাজ গড়ে ওঠে।

মার্কস বলেন — 'যে অবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম ও শ্রম নিয়োগের মুখ্য উপযোগী অবস্থা সমূহের উপর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব থাকে কেবল সেই অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারে। সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এল, সাথে সাথে সেই সম্পত্তির মালিকানার সূত্রে সমাজের সমস্ত মানুষ প্রধান দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একশ্রেণী যারা সম্পত্তির মালিক, অপর শ্রেণী যারা সম্পত্তির মালিক নয়। সমাজে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক স্থাপিত হল।

প্রভু শ্রেণী ও দাস শ্রেণী—এই দুই শ্রেণীতে মানবগোষ্ঠী বিভক্ত হল। একশ্রেণীর লোকেরা পরশ্রমভোগী, অপর শ্রেণীর লোকেরা শ্রমজীবী। এক শ্রেণী শোষক, অপর শ্রেণী শোষিত। গোষ্ঠীপতিদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও তাদের বিলাস দ্রব্যের সরবরাহ করবার জন্য প্রচলিত আর্থিক রীতিকে চালু রাখার জন্য ঐ যুগে ক্ষুদ্র শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে নিয়ে এক মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই মধ্যশ্রেণীর মালিকানাভুক্ত হয়। কিছু দাসেরা মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আপন স্বার্থে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। পুরাতন আর্থিকরীতির সাথে নব আবিষ্কৃত আর্থিকরীতির লড়াই বাধে। এ লড়াইয়ে গোষ্ঠীপতি প্রধান সমাজ ভেঙে পড়ে। মানব সমাজ আবার সভ্যতার এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

ভূস্বামীতান্ত্রিক সমাজকে অনেকে সামন্ত-প্রধান সমাজ বলে। একজন বড় ভূস্বামীর অধীনস্থ অন্য ছোট ছোট ভূস্বামীদের 'সামন্ত' বলে মার্কস এই সমাজকে 'ফিউডাল' সমাজ নামে আখ্যাত করেছে। মানব সব্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় সমাজ বিপ্লব হল—ফিউডাল বিপ্লব। ভূমির উপরে মানুষ ও পশুর শ্রম নিয়োগ করে ধনোৎপাদন করার কৌশল অবগত হওয়া মানব মস্তিষ্কের এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন।

ফিউডাল আর্থিক রীতি আপন প্রয়োজনেই এক মধ্য শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। এই মধ্য শ্রেণীর লোকেরা প্রধানত বণিক এবং বৃত্তিজীবী শিল্পী। ফিউডাল ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সাথে এই মধ্য শ্রেণীর লোকদেরও নিজেদের কাজকর্মে মূলধন নিয়োগের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং তাদের ক্রমশঃ বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অসন্তুষ্ট ভূমিদাসরা এদের কাছে প্রশ্রয় পেতে থাকে। মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা নতুন বাণী নিয়ে শোষিতবর্গের সম্মুখে দেখা দেন। ফিউডাল প্রভুশক্তির অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের বাণী প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নতুন আর্থিকরীতি, পুরাতন জরাজীর্ণ ফিউডাল আর্থিক রীতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। মানব সভ্যতা আরো এক নতুন প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। পত্তন হয় নতুন সমাজের, যার নাম পুঁজিতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ— ইংরাজীতে বলা হয় ক্যাপিটালিস্ট সমাজ।

শিল্পজ উৎপাদনে স্পষ্টত দুইটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটল। এক মালিক শ্রেণী বা শিল্পপতি — যারা শ্রম না করে মূলধন খাটিয়ে মুনাফা লোটে, অপর শ্রেণী মজুরির বিনিময়ে সেই উৎপাদনে শ্রম নিয়োগ করে। একশ্রেণী 'পুঁজিপতি' বা মূলধনওয়ালা, অপরশ্রেণী 'শ্রমিক' বা মেহনতওয়ালা। এক শ্রেণী মুনাফাভোগী, অপর শ্রেণী মজুরীজীবী। একশ্রেণী মালিক, অপরশ্রেণী মজুর। এই হল পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী বিভাগের চিত্র।

মানব সভ্যতার প্রত্যেক স্তরে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা, আইনকানুন প্রভৃতি যে রীতিতে গঠিত ও পরিচালিত হয় তা সেই সমাজের আর্থিক রীতির প্রতিফলন মাত্র। প্রত্যেক সামাজিক স্তরেই উৎপাদন ব্যবস্থায় আধিপত্য যে শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও সেই শ্রেণীর কবলিত হয়। সেই আইন কানুন, ধ্যানধারণা সর্বক্ষেত্রে প্রভুশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন দেখা যায়। সভ্যতার কোন বিশেষ স্তরে যে সকল রাষ্ট্রীয় বিধান, আইন, ন্যায়বোধ ইত্যাদি প্রচলিত থাকে তা একদিক দিয়ে যেমন প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার প্রসূত ফল অন্যদিক দিয়ে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার দর্পণ।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা থেকে আমরা যুগে যুগে উৎপাদন প্রকৃতি (mode of production) বদলে যাওয়াতেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উদ্ভব হয়েছে। উৎপাদনের শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদনের সম্বন্ধ (relation

of production) —এই দুই-এর মিলনে উৎপাদনের প্রকৃতি গড়ে ওঠে। উৎপাদনের উপাদান (means of production) যখন গোষ্ঠী বিশেষের সম্পত্তি হয় তখন শ্রেণী বা class কে দেখা যায়। আরো যে সূত্রটি পাই তা হল ঃ 'সমাজ বিকাশের মূলনীতি (অর্থাৎ দ্বন্দ্ব নীতি) অনুসারে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমাজের প্রতিস্তরেই বিরোধের বীজ নিহিত থাকে। প্রত্যেক সমাজ তার আপন পরিপুষ্টির সাথে সাথে আত্মধ্বংসের বীজকেও পুরিপুষ্ট করতে থাকে।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে যে সকল বিশেষ সমাজ গড়ে ওঠে তারা প্রত্যেক জন্মকাল থেকে নিজের গর্ভে আত্মধ্বংসকারী শত্রু শিশুর ভ্রূণকে লালিত করতে থাকে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তার বিস্ময়কর অগ্নগতির সূত্রে একদিকে যেমন পর্বত প্রমাণ সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি সর্বহারাজনশ্রেণীর ক্রমাগত স্ফীতি ঘটাচ্ছে। পুঁজিবাদের নিজের সৃষ্টি এই সর্বহারাজনশ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে লালিত দৈত্য শিশু। এই সংঘর্ষে পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সর্বহারার আত্মপ্রতিষ্ঠা মানব ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ।

সামাজিক রূপান্তর (অর্থাৎ সভ্যতার এক স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নয়ন) শান্তিপূর্ণ ক্রমবিকাশের নীতিতে হয় না। বেগবান্ সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সমাজের রূপান্তর ঘটে। সভ্যতার প্রতিস্তরেই প্রচলিত আর্থিকরীতির মধ্যে সঙ্কট পাওয়া মাত্র একদল লোক তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। পুরানো আর্থিকরীতির ধারকদের সাথ তাদের বিরোধ বাধে। পুরানো আর্থিক রীতির আওতায় যে প্রভুশ্রেণী পুষ্ট হয়েছে তারা নতুন আর্থিক রীতির প্রবর্তনকে প্রাণপণে বাধা দেয়। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

১। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবর্তক কে?

২। পুঁজিবাদী সমাজের দুটি শ্রেণী কী কী?

১.৪.১০.৩ ঃ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসতত্ত্ব (Socialogical Approaches in History)

অগাষ্ট কোঁত (August Conte) প্রবর্তিত দৃষ্টিবাদী ইতিহাসচর্চার এক উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হিসাবে ইতিহাসচর্চায় সমাজতত্ত্বের প্রতিফলন ঘটে। দৃষ্টিবাদীরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যবহার করে মানব সমাজের গতিপ্রকৃতি কতকগুলি সূত্রের (laws) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। র‍্যাঙ্কীয় পদ্ধতিতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার পর দৃষ্টবাদীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সেই তথ্যগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রচনার কাজে নিয়োজিত হন। অর্থাৎ ঐতিহাসিকদের কাজ হল সমাজতত্ত্ববিদদের মত তথ্যগুলির কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা। এজন্য R. G. Collingwood বলেছেন, "The sociologist would thus be a kind of super-historian raising history to he rank of a science." সুতরাং দৃষ্টিবাদী ইতিহাস তত্ত্ব থেকে ইতিহাসচর্চা সমাজতাত্ত্বিকতার দিকে অগ্রসর হয়। 'Man is Society' এবং 'social behaviour' সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা সচেতন হতে থাকে এবং তা ইতিহাসচর্চায় অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে।

এমিনি ডার্কহাইম (১৮৫৮-১৯১৭) এবং ম্যাক্স ওয়েবারের (১৮৬৪-১৯২০) প্রচেষ্টায় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব

অনেক কাছাকাছি আসে এবং ইতিহাসচর্চায় সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক H. E. Barnes এবং E. H. Can ইতিহাস সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক কার বলেছেন, 'Sociology, if it is to become a fruitful field of study, must like history concern itself with the relation between the unique and the general; but it must also bcome dynaamic — a study not of society at present but of social change and development." একথা অনস্বীকার্যযে সমাজবিদ্যা ইতিহাসকে সামাজিক গতিশীলতা অনুভব করতে সাহায্য করে। সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি ইতিহাসচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মানুষ ও তার সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন সামাজিক ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন পারিবারিক গোষ্ঠীজীবন, আচারব্যবহার, খাদ্যভ্যাস, লোকাচার, উৎসব, রমেলা ইত্যাদি সব কিছুই সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সমাজতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকদের কাজ হল একজন সমাজতত্ত্ববিদের মত বিভিন্ন তথ্যগুলির কার্যকারণ সম্পর্কে খুঁজে বের করা। কারণ তাদের মতে সমাজ হল ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। যেমন ঐতিহাসিক টয়েনবি সমাজকে ইতিহাস রচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করেন।

কার্ল মার্কস তাঁর *The Critique of Political Economy* দেখেয়েছেন সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটে। সমাজ বিপ্লব সামাজিক প্রগতি নিয়ে আসে। প্রাচীন যুগে দাসবিদ্রোহ, মধ্যযুগে কৃষকবিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটেছে। ১৬৪২ সনে ইংলণ্ডের বিপ্লব এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের ফলে এই দুই দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তে বুর্জোয়া সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালে জার্মানিতেও একটা ঘটা ঘটে। মার্কস ও এঞ্জেলস্ এর সমাজ চেতনা ও সমাজ ভাবনা নিঃসন্দেহে ইতিহাস রচনাকে প্রভাবিত করেছে। *The Communist Manifesto* সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক A. J. P. Taylor বলেছন, everyone thinks differently about politics and society, when he thinks at all." *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* সম্পর্কে একই কথা বলেছেন, এডমণ্ড উইলসন। ব্রদেল তাঁর structural history রচনার সময়ও ইতিহাসে social theoryর অবতারণা করেছেন। কারণ সামাজিক তত্ত্ব structure কে প্রভাবিত করে। ঐতিহাসিক টয়েনবিও সমাজকে ইতিহাস রচনার মূলকেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করতেন। সমাজ হল ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। বর্তমানে 'Social Mobility', 'social protest', 'Caste history' বর্ণব্যবস্থা, ফিউডাল সমাজ, বুর্জোয়া সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ, সামাজিক সংঘাত ইত্যাদি কথাগুলি ইতহাসচর্চায় বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে। অধ্যাপক ইরফান হাবিব তাঁর *Interpreting Indian History* গ্রন্থে দেখিয়েছেন সুরী ও তুর্কীদের উত্তরভারত বিজয়ের পর এক ধরনের 'social formation' হয়েছিল, যার ভিত্তি ছিল 'labour process', 'surplus value' এবং 'syustem of distribution of surplus' অর্থাৎ ভারতের মধ্যযুগীয় অর্থনীতিতে এক ধরনের স্বতন্ত্র 'social formation' হয়েছিল যা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে আলাদা ছিল।

তবে ঐতিহাসিক আর্থার আরউইক মনে করেন, ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ট যোগসূত্র থাকলেও পার্থক্যও আছে। কারণ সমাজতত্ত্ববিদরা 'general section' করে থাকেন, যা ঐতিহাসিকরা সাধারণত করতে চান না।

প্রশ্ন ১। সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চা বলতে কি বোঝ?

১.৪.১০.৪ ঃ তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব (Comparative History)

ইতিহাস চর্চায় তুলনামূলক পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হল সাধারণ প্রতিষ্ঠান, ধারণা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ঐতিহাসিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলির অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তুলনামূলক ইতিহাসচর্চার প্রধান এককগুলি হল ঃ রাষ্ট্র, সামাজিক শ্রেণী, প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা (idea)। এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় এই এককগুলিকে ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া যদি সমাজগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক এককের তুলনা করার ক্ষেত্রে (যেমন—গ্রামীণ ও শহুরে, রক্ষণশীল ও আধুনিক) যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সেই পার্থক্যের স্তরভাগকেও তুলনার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যেসব contextual veriable-গুলিকে পরীক্ষা করা হবে সেগুলিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ব্যাখ্যা করতে হবে। সাধারণভাবে তুলনামূলক পদ্ধতি বলতে cross-cultural তুলনাকেই বোঝায়। কিন্তু এই ধরনের অন্যান্য বিষয়কেও তুলনামূলক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন, কোন একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের ধারণার অনুপ্রবেশ ও গ্রহণ। এই ধরনের বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির পরিবর্তে সেই সমাজে ধারণাগুলি গ্রহণের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলির চিহ্নিতকরণ করতে হবে।

ঊনিশ শতকের Comparative Method থেকেই আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসচর্চা উদ্ভূত হয়েছে। John Wyon Burrow-এর মতে, "Comparative Method consists in the recognition of similarities between the practices and beliefs of contemporary primitive or barbaric peoples and those reocrded in the past history of civilisation" বস্তুতপক্ষে এই Comparative Method কিন্তু অনেক আগেই ব্যবহৃত হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ, অ্যাডাম ফার্গুসন, জন মিলার প্রমুখ স্কটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ্‌রা তাঁদের লেখায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। মানবসভ্যতার কথা বলতে গিয়ে তাঁরা সমাজের শ্রেণী বিভাজন করেছিলেন সেই সমাজের গঠন পদ্ধতি বা কাঠামোর সাথে মানবদেহের তুলনা করে।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে স্যার হেনরি মেইন আইন ও historical jurisprudence-এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁর Ancient Law এবং Village Communities in the East and West গ্রন্থ দুটিতে এবং তাঁর অন্যান্য লেখায় তুলনামূলক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি গ্রীস ও ভারতের ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমধর্মী উৎপতির তুলনা করেন। তুলনামূলক পদ্ধতি আলোচনায় তিনি একদিকে যেমন সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্রীয়করণের কথা বলেছেন, তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক - অর্থনীতিবিদ্‌দের মত পরিবর্তন ও বিবর্তনের কথাও বলেছেন। ঊনিশ শতকে নৃতত্ত্ববিদ্‌রাও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকেন। তবে বর্তমানে তুলনামূলক ইতিহাসচর্চা প্রভাবিত হয়েছে কার্ল মার্কসের

*ঊনিশ শতকের **Comparative Method** থেকে আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসচর্চার উদ্ভুত হয়েছে। তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার প্রধান এককগুলি হল ঃ– রাষ্ট্র সামাজিক শ্রেণী প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক এককের তুলনার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিলে সেই পার্থক্যের স্তরভাগকে তুলনার অন্তর্ভুক্ত করা। কার্ল মার্কস তুলনামূলক ইতিহাসকে বর্তমানে প্রভাবিত করেছেন। টয়েনবির নিজের অজ্ঞাত সারেই রোমের ইতিহাস ও সভ্যতাকে **'ideal type'** হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে অন্য দেশের সভ্যতাকে তুলনা ও মূল্যায়ন করেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তুলনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন — ডারউইনবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।*

মাধ্যমে। মার্কস প্রথম social action-এর সাধারণ তত্ত্ব তৈরী করেন এবং তারপর তা বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। মার্কস-এর ঐতিহাসিক ব জ্রবাদ ও সম্পদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিবর্তনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল। এই সম্পদ ছিল বিভিন্ন ধরনের যেমন — tribal বা communal, state, feudal and capitalistic। এই ধরনের পরিকল্পনা ইউরোপের ইতিহাসের পর্ব বিভাজনের সৃষ্টি করে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে তুলনা করার পদ্ধতির অবতারণা করে। মার্ক্স-এর ম্যাক্স ওয়েবারও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ, আমলাতন্ত্র এবং কৃষিকার্যের বিভিন্ন প্রথাগুলির মধ্যে তুলনা করেন। তাঁর approach ছিল typological। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার গঠনকে একত্রিত করে একটি ধারার মধ্যে নিয়ে আসেন। যেমন—modern bureaucracies of the West, ancient bureaucracies of the old empires, partrimonialism, hierarchy, and caesaro-papism—এই model গুলিকে তিনি অন্য model-এর সঙ্গে তুলনা করেন এই উদ্দেশ্যে যে এর ফেলে একদিকে যেমন subtype গুলির মূল্যায়ন করা যাবে তেমনি কোন একটি বিশেষ model-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক আর্নল্ড টয়েনবিও তাঁর বিখ্যাত 'A stgudy of History' গ্রন্থে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনি ২৬টি দেশের সভ্যতাকে তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একক হিসাবে বেছে নেন। দ্বেসই সভ্যতাগুলির পরিবেশগত তাৎপর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। টয়েনবির নিজের অজ্ঞাতসারেই রোমের ইতিহাস ও সভ্যতাকে 'ideal type' হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে অন্য দেশের সভ্যতাকে তুলনা ও মূল্যায়ণ করেন। তিনি খ্রষ্টধর্মকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এজন্য অবশ্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও যে বিরাট পরিধি নিয়ে তিনি কোন বিশেষ সভ্যতার dynamic এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন তা অতুলনীয়। তবে পৃথিবীর ইতিহাস তত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য এবং বর্তমানে অর্থনীতিকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায় World-economyকে আবার তিনটি type-এ বিভক্ত করা যায়—Corestates, peripheral areas, এবং semi-peripheral areas. তৃতীয় Core এবং Peripheral-এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করে। মার্শাল হজসন্ পাঁচ ধরনের এর কথা বলেছেন, যাদের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক তুলনা করা যেতে পারে। এগুলি হল ঃ (i) Common events (2) Parallel developments (3) supra regional effects (4) activity motifs (5) the inter regional role of specific regions.

হজসন ঐতিহাসিক তুলনার ক্ষেত্রে যে এককগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলি হল — সভ্যতা, অঞ্চল, সাংস্কৃতিক এলাকা এবং সভ্যতার ট্রাডিশন।

বৌদ্ধিক তুলনামূলক ইতিহাস সাধারণত একটি বা অনেকগুলি ধারণার উপর ভিত্তি করে সেগুলিকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। বৈজ্ঞানিক ধারণ বা তত্ত্বের তুলনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন—ডারউইনবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

প্রশ্ন

১। আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসের উৎস কি?

২। তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার প্রধান এককগুলি কী কী?

১.৪.১০.৫ ঃ মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক। তাঁর মতে, তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতি ইতিহাসচর্চায় এক মহত্তর কাজ সমম্পাদনা করে। কারণ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক সমাজ সংস্থা এমনকি সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটেছে।

বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ রপ্ত করে উঠতে পারেননি। অধ্যাপক ব্লক-এর মতে এর প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তুলনামূলক ইতিহাস হল — ইতিহাসের দর্শন বা সাধারণ সমাজতত্ত্বের একটি অধ্যায় মাত্র। অন্যদিকে ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা এমন একটি পদ্ধতি চান যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যাকে সহজেই অনুকরণ করা যায় এবং যা প্রত্যক্ষ ফল দেবার ক্ষমতা রাখে — এমন একটি ব্যবহারিক যন্ত্র। মার্ক ব্লক-এর মতে, তুলনামূলক পদ্ধতি ঠিক এইধরনের একটি যন্ত্র।

অধ্যাপক ব্লক মনে করেন, কোন অঞ্চলের জমিদারী পদ্ধতির ইতহিাস রচনা করতে হলে ঐ জমিদারীর দলিল, দস্তাবেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের অংশ বিশেষের সাথে অনবরত তুলনা করতে হবে। কারণ ইতিহাস রচনার বিভিন্ন বিষয়গুলি একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। কেবলমাত্র কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সীমারেখার পাশের ঘটনাগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই চলবে না, রাজনৈতিক ও জাতীয় বৈষণ্যের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে এই বৈষম্যগুলিই সামাজিক বৈষম্যের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। ব্লক-এর মতে সমাজ তার সম্পূর্ণতা নিয়ে একটি বৃহত্তর এককের সৃষ্টি করে। সমাজের এই এককগুলি স্থান ও কলের দিক থেকে আলাদা। কিন্তু তুলনামূলক ইতিহাস এই বিভিন্ন সমাজগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এবং তাদের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — পুরাতন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে বর্তমানকালের এবং আদিম সমাজের তুলনা করা যেতে পারে।

তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির আর এক ধরনের প্রয়োগের কথা মার্ক ব্লক বলেছেন। এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে তুলনীয় একক হল ''ভৌগোলিক প্রতিবেশী বা ঐতিহাসিক সমসাময়িক সমাজগুলি অবিরাম পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত।'' এই সমাজগুলি ইতহিাসের বিকাশের ক্ষেত্রে একই ধরনের কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর কারণ হল এরা স্থান ও কালের দিক থেকে পরস্পরের খুবই নিকটবর্তী। ইতহিাস আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের তুলনামূলক পদ্ধতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুনভাবে প্রয়োগ করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রত্যক্ষ ফল দেবার একটি যন্ত্র। ব্লক বলেছেন যে ভৌগোলিক প্রতিবেশী বা ঐতিহাসিক সমসাময়িক সমাজগুলি অবিরাম পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রকৃত অর্থে তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল পার্থক্য পর্যালোচনা করা। সেই পার্থক্য মৌলিক ও সাধারণ উৎস থেকে হতে পারে।

অধ্যাপক মার্ক পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে পাশাপাশি অবস্থিত সমসাময়িক সমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছন। এক্ষেত্রে

তিনি ফ্রান্সের দাসত্ব প্রথার অবসানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ফ্রান্সের প্রভেনসে্ দাসত্ব প্রতার অবসান ঘটেছিল এবং কৃষি সংক্রান্ত রূপান্তর ঘটেছিল। এটি অষ্টাদশ শতাব্দর ঘটনা। ব্লক মনে করেন পঞ্চাদশ, ষাড়শ ও সপ্তদশ শতকেও এই অঞ্চলে এ ধরনের আন্দোলন ঘটেছিল। কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করেনি। প্রভেন্সে দাসপ্রথার বসানের আন্দোলন ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য আন্দোলন-এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এছাড়া মার্ক ব্লক মধ্যযুগের ইউরোপের মেরোভিঞ্জিয়ান ও ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাজত্বের মধ্যে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ক্যারোলিঞ্জিডয়ান রাজত্বকাল ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং মৌলিক বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ। চার্চের সাথে জনগণের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করলে মেরোভিঞ্জিয়ানদের কেবলমাত্র একজন সাধারণ মত্রাড্নুষ ছাড়া কিছু মনে করা যায় না। অন্যদিকে ক্যারোলিঞ্জিলিয়ান জনগণ রাজার সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকেই পবিত্রতার চিহ্ন পেয়েছিলেন।

তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সমালোকরা তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন ঘটনার সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা ছাড়া এই পদ্ধতির আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এই অভিযোগ করা হয় যে, অনেক চেষ্টা করেই এই সাদৃশ্য খেঁজা হয়, সাদৃশ্য খোঁজার জন্য বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে প্রয়োজনীয় সমান্তরাল অবস্থান প্রমাণ ছাড়া এবং ইচ্ছা করেই প্রবেশ করানো হয়। যদি এইসব অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে মন করতে হবে যে, এই পদ্ধতিটিতে স্বধর্মের বিকৃতি ঘটেছে। প্রকৃত অর্থে তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির মউল উদ্দেশ্য পার্থক্য পর্যালোচনা করা, সেই পার্থক্য মৌলিক ও সাধারণ উৎস থেকে হতে পারে।

মার্ক ব্লক মনে করেন, ''যখন আলোচনা বিশদ, সূক্ষ্ম ও সুপ্রমাণিত তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই তুলনামূলক আলোচনার যথার্থ মূল্য পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন

১। মার্কব্লক কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুণভাবে পর্যালোচনা করেছেন?

২। মার্ক ব্লকের মতে কোন অঞ্চলের জমিদারী পদ্ধতির ইতিহাস রচনা করতে হলে কি করতে হবে?

১.৪.১০.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. Keith Jenkins (ed) : The Postmodern Histgory Reader.
2. Steven Best and Douglas Kellner : Post modern Theory : Critical Interrogations.
3. Brian Fay, Philip Pomper and Richard T. Vann (eds) : Histoy and Theory :contemporary Readings.
4. Butterfield : Dictionary of the History of Ideas.
5. Collingwood : Idea of History.
6. John Whitlam : 'Karl Marx' in John Cannon, ed., Historian at Work.
7. E. H. Carr : What is History

8. H. E. Barnes : A History of Historical Writing
9. Arthur Marwick : Nature of History
10. Collingwood : Idea of History.

১.৪.১০.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

1. Critically discuss cyclical view of history.
2. How did Vico formulate his cyclical views on the basis of three ages of mankind.
3. Critically discuss Marx's materialist interpretation of history.
4. How would you explain comparative theory of history.
5. What is the Sociological History?
6. Write a note on the approaches of the Sociological Historians.

একক ১১

Post-Modernist Critiques of History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৪.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৪.১১.১ ঃ উত্তর-আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ

১.৪.১১.১.১ ঃ ফুকো এবং তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন

১.৪.১১.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.৪.১১.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৪.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তর-আধুনিকতাবাদ খুবই আলোচিত, সমালোচিত এবং গুরত্বপূর্ণ। Michael Fucault, Jacques Derrida, Jean Francois Lyotard প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকগণ উত্তর আধুনিকতাবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন গবেষক ও বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্নভাবে উত্তর আধুনিকতাবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক Arran Gare এর সংজ্ঞা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে উত্তর আধুনিকতাবাদ এমন পরিস্থিতি যেখানে আধুনিকতা, অগ্রসরতা এবং জ্ঞানদীপ্তি যুগের যুক্তিবাদ এর প্রতি কোন বিশ্বাস জ্ঞাপন করা হয় না। আরও বলা যায় যে, এটি জনগণকে এই মর্মে সচেতন করে যে, এই পরিস্থিতিই কালক্রমে মানবতাবাদকে ধ্বংসের পথে চালিত করে। এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে সমগ্র আধুনিক সভ্যতা নিজেই নিজেকে একটি জটিল দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে বাধ্য হয়।

সুতরাং এই এককটি পাঠের ফলে শিক্ষার্থী আধুনিক ইতিহাসের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে যা জটিল দার্শনিক চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শিক্ষার্থী এই বিষয়টি সম্পর্কেও অবহিত হবে যে, উত্তর আধুনিকতাবাদ ইতিহাসের প্রচলিত চিন্তাভাবনাকে কিভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছে। মিশেল ফুকোর ন্যায় উত্তর আধুনিকতাবাদীগণ কিভাবে জ্ঞানদীপ্তি যুগের চিরাচরিত ধারনাকে খণ্ডন করে ইতিহাসের ধারাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে, তা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে অবহিত করবে।

১.৪.১১.১ ঃ উত্তর-আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ

জ্ঞানদীপ্তি সামাজিক চিন্তার উপর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনায় একটি মৌলিক অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ৩০০ বছর পূর্বেও Descartes-এর ন্যায় দার্শনিকগণ ঐতিহাসিক ধ্যান ধারনাকে

চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে দেখা দিয়েছে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের কাছ থেকে। সাধারণভাবে তারা এই ধারণা উপস্থিত করেছেন যে ঐতিহাসিক ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। Derrida-র উপর লিখিত একটি প্রবন্ধে David Hoy এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মানব সভ্যতার অগ্রসরের কাহিনী যা ঐতিহাসিক গবেষকদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল তা এখন কার্যত পরিত্যক্ত। এমনকি এটি একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ অস্তিত্বহীন রূপক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। David আরও বলেন যে, দর্শন (Philosophy) যা নিজেই মানুষের কার্যকলাপের বিবরণকে তুলে ধরে তা কার্যত এই অলীক কাহিনীরই একটি অংশ।

সপ্তদশ শতকে 'বিজ্ঞান বিপ্লব' শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটেই সামাজিক অথবা মানবিক বিজ্ঞানের (Human Sciences) আবির্ভাব ঘটে। মানুষের আচরণের সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও অভিন্ন ধারা আছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। একটি সামাজিক বিজ্ঞানকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তৎপরতাও শুরু হয়। এই প্রবণতা চলতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কাল পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত Sartre-এর মত পণ্ডিতেরা ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে আক্রমণ করেন। Claude Levi Struss বলেন যে, ইতিহাসকে অন্য সব কিছুর ন্যায় জানা যাবে কিছু বৈসাদৃশ্যমূলক সাংকেতিক পদ্ধতির দ্বারা (Codes of Contrasts)। সত্য অথবা স্বাধীনতাকে জানার জন্য ইতিহাস কোনও স্বতন্ত্র উপলব্ধির বিকাশ ঘটায় না। আরও একধাপ এগিয়ে অন্যতম উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক Lyotard। ইতিহাস এবং সমাজের সম্পূর্ণতার ধারণাকে পুরোপুরি খণ্ডন করেছেন। তিনি মার্কসবাদের ন্যায় 'বিস্তৃত বর্ণনামূলক' (Grand narratives) পদ্ধতির উদঘাটন করেছেন বিশ্বজগৎকে পারস্পরিক সম্পর্কের ধাঁচে (Patterned interrelationship) বোঝার জন্য। তবে সবতেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ্ যিনি এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, ইতিহাসে মানুষের আচার আচরণকে সাধারণ আইনকানুনের মাধ্যমে বোঝা যাবে না, তিনি হলেন মিশেল ফুকো।

১.৪.১১.১.১ ঃ ফুকো এবং তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন

ফরাসী দার্শনিক Sartre এর পর থেকে মিশেল ফুকো উত্তর আধুনিকতাবাদ বা উত্তর গঠনবাদ (Post - structuralism) সম্পর্কিত ভাবনায় নেতৃত্বে প্রদান করেছেন। ইতিহাস দর্শনের প্রতি ফুকোর বিরোধপূর্ণ চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, (ক) ইতিহাস মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরে না। (খ) মনুষ্য প্রকৃতির উপর যুক্তিবাদের আধিপত্যকেও ইতিহাস নির্দেশ করে না। (গ) হেগেল এবং মার্কসবাদী দর্শনের মত কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ইতিহাসে নেই। এই সমস্ত যুক্তিগুলির অবতারণা করে ফুকো জ্ঞানদীপ্তি যুগের দার্শনিকদের দাবী অগ্রাহ্য করে বলেন যে, মানুষ কখনই একটি সর্বজনীন ধারণা (Universal Category) র মধ্যে থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'Effective history differs from traditional history in being without constants. Nothing in man-not even his body-is sufficiently stable to serve as a basis for this self recognition or for understanding other men,' ফুকোর মতে, ইতিহাস আমাদের আবেগ, অনুভূতি সবকিছুকেই বিভক্ত করে। সর্বোপরি ইতিহাস ধারাবাহিকতাহীন প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায়।

ফুকোর ধারণায় অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের কার্যকলাপের বিস্তৃত ইতিহাস হল মূলত একটি অলীক কল্পনা। এটি বহুল প্রচলিত ধারণা যে, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলিত

উন্নতি অর্জন করেছে। কিন্তু মানুষের অতীতকে ফুকো কখনই শৃঙ্খলিত হিসাবে দেখেন নি, বরং সেটি একটি ঝঞ্ঝাটপূর্ণ সংঘর্ষের দ্বারা (haphazard Conflicts) সংগঠিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের জীবন ধারাবাহিকতাহীন, অসংখ্য এবং বিরামহীন সংঘর্ষের মধ্যে নিয়োজিত।

ফুকোর ন্যায় Post-Structuralist তথা উত্তর আধুনিকতাবাদীগণ ইতিহাসের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করেছেন তার মূলকথা হল বিশুদ্ধ অতীত বলে কিছু হতে পারে না। এবং ঐতিহাসকিরা অতীত সম্পর্কিত যা ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে না। অতীত সম্পর্কিত তথ্যাবলীতে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বের ভূমিকা খুব সামান্যই, বরং এই সমস্ত কার্যাবলীতে প্রধানত ঐতিহাসিকের পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই ফুটে ওঠে। একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বহুমুখী সত্য উদঘাটন করতে পারে। সুতরাং নিরপেক্ষতা একটি অলীক ধারণা।

ফুকো ইতিহাসে সমস্ত রকমের ধারাবাহিকতার তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফুকো বলেন যে ইতিহাসে ধারাবাহিকতার ধারণা চিন্তা এবং সময়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে সচেতন মুহূর্তগুলির সম্পূর্ণতার প্রেক্ষাপটটি গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তা, মানসিকতা এবং কাজকর্মে সমান্তরাল ধারাবাহিকতা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে ইতিহাসে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আসলে সেখানে মতবিরোধ, বিচ্ছিন্নতা এবং ধারাবাহিকতাহীনতাই লুকিয়ে থাকে এবং এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতিই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। কারণ এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাগুলির মধ্যেই ইতিহাস নিক্ষিপ্ত থাকে, কোন স্থায়ী গঠন কাঠামোর মধ্যে নয়।

বস্তুতপক্ষে ফুকো যে ধরনের ইতিহাস লিখেছেন তা চিরাচরিত ইতিহাস নয়। এর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্তসমূহ অতীতকে নুতনভাবে দেখতে শেখায়। সমস্ত ধরনের মানবিক বিজ্ঞানগুলিতে (human sciences) ফুকো ইতিবাচক ধারনাগুলির বিরোধিতা করেছেন। প্রধানত ইতিহাস এবং দর্শনের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্য ফুকো এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা শেষ পর্যন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং জ্ঞানদীপ্তির ভিত্তিগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনার পথ প্রশস্ত করে।

১.৪.১১.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. E. Shreedharan—A Text Book of Historiography
2. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—'উত্তর-আধুনিকতাবাদ এবং কয়েকজন ফরাসী ভাবুক'
3. Will Thompson—'Post modernism and History'.

১.৪.১১.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উত্তর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ কর?

২। উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক হিসাবে ফুকো কিভাবে ইতিহাসের রূপরেখা বিশ্লেষণ করেছেন?

একক ১২

Structure, World-System, Ecological Approaches of History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৪.১২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.৪.১২.১ ঃ গঠনবাদ (Structuralism)

১.৪.১২.২ ঃ ইতিহাসচর্চায় পরিবেশবিদ্যা (Ecological Historigraphy)

১.৪.১২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

১.৪.১২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৪.১২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি থেকে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন ঃ

১) গঠনবাদ বলতে কি বোঝায়?

২) পরিবেশবিদ্যা চর্চার সাথে ইতিহাস চর্চার সম্পর্ক।

১.৪.১২.১ ঃ গঠনবাদ (Structuralism)

ইতিহাসের ধারণা বা মতবাদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল Structuralism । এই মতবাদের জন্ম হয়েছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যেটি এখনো বিস্তৃত হচেছ। এজন্য এ সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখানো আসেনি। 'Structure' সম্বন্ধে ধারণাটি অবশ্য খুবই পুরানো। সপ্তদশ শতকে জীববিদ্যার শব্দকোষে এই শব্দটি পাওয়া যায়। ১৯ শতকে ভাষা সাহিত্য দর্শনের ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। Structuralism এর কাছাকাছি একটি শব্দ হল 'System'। System ও Structure এর মধ্যে একটি অদ্ভূত সম্পর্ক আছে। যেমন System কাজ করে কিন্তু Structure করে না। যেমন Traffic Singnasl System এর মাধ্যমে Traffic নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং Structure in this sense is a more fundamental characteristic of the object it studies." Structure কেবলমাত্র একটি From নয়। Structure হল 'The significative Contact of the System.'

প্রধান প্রধান গঠনবাদীদের মধ্যে গঠনবাদ আন্দোলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই আন্দোলন কি কেবলমাত্র সমাজ বিজ্ঞানের Methodology এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে; না এটি সাহিত্যিক সমালোচনা এবং দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হবে? একটি বিষয়ে সবাই একমত যে কোন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কিছু ধারণার অগ্রগতি বিভিন্ন

ধরনের চিন্তাবিদদের আকৃষ্ট করে। তাঁদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৌদ্ধিক মিল দেখা যায়। বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় Structuralist Trend লক্ষ্য করা যায়। ফার্দিনান্দ সসার ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে Structuralism-এর প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন।

গঠনবাদ আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছে প্রধানত লেভিস্ট্রেসের দুটি বইকে কেন্দ্র করে। বই দুটি হল Tristes Tropiques (1955) এবং La Pensee Sauvage (1962). তিনি মার্কস এবং এঙ্গেলসের কাছ থেকেই Structure সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। গঠনবাদী বিশ্লেষণ কখনো একটি সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে না, বা কোন নির্দিষ্ট সমস্যা থেকে নিশ্চিত সমাধানের খোঁজে বের হয় না। লেভিস্ট্রস মনে করেন ছড়ানো তথ্যগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার।

প্রধানত সাংস্কৃতিক কাব্যে গঠনবাদের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় যেখানে সবকিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে mind বা মন—এর ফসল। জ্যাক দেরিদা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে গঠনবাদী দর্শনকে সাম্প্রতিক পশ্চিমী চিন্তাধারায় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। লুই আলথুজার অন্যভাবে Structuralism method ব্যবহার করেছেন। তবে আলথুজার নিজেকে একজন Structuralist বলে মনে করেন না।

মার্ক ব্লক, লুসিয়ান ফেবার, ফার্দিনান্দ ব্রদেল প্রমুখ 'আনাল' গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা তাঁদের রচনায় ইতিহাস গঠন বাদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, 'Historiography would gain its Structral history' and historical events' are brought together is a genuinely historic explanation of human life." এই সমালোচনার উত্তরে Peter Caws বলেছেন "Fashions change, and the value of the structural perspective will survive these changes."

গঠনবাদীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উঠেছে। প্রথমত, গঠনবাদ হল একটি গোষ্ঠী বা আদর্শ যেখান থেকে Historical Positivist এবং Existentialist দের বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যা কিছু দুর্বোধ্য তাকেই Structuralist বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আপত্তিকর।

Structuralism এর কাছাকাছি একটি কাজ হল 'System' ও 'Structure' এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সম্পর্কে রয়েছে। যেমন System কাজ করে কিন্তু Structure করেনা। যেমন Trafic Signal System এর মাধ্যমে Trafic নিয়ন্ত্রণ করে। সুতারাং Structure শুধু লাল ও সবুজ আলোর সঙ্কেত দেয়।

প্রশ্ন

১। গঠনবাদ বলতে কি বোঝ?

২। গঠনবাদ সম্পর্কে লেভিস্ট্রস-এর বক্তব্য আলোচনা করো।

১.৪.১২.২ ঃ ইতিহাসচর্চায় পরিবেশবিদ্যা (Ecological Historigraphy)

বর্তমান বিশ্বের এক কঠিন সমস্যা হল পরিবেশগত সমস্যা। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক হারে ভূমির অবক্ষয়, অরণ্য, সংহার, মিষ্টি জলের ঘাটতি এবং জল ও বায়ুদূষণ প্রকৃতির ভারসাম্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত করেছে। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পৃথিবী থেকে লোপ পেতে চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের

যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বের শিল্পায়ন একদিকে যেমন নিয়ে এসেছে বিপুল বৈষয়িক প্রাচুর্য; তেমনি অন্যদিকে করেছে ব্যাপক পরিবেশগত অবক্ষয়। প্রযুক্তির হাত ধরে এসেছে তেজস্ক্রিয়দূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, জলদূষণ ইত্যাদি। ফলশ্রুতি হিসাবে নষ্ট হয়েছে পরিবেশগত ভারসাম্য। দেখা দিয়েছে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট। পরিবেশের এই সমস্যার বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারেন না। পরিবেশের এই সংকটের কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান, বিচার ও বিশ্লেষণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। এর ফলে এক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চার উদ্ভব হয়েছে। যার নাম হল Environmental historiography বা পরিবেশগত ইতিহাস চর্চা। কারণ, আধুনিক পরিবেশবাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা দেবার ক্ষেত্রে ইতিহাসের একটি বড় ভূমিকা আছে। সাম্প্রতিক পরিবেশ সংক্রান্ত বির্তকে ইতিহাস অবশ্যই নতুন দিক নির্দেশ করার দাবী রাখে।

পরিবেশগত ইতিহাসচর্চাকে তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (a) biocentric (b) ecological (c) economic (d) ethical. Biocentric তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, প্রাকৃতিক জীবজন্তুকে রক্ষা করা। প্রাচীন কালে বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষ ভয়ে প্রকৃতি, গাছপালা ও জীবজন্তুকে শ্রদ্ধা করত ও তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করত। পরিবেশ চর্চার ecological দিক বলতে বোঝায় 'something like a stable system, a certain mix of species of plants and animals with natural conditions like climate or soil structure remain in or near a state of equilibrium.' পরিবেশগত ইতিহাস চর্চার অর্থনৈতিক দিক হল প্রকৃতিকে ব্যবহার ও শোষণ করে অর্থনৈতিক উন্নতি করার প্রচেষ্টা। পরিবেশ চর্চার ethical দিক বলতে বোঝায় 'right of nature' বা ‘প্রকৃতির অধিকার’ এর ধারণাকে বলবৎ ও প্রতিষ্ঠিত করা। এর উদ্দেশ্য হল প্রধানত গাছপালা, জীবজন্তু ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা।

ইতিহাস ও Ecology ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক সংগঠনের পরিবেশগত প্রভাব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়তে বাধ্য। প্রাচীন যুগে মানুষের খাবার সংগ্রহ, পশুচারণ, স্থায়ী কৃষিকাজ এবং আধুনিক যুগে শিল্পায়ন নিঃসন্দেহে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করেছে। প্রাচীন যুগের প্রথম তিনটি কাজের ফলে প্রকৃতি ততটা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ আধুনিক যুগে শিল্পায়ন ও প্রকৃতিকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রাতিরিক্ত প্রচেষ্টা পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রাক-আধুনিক ইউরোপে এবং বিশেষ করে উত্তর-রেনেসাঁস যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। Keith thomas এর Man and the Naturl World গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে Simon Schame তাঁর বিখ্যাত বই Landscape and Memory গ্রন্থে সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি উপাদান ব্যহার করে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট করেছিল। আদিম অরণ্য, নদী-জীবন, পবিত্র পর্বতের ধারণা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে। তবে পরিবেশ ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে বড় দিক হল পরিবেশ আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি হল পরিবেশ রক্ষার আর্দশগত ও নৈতিক দিক। Donald Worster মনে করেন 'Environmental history was born out of a moral purpose'. কারণ অনেকেই মনে করেন যে 'Environmental ethics হল পরিবেশ আন্দোলনের উজ্জীবনী শক্তি।

এখন প্রশ্ন হল, পরিবেশ ঐতিহাসিকরা আধুনিক পরিবেশবাদ বা পরিবেশ চেতনার সূচনাকাল কখন থেকে ঠিক করেছেন? অধ্যাপক রিচার্ড গ্রোভ তাঁর 'Green Imperialism'(1995) ও 'Ecology, climate and Empire'

(1998) গ্রন্থ দুটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আধুনিক পরিবেশবাদ এর শুরু হয়েছিল। আমেরিকায় পরিবেশগত পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। গ্রোভ পরিবেশবাদকে আরও তিনশত বছর পিছনে নিয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি পরিবেশ চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। উপনিবেশ বিস্তারকারী ইউরোপীয়রা 'Tropical Forest' এবং 'Botanical Garden' গুলিকে সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়। ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে Fernandery Oveido আবহাওয়ার পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, গাছপালা সম্পর্কে তাঁর বইতে আলোচনা করেন। প্রধানত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রভাবেই উপনিবেশ বিস্তারকারীরা এই ধরনের পরিবেশচিন্তায় সচেষ্ট হয়। রিচার্ড গ্রোভ পরিবেশের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে চাননি। তিনি পরিবেশ চেতনাকে সংস্কৃতি, ধর্ম, ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখাতে চেয়েছেন। পর্তুগীজ ও ডাচদের মধ্যেও পরিবেশ চেতনা বা প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ চিকিৎসক Garcia da orta এ সম্পর্কে একটি বই লেখেন। বইটিতে প্রাচ্য ও ভারতের বিভিন্ন ঔষধি গাছপালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব গাছপালা থেকে সংগৃহীত ঔষধ ইউরোপে যেত। বইটিতে স্থানীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৬৭৮-১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ১২টি খণ্ডে প্রকাশিত Dutch Botanical Encyclopaedia সংকলন করেন Van Reede। তিনি স্থানীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবেশবাদ বা বিশ্ব পরিবেশবাদ (Global environmentalism) ধারণার সৃষ্টি হয়। রিচার্ড গ্রো মনে করেন, আধুনিক পরিবেশবাদ আলোচনায় স্থানীয়র পরিবর্তে বিশ্বকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। পরিবেশ চিন্তার ক্ষেত্রে Forster, Robert Kyd এবং Alexander Von Humbolt এর নাম উল্লেখ করা যায়। Robert Kyd ১৭৮৬ সালে কলকাতায় Botanical Garden প্রতিষ্টা করেন। Humbolt অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। Roxbarg বৃক্ষ রোপণের উপর গুরত্ব দেন। Nathaniel Wallich বাংলায় বাঁশ গাছ কাটার বিরুধে মত প্রকাশ করেন। Sleeman উত্তর ভারতের অরণ্য সংরক্ষণের পক্ষে মতামত দেন। এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রিচার্ড গ্রোভ মনে করেন, ''Modern environmentalism is the child of European and colonical experience as well as knowledge.'' তবে গ্রোভের আলোচনার প্রধান ত্রুটি হল তিনি পরিবেশ সচেতনতার উপর বেশী জোর দিয়েছেন, পরিবেশ ধ্বংসের উপর জোর দেননি। সাম্প্রতিককালে ভারতের পরিবেশ ইতিহাস সম্পর্কে বিখ্যাত বইটি হল রামচন্দ্র গুহ ও ডেভিড আর্নল্ড সম্পাদিত Nature, culture and imperialism গ্রন্থটি। বইটিতে অধ্যাপক নীলাদ্রি ভট্টাচার্য ও সাতলুরি মুরালি তাঁদের প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন সংস্কৃতি ও ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ পরিবর্তনকে বুঝতে হবে। মুরালি দেখিয়েছেন কিভাবে সাহিত্যের মধ্যে পরিবেশ পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের চেতনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আদর্শগত বিভিন্নতার কথা বলা দরকার। বিভিন্ন গোষ্ঠী এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে আছেন গান্ধীবাদী, মার্কসবাদী ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা। গান্ধীবাদী আদর্শে পরিবেশ আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হল সুন্দর লাল বহুগুণা। এঁরা পরিবেশ সংরক্ষণের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। মার্ক্সবাদী পরিবেশবিদরা প্রধানত ব্যবসায়িক বনসৃজন, অনিয়ন্ত্রিত খনি স্থাপন, ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। প্রযুক্তিবিদরা অবশ্য চেষ্টা করেছেন কিভাবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তবে সবশেষে বলা যায়, যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে তবুও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার কথা, উপেক্ষা করা যায় না।

১.৪.১২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Keith Jenkins (ed) : The Postmodern History Reader.
2. Steven Best and Douglas Kellner : Post modern Theory : Critical Interrogations
3. Brain Fay, Phiip Pomper and Richard T.Vann(eds) : History and Theory ; Contemporary Readings.
4. Butterfield : Dictionary of the History of Ideas.
5. Collingwood : Idea of History.
6. John Whitlam : 'Karl Marx' in John Cannon, ed, Historian at Work.
7. Michel Lane (ed) ; Structuralism : A Reader.
8. Derk Attridge (ed) : Post- Structuralism and the Question of History.
9. Richard Macksey and Eugenio Donato (ed) : The Structuralist Controversy : The Languages of Criticism and the Sciences of Man.
10. Richard Grove : Green Imperialism, Colonial Expansion, tropical island Eens and The Origins of Environmentalism 1600-1800.
11. Alfred W. Crosby : Ecological Imperialism and the biological of Europe.
12. David Arnold and Ramchandra Guha (ed) : Nature, culture, Imperialism.
13. Gadgil and Guha (ed) : Ecology and Equityy, the Use and abuse of nature in contemporary India.

১.৪.১২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. How would you define Structuralism?
2. Analyse the main features of Ecological historiography.
3. Make an assessment of the contribution of Richard Grove to the development of ecological historiography.

প্রশ্ন

১। পরিবেশগত ইতিহাসচর্চার তত্ত্বগত বিভাজনগুলি কি কি?

২। পরিবেশ ইতিহাস চর্চায় রিচার্ড গ্রোভের অবদান আলোচনা করো।

৩। পরিবেশ চেতনার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করো।

৪। পরিবেশ ইতিহাস চর্চার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ—৫

একক-১৩

Economic, Labour and Peasant, Varna, Jati, Janajati and Gender

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৫.১৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

১.৫.১৩.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস (Economic History)

১.৫.১৩.২ ঃ কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস (History of the peasants and workers)

১.৫.১৩.৩ ঃ সূচনা—শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা

১.৫.১৩.৪ ঃ শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা (Trend of Labour Histroiography)

১.৫.১৩.৫ ঃ উপসংহার (Conclusion)

১.৫.১৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Redings)

১.৫.১৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৫.১৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসের সূচনাপর্ব

(২) ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে ভারতীয় ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্য ও তাদের মধ্যে বিতর্ক

(৩) ভারতীয় অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং ব্রিটিশ শাসনে সম্পদের নির্গমণ

(৪) কৃষকদের নিয়ে ঐতিহাসিকদের ইতহিাসচর্চার সূচনাপর্ব এবং স্বাধীনতা -সংগ্রামে কৃষকদের ভূমিকা

(৫) শিল্প ও শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা ও প্রসার —স্বাধীনতার পূর্বে ও উত্তরপর্বে।

(৬) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান নিয়ে ইতিহাসচর্চা

(৭) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত

(৮) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা

(৯) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার মূল্যায়ন

১.৫.১৩.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস (Economic History)

আঠারো শতকে শিক্ষার একটি বিষয় হিসাবে অর্থবিদ্যার (Economics) আবির্ভাব ইতিহাসেরও একটি নতুন শাখার উদ্বোধন ঘটায়। সেটি হল অর্থনৈতিক ইতিহাস। অর্থবিদ্যার জগতের আদিপুরুষরা হলেন এ্যাজাম স্মিথ ও অন্যান্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা। শিল্পবিপ্লবের সময়ে ইংলণ্ডের একদল চিন্তাবিদ ও ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের কাছে ভারতও একটি আগ্রহের বিষয় ছিল। তাঁরা 'লেসে ফেয়ার' (অবাধ বাণিজ্য) নীতির প্রবক্তা ছিলেন এবং দেশের অর্থনীতিতে যতটা কম সম্ভব রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ-এর পক্ষপাতী ছিলেন। অগ্রগণ্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ভারতের শাসক হিসাবে ইসচ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন ভূমিকার নিন্দা করেন। তিনি কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমালোচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জে. এম. কেইনসের প্রভাবে অর্থবিদ্যার জগতে তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি জনকল্যাণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের কৌশলগত হস্তক্ষেপের কথা বলেন। কেইনস্ ভারতের কথাও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। এর প্রমাণ হল তাঁর 'Indian Currency and Finance' গ্রন্থখানি। সর্বোপরি, ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন দুটির মাধ্যমে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ্যাডাম্ স্মিথের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই ধারণার প্রকাশ ঘটেছিল কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে। যেমন Eric Stokes এর 'The English Utilitarians and India' : S Ambirajan এর 'Classical Political Economy and British Policy in India'. এবং A Chandravarkar-এর ''Keynes and India : a study in Economics and Biography''. বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থবিদ্যায় অগ্রগতির বীজ কেনসীর অর্থনীতি বপন করেছিল। অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই দুই ধরনের অর্থনৈতিক নীতি ভারতীয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

প্রথম দিকের ঔপনিবেশিক লেখকরা স্বাচ্ছন্দের সঙ্গেই দেশীয় অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁরা ভারত থেকে ইংলণ্ডে সম্পদ নির্গমনেরও নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা *The Seir Mutaqherin* (1789) এর লেখক সৈয়দ গোলাম হুসেন খান্ এর বক্তব্যকেও অস্বীকার করেন নি। গোলাম হুসেন বলেছিলেন, এদেশে ইংরেজদের যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল 'scraping together as much money as they can and carrying in immense sums to the kingdom of England'.এছাড়া 'Historical Review of the Extemal Commerce of Calcutta from 1750 until 1830' শীর্ষক সরকারী রিপোর্টে এদেশে সম্পদ লুণ্ঠনের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছেল।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যখন সমালোচনায় ভারতীয় মতামত প্রকাশ পেতে থাকে, তখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন দেখানো চেষ্টা করে যে ভারতে কী রকম অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। মাদ্রাজ প্রশাসনের তরফ থেকে প্রকাশিত *'Memorandum on the progress of Madras Presidency during the last forty years of the British Administration'* গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় শতকে একদিকে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক (apologist) ও অন্যদিকে সমালোচক (critic) দের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। ভারতীয় জাতীয়বাদীরা, ভারতের পক্ষে সহানুভূতিশীল ইংরেজরা এবং মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারত থেকে সম্পদের নির্গমণ এবং ভারতকে দরিদ্র করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর দোষারোপ করেন। অন্যদিকে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ঔপনিবেশিক অফিসাররা দেখানো চেষ্টা করে যে ভারতকে কোনভাবেই সম্পদশূন্য করা হয়নি এবং তাঁরা দুপক্ষেরই জাতীয় আয়ের হিসাব দাখিল করেন। ভারতীয়দের পক্ষে এইসময়কার দুটি বিখ্যাত বই হল —দাদাভাই নওরোজীর লেখা *'Poverty and Un- British Rule in India :* এবং উইলিয়াম জিগ্‌বি-র লেখা *"Prosperous" Brotish India : a Revelation from the Official Records.* অন্যদিকে বৃটিশ পক্ষের বিখ্যাত প্রবন্ধ হল F.T. Atkinson-এর লেখা *'A Statistical Review of the Income ans Wealth of British India :* লেখাটি Journal of the Royal Statistical Society তে প্রকাশিত হয়েছিল। Atkinson ছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জনের অধীনে একজন অফিসার। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ধীরে হলেও ভারতে জাতীয় আয় কীভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্যদিকে দাদাভাই নওরোজী বিপরীত বক্তব্য রাখেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন ভারত থেকে সম্পদ নির্গমণের পরিমাণ ১৮০০ সালে যেখানে ছিল ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড সেখানে তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে হয়ে দাঁড়া. ৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

আঠারো শতকে শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে অর্থনৈতিক ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবাধ বাণিজ্য নীতি নিয়ে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক ও অন্যদিকে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা, ভারতের পক্ষে সহানুভূতিশীল ইংরেজরা এবং মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারত থেকে সম্পদের নির্গমণ এবং ভারতকে দরিদ্র করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দোষারোপ করেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক অফিসাররা দেখান যে ভারতে কোনভাবেই সম্পদশূন্য করা হয়নি।

ব্রিটিশ ও ভারতীয় পক্ষের লেখকদের এই বির্তকের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রমেশ চন্দ্র দত্তর লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বই দুটি হল— *'The Economic History of India under Early British Rule (1757-1837)'* এবং *'The Economic History of India under the Victorian Age'.* তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক কুফলের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি যে বিষয়গুলির উপর জোর দেন সেগুলি হল—চাষীদের উপর অত্যধিক জমির যোজনা, কুটির শিল্পের ধ্বংস, বারংবার দুর্ভিক্ষ এবং ভারত থেকে বাৎসরিক সম্পদ নির্গমণ। তিনি লিখেছেন, 'The British had given India peace, but nit properity'. তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসন দত্ত-র এই জাতীয়তাবাদী বক্তব্য মেনে নেয়নি।

তাঁর ব্রিটিশ ধ্বংসাত্মক অর্থনীতির সমালোচনা পরবর্তীকালে R.P. Dutt প্রমুখ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করেন। ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য R.P Dutta ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা করে India Today গ্রন্থটি রচনা করেন। বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশ হয়েছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতে এই বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তিনি ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সাম্রজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

ভারতীয় অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ও ব্রিটিশ শাসনে ভারতেতর সম্পদশূন্যতদা সম্পর্কে এই বিতর্ক শিক্ষিত মহলে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল। সেটি হল—ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? তখন কী ভারত অনেক বেশী সম্পদশালী ছিল? জাতীয় আয় কী তখন বেশী ছিল? ঔপনিবেশিক

শাসনের প্রথম দিকে দেশীয় অর্থনীতির গঠন সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব দক্ষিণ ভারত স্পকর্কে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যমিল্টনের বই উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃষি, শিল্প ও আভ্যন্তিরীণ বাণিজ্যের উপর বিস্তারিত অনুসন্ধান করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বই দুটি হল—A Journey from Madras through the Countriesof Mysore, Canara and Malabar এবং An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-1812 পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন।

প্রকাশিত হয় Edward Thomas এর *'The Revenue Resources of the Mughal Empire in India'* এবং যদুনাথ সরকারের *'India of Aurangzed : Topography, Statistics and Roads'*-প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের ভারতের সাধারণ অর্থনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন W,H..Moreland তাঁর বইগুলি হল ঃ *India at the Death of Akbar, From Akbar to Aurangzeb* এবং *Agrarian System of Moslem India.*মোরল্যাণ্ড হিসাব করে দেখিয়েছেন যে টোডরমলের সার্ভে অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয় বিংশ শতাব্দীর শুরুর তুলনায় আকবরের আমলে বেশি ছিল না। মোরল্যাণ্ডের সিদ্ধান্ত হল 'a parasitic agrarian despotism had driven India to an economic dead end, despite the considerable, expansion of foreign trade that the Dutch and English East India Companies brought about in the seventeenth century". তিনি আরও বলেছেন যে মুঘল যুগে বিদেশী বণিকরা যথেষ্ট রুপো এনেছিলেন এবং বস্ত্র রপ্তানিকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় K.N.Chaudhuri র লেখা *'The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760'* গ্রন্থে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মুঘল যুগের ধনতন্ত্র সম্পর্কে যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখেন তা হল ঃ *'The Potentialities of Capitalist Devolopment in the Economy of Mughal India'.* অধ্যাপক রজত কান্ত রায় মন্তব্য করেছেন, "Habib demonstrated the sophistication of the Mughal urban economy, but like Moreland he emphasized its parasitic relationship with the heavily taxed rural economy".

ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনীতি সম্পর্কে R.C. Dutt এর পর অনেক বই প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল ঃ D.R. Gadgil এর *The Industrial Evolution of India in Recent Times;* Vera Anstey র *The Economic Development of India* এবং D.H. Buchanan এর *Development of Capitalist Enterprise in India.* সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত *The Cambridge Economic History of India Vol.1 1200-1750* এবং ধর্মা কুমার সম্পাদিত *The Cambridge Economic History of India vol. 2 1757-1970.* বই দুটি খুবই উল্লেখযোগ্য। Daniel Houston Buchanan নামে একজন আমেরিকান লেখকের মতে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কেটি প্রধান বাধা হল জাতিভেদ প্রথা। অন্য দিকে অধ্যাপক গ্যাডগিল এরজন্য অর্থনৈতিক কারণের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—'The difficulties of capitilist mobilisation on accouny of the absolute smallness of capital resources in respect to the size of the population, the late development of organized banking, and the seasonal fluctuations of a monsoon economy". একজন নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি ভারতে শিল্পবিন্যাসের অনুপস্থিতির জন্য ভারতীয় সামাজিক কাঠামো বা বিদেশী শাসনের উপর দোষারোপ করেননি। পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা এরজন্য ভারতীয় অর্থনীতির 'technological backwardness' কে দায়ী করেছেন।

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতি হিসাবে এক বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক সরকারী পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা ওই সব পরিসংখ্যানের সাহায্যে জাতীয় আয়, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন প্রভৃতির সুদূরপ্রসারী গতিধারা বিশ্লেষণ করেছেন। এই ধরনের গবেষণা সংক্রান্ত দুটি বই-এর কথা উল্লেখ করা যায়। একটির লেখক George Blyn. এর বই এর নাম হল *'Agricultural Trends in India 1891-1947 ; Output, Availability and Productivity'*. অন্যটির লেখক S. Sivasubramonian এর বইটির নাম হল—*The National Income of India in the Twentieth Century. Byln* ১৯২০ সালের পর ভারতের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল গতির সন্ধান পেয়েছেন। প্রধানতঃ বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত Greater Bengal' এরপ ক্ষেত্রে এটি প্রযুক্ত ছিল। উপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে জনপ্রতি খাদ্যের পরিমাণ কমতে থাকে। S. Sivasubramonian দেখিয়েছেন যে ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় অত্যন্ত ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ হল কৃষিক্ষেত্রের অনগ্রসরতা। অন্যদিকে শিল্পে উন্নতি ঘটে। তাঁর মতে এই পর্বে কোন 'de-industrialisation' ঘটেনি।

উনিশ শতকের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিসংখ্যানের যথেষ্ট অভাব আছে। সেজন্য এই শতকে অবশিল্পায়ন নিয়ে বিতর্কও আছে। যেহেতু এই শতকে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প উৎপাদন হয়নি, সেজন্য এই শতকে প্রকৃতই কুটির শিল্প ধ্বংস হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ১৯৬০ এর দশকে এ সম্পর্কে বিখ্যাত বির্তকের সৃষ্টি করেছেন মরিস ডেভিড মরিস। অর্থশিল্পায়নের পক্ষে ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতের তাঁতীরা ব্রিটেন থেকে আনা কম দামী সুতোর দ্বারা লাভবান হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু কোন পক্ষই যথেষ্ট পরিসংখ্যান উপস্থাপিত করতে পারেননি সেজন্য এই বিতর্কটি 'আলোর পরিবর্তে যথেষ্ট তাপ' উৎপন্ন করেছে মাত্র। অন্যদিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচীর একটি প্রবন্ধকে নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। প্রবন্ধটির শিরোনাম হল 'Deindustrialisation in Gangetic Bihar 1809-1901' বুকানন হ্যামিলটনের লেখা থেকে তিনি যথেষ্ট পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন উনিশ শতকে কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা দারুণভাবে কমে যায়। অধ্যাপক বাগচীর বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন Marika Vieziany. তিনি বাগচীর বুকানন হ্যামিলটন থেকে নেওয়া পরিসংখ্যানগত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। Marika-এর বক্তব্য প্রকাশিত হয় The Indian Economic and Social History Review পত্রিকায়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম হল ঃ 'The Deindustrialisation of India in Nineteenth Century : A Methodlogical Critique of Amiya Kumar Bagchi'. এইপ্রবন্ধটির সঙ্গে অধ্যাপক বাগচীর 'A Reply' টিও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে একই পত্রিকায় J . Krishnamurty অধ্যাপক বাগচীর সমর্থন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। শিরোনাম হল ঃ 'De-industrialisation in Gangetic Bihar during the nineteenth century : Another Look at the Evidence'. কিন্তু সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় তাঁর Traditional Industry in the Economy of Colonial India' (১৯৯৯) গ্রন্থে অধ্যাপক বাগচীর মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে উনিশ

উনিশ শতকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা অন্যতম বিষয় ছিল অবশিল্পায়ন বিতর্ক। এই বিতর্কের ক্ষেত্রেও আমরা দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। একটা শ্রেণী দেখতে চেয়েছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফলে ভা রতীয় শিল্পেকতটা সমস্যা ঘটেছিল অন্যদিকে আর একটি শ্রেণী বলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের ফলে শিল্পে ক্ষতি হয়নি এবং উন্নতি ঘটেছিল।

শতকে অবক্ষয় ঘটেনি। আঠারো শতক সম্পর্কে বাংলাদেশী গবেষক হামিদা হোসেনের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন এই শতকে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি কাপড়ের রপ্তানির ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার ফলে তাঁতীদের উপর অবর্ণনীয় নিষ্পেষণ চলে। তাঁর বই এর নাম হল ঃ *The Company Weavers of Bengal : The East India Company and the Organisation of Textile production in Bengal 1750-1813.*

উনিশ শতকের প্রথম দিকের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বইটি লিখেছেন অধ্যাপক ব্লেয়ার ক্লিং (Blair B. Kling) বইটির নাম হল ঃ *Partnership in Empire: Dwarknath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India.* আসিয়া সিদ্দিকের লেখা *'The Business World of Jamestjee Jeyeebhoy'* প্রবন্ধটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বন্দর নগরগুলিতে ব্যক্তিগত ইউরোপীয় ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্পর্কে লিখেছেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833* গ্রন্থে। পরবর্তীকালের managing agency house গুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন রাধেশ্যাম রুংতা, তাঁর *The Rise of Business Corporations in India 1851-1900.*গ্রন্থে। কিন্তু ঔপনিবেশিক নগরগুলিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও জামসেদজী জিজিভয় তার পদ্ধতি অনুসৃত ভারতীয় ব্যবসা পিছিয়ে পড়তে থাকে যখন ইউরোপীয় পুঁজি ধীরে ধীরে একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিস্তার করে। কিন্তু C.A.Bayly কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর বিখ্যাত *Rulers, Townsmen and Bazaars : North Indian Society in the Age of British Expansion 1770-1870.* গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সমঝোতা করে আভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতে ভালই ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিল।

ভারতীয় অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে K.N.Chaudhuri and C.J.Dewey সম্পাদিত *Economy and Society* গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে C.J. Dewey and A.G. Hopkins সম্পাদিত *The Imperial Impact : studies in the Economic History of India and Africa* গ্রন্থে। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিতে বাজার, শিল্পনীতি ও কৃষিসমাজ সম্পর্কে অনেক নতুন সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়েছে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ হল অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এর তিন খণ্ডে লেখা *The Economic History of Bengal* এবং C.J Baker এর লেখা *An Indian Rural Economy : The Tamil Nadu countryside 1880-1950.*

ডঃ রজত রায় মনে করেন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশী ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছিল 'railways and canals'-এ। কিন্তু তাঁর মত হল এই বিনিয়োগের ফলে উনিশ শতকে জার্মানী, রাশিয়া ও জাপানের মত ভারতে শিল্পের অগ্রগতি ঘটেনি তাছাড়া এর ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং গ্রামাঞ্চলে দুর্বিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন Daniel Thorner, তাঁর *Investment in Empire* গ্রন্থে এবং 'Great British and the Economic Development of India's Railways' নামক প্রবন্ধে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা করেছেন Elizabeth Whitecomb এবং অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। Whitecomb এর বই এর নাম হল ঃ *Agrarian conditions in Northern Indi: the United Provinces under BritishRule 1660-1900.* নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর *Poverty and Faminers : an Essay on Entilement and Deprivation* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে "famines could because of adverse movements in prices and wages even when the food stocks were available."

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছু শিল্পায়ন ঘটলেও কোন শিল্পবিপ্লব ঘটেনি। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ এর আগে বৃহদায়তন শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও ভারতীয় অর্থনীতিতে বিরাট কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। কোনও 'take off' কেন হল না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী তাঁর *Private Investment in India 1900-1939* গ্রন্থে এবং অধ্যাপক রজত কান্ত রায় তাঁর *Industrialisation in India : Growth and Conflict in the Private Corporate Sector. 1914-1947* গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক নীতিই এজন্য দায়ী ছিল। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক মরিস ডি মরিস যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কারিগরী অনগ্রসরতা বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক B.R. Tomlinson মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকারী নীতির জন্য ভারতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। ডঃ রজত কান্ত রায় মন্তব্য করেছেন, "By then, there was a large Indian capitalist class locked in a struggle with European capital in India". এই অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও অস্থিরতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন Claude Markovitz. তাঁর *Indian Business and Nationalist Politics 1931-1939* গ্রন্থে।

বলা যেতে পারে যখন থেকে দাদাভাই নওরোজী, আর, সি. দত্ত. উইলিয়াম ডিগ্‌বী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা সরকারের অর্থনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করে লিখতে শুরু করেন, তখন থেকেই সম্ভবত প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। D.R. Gadgil, Vera Anstey এবং D.H.Buchanan এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন। যদুনাথ সরকার ও মোরল্যাণ্ড মুঘল অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

প্রশ্ন

১। তুমি কি মনে কর ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল?

২। অবশিল্পায়ন বিতর্ক কি?

১.৫.১৩.২ ঃ কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস (History of the Peasants and Workers)

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিকদের ভূমিকা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। বিশেষ করে কৃষক-জমিদার সম্পর্ক এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্ক। এর আগের ইতিহাস চর্চায় শিল্প সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। কিন্তু 'র‍্যাডিকাল' গতিধারা অন্যরকম। ডঃ রজত রায় লিখেছেন, 'The aim of radical historiography, however, was to treat the peasants and workers as historical subjects in their own right". বোঝা গেল যে, কৃষক ও শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে হলে তাদের সঙ্গে উচ্চতর শ্রেণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। এই উপলব্ধির পর নতুন শ্রমিক ঐতিহাসিকরা শ্রমিক ও পুঁজি এই দুই বিষয়বস্তুকে নিয়ে একই আলোচনার উপর গুরুত্ব দিতে

থাকেন। একইভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, ইতিহাস রচনা করতে হলে সামগ্রিকভাবে কৃষিসমাজের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই তা করতে হবে। কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে বামপন্থী ইতিহাসচর্চা প্রধানতঃ স্বাধীনতা লাভের পরে শুরু হয়েছে। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে দুজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম করা যেতে পারে। একজন হলেন ডঃ এ. আর. দেশাই। আর অন্যজন ডঃ সুনীলকুমার সেন। ডঃ দেশাই এর বইটির নাম হল *Peasant Struggeles in India* (১৯৭৯)। ডঃ সেনের বই দুখানির নাম হল ঃ *Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47* এবং *Working Class Movements in India 1885-1975.* আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় রচিত সুকোমল সেনের *Working Class of India : History of Emergence and Movement 1830-1970.*

তবে এটা ভাবলে ভুল করা হবে যে কৃষক ও শ্রমিকদের বিষয়টি একেবারেই নতুন ভাবনা। এটাও ঠিক নয় যে,সমাজতন্ত্রের উত্থানের আগে এই বিষয় দুটি নিয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। অনেক আগেই ১৮৭৪ সালে গরীবদের অবস্থা সম্পর্কে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র ইংরাজীতে লেখা দুখণ্ডের উপন্যাস *Govinda Samanta* প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির নতুন নাম হল *Bengal Peasant Life.* বইটিতে উনিশ শতকে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া ১৮৭৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক শশীপদ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকা '**ভারত শ্রমজীবী**'-র কথা অবশ্যই উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাতেও শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

ইচ্ছা করলে আঠারো শতকেও ফিরে যাওয়া যায়। সে সময় ইংরাজী ও পার্সী ভাষায় কৃষি ও কৃষকদের সম্পর্কে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রবীণ কর্মচারী এইচ.টি. কোলব্রুক লিখেছিলেন, *Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of Bengal in 1794.* বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৪ সালে। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকরা একটি পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপির খোঁজ পেয়েছেন। বইটির লেখক শেষ মুঘল পর্বের একজন বাঙালী। বইটির নাম Risala-i Zirat (Treaties on Agriculture) । বইটি লেখা হয়েছিল ১৭৮৫ সালে। বইটিতে চাষীদের চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ভূমি রাজস্বের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশাসন চাষীদের সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিল এবং তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না কারণ তারা কোন জমির খাজনা দিত না।

B.H. Baden Powell তাঁর *Manual of Land Revenue system and Land Tenures of India* (১৮৮২) বইতে চাষী ও জমিদারদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। বইটির পরবর্তী কালে *Land Systems of British India* নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। W.H. Moreland নামে আর একজন ব্রিটিশ অফিসার দুখানি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। বই দুটির নাম হল ঃ *Notes on the Agricultural Conditions and problems of the United Provinces, Revised upto 1911* এবং *Agrarian System of Moslem India.*

ব্যাডেন পাওয়েল এবং মোরল্যাণ্ডের রচনা থেকে বোঝা যায় যে শুধু ঔপনিবেশিক পর্বেই নয়, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগেও রাষ্ট্র ও জমিদার কৃষকদের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করত। চাষীদের ঋণগ্রস্ততা সম্পর্কে Malcom Darling এর লেখা *The Punjab peasant in Prosperity and Debt* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক

প্রশাসনও সরকারী উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও বই প্রকাশ করেছেন। William Honey-এর লেখা *A Monograph on Trade and Manufactures in Northern India* গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বৃহদায়তন-শিল্পের উত্থানের ফলে দুটি নতুন 'সামাজিক শক্তি' আত্মপ্রকাশ করে—শ্রমিক এবং পুঁজি। ঔনিবেশিক যুগে এ সম্পর্কে বিখ্যাত বইগুলি হল ঃ S.M. Rutnagar এর লেখা *Bombay Industries : The Cotton Mills* এবং D.H. Buchanan-এর লেখা *The Development of Capitalist in India.* এটা বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে কৃষকদের পাশাপাশি শ্রমিকরা ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল।

বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ও ঐতিহাসিকরা কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস চর্চায় নতুন 'কাঠামো' উপস্থাপিত করেন। তাঁরা শ্রমজীবী শ্রেণীকে শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং ভারতীয় সমাজে তাদের প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি বলে মনে করেন। যেহেতু ভারতের এক বিপুল জনসংখ্যা কৃষির উপর নির্ভরশীল,সেজন্য বামপন্থী ঐতিহাসিকরা কৃষক সমাজের উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। ঔপনিবেশিক যুগে কৃষি সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁরা নতুন 'কাঠামো' তৈরি করেন। স্বাধীনতা লাভের পরই ১৯৫২ সালে প্রকাশিত S.J. Patel-এর লেখা *Agricultural Workers in Modern India and Pakistan* গ্রন্থটিকে এই 'কাঠামো' রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে গণ্য করা যায়। এ সম্পর্কিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হল ঃ রামকৃষ্ণ মুখার্জির The Dynamics of a Rural Society (১৯৫৭)। এঁদের বক্তব্য অনুযায়ী উপনিবেশিক যুগে কৃষিসমাজে কতগুলি বাজারের সৃষ্টি, চাষীদের ঋণগস্ততা, চাষীদের অবলুপ্তি, ভূমিহীন কৃষকদের উদ্ভব এবং স্বনির্ভর চাষীদের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভাঙন ইত্যাদি।

পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা যায় এই সব ধারণার অনেকগুলিই তথ্যসম্মত নয়। সংশোধন শুরু হয় ধর্ম কুমারের *Land and Caste in South India. Agricultural Labour in Madras Presidency during the Nineteeth Century (1965)* গ্রন্থটির মাধ্যমে। প্রচুর তথ্য উপস্থাপিত করে তিনি দেখালেন যে "Pre-colonial and early colonial already Possessed a vast agraian under-class of bonded labourers who traditionally belonged to the untouchable castes." রজত ও রত্না রায় দেখিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে একদল ধনী চাষী তাদের জমি চাষ করাতো ভাগচাষী ও 'bonded labourer' দের মাধ্যমে।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ধনী ও গরীব চাষীর মধ্যে বিভাজনের তত্ত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। Eric Stokes বললেন, "there was no agrarian polarisation," এই জটিল প্রশ্নটিকে ঘিরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। নীল চার্লসওয়ার্থ দেখালেন যে ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষির বাণিজ্যকরণের ফলে অনেক চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে ডঃ সুগত বসুর সিদ্ধান্ত হল যে ''Rich farmers were to be seen only among reclaimers of land in a few frontier areas.'' সম্প্রতি Nariaki Nukazato অধ্যাপক বিনয়ভুষণ চৌধুরীর বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক চৌধুরীর মতে, ''The growing number of share -croppers among the peasants indicated an incipient process of depeasantisation even while outwardly the small-holding system appeared to be intact''. অনেক ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রেণীই একমাত্র নির্ণায়ক ছিল না। M.C Pradhan, David Polock এবং Stephen F.

Dale দেখিয়েছেন যে "caste and community were capable of producing important rural solidarities among members setting them apart from other peasants."

ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড গ্রামীণ মানুষদের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকার যে বিষয়সূচী তৈরী করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে আলিগড়ের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা সেই পথ অনুসরণ করেন। তাঁরা প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগের কৃষিজীবন ও রাষ্ট্রীয় গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৬০ এর দশকে আলিগড়ের বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব দেখিয়েছিলেন "The overwhelming presence of the Mughal state in the life of the heavily taxed peasantry." তিনি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহের বর্ণনা দেন। জাপানী ঐতিহাসিক Hisorhi Fukazawa একদিকে রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মার্কিন ঐতিহাসিক স্টেইন বলেছেন যে "The state, rooted in the life of the peasant community, had a weaker and more segemented character ". আর একজন মার্কিন ঐতিহাসিক David Ludden দক্ষিণ ভারতের তিরুনেলভেলী জেলায় স্থানীয় শাসক ও গ্রামবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর ফলে কৃষকদের ইতিহাস মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের কৃষক আন্দোলননের স্তর অতিক্রম করে এক বিস্তৃততর আঙ্গিকে প্রবেশ

এভাবে একদল অ-মার্কসবাদী ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এঁরা কৃষক বিদ্রোহ আলোচনায় 'sophisticated new variety' নিয়ে আসেন। এই ঐতিহাসিকদের পথপ্রদর্শক হলেন Eric stokes তিনি কৃষকদের অবস্থা ও কৃষকআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে জাতি, বাজার , ট্যাক্সের চাপ, এবং তরাওঅন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্রে সংকলিত করে একটি বই আকারে প্রকাশিথ হয়েছে। বইটির নাম *The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian Society snd Peasant Rebellion in Colonial India (1978).* বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ D.N Dhanagare এর লেখা Peasant Movements in India (1983) বইটিতেও প্রচলিত মার্কসবাদী বক্তব্য থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেখিয়েছেন, "Peasant actions were typically circumscribed by the locality, based in caste of communal ties."

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পুরানো বামপন্থী ইতিহাসে ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইউরোপীয় শ্রমিকদের কোন পার্থক্য দেখানো হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা শ্রমিকদের বিপ্লবী ক্ষমতা ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অভাব লক্ষ্য করেছেন। নতুন শ্রমিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন শিল্প শ্রমিকদের মানসকিতা ও চেতনা গরীব ঠিকা শ্রমিকদের থেকে আলাদা ছিল না। এই ধরনের সংশোধিত শ্রমিক ইতিহাসের অন্যতম প্রবক্তা হলেন মরিস ডি মরিস, আর .কে. নিউম্যান, সুজাতা প্যাটেল প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মরিস ডি মরিস-এর বইটির নাম হল ঃ *The Emergence of an Indutrial Labour Force in India : A stdy of the Bombay Cotton Mills 1845-1947.* নিউম্যান-এর বই এর নাম হল ঃ Workers and Unions in Bombsy 1919-29: A study of Organisation in the Cotton Mills. সুজাতা প্যাটের এর বই-এর নাম হল ঃ *The Making of Industrial Relations,* The Ahmedabad Textile Industry 1918-1939. অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *Rethinking Working Class History: Bengal 1890-1940* গ্রন্থে নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাটকল শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী মনে করেন, "The hierarchical precapitalist

culture of the workers made them prone to communal violence and inclined them to dependence on the 'Sardars' who recruited them". রাজনারায়ন চন্দ্রভারকরও দেখিয়েছেন যে শ্রমিকরা স্থানীয় দাদাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা সম্প্রদায়গত ভাবে সংঘবদ্ধ ছিল। Sir Henry Maine এবং Kapil Khmar শ্রমিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভারতীয় সমাজকে 'status snd community'-র ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। ডঃ রজত রায় মন্তব্য করেছেন, "The long term effect of colonial rule was to bring the classes into play in a new national area."

প্রশ্ন

১। কোন সময় থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী স্থান পেয়েছে?
২। শ্রমিক ও কৃষকদের ইতিহাসটা কিভাবে ভারতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে?

১.৫.১৩.৩ ঃ সূচনা—শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা

একটি নতুন আর্থ-সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পে নিযুক্ত বেতনভোগী শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ভারতবর্ষে উনিশ, শতকের শেষপাদে হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণী, তাদের অবস্থা ও আন্দোলন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের আগ্রহ এরপর আস্তে আস্তে দেখা যায়। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। অথচ ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শ্রমিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে ইতিহাসচর্চা জোরকদমে চলেছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ইতিহাসচর্চা থেমে থাকেনি। বরং ভারতে বিশ শতকের শেষ দু-তিন দশকের কথা বাদ দিলে এই ইতিহাসচর্চার গতি ছিল বেশ মন্থর। কিন্তু বিগত দু-দশকে এই ক্ষেত্রে বহু গবেষণা হয়েছে, গ্রন্থ বেরিয়েছে, প্রবন্ধ সংকলন হয়েছে, ইংরেজী ভাষায় রচিত আন্তর্জাতিক মানের পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের একাডেমিক পত্রিকায়, এমনকি লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাতেও বহু মূল্যবান নিবন্ধ, স্মৃতিচারণ ছড়িয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন শুধু ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের কাছেই একটি অতি পরিচিত বিষয়বস্তু নয়, এমনকী সাধারণ মানুষ ও অন্যন্য বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছেও এ বিষয়টি একিট পরিচিত বিষয় শুধু নয়, যথেষ্ট কৌতূহল ও উৎসাহও সৃষ্টি করেছে সকলের মধ্যে।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শ্রমিক ইতিহাসচর্চা জোর কদমে চললেও ভারতীয় শ্রমিক নিয়ে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। বিগত দু দশকে এই শ্রমিক ইতিহাস চর্চা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে প্রবন্ধ এমনকি ম্যাগাজিনেও স্থান পেয়েছে। তাই ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন শুধু ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের কাছেই পরিচিত বিষয়বস্তু নয়। এমনকি সাধারণ মানুষও অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছেও বিষয়টি যথেষ্ট কৌতূহল ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধে বাংলা, বিহার, বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই), আমেদাবাদ, কানপুর দক্ষিণ ভারতের প্রধান শরহগুলিতে নতুন নতুন কলকারখানা, পাটশিল্প, সূতীবস্ত্রশিল্প, কয়লাখনি, বাগিচা. রেল ও ট্রামের মত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা চালু হবার পর শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। পূর্বতন কারিগর শ্রেণী, বা হস্তশিল্প, কুটীর শিল্প ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে এই আধুনিক শিল্পের মজুরিভোগী শ্রমিকদের পার্থক্য ছিল এবং তা এখন নানা লেখায় পরিষ্কার। প্রধানতঃ বিদেশি পুঁজির লগ্নিতেই ভারতরে শিল্পায়নের

সূত্রপাত, যদিও কিছু পরেই দেশীয় পুঁজিপতিদেরও আবির্ভাব। যে যুগে দেশের মানুষ বিদেশি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেই সময়েই শ্রমিককে লড়তে হয়েছে যুগপৎ বিদেশি সরকার ও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। ভারতে শিল্পায়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, মালিক -শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠল। নতুন সামাজিক শ্রেণী হিসাবে তাদের জন্মের পর ঔপনিবেশিক যুগেই তাদের নিয়ে নানা স্তিাভাবনা ও সেই চিন্তাভাবনারফসল হিসাবে ইতিহাস রচনা শুরু হল।

প্রশ্ন

১। ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা কখন থেকে শুরু হয়?

২। কিসের ভিত্তিতে ভারতে শিল্পায়নের সূত্রপাত ঘটে?

১.৫.১৩.৪ ঃ শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা (Trend of Labour Historiography)

তবে ঔপনিবেশিক যুগে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা শৈশব অবস্থায় ছিল বলা যেতে পারে। আজ থেকে দু-দশক পূর্বেও 'তলা থেকে ইতিহাস' (History from below) রচনার সম্ভাবনাগুলি একেবারেই খতিয়ে দেখা হয়নি। বরং সে সময়কার ইতিহাস ছিল 'এলিটিস্ট' মনোভাবাপন্ন। এ ধরনের ইতিহাসে কায়িকশ্রমে নিযুক্ত সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়েনি।

একথা সত্যি যে, ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের 'নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা' বা 'নিপীড়িতদের ইতিহাসচর্চা' হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার ধারা ভারতবর্ষ ও তৃতীয় বিশ্বের দরজায় প্রবেশ করার ফলেই এদেশে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এই দেশের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার তাই হিলটন, হিল, এ.এল .মর্টন, ই. পি.টমসন. হবস্‌বম, গ্রামশ্চি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। তাঁরা শুধু নিম্নবর্গ তথা শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিতই করেননি, উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এইসঙ্গে সামাজিক অচ্ছুৎদের ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন আছে তা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এরই সূত্র ধরে ১৯২০ এর দশক থেকে শ্রমিকদের নিয়ে ভারতে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছে ধরা যেতে পারে। যদিও ভারত ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে দীর্ঘকাল তা আদৌ অন্তর্ভূক্ত ছিল না। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রমিকদের একটি আলাদা অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে মূলতঃ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের পরিবেশ, খাদ্য , বাসস্থান ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হয়। ইতিহাসচর্চার এই ধারায় উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকগণ হলেন— রজনীকান্ত দাস (১৯২৩), কেলম্যান (১৯২৩), ব্রাউটন (১৯২৪), চমনলাল (১৯৩২), বি.শিবারাও (১৯৩৯), আর.কে মুখার্জী (১৯৫১), কে.পি.চট্টোপাধ্যায় (১৯৫২) ইত্যাদি। যেহেতু বাংলা ও বোম্বাই ছিল তদনীন্তন কালে শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলির একেবারে উপরে তাই সর্বভারতীয় আলোচনাতে এই দুই অঞ্চলের শ্রমিকদের নানা কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়েও ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত সেই বিশের দশক থেকেই। কারণ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সংক্ষেপে AITUC গড়ে উঠেছে। এর পূর্বে মাদ্রাজে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে Textile Labour Union গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন কলকারখানা, চটকল, বস্ত্রকল ও আরও নানা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন একের পর এক

গড়ে উঠতে লাগল। বামপন্থী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠল । কম্যুনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও অনেকে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২০ পর পরবর্তী প্রায় ৫০ বছর ধরে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা এগিয়ে চলল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কালানুক্রমিক ধারায় প্রধান প্রধান ধর্মঘটের কথা ও আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির কার্যকলাপ ও দাবি দাওয়ার কথা নিয়ে ঐতিহাসিক কর্ণিক (১৯৬৭), রজনীকান্ত দাস (১৯২৩) ও আরও কেউ কেউ ইতিহাস লিখলেন। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন মার্কসবাদ ঐতিহাসিকেরা। এর পথিকৃত নিঃসেন্দেহে রজনী পাম দত্ত (ইণ্ডিয়াটুডে,১৯৪০)। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী লেখকরা এই ধারা তো বজায় রাখলেনই, সেইসঙ্গে এই ধারার আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক নতুন বিষয় সংযোজিত করলেন। অনেক মাক৪সবাদী ঐতিহাসিক ডগম্যাটিক সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকালের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নানা নতুন নতুন দিকের উন্মোচন ঘটালেন। ডগম্যাটিক সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে শ্রমিক ইতিহাসকে নতুন আলোকে বিচার করবার চেষ্টা শুরু করলেন।

ঔপনিবেশিকযুগে এমনকি আজ থেকে দু-দশক পূর্বেও ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা শৈশব অবস্থায় ছিল। কারণ সে সময়কার ইতিহাস ছিল 'এলিটিস্ট' মনোভাবাপন্ন, সেখানে নিম্নবর্গের মানুষদের কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ১৯২০-এর দশক থেকে হিলটন, হিল, টমসন, হবস্‌বম, গ্রামশ্চি, রজনী পাম দত্ত প্রমুখের হাত ধরে ভারতে এক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয় যেখানে কায়িকশ্রমে নিযুক্ত অর্থাৎ নিম্নবর্গ বা নিপীড়িতদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার ১৯৭০-এর দশক থেকে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৭০-এর দশক থেকে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন ধারা আসতে থাকল। তার মধ্যে প্রধান ধারা হল এক সঙ্গে সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়ে গবেষণা— যেমন বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর বা কোয়েম্বাটুরের সুতাকল বা জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিক। শুধু প্রদেশভিত্তিক ইতিহাসই নয়, বিষেষীকরণ আরও এগিয়ে চলল যখন গবেষক-ঐতিহাসিকেরা এক-একটি সংক্ষিপ্ত পর্বের (Phase) উপর তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে লাগলেন।

সময়ের পর্বভিত্তিক গবেষণা ছাড়াও, একটি মাত্র নির্দিষ্ট শিল্প বা তৃণমূল স্তরের একটি মাত্র অঞ্চলের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ইতিহাসচর্চার বিষয় হিসেবেপ এসে দেল। সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে চটশিল্পের উপর। চা- বাগিচা শিল্প নিয়েও চটশিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে নানা দিক দিয়ে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন— রণজিৎ দাশগুপ্ত, দীপেশ চক্রবর্তী নির্বাণ বসু, পরিমল ঘোষ, অর্জন দি হান, শুভ বসু,. অমল দাস ও আরও অনেকে।

বোম্বে, আমেদাবাদ, কানপুরের সুতোকল শ্রমিকদের নিয়েও এখন পর্যন্ত বেশ ভাল ইতিহাসচর্চা রয়েছে ও হচ্ছে। এক্ষেত্রে মরিস.ডি মরিস. চার্লস মায়ার্স, আর, কে. নিউম্যান, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ চন্দ্রভারকার, চিত্রা যোশী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। জামশেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের নিয়েও সময়ের পর্বভিত্তিক আলোচনা ও বিশেষীকরণ বেশ ভালভাবেই শুরু হয়েছে।

নারী শ্রমিকদের নিয়ে আলাদাভাবে অনুসন্ধান চলেছে। মহিলা শ্রমিক নেত্রীদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ নারী শ্রমিকদের জীবন ও দাবি দাওয়া নিয়ে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

ও ইতিহাসচর্চা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেন— সুনীল সেন, শমিতা সেন, নির্মলা ব্যানার্জী, এগেলস ডাগমার ও আরও কেউ কেউ। সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব নিয়েও ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রমিকদের সম্প্রদায়গত চেতনা নিয়ে লিখেছেন দীপেশ চক্রবর্তী। অবশ্য এর বিপরীত মতও পাওয়া গেছে অন্য শ্রমিক ইতিহাসচর্চায়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল জাতীয় আন্দোলনের বিশাল প্রেক্ষাপটে বামপন্থী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অনুকূল-প্রতিকূল সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উবদান রেখেছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাও কিছু কিছু হয়েছে। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের জীবনীমূলক আলোচনা ও তাদের মূল্যায়ন নিয়েও ইতিহাস লেখা হয়েছে। জীবনীমূলক অভিধান রচনা করেছেন পঞ্চানন সাহা।

তবে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে যা বড় বড় শিল্পগুলি সম্পর্কে ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি হলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকও অসংগঠিত নানা শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা তুলনামূলকভাবে কম। তবে সুখের বিষয়, এই অভাববোধ শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকারীদের মধ্যে অধুনা এসেছে এবং কেউ কেউ এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের নানাা শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় স্বাধীনতা উত্তরকালে নানা শিল্পের শ্রমিকদের নানা সমস্যা-আন্দোলন নিয়ে ইতিহাসচর্চা অপেক্ষাকৃত কম বললেই চলে। অবশ্য সাম্প্রতিককালের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কিছু কিছু ইতিহাসচর্চা হয়েছে। নয়া অর্থনীতির ফলস্বরূপ রিন্ট্রেঞ্চমেন্ট ও নয়া প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা ও লেখা হয়েছে।

প্রশ্ন

১। কয়েকজন নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদদের নাম লেখ?

২। ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

১.৫.১৩.৫ ঃ উপসংহার (Conclusion)

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তের আসা যায় যে ভারতের শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন মোটেই পিছিয়ে নেই। ভারত-ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক বিষয় হিসেবে শ্রমিকদের ইতিহাস নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহু বিচিত্র পথে এই গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ধারা এখন এগিয়ে চলেছে।

১.৫.১৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (References Books)

1. Sanjay Subrahmanyan (ed) : Money and Market in India;1100-1700.
2. Sugata Bose : PeasantLabour and Colonial Capital : Rural Bengal since 1770.
3. Sumit Guha : The Agrarian Economy of the Bombay-Deccan,1881-1941.

4. R.S. Rungta : The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900.
5. R.K.Ray (ed) : Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947.
6. T. Roy : Traditional Industry in the Economy of Colonial India.
7. Burton Stein and Sanjay Subrahmanyan (ed) : Institutions and Economic change in South Asia.
8. Dwijendra Tripathi (ed) : Business Communities of India.
9. A.K. Banerjee : Aspects of Indo-British Economic Relations, 1858-98.
10. Ranajit Guha : Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.
11. Narahari Kabiraj : A Peasant Uprising in Bengal.
12. Narahari Kabiraj : Wahabi and Farazi Rebels of Bengal,
13. Blair B. Kling : The Blue Mutiny : The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1862.
14. Majid Siddiqui : Agrarian Unrest in Northern India : The United Provinces 1918-32.
15. E.D. Murphy : Unions in Conflict : A Comparative Study of four South Indian Textile Centres, 1918-1939.
16. Samita Sen : Women and Labour in Late Colonial India : the Bengal Jute Industry.
17. H.J Mc Closkey : Ecological Ethics and Politics.
18. D.E. Worster : Nature's Economy : The Roots of Ecology.
18. William Tucker : Progress and Privilege: America in the Age of Enviromentalism.
19. বিনয়ভূষণ রায় : উনিশ শতকে বাংলার বিজ্ঞান সাধনা।
20. C.A. Bentley : Malaria and Agriculture in Bengal.
21. Pandita Ramabai : The High Caste Hindu Worman.
22. B.C. Law : Women in Buddhist Leterature.
23. Bharati Ray (ed) : From the Seams of History : Essays on Indian Women.
24. Usha Chakraborty : Condition of Bengali Women around the second half of the Nineteeth century.
25. অমল দাশ : ইতিহাস—অনুসন্ধান (১৫)—সম্পাদনা গৌতম চট্টোপাধ্যায়—সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা।
26. নির্বাণ বাসু (সম্পাদনা) : বাংলার শ্রমিকচর্চা সংক্রান্ত রচনাপঞ্জী।
27. সুমিত সরকার : আধুনিক ভারত।
28. সব্যসাচী ভট্টাচার্য : ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস. আধুনিক ভারত ইতিহাস, সভাপতির ভাষণ, ১৯৮২।

১.৫.১৩.৭ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Discuss the views of various authors on the economic history of Colonial India.
2. What are the differences between colonialist and nationalist works on Indian economic history?
3. How did the peasant and working class histories begin?
4. Discuss the history related to peasants and working class before independence.
5. Give an account of the history of Peasant and working class after independence.
6. Discuss the historical works related to gender.
7. ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।
8. ভারতের ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
9. শ্রমিক ইতিহাসচর্চা প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কতটা প্রসারলাভ করেছিল? এই ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি কী ছিল?
10. সাম্প্রতিককালে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি আলোচনা কর।
11. শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কী?

একক-১৪

Religion, Culture, Environment and Science and Technology

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৫.১৪.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

১.৫.১৪.১ ঃ পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Environment, Science And Technology)

১.৫.১৪.২ ঃ নারী-ইতিহাস (Women History)

১.৫.১৪.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৫.১৪.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৫.১৪.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ধারা

(২) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং গবেষণার ফলে এই সব ক্ষেত্রে ইতিহাস অগ্রগতি

(৩) ভারতীয় ইতিহাসে নারীর গুরুত্ব ও গবেষণার প্রসার

(৪) নারী ইতিহাসচর্চার মূল্যায়ন—প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে এবং উত্তরপর্বে

১.৫.১৪.১ ঃ পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Environment, Science and Technology)

আধুনিক ভারতের ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ভারতের প্রাকৃতিক ভূচিত্র পাল্টে গিয়েছে। এই বিরাট রূপান্তর ইদানীংকালে ভারতের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একথা মনে করলে ভুল করা হবে যে ভারত ইতিহাসের মূল উপাদান হিসাবে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিগত প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তথাপি কেবলমাত্র ১৯৯০ এর দশক থেকেই ভারতের বেশ কিছু ঐতিহাসিক এগুলিকে স্বাধীন গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণের কল্যাণ ও দেশের আবহাওয়ার উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা একমত নন। তাঁদের মতভেদের ফলে দেশের জনমত, সরকার এবং রাজনীতির মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। এর ফলে দেশে বিভিন্ন Lobby বা গোষ্ঠীর উদ্ভব

হয়েছে। যেমন—Science lobby, economics and planning lobby এবং environment lobby, তবে আসন্ন আকস্মিক দুর্বিপাকের আকাঙ্খায় সবাই সন্ত্রস্ত। বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে 'Greenhouse effect' এর ফলে গ্লেসিয়ারের ক্ষয়প্রাপ্তি চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশের এই সংকটকে কেন্দ্র করে গণবিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করেছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে এই সমস্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তারও আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। যেমন—ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা বিবৃত হয়েছিল? বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে বিজ্ঞানের অবস্থা এবং প্রযুক্তির মান কেমন ছিল?

ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান ঔপনিবেশিক ভারতে ছড়িয়ে দেবার সুবাদে ব্রিটিশরা ভারতে তাদের শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল।

*বিশেষত ১৯৯০ দশকের পর থেকে ভারতের ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। এবং এই আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের **Lobby** বা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। ১৯৯০ এর দশক এর আগেও যদি দেখি তবে সেখানেও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেখা যায়। যেমন-ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা বিবৃত হয়েছিল? বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে বিজ্ঞানের অবস্থা এবং প্রযুক্তির মানই বা কেমন ছিল? এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে ভারত ইতিহাস চর্চায় এক নতুন শাখা বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে।*

ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের ধারণা ছিল, এটা প্রধানতঃ ধর্মনির্ভর, বিজ্ঞান নির্ভর নয়। কিন্তু সাত শতাব্দী আগে প্রথম দিকের মুসলমান ভ্রমণকারীদের মত কিন্তু আলাদা ছিল। ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আলবিরুনী ভারতের ধর্ম ও বিজ্ঞানের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মুসলমানরা কিছু কারিগরী দ্রব্য এদেশে এনেছিলেন। যেমন, কাগজ ও 'Persian wheel'. ইউরোপও সে সময়ে চীন ও মুসলমান জগৎ থেকে কিছু প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সতেরো শতকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা ভারতে তাদের বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকৃষ্টতা দাবী করতে থাকে। উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান আনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করেননি। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রাচীন যুগে ভারতে বৈজ্ঞানিক ট্রাডিশন অব্যহত ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই দ্বৈত ধারণা ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মধ্যে। তিনি একদিকে নাইট্রেটের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান রাসায়নিক আবিষ্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে *The History of Hindu Chemistry* বইটিও রচনা করেন। ১৯০২ এবং ১৯০৮ সালে দুখণ্ডে প্রকাশিত এই বইখানির মাধ্যমে এই পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রিটিশদের 'imperialist idea of science as the achievement of Western enlightened thought alone'-ধারণাকে ইতিহাসগতভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভূত হয়েছে বহুমাত্রিক সভ্যতার মাধ্যমে, শুধু ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা নয়। জেসেফ নিড্হামের লেখা *Science and Civilisation in China* বইটিতেও একই সুর শোনা যায়।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যেও আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় সভ্যতার তার ঐতিহাসিক প্রভাব সম্পর্কে দুটি ভিন্নমুখী চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। ডঃ রজত রায় লিখেছেন, "Mohan Das Karamchand

Gandhi denouced railways lawyers and doctors, and declared machineryto be a 'great sin".Hind Swaraj-এ গান্ধীজী লিখেছিলেন, ''It id machinery that has impoverished India''. তাঁর শিষ্য জওহরলাল নেহরু কিন্তু এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি *The Unity of India* নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "Politics led me to economics, and this led me inevitably to science and the scientific approach to all our problems of hunher and poverty''. ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে এবং ইস্পাত কারখানা স্থাপন করে ভারতের 'landscape'-এর রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। আধুনিককালের সংস্কারপন্থী পরিবেশবাদী ঐতিহাসিকরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশের প্রশ্নে বিতর্কের ক্ষেত্রে নেহরুর চেয়ে গান্ধীজীর উপরই বেশী নির্ভর করেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে যে পরিবেশগত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল সেটি হল ঃ how far had the face of the country changed over time? রাধাকম মুর্খাজী তাঁর ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *The Changing face of Bengal: a study in Riverine Economy* গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে নদী ও পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। তবে পরিবেশ পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলে না। উনিশ শতকের গোড়ায় D,Butter নামে এক ব্রিটিশ অফিসার পরিবেশ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তার নাম হল ঃ *An Outline of the Topography and Statistics of the Southern Districts of Oudh.* ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত এই রিপোর্টে তিনি বিগত কয়েক দশকের গ্রীষ্মকালীন গরম হাওয়া বা 'loo' এর 'unremitting asvance' সম্পর্কে লিখেছিলেন। ঔপনিবেশিক অফিসারদের ঐতিহাসিক ভূগোল সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আলেকজান্ডার কানিংহামের লেখা *The Ancient Geography of India* গ্রন্থটি এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছিল। এইসব লেখাগুলি থেকে বোঝা যায় আধুনিক বিজ্ঞান ভারতে প্রবেশ করার আগেই জনসংখ্যা ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইতিমধ্যেই ভারতের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটেছিল।

১৯৯০ এর দশকে নতুন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন, What was the popular reception of science-acceptance or resistance? What was the impct of ecological change upon the question of welrare-partially beneficial or wholly negative? তবে ঐতিহাসিক গবেষণার নিরিখে এই প্রশ্নগুলি একেবারে নতুন নয়। নতুন ইতিহাস চর্চার নতুনত্ব হল এই যে তাঁরা সব প্রশ্নগুলিকে একত্রে নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এর আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। একদিকে দেশপ্রেমী ভারতীয়রা বৈদিক যুগের অনেক আবিষ্কারের কথা বলে পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নগণ্য করার চেষ্টা করেছেন। আবার অন্যদিকে কিছু ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক বক্তব্যেক পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলেছেন।

সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে 'power and politics' সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রকাশিত বিখ্যাত বই হল অধ্যাপক দীপক কুমার এর লেখা *Science and the Raj.* এক্ষেত্রে আরও কতকগুলি বই হল ঃ ডেভিড আর্নল্ড-এর *Colonizing the Body : State, Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India:*জ্ঞান প্রকাশের *Another Reason : Science and the Imagination of Modern India:* ডেভিড আর্নল্ডের *Science, Technology and Medicine in Colonial India.* নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিক ডেভিড আর্নল্ড ওজ্ঞান প্রকাশ

দুজনেই দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানের মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দুজনেই নতুন প্রযুক্তিকে দেখেছেন 'a link between space and the state'. এঁদের মতে বিজ্ঞান হল ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যম। ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আধিপত্য প্রসারের নীতি গ্রহণ করেছিল; এর মধ্যে ঔপনিবেশিক মানুষদের জন্য কল্যাণকামনা ছিল না। এঁদের মতে বিজ্ঞান নির্ভর রেলপথ ও টেলিগ্রাফের প্রসারের ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জনস্বাস্থ্যের অবনতি ও মৃত্যুর কারণ হিসাবে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বসন্তস কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির উপর ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া এইসব রোগের জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কথাও আলোচিত হয়েছে। কঠোর ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও বই প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৯০ এর দশকে ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস রচনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৮৭ সালে C.A. Bayly মন্তব্য করেছিলেন, "Ecological change in India is the coming subject but no overview has appeared". বেইলী নিজেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ১৮৭০ সালের পরের একশো বছরে ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিপুল পরিমাণ বৃক্ষশূন্যতার সূচনা হয়েছিল। নতুন প্রজন্মের পরিবেশ ইতিহাসবিদদের প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল ঃ রামচন্দ্র গুহ-র The Unquiet Woods : Ecological Change and peasant Resistance in the Himalaya. বইটি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি অধ্যাপক গুহ নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের 'থিম' অনুযায়ী পরিবেশের পরিবর্তন অপেক্ষা "dominance and resistance"-এর কথাই বেশি বলেছেন। হিমালয় অঞ্চলের বনসম্পদের বাণিজ্যিক গণ শোষণের বিরুদ্ধে হিমালয়ের পাদদেশের মানুষের গণ আন্দোলনের উত্থানের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাড্‌গিল এর লেখা *This Fissured land : an ecological history of India* গ্রন্থটি। এখানে আলোচনার বিষয়বস্তুর পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল। এঁদের সিদ্ধান্ত হল ঃ 'In India the ongoing struggle between the peasant and industrial modes of resources use has come in two stages : colonial and post colonial. It has left in its wake a fissured land, ecologically and socially fragmented beyond belief and, to some observers, beyond repair".উপনিবেশিক নীতির ক্ষতিকারক পরিবেশগত ফলাফল সম্পর্কে দুখানি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি Richard H. Grove-এর লেখা Green Imperialism : Colonaial Expansion, Tropical Island Edens, and the Origins of Environmentalism 1600-1860. বইটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। আরেকটি বই এর লেখক হলেন Mahesh Rangarajan. বইটির নাম হল ঃ *Fencing the Forest: Conservation and Ecological change in India's Central Provinces 1860-1914.* বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। পরিবেশের ইতিহাসের কতকগুলি মূল বিষয় হল ঃ বনবাসীদের অধিকার হারানো, তাদের প্রতিরোধ এবং বনসংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা।

প্রথাগত ইতিহাসে ইতিমধ্যেই পরিবেশের উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব আলোচিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, সেচ খাল খনন, জমা-জল, রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ এলিজাবেথ হোয়াইকোম্ব—এর *Agraian Conditions in Northern India : The United provinces under British Rule, 1860-1900* আয়ান স্টোন এর Canal Irrigation in British India :

Perspectives on Technological change in a Peasant Economy. এম. মুফাখারুল ইসলাম এর Irrigation, Agriculture and the Raj: Punjab 1887-1947. বইগুলি থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তা হল, রাস্তা ওখাল জলের স্বাভাবিক গতিধারাকে ব্যাহত করেছিল, যদিও জলসেচের সুবিধার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। Robert Varady-র রেলপথের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা থেকে জানা যায় কীভাবে রেলপথ নির্মাণের ফলে হিমালয় অরণ্য অঞ্চল এবং সমতলের বনাঞ্চল অবলুপ্ত হয়েছিল। রাস্তা এবং রেলপথ তৈরির ফলে বিভিন্ন রোগ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিবেশ ইতিহাসবিদ ছাড়াও অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা কৃষির সম্প্রসারণের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল শিরিন মুসভি-র *Man and Nature in the Mughal Era (1993).* তবে পরিবেশের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে শুধু পরিবেশ ইতিহাসবিদ নয়, মূলস্রোতের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের কাজগুলি নিয়ে একত্রে আলোচনা করা দরকার। তবেই একটি 'balanced picture' পাওয়া সম্ভব।

পরিবেশের ইতিহাসের উত্থানের ফলে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নতুন করে চিন্তা শুরু করেছেন। এর কারণ হল, ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সম্পর্কে পরিবেশ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ। কারিগরী উন্নতি আগেকার অসমালোচনামূলক ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বর্তমানে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা একরকম নিশ্চিত যে বৃটিশ শাসন, ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূচনা করে ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিল। তবে তাঁরা মনে করেন যে একেবারে শুরুতে ভারতীয়রা রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপনের বিরোধিতা করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ হিসাবে J,H,Kaye ভারতীয়দের এই ব্রিটিশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর বিখ্যাত *A History of the sepoy war in India* গ্রন্থে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বক্তব্য হল ঃ বিদ্রোহ দমনের পর প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের প্রকৃত উন্নতি ঘটেছিল। L.S.S O'Malley এনামে একজন ঔপনিবেশিক অফিসার তাঁর বিখ্যাত *Modern India and the West : a study of the interactions of the civilisations* গ্রন্থে 'Mechanism and Transport' নামে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি রেলপথ, যোগাযোগ, বেতার, ফিল্ম, প্রভৃতির নতুন গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এর ফল ভারতের অনুকূলেই গিয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রযুক্তি সম্পর্কে গ্রন্থ মূলত ঃ ইতিহাসের বিশ্লেষণাত্মক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রচিত হয়েছিল। ভারতের এই গতিধারা অনুযায়ী ভারতের কয়েকজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীও 'technicaleducator' রা নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী'তে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। ১৯৭৭ সালে এই বক্তৃতাগুলি বি.আর.নন্দার সম্পাদনার *Science and Technology in India* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখানেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলাফল সম্পর্কে অসমালোচনামূলক সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয় এবং জওহরলাল নেহরুর প্রগতিমূলক নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সমস্ত গ্রন্থে প্রযুক্তিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রযুক্তির নিজস্ব পৃথক ইতিহাস গড়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে। ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিক দেখাতে চান যে পশ্চিম থেকে অ-পশ্চমী সমাজে প্রযুক্তির হস্তান্তরের ফলেই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

Daniel R.Headrick-এর লেখা *The Tentacles of Progress : Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850-1940* গ্রন্থে এই ধরনের বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছিল। Roy McLeod ও Dipak Kumar সম্পাদিত *Technology and the Raj* গ্রন্থে ভারতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভারতীয় রেলপথের উপর একটি প্রবন্ধে Ian Derbyshire বলেছেন, "Technical development remained colonial-dependent." F.Lehmann হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, 'during the entire period of British rule in India, not more than 700 locomotives were built in the country, despire the vast railway network that existed in 1947". অন্যান্য রেল ইঞ্জিনগুলি বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল যেগুলির অধিকাংশই সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে তৈরি হয়েছিল। একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন Daniel Thorner. তিনি বলেছেন, "India alone of the countries with great railway networks is unindustrialized".

প্রথমে ব্রিটেন থেকে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তান্তরের ঐতিহাসিক ভূমিকার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃপরিবেশের চেয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বেশি করে দেখা হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের ইতিহাসের উত্থানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকায় সমালোচনা একটি নতুন মাত্রা পায়। রেলপথের উপর অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ও পরিবেশ ইতিহাসবিদদের প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে সম্পাদনা করেছেন Ian. J. Kerr. বইটির নাম Railways in Modern India. তিনি রেলপথের শুভ ও অশুভ দুরকম ফলাফল নিয়েই লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক হল ভারতে ইউরোপীয় ঔষধের আমদানী। এক্ষেত্রেও আধুনিক গবেষকরা এর সদর্থক ও নঞর্থক দুই ধরনের ফলাফলের উল্লেখ করেছেন। তবে নতুন গবেষণা "has still not dislodged the impression that technology brought important benefits".

যাই হোক, গবেষণার অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশের ইতিহাস ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন

১। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের কি ধারণা ছিল?

২। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নতুন ভাবনাটা কি?

১.৫.১৪.১ ঃ নারী-ইতিহাস (Women History)

দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এর পরিবর্তন ঘটলেও অধ্যাপিকা রেখা পাণ্ডের ভাষায় বলা যায়, "In the Indian context Women's history is still at its infancy". এর অর্থ এই নয় যে, আসলে নারীদের সমস্যা নিয়ে কোন গভীর চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি "independent and natural discipline". হিসাবে নারী ইতিহাস তখন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়নি। তবে ভারতে বিভিন্ন নারী ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হবার ফলে এবং সিলেবাসে নারী ইতিহাস স্থান পাওয়ার বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় নারীদের অবহেলিত হওয়ার প্রধান কারণগুলি হল ঃ

(১) ভারতীয় ইতিহাসচর্চা ছিল প্রধানত পুরুষকেন্দ্রিক। যদিও কিছু কিছু গ্রন্থে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা থাকত, সেগুলি স্থান পেত একেবারে পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে। বৈদিক, পরবর্তী বৈদিক, মধ্যযুগ ও বিজয়নগর সমাজে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে লেখা থাকলেও এই পর্বে ভারতের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকার যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়নি।

(২) প্রচলিত ভারতের ইতিহাসচর্চায় রাজনীতি, যুদ্ধ, কূটনীতি প্রভৃতি যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্বদেওয়া হত সেখানে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরার কোন সুযোগ ছিল না। সুলতানা রাজিয়া বা ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈকে ইতিহাসের পাদপ্রদীপে তুলে আনা হয়েছিল এই কারণে যে তারা নারী হয়েও পুরুষের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

(৩) নারীদের প্রধান কাজগুলি যথা সন্তানের জন্ম দেওয়া, রান্না করা, চাষের কাজে অংশগ্রহণ, লোকশিল্পে অংশগ্রহণ প্রভৃতিকে ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবার মত উপযুক্ত বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে চাননি। এইজন্য নারী ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

(৪) নারী ইতিহাস অবহেলিত হওয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল উপাদানগত অপ্রতুলতা। প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানগুলিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের কথাই বেশি জানা যায়, নারীরা সেখানে অবহেলিত। রেখা পাণ্ডে তাই মন্তব্য করেছেন, "Nurnismatics , archaeology, inscriptions and literary texts reflect an elite world, and coupled with the pre-occupation with Political history, have completely ignored women".

উনিশ শতকের কয়েকজন ইউরোপীয় লেখক ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং তাদের রচনায় ভারতীয় নারী গুরুত্ব পায়। ভারতীয় নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তত্ত্বগত বিতর্ক দেখা দেয়। প্রাচ্যবাদী ইউরোপীয়রা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসা করলেও উনিশ শতকে ইউটিলিটারিয়ান ও ইভানজেলিস্টরা (Utilitarians and Evangelists) সমকালীন ভারতীয় সমাজের কঠোর সমালোচনা করেন। তারা ভারতীয় নারীদের 'low status'-এর কথা তুলে ধরেন। এই সমালোচনার জবাবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য উল্লেখ করে দেখান যে ভারতীয় নারী 'high status'-এর অধিকারী ছিল। উইলিয়াম জোন্স এবং এইচ.টি.কোলব্রুক প্রমুখ প্রাচ্যবাদীরা সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শনের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাদের রচনাতেও নারীদের স্থান ছিল নগণ্য; জোন্স কেবলমাত্র গার্গীকে একজন শিক্ষিতা মহিলা হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সতীদাহ প্রথা বা ভারতের বিধবা মহিলাদের কথা বলেননি। কোলব্রুক ধর্মীয় সাহিত্যে সতীদাহ প্রথার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে পুরুষকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চা উপাদানগত অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে ভারতের ইতিহাস চর্চায় নারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু আসলে এই নয় যে, নারীদের সমস্যা নিয়ে কোন গভীব চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। আসলে যেটা হয়েছিল তা হল নারী ইতিহাস এমন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়নি। কিন্তু উনবিংশ এবং বিংশ শতকে থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা নারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং এর ফলে নারী ইতিহাস চর্চা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

Clarisse Bader তাঁর "Women in Ancient India"(1925) গ্রন্থে আর্যযুগের ভারতীয় নারীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন আর্য নারীদের ধর্মীয় নমনীয়তা, স্বার্থত্যাগ, পরিবারের প্রতি সীমাহীন দায়িত্ববোধ ও

আনুগত্য প্রভৃতি গুণ পশ্চিমী মহিলাদের অনুকরণযোগ্য। Bader ভারতীয় নারীদের স্বামীর সঙ্গে সতী হওয়ার ঘটনাকে তাদের 'আধ্যাত্মিক সাহসিকতা' বলে বর্ণনা করেছেন। Isabel Blen Horner বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের উপর নির্ভর করে নারীদের একটি নতুন বিভাগ সংযোজন করেছেন, সেটি হল 'Women Workers' : তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Women Under Primitive Buddhism' (1930) গ্রন্থে প্রচলিত মাতা, কন্যা, স্ত্রী ও বিধবাদের কথা না বলে নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

জেমস মিল তাঁর 'History of British India' (1871) গ্রন্থে হিন্দু সভ্যতার নিষ্ঠুরতার কথা বলেছেন। কারণ হিন্দুরা নারীদের কোন সম্মান দেয়নি। মিলের মতে, "They excluded women from sacred texts, while depriving them of education, of a share of paternal property, and held them as unworthy to eat with their husbands." নারীদের শিক্ষা ও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু হিন্দু সমাজ মেয়েদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে পারেনি সেজন্য ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ প্রয়োজন । তিনি আরো বলেছেন যে, হিন্দু পুরুষরা Self-rule এর জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। মিলের বক্তব্যকে অনেক ব্রিটিশ প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ সমর্থন করেন। পশ্চিমী ধারণায় শবদাহের সময় কোন বিধবার মৃত্যু এবং শিশুকন্যার বিবাহ মানেই ভারত বলে মনে করা হতে থাকে। Katherine Mayo তাঁর বিখ্যাত 'Mother India' (1927) গ্রন্থে ভারতীয় নারীদের শোচনীয় দুর্গতি এবং বিশেষ করে শিশুপত্নীদের কষ্টের কথা বলেছন। এইজন্য ভারতীয় পুরুষদের উপর তিনি দোষারোপ করেছেন।

(১) পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের সমালোচয় বলা যায় যে, তারা ভারতীয় সমাজের আংশিক ছবি তুলে ধরেছেন, পূর্ণাঙ্গ নয়। এর কারণ হল তাদের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা। এই উপাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। কারণ এই ধরনের সাহিত্যে প্রধানত ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। যেমন নারীর পুনঃবিবাহের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সন্তানহীন বিধবার দত্তক গ্রহণ, শিক্ষার অধিকার, জনসমাবেশে নারীদের উপস্থিতির প্রশ্ন প্রভৃতি। এই ধরনের সাহিত্যে কেবলমাত্র মেয়েদের সাংসারিক জীবন ও স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বলয়ছে। সমাজের অন্যান্য কাজকর্মের কথা স্থান পায়নি। এই সাহিত্যে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা বলা আছে।

(২) পশ্চিমী লেখকদের রচনায় ভারতীয় নারীদের 'low status'-এর ব্যাখ্যার পিছনে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এর মাধ্যমে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত শাসন এবং ভারতীয় সমাজের রূপান্তরের নৈতিক অধিকার দাবী করার চেষ্টা করেছিল।

(৩) এইসব লেখকরা কেবলমাত্র বিশেষ একটি শ্রেণী অথবা উচচশ্রেণীর নারীদের সম্পর্কে লিখেছেন। অধ্যাপিকা পাণ্ডে তাই মন্তব্য করেছেন, "Women of other castes and sections were totally omitted from scrutiny and were not a matter of concern".

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই ভারতের বুদ্ধিজীবীরা নারী সচেতন হয়ে ওঠেন। সতী, শিশুকন্যা বিবাহ, কন্যাহত্যা ও বিধবাদের সম্পর্কে তারা চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তার সমাজ সংস্কারের কথা বলতে থাকেন। এর বিরোধিতাও করা হয়। দুপক্ষই কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের যুক্তির সমর্থনে সংস্কৃত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু ঐতিহাসিকদের রচনায় নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

(১) এক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল A.S. Altekar-এর ''position of women in Hindu Civilization''. (1938), বইটি ব্রাহ্মণ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। গ্রন্থটিতে প্রাচীন আইনবিদদের নারীদের শিক্ষা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবাদের অবস্থা, নারীদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। Altekar-এর মতে কোন দেশের সভ্যতাকে বুঝতে হলে সেই দেশের নারীদের অবস্থা কী ছিল তা আগে জানা দরকার। তাঁর মতে, বিবাহ আইন ও প্রথায় নারীদের কেবলমাত্র 'market commodities' বলে মনে করা হত, না 'husband's valued partner' হিসাবে দেখা হত, তার মধ্যেই নারীদের প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। আলতেকার মনে করেন, হিন্দু নারীরা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান চাইত এই কারণে যে বিধবারা পিতা মাতার দুঃখের কারণ ছিল অথবা পিতা মাতা তাদের কন্যাদের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত না বলে। কারণ সে যুগে পুনঃবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। আলতেকার লিখেছেন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হত না এই কারণে যে শত্রুদের হাত থেকে তা রক্ষা করবার মত ক্ষমতা তাদের ছিল না। তিনি আরো বলেছেন যে মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হত এই কারণে যে তারা যাতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করতে না পারে। অবশ্য আলতেকার ও উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের কথা বলেছেন। এর ফলে প্রাচীন যুগের নারী ইতিহাস রচনার বিশ্লেষণধর্মিতা বাধা প্রাপ্ত হয়।

(২) Devaki Indra তাঁর 'Status of Women in Ancient India' (1940)গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আদি আর্য সমাজের মেয়েদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈকি অবস্থা পূর্ববর্তীযুগের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। J.B. Chowdhuro তাঁর 'Position of Women in Vedic Ritual' (1956) গ্রন্থে ভারতীয় নারীদের রক্ষণশীলতা এবং তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের কতা বলেছেন। ''The Status of Wmmen in fhe Epic'' (1966) গ্রন্থে Shakambari Jayal দেখিয়েছেন যে, প্রথমে নারীদের 'high status' থাকলেও পরবর্তী বৈদিক যুগ অনার্য স্ত্রীদের আগমনের ফলে অবস্থান অবনতি ঘটে।

(৩) ডি.ডি. কোশাম্বী আর.এস.শর্মা প্রমুখ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাসেদ্দ ওপর বেশি জোর দেওয়া ফলে নারী ইতিহাস তাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। রোমিলা থাপারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।

(৪) সরোজ গুলাটি এবং কমলা গুপ্ত প্রমুখ medievalist ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে সমালোচনা প্রতিবাদ করেছেন, তাদের মতে এইসব নারীরা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তখন তাদের সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল। যেমন রাজিয়া একজন 'wise, just, generous, a protector of her subjects and leader of her armies' হওয়া সত্ত্বেও দাস ইয়াকুত এর সঙ্গে তার সম্পর্ব্বকে কেন্দ্র করে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। একইভাবে নূরজাহানের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভকেও সমকালীন ইতিহাসে অযথা সমালোচনা করা হয়েছে এবং 'Petticoat Government' বলে নিন্দা করা হয়েছে। রেখা মিশ্র তাঁর 'Women in Mughal India' (1967) গ্রন্থে মহিলাদের

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা লিখেছেন। অবশ্য সরোজ গুলটি 'Women and Society' গ্রন্থে মহিলাদের সাংসারিক কাজকর্মের কথা বললেও 'Production Process'-এ মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই বলেনি।

১৯৪৭ সালের পর অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নারী ইতিহাসচর্চায় নতুত্ব দেখা যায়। উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারের গণ্ডি পেরিয়ে ঐতিহাসিকরা নারী ইতিহাস আলোচনায় জাতীয়বাদী প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। Joanna Liddle এবং Roma Joshi তাদের 'Daughters of Independence' গ্রন্থে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল "women could not envisage an independent programme for they had to find their understanding of women's participation within the conceptional framework of the national movement'. স্পষ্ট করে বলা যায় জাতীয় আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। Partha Chatterjee 'Recasting Women' (1989) গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে 'Nationalism' এবং 'Women Question' এর মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে জাতীয়তাবাদ 'Women Question' এর সমাধান করেছে।

K.Lalita 'Women Writing in India' (1991-1993) গ্রন্থে কৃষক সংগ্রামে নারীদের ভূমিকার কথা বলেছেন। তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বলেছেন।

বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা নারী ইতিহাস রচনার ফলে নারী ইতিহাসচর্চা বর্তমানে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। তাই বিভিন্ন যুগে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে বর্তমানে ইতিহাস রচনায় 'male and elite perspective'-এর সঙ্গে সঙ্গে নারী ইতিহাসও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। যার উদ্দেশ্য হল ঃ Building a new comprehensive history in which women are given a proper palce as par with man".

প্রশ্ন ১। ভারতীয় ইতিহাস চর্চার নারীদের অবহেলিত হওয়ার কারণগুলি কি ছিল?

১.৫.১৪.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (References Books)

1. Sanjay Subrahmanyan (ed) : Money and Market in India; 1100-1700.
2. Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital : Rural Bengal since 1770.
3. Sumit Guha : The Agrarian Economy of the Bombay-Deccan,1881-1941.
4. R.S. Rungta : The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900.
5. R.K. Ray (ed) : Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947.
6. T. Roy : Traditional Industry in the Economy of Colonial India.
7. Burton Stein and Sanjay Subrahmanyan (ed) : Institutions and Economic change in South Asia.

8. Dwijendra Tripathi (ed) : Business Communities of India.
9. A.K. Banerjee : Aspects of Indo-British Economic Relations, 1858-98.
10. Ranajit Guha : Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.
11. Narahari Kabiraj : A Peasant Uprising in Bengal.
12. Narahari Kabiraj : Wahabi and Farazi Rebels of Bengal.
13. Blair B. Kling : The Blue Mutiny : The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1862.
14. Majid Siddiqui : Agrarian Unrest in Northern India : The United Provinces 1918-32.
15. E.D. Murphy : Unions in Conflict : A Comparative Study of Four South Indian Textile Centres, 1918-1939.
16. Samita Sen : Women and Labour in Late Colonial India : the Bengal Jute Industry.
17. H.J McCloskey : Ecological Ethics and Politics.
18. D.E. Worster : Nature's Economy : The Roots of Ecology.
18. William Tucker : Progress and Privilege: America in the Age of Enviromentalism.
19. বিনয়ভূষণ রায় : উনিশ শতকে বাংলার বিজ্ঞান সাধনা।
20. C.A. Bentley : Malaria and Agriculture in Bengal.
21. Pandita Ramabai : The High Caste Hindu Worman.
22. B.C. Law : Women in Buddhist Leterature.
23. Bharati Ray (ed) : From the Seams of History : Essays on Indian Women.
24. Usha Chakraborty : Condition of Bengali Women around the second half of the Nineteeth century.

১.৫.১৪.৪ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Write a note on the role of technology in modern history.
2. Discuss some of the historical works on science, technology and environment.
3. Why did the early writers of Indian history relegate women to the background?

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

একক ১৫

Social History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৬.১৫.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৬.১৫.১ ঃ ইতিহাসে বিতর্ক (Debates in History)

১.৬.১৫.২ ঃ ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ (১৫৪২ খ্রীঃ)

১.৬.১৫.৩ ঃ হেনরী পিনের বিতর্ক

১.৬.১৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

১.৬.১৫.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

১.৬.১৫.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন ঃ

১) ইতিহাস বিতর্কের কারণ

২) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য ও নানা অভিমত

৩) হেনরী পিরেনের তত্ত্ব

৪) এই তত্ত্ব নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক

৫) এই তত্ত্বের গুরুত্ব

১.৬.১৫.১ ঃ ইতিহাস বিতর্ক

ইতিহাস চর্চার একটি প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক। বিক্ষিপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ ঐতিহাসিক নথিপত্রের ফলে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা বোর সুযোগ ঘটে।

ইতিহাস চর্চার একটি প্রধান বিষয় হল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক বিতর্ক। কারণ এই বিতর্কের সাহায্যেই আজ সমৃদ্ধশালী হয়েছে ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস চর্চার জগৎ।

সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক বিতর্কের। তবে এই বিতর্কই ইতিহাসকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। ঐতিহাসিক আর্থার মারউইক অবশ্য মনে করেন, বিতর্ক দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, এর ফলে ইতিহাস গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ অতীত সম্পর্কে গভীর বোধ বা অনুভূতির সৃষ্টি ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক বিতর্ক ইতিহাস চেতনার প্রসারে সাহায্য করে, মতানৈক্যের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয় এবং নথিপত্রগুলি নতুনভাবে পরীক্ষিত হয়। এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই অদ্ভুত হয়েছে ইতিহাসের অনেক নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন তত্ত্ব। আবির্ভাব ঘটেছে নতুন নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর। এর ফলে ইতিহাসের অন্তরালে জমে থাকা অনেক নতুন তথ্য ও ঐতিহাসিক সত্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়েছে। সমৃদ্ধশালী হয়েছে ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাসের জগৎ।

১.৬.১৫.২ ঃ ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রীঃ)

এমনই একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয় হল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রীঃ)। এই গৃহযুদ্ধের কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে।

লং পার্লামেন্ট (Long Parliament) কেন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল — এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের প্রকৃতির ব্যাখ্যা অন্তর্নিহিত আছে। লং পার্লামেন্টের বিভাজনের প্রকৃত কারণ অথবা গৃহযুদ্ধের চরিত্র কী ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করেন। রাজতন্ত্রী ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিবে কেন হয়েছল তা বুঝতে হলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধর্মীয়, সাংবিধনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্যগুলি আলোচনা করা দরকার। স্টুয়ার্ট আমলে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করার মতো। কতগুলি ধর্মীয় নমীতি ও নিয়ম ইংল্যাণ্ডের জনগণের উপর চাপানোর ফলে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যায়। যদি রাজা চার্লস এবং আর্চবিশপ লড 'প্রেয়ার বুক' জোর করে চাপানোর চেষ্টা না করতেন তা হলে হয়তো লং পার্লামেন্ট ডাকার দরকার হত না।

১৬৪২ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ খুঁজে পেতে হলে আমারে লং পার্লামেন্ট কেন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল এবং রাজা ও পার্লামেন্টের অধিকারের বিরোধ– এই দুটি বিষয় জানা দরকার।

আর্চবিশপ লড কর্তৃক নানান ধরনের ধর্মীয় আচার ও নিয়মকানুনের পরিবর্তন ইংল্যাণ্ডের পিউরিটান জনগণকে আহত করেছিল। পার্লামেন্ট যখন নতুন বিশপের নতুন নিয়মকানুনের প্রতিবাদ করল তখন তারা খুব সহজেই ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের সমর্থন পেল। পরবর্তীকালে এই ধর্মীয় নীতি নিয়ে পার্লামেন্টের বিবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে জনসাধারণ অব্যাহত পায়নি। গৃহযুদ্ধের সময় এই ধর্মীয় বিরোধের প্রতিফলন নিশ্চিতভাবে পড়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের সাংবিধানিক পটভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একদিকে রাজার প্রচলিত বিশেষ ক্ষমতা ভোগের দাবী এবং অন্যদিকে পার্লামেন্টের ধর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, বৈদেশিক নীতি, কর স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে

অধিকার অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টা দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিফলন গৃহযুদ্ধের মধ্যে খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রাজা চার্লস যখন বললেন, "Parliamentary Privileges had their l/imitations and since they emanated from the grace and the permission of the king and they were never above Remembers of the Parliament" তখন বিক্ষুব্ধ পার্লামেন্ট জানাল "The privileges of the Parliament are the birthrights and due inheritance of the people of England". এইজন্য ঐতিহাসিক গার্ডিনার গৃহযুদ্ধকে 'Puritan Revolution' বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ তার মতে এই যুদ্ধ ছিল পার্লামেন্টের ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান গার্ডিনারের মত সমর্থন করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, "In motive the great rebellion wsas a war not of clauses but of ideas."

যদিও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে গার্ডিনার ও ট্রেভেলিয়ানের ধ্রপদী ব্যাখথ্যা একনো পর্যন্ত অব্যাহত আছে তবুও আধুনিক ঐতিহাসিকরা মধ্য সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পিউরিটান রেভোলিউশনের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা রইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদের সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র বিভিন্ন রধরনের মতামতই নয়, ঐতিহাসিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মতও প্রকাশ পেয়েছে।

গৃহযুদ্ধের আধুনিকতম ব্যাখ্যা হল যে সমাজের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শক্তিগুলির বিরাট রূপান্তর ঘটেছিল।

(১) অধ্যাপক টনি দেখিয়েছেন যে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জমি পুনঃবন্টনের ফলে যে সম্পত্তিগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছিল, তার প্রতিবিধান করার জন্য গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। টনির মতে, একটি নতুন জেন্ট্রি বা জমিদার শ্রেণী ইংল্যান্ডের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল।

(২) টনির মতে, জেন্ট্রিরা Capitalism এর পক্ষে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল টনি ও তার সমর্থকদের মতে, গৃহযুদ্ধের সময় শ্রেণী সংগ্রাম ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। যখন স্টুয়ার্ট রাজারা রাজত্ব করতে আসেন তখনই জেন্ট্রি পরিচালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজ জড়গণের মধ্যে সবচেয়ে কর্মক্ষম শ্রেণী হিসাবে পরিচিত ছিল। এই নতুন জেন্ট্রি শ্রেণীর উত্থান টিউডর আমল থেকে শুরু হয়েছিল। তারা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহী করে তুলেছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই দুই পক্ষের প্রচার যুদ্ধ চলেছিল। এতে যেমন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অংশগ্রহণ করেছিল তেমনি অপরদিকে ধনী ও জমিদাররা বাদ যায়নি।

টনির Thesis-এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন অধ্যাপক ট্রেভার রোপার।

(ক) তিনি মনে করেন না যে নব জাগ্রত পিউরিটানিজমের সঙ্গে ক্যাপিটালিজমের সমীকরণ সঠিক।

(খ) তিনি এটা মনে করেন না যে যুদ্ধের পূর্বে এই জেন্ট্রি শ্রেণীর উত্থান হয়েছিল। অপরদিকে তিনি কতগুলি উদিাহরণ দিয়ে দেখান যে এক শ্রেণীর জমিদারদের উত্থান নয় বরং পতন শুরু হয়েছি। ট্রেভার রোপার ক্রমওয়েলকে একজন 'ক্ষীয়মান ভদ্রলোক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "The great rebellion was not the clear headed self-assertion of he rising bourgeoisie

and the gentry but rather the blind protest of the depressed gentry." তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, জেন্ট্রিদের একাংশ বা mee gentry অন্য এক ধরনের court gentry-দের বিরোধিতা করে ও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। অধ্যাপক রোপার এই mere gentry-দের Round heads-দের সঙ্গে এবং court gentry-দের Cavalier সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অধ্যাপক ক্রিস্টোফার হিল বলেছেন যদি আমরা ক্রমওয়েলের মত Independent কে declining gentlemen-এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বোধহয় গৃহযুদ্ধের প্রকৃত চরিত্র পাওয়া যাবে না। কারণ যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ওয়েস্টমিনিস্টারের নেতৃত্বে Independent-দের হাতে ছিল না। বরং ওয়ারউইক এসেক্স, হ্যাম্পডেন প্রমুখ পিয়ারদের হাতে তা ছিল। হিলের মতে, Independent রা যুদ্ধ জয়ের বড় হাতিয়ার হলেও তারা গৃহযুদ্ধ শুরু করেনি।

কিন্তু আধুনিক গবেষকরা গৃহযুদ্ধের অর্থনৈতিক বক্ত্র্যাখ্যার ওপর অত্যধিছক গুরুত্ব আরোপ মেনে নিতে পারেননি। ওদের মতে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড কখনোই পরিষ্কারভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়নি। উভয়পক্ষই ব্যবহারজীবি, 'country gentlemen' এবং 'Universit graduate-দের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। এমনকি ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। কেবলমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ব্রানটন ও পেনিংটন পার্লামেন্টের সদস্যদের Family, Local, Economic এবং Patronage এর উপর ভিত্তি করে নানাভাবে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তাদের মতে, এই প্রতিটি গ্রূপ কোন বিশেষ আদর্শ ও নীতরি দ্বারা একতাবদ্ধ ছিল না। সুতরাং তাদের মতে, গৃহযুদ্ধকে কখনোই শ্রেণীসংগ্রাম বলা যায় না।

অধ্যাপক হিল, ব্রন্টন ও পেনিংটন-এর বক্তব্যের প্রতিয়বাদ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে লতাদের বিশ্লেষণের মদ্যেই দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের সদস্যদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তাঁর মতে ব্রান্টন ও পেনিংটন landed এবং mercantile interest-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাননি।

আসলে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের মূলে ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য। কারণ একদিকে ধনী ও সাধারণ মানুষ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল এবং অন্যদিকে উচ্চশ্রেণী ও জমিদার যারা রাজাকে সমর্থন করেছিল এবং এই দুই এর সংঘাতেই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

হিল, ব্রানটন ও পেনিংটন-এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক বিভাজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ তাঁর মতে, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল এবং রতারা পার্লামেন্টেরীয়দের সমর্থক ছিল। তুলনায় উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল আর্থিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল এবং তারা Royalist দের সমর্থন করত। তবে হিল এবং ব্রান্টন ও পেনিংটন সকলেই একমত যে পার্লামেন্টের সদস্যরা গোষ্ঠীবদল করত। দেখা গেছে অনক সদস্য যারা প্রথমে রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তারাই পরে Royalist-দলে যোগদান করেছিল।

এর মধ্যে আমরা হিল এ মতামতকেই গুরুত্ব দিতে পারি। হিল বলেছেন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পার্থক্য গৃহযুদ্ধের মূলে ছিল। তিনি মনে করেন, ধমী ও সাধারণ মানুষ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল এবং উচ্চশ্রেণী ও জমিদার শ্রেণী যারা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল না তারা রাজাকে সমর্থন করেছিল। গৃহযুদ্ধের জন্য ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক পার্থক্য অনেকাংশে দায়ী ছিল।

প্রশ্ন

১। ১৬৪২ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের মূল বিতর্কগুলি কি?
২। ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের সম্পর্কে ক্রিস্টোফার হিল এর বক্তব্য কী?

১.৬.১৫.৩ ঃ হেনরী পিরেন বিতর্ক

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান জগৎ, ইসলামীয় সাম্রাজ্য এবং ক্যারোলিঞ্জিয় রাজ্যের বিকাশের উপর আরবদের সম্প্রসারণের প্রভাব সম্পর্কে বেলজিয়ান ঐতিহাসিক হেনরী পিরেনের অভিমত ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। 'Medieval Cities' নামক গ্রন্থে পিরেন-এর মতবা প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর 'Muhammad And Charlemagne' গ্রন্থে তাঁর সিদ্ধান্ত তত্য ও পরিসংখ্যান দ্বারা সমর্থিত হয়। তাঁর বক্তব্য ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজকে বিস্মিত করেছিল। হেনরী পিরেনোর মূল বক্তব্য হল ঃ খ্রীষ্টীয় চতুথ৪ ও পঞ্চম শতকে বর্বরজাতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক যে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি, তা সপ্তম শতকে ইসলামর শক্তির অসামান্য বিস্তারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পরোক্ষভাবে ইসলামই ছিল ফ্রাঙ্করাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ।

পিরেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের মধ্যে ভেদরেখাকে কৃত্রিম ও অবান্তর বলে মনে করতেন। তঁ—ার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসের ছেদ চিহ্ন বলে মনে করতেন। পিরেন এই মত মেন নেননি। তাঁর মতে, বর্বর আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের আয়তদন হ্রাস পেলেও তার রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়নি। রোমান সব্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষত থাকে। বৃদ্ধি পায় ভূমধ্যসাগরের উপর নির্ভরতা। ভূমধ্যসাগরের আমদানী বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। রোমানদের জীবনে বর্বরদের রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটলে তাদের সাময়িক জয়ের ফলে জার্মান সংস্কৃতি রোমান সংস্কৃতির স্থান দখল করতে পারেনি। রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ৪৭৬ খ্রীঃ থেকে ফ্রাঙ্কশাসক শার্লামেনের আবির্ভাব পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক ইতিহাসের মধ্যে কোন ছেদ হেনরী পিরেন দেখতে পাননি। মেরোভিঞ্জিয়ান আমলে আগের মতই প্রাচ্য দেশগুলর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন অব্যাহত ছিল। হেনরী পিরেন মনে করেন, বর্বর আক্রমণের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক জগতের শ্রী ও সমৃদ্ধি হ্রাস করলেও কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অপমৃত্যু ঘটেনি। বর্বর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী নগরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বেশিরভাগ নগরের সজীবতা বজায় ছিল। নগরগুলির পৌর চরিত্র বিনষ্ট হয়নি। পিরেন পরবর্তীকালের নগরগুলিতেও রোমান নামে অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন।

পিরেন মনে করেন, বর্বর আক্রণ সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার অব্যাহত গতি কেবলমাত্র সপ্তম শতকে ইসলামীয় শক্তির অভিঘাতে স্তব্ধ হয়ে যায়। ইসলামের দিগ্বিজয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চীন সাগর থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত ভূভাগে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় অপ্রতিহত গতিতে। মুসলমানদের অকস্মাৎ আক্রমণ ও অভূতপূর্ব সাফল্যে ইউরোপের ইতিহাসের ধ্রুপদী অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। রোমান আইএনর জায়গা দখল করল মুসলমান আইনকানুন। গ্রীক ও লাতিনের স্থান অধিকার করল আরবী। সুদীর্ঘকালের রোমন প্রভাবাধীন ভূমদ্যসাগর 'মুসলমান হ্রদে' পরিণত

হল। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৬৫০ খ্রীঃ থেকে আরবদের হস্তগত হবার ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পশ্চিম ইউরেপের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পিরেন মনে করেন, অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপ হয়ে পড়েছিল নিঃসঙ্গ অবরুদ্ধ। পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দু ভূমধ্যসাগর থেকে সরে গেল উত্তর ইউরোপে। রোমের জায়গা দখল করল আখেন। বহু শতাব্দীর পুরানো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ছিন হল পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। হেনরী পিরেন মনে করেন, এভাবেই ইউরোপে ধ্রুপদী যুগের অবসান ঘটেছিল এবং মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পিরেন-এর মতে, ক্যারোলিঞ্জিয় অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনাই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মুসলমান শক্তির বিস্তারের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইসলামের বিজয় ক্যারোলিঞ্জিয় ফ্রাঙ্কদের ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হতে সাহায্য করেছিল। যে ফ্রাঙ্করা এতদিন লাতিন ইউরোপে অনুজ্জ্বল ভূমিকায় ছিল, তারা ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে আসার সুযোগ পেল। ইসলামীর অভিঘাতে সৃষ্ট ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শূন্যতা পূর্ণ করা ও ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব ফ্রাঙ্কদেরই নিতে হয়েছিল। ভূমদ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমী সভ্যতার অশিষ্টকে কেন্দ্র করে রোমে এক নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম হয়। সৃষ্টি হয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের যা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবমুক্ত। সুতরাং পরোক্ষভাবে মুসলমানগণই ছিল ফ্রাঙ্ক রাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ। অর্থাৎ ''মহম্মদই শার্লামেনকে সম্রাট করেছিলেন''। পিরেন মনে করেন, ইসলামী আক্রমণের ফলেই অষ্টম শতংকের শুরুতে প্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে পশ্চিম ইউরোপ অবরুদ্ধ হয়। এই অবরুদ্ধ অর্থনীতির ফলে উদ্ভব হয় সামন্ততন্ত্রের । পিরেন-এর মতে শার্লামেন সামন্ততন্ত্রের ফল। এ প্রসঙ্গে পিরেনের বিখ্যাত মন্তব্যটি স্মরণীয়— "Without Islam, the Frankish Empire would probably never have existed and Charlemagne without Muhammad would be inconceivable." তাঁর মতে, কতকগুলি অর্থনৈতিক কারণ এবং ঘটনাবলী এই দুই ব্যক্তির জীবনকে যুক্ত করেছিল। পিরেন-এর সব শেষ বক্তব্য হল — সকল ক্ষেত্রেই শার্লামেনের যুগকে পুনরুজ্জীবনের যুগ বলে মেনে নেওয়া হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ধারণা সঠিক নয়।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান জগৎ, ইসলামীয় সাম্রাজ্য এবং ক্যারালিঞ্জিয় রাজ্যের বিকাশের উপর আরবদের সম্প্রসারণের প্রভাব সম্পর্কে হেনরী পিরেনের বক্তব্য হল ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বর্বরজাতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক যে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি, তা সপ্তম শতকে ইসলামের শক্তির অসামান্য বিস্তারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আসলে পরোক্ষভাবে ইসলামই ছিল ফ্রাঙ্করাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ।

হেনরী পিরেনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই তা গ্রহণ করতে রাজী নন। আধুনিক গবেষণা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের পিরেন-এর মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলেই জন্মলাভ করেছে পিরেন বিতর্ক।

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক আর. এইচ. সি. ডেভিস যুক্তি দেখিয়েছেন যে মুসলমান আক্রমণের আগেই ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের অবনতি দেখা দিয়েছিল। তাঁর মতে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য চার শতক ধরে হ্রাস পেতে থাকে এবং সপ্তম শতকের শেষে তা চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য ডেভিস মনে করেন যে মুসলমান আক্রমণই এই বাণিজ্যিক পতনের জন্য দায়ী করা সমীচীন হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, রবার্ট লোপেজ ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য থেকে কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের অন্তর্হিত হওয়া সম্পর্কে পিরেনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। লোপেজের মতে, পিরেন কর্তৃক উল্লিখিত চারটি অন্তর্হিত হওয়া দ্রব্যের মধ্যে তিনটি—স্বর্ণমুদ্রা, বস্ত্র ও প্যাপিরাসের উপর মেরেভিঞ্জিয়ান সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ছিল। পিরেন বলেছেন, আরবরা ৬৩৯ খ্রীঃ থেকে ৬৪২ খ্রীঃ এর মধ্যে মিশর অধিকার করে এবং একমাত্র মিশরেই প্যাপিরাস তৈরী হত। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে লোপেজ দেখিয়েছেন যে ৬৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত মেরোভিঞ্জিয়ান চ্যান্সারিতে সরকারী কাজে প্যাপিরাস ব্যবহৃত হত।

তৃতীয়তঃ, ড্যানিয়েল সি, ডেনেট ও এ্যান রাইসিং যুক্তি দেখিয়েছেন যে সপ্তম অথবা অষ্টম শতকে আরবদের ভূমধ্যসাগর বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল এবং তারা ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য থেকে পশ্চিমকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এমন কোন প্রমাণ নেই।

চতুর্থতঃ, ডেভিস প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে অষ্টম শতকের প্রথমে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য হয়েছিল, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই প্রমাণ কি আছে যে মুসলমান আক্রমণের ফলেই এই বাণিজ্য বন্ধ হয়েছিল?

সুতরাং, হেনরী পিরেন-এর 'catastrophic' বা 'আকস্মিক বিপর্যয়'-এর তত্ত্বটি মেনে নেওয়া কঠিন। আরবদের অতর্কিত আক্রমণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধ্বংস হয়নি। পিরেন যতটা অনুমান করেছিলেন মহম্মদ-এর জীবন ইউরোপের ঘটনাবলীকে ততটা প্রভাবিত করেনি। তবুও একথা বলা যায় যে, যদিও পশ্চিমী বাণিজ্যের আকস্মিক বন্ধ হওয়ায় ঘটনাটি অতিরঞ্জিত তবুও আগের তুলনায় অষ্টম ও নবম শতকে যে বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল সেদিকে পিরেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রশ্ন

১। হেনরী পিরেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপেই ইতিহাসের মধ্যে ভেদরেখাকে দ্বিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

২। হেনরী পিরেন কোন দেশের ইতিহাসিক এবং তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।

১.৬.১৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

1. অমলেশ ত্রিপাঠী : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
2. Arthur Marwick : The Nature of History
3. Albert Soboul : Understanding the French Revolution
4. g. M. Trevelyan : English Social History
5. D. H. Pennington : Seventeenth Century Europe
6. L. W. Owie : Seventeenth Century Europe.
7. Sumit Sarkar : Modern India
8. R. C. Majumdar : The sepoy Mutiny and The Redvolt of 1857
9. The Cambridge Economic History fo Europe.

১.৬.১৫.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Analyse the debate among historians on the nature of the Civil War in England.
2. Do you think that the civil War in England was a 'Puritan Revolution'?
3. 'Charlemagne without Muhammed would be inconceivable'—Do you agree with this view of H. Pirenne.
4. Evaluate the importance of Pirenne Thesis.

একক ১৬

Economic History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৬.১৬.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৬.১৬.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং তার প্রকৃতি

১.৬.১৬.২ ঃ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ—যুগ সন্ধিক্ষণের বিতর্ক

১.৬.১৬.২.১ ঃ মরিস ডব ও পল সুইজি

১.৬.১৬.২.২ ঃ মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার

১.৬.১৬.৩ ঃ ফরাসী বিপ্লব কি বুর্জোয়া বিপ্লব?

১.৬.১৬.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

১.৬.১৬.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

১.৬.১৬.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক বিতর্ক সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থনৈতিক ইতিহাস ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে। সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলিতে অর্থনৈতিক ইতিহাস কিভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে — তা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস পাঠ করে শিক্ষার্থী দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক যথা ঃ (১) সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ এবং (২) ফরাসী বিপ্লব একটি বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল কিনা সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

১.৬.১৬.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং তার প্রকৃতি

অর্থনৈতিক ইতিহাস মূলত অর্থনৈতিক এবং অতীতে ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত চর্চা। প্রধানত ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের একত্রে প্রয়োগে এই ধরনের ইতিহাসের আলোচনা সংঘটিত হয়। বর্তমান সময়কালের ঐতিহাসিক আলোচনায় অর্থনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় মূল্যহীন। সামাজিক ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে মূলত আর্থিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাস, জনসংখ্যাগত এবং শ্রমিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধীনস্থ। উল্লেখ্য অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত চর্চা 'Cliometrics' নামেও পরিচিত।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে জার্মানিতে Gustav Von Schmoller এর অধীনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী Historical School of Economic History) গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা পরিমাণগত এবং গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করেছিলেন। সমগ্র বিংশ শতক জুড়ে তাদের আলোচনায় প্রধানত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পেয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসার ঘটান William Ashle (1860-1927)। ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক George Unwin। ফ্রান্সে অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রসারিত হয়েছিল অ্যানাল ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দ্বারা। প্রধানত 'Annales', 'Histoire', 'Sciences Sociales' ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসার ঘটান।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি বহুল চর্চিত বিষয়। প্রধানত কৃষিজীবি এবং বাণিজ্যিক সমাজ থেকে ভারত কিভাবে শিল্পোন্নত তথা মিশ্র অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হল, তা অর্থনৈতিক ইতহাসের মূল বিষয়বস্তু। হরপ্পা সভ্যতার (৩৩০০-১৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে) বাণিজ্য, ষোড়শ মহাজনপদের সময়কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাণিজ্য, নগরায়ণের বিকাশ, ৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে মৌর্য যুগের কৃষি ও বাণিজ্যের মেলবন্ধনে এক অভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দিল্লী সুলতানি যুগের ইকতা, রাজস্ব ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরীক্ষ-নিরীক্ষা, এরপর মুঘল যুগের রাজস্ব ব্যবস্থা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, বাণিজ্য, সম্পদের নির্গমন, অবশিল্পায়ন, রেলপথের প্রসার, কৃষির বাণিজ্যকরণ দেশীয় শিল্পের প্রসার ইত্যাদি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু। ডি. ডি. কোশাম্বী, রোমিলা থাপার, ডি. এন. ঝাঁ, ঈশ্বরী প্রসাদ, ইরফান হাবিব, সুমিত সরকার, রজনীপাম দত্ত, অমিয় বাগচী, তীর্থঙ্কর রায়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রমুখ ভারতীয় ঐতিহাসিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা আলোচনা করেছেন।

সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চায় ঐতিহাসিক বিতর্কগুলি একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত বিতর্ক বরাবরই আকর্ষণীয় এবং ইতিহাসচর্চাকে তা বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। সাধারণত নিত্যনতুন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদঘাটনে আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিতর্কগুলিতে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণত এই বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে গতিপ্রকৃতি নির্ধারণকারী অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কারণ সেগুলি ইতিহাসে খুবই প্রাসঙ্গিক। এদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব, ইউরোপে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ এবং ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলি আলোচনা করা হবে।

১.৬.১৬.২ ঃ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ — যুগ সন্ধিক্ষণের বিতর্ক

অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক — যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঐতিহাসিকেরা একটি বিষয়ে একমত হয়েছন। এটি হল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সামন্ততন্ত্র তীব্র হয়ে উঠেছিল। তবে ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। উল্লেখ্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা

একমত হলেও এর পতনের কারণ সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারেননি। কারণ এটি শুধু এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসানই নয়, বরং এর সঙ্গে অপর একটি যুগ ব্যবস্থার উত্থানের প্রশ্নও জড়িত আছে। যা ধনতন্ত্র নামে পরিচিত। এই রূপান্তরের ঘটনা এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিংশ শতকের গোড়ায় এক বিতর্ক দেখা দেয় — যা 'যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক' বা 'Transition debate' নামে পরিচিত। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের হাত ধরে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রথাকে, তার পদ্ধতিকে, এবং নিয়মপ্রণালীকে ঘিরে পণ্ডিত মহলে প্রচুর মতামত আছে। তিনপ্রকার গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমতঃ ডব-সুইজি; দ্বিতীয়ত ঃ মাইকেল পস্টান ও বরার্ট ব্রেনার এবং তৃতীয়তঃ হবসবম—ট্রেভর — রোপার। এক্ষেত্রে প্রথম দুটি বিতর্ক বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

১.৬.১৬.২.১ ঃ মরিস ডব ও পল সুইজি

ব্রিটিশ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ মরিস ডব ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'Studies in the Development of Capitalism' গ্রন্থে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার পতন সম্পর্কে দুটি অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভরকেন্দ্র ভূমিদাস প্রথার অবসানই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের সূচক। দ্বিতীয়তঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের জন্য দায়ী ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় নিহিত অন্তর্বিরোধ। মূলত ডবের আলোচনায় সামন্ততন্ত্রের পতন উৎপাদন সম্পর্কের বা Production relation-এর মধ্যেই নিহিত ছিল।

ডবের মতে, দশম শতাব্দীতে কৃষি নির্ভর ইউরোপীয় অর্থনীতিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত মানুষ স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির চাপে সামন্তপ্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে ভূমিদাসে পরিণত হয়। প্রতিটি সামন্তপ্রভুর অধীনস্ত এলাকা বা ম্যানর-এ বসবাসকারী ভূমিদাস বা সার্ফরা জমির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে গণ্য হত। এই ভূমিদাস প্রথাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ম্যানরে যা উৎপন্ন হত তা ম্যানরেই সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যেত। ম্যানরের বাইরে বা বাজারে কেনাবেচার কোনো উদ্দেশ্যে উৎপাদনের কোনো তাগিদ ছিল না। তাই সামগ্রিকভাবে এই ধরনের অর্থনীতিকে বলা হত Economy of no outless।

কিন্তু সাধারণত ম্যানরে ব্যবহার হয় এমন অধিকাংশ বস্তু ম্যানরে প্রস্তুত হলেও কিছু দৈনন্দিন জিনিসপত্র যেমন— নুন, মশলা ইত্যাদি ম্যানরের বাইরে থেকে আনতে হত। —যা যোগান দিত বণিকেরা। ম্যানরের দুষ্প্রাপ্য পণ্যের পরিবর্তে এঁরা ম্যানর থেকে শস্য এবং খাদ্য বা পণ্যদ্রব্য নিময়ে নগরবাসীদের চাহিদা মেটাতেন। একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে ইউরোপীয় দুরবাণিজ্যের প্রসার ঘটলে এই বণিকেরা সুদূর এশিয়া থেকে আমদানি করা পণ্যদ্রব্য (যেমন — মশলা, রেশম, মসলিন, ধূপ ইত্যাদি) ইউরোপের প্রায় সর্বত্র পৌঁছে দেন। ইউরোপের এক প্রান্তের জিনিস (যেমন উত্তর ইউরোপের পশম, পশুচামড়া, ফরাসি মদ) অন্য প্রান্তের বাজারে পৌঁছাতে থাকে।

তবে ডবের মতে, উন্মুক্ত বাণিজ্যিক দিগন্তই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ নয়। তাঁর মতে, বণিকদের দ্বারা ম্যানরের বাইরে থেকে আনীত নতুন নতুন এবং মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য সামন্তপ্রভুরা প্রজাদের উপর বাড়তি কর চাপাতে থাকেন। পশ্চিম ইউরোপের বাড়তি করের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় ভূমিদাস ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী নগরাঞ্চলে বা জঙ্গলে গা ঢাকা দিত। ভূমিদাস প্রথার আইন অনুসারে কোনো ভূমিদাস যদি পালিয়ে গিয়ে একবছর গা ঢাকা দিতে সফল হত, তবে সে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেত। এহেন পরিস্থিতিতে সামন্তপ্রভুরা তাদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে চাইতে শুরু

করে। একে বলে 'খাজনা নগদীকরণ'। ডবের মতে, এটিই ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের সূচক। কারণ নগদীকরণের পরে সামন্তপ্রভুদের উৎপাদনের উপর পূর্ববৎ নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ আর ছিল না। ইতিমধ্যে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে প্রজারা ম্যানরের বাইরে বাজারের জন্য উৎপাদন করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ডব বলেছেন, 'there sems, in fact, to be as much evidence that the growth of money economy per se led to an intensification of serfdom as there is evidence that it was the cause of the feudal decline.'

ডবের মতে, মামুলি প্রযুক্তি, সাধারণ উৎপাদনের সাধন দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন বিশাল বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না বলেই ভূমিদাসরা পালাতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে সামন্তপ্রভুরাও উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে চাহিদা এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভবপর ছিল না। চাহিদা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিরোধকেই ডব সামন্ততন্ত্রের 'অন্তর্বিরোধ' (Internal Contradiction) বলেছিলেন। ডবের মতে, যেসব ভূমিদাসরা পালাতে পারত না, তাদের পুরানো ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত শ্রম দিতে হত। এছাড়া তাদের সংখ্যাও খুব অল্প ছিল। এই পরিস্থিতিই সামন্তপ্রভুদের কিছু কিছু উপযোগী উপায় যেমন—শ্রমের নগদ মজুরী, ভাড়াটিয়া কৃষকদের (Tenant farmers) খাসজমি লিজ দেওয়া প্রভৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল—এটিই শেষ পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল সুইজি ডবের এই অন্তবিরোধের তত্ত্ব মানেন না। সুইজির দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্রের অবসানে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে দূরবাণিজ্যের প্রসারই ছিল একমাত্র চালিকা শক্তি। ১৯৫০ সালে 'Science and Society' নামক পত্রিকায় সুইজি 'Feudalism : A Critique' প্রবন্ধে বলেছেন, একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে পৃথকভাবে ভূ-মধ্যসাগরীয় এবং উত্তর সাগরীয় বাণিজ্য বাড়তে থাকার ফলে পশ্চিম ইউরোপের নগরজীবন জঙ্গম হয়ে উঠতে শুরু করে। ধর্মযুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকা খ্রিষ্টীয় চেতনা ইউরোপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে ইতালিয় বণিকেরা ভূ-মধ্যসাগরীয় এশিয়া এবং আফ্রিকার পণ্যসম্ভার নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে প্রবেশ করতে থাকেন। ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স, রাইনল্যাণ্ড প্রমুখ অঞ্চলে বণিকদের সঙ্গে এই ইতালিয় বণিকদের বাৎসরিক মিলন ক্ষেত্র ছিল শম্পান (Champagne) মেলা। এই আন্তঃ ইউরোপীয় বাণিজ্য পথকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-মধ্য ইউরোপের অসংখ্য নতুন নগরের পত্তন হয় বা ক্ষয়িষ্ণু বহু নগর পুনর্জীবন লাভ করে।

সুইজির মতে, এই নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ। এই সময় নগরবাসীদের চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। নগরাঞ্চলে ম্যানরের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের (শস্য, সবজি ইত্যাদি) চাহিদা বাড়ার কারণে নগদীকরণ প্রক্রিয়াও কার্যকরী হয়েছিল। অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ পলায়নোন্মুখ প্রজারা পশিচম ইউরোপের নগরাঞ্চলে আশ্রয় নিলে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এর ফলে ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্রও আয়তন বাড়তে থাকে। উৎপাদন এই সময় ক্রমশ বাজারমুখী হয়ে পড়লে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অবসান ঘটে সামন্ততন্ত্রের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'It seems to me that the important conflict in this connection is nor between "money economy" and "natural economy" but between production for the market and production for use." যদিও তিনি বলেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতনে অর্থনীতির বাণিজ্যকরণ ছিল এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

১.৬.১৬.২.২ ঃ মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার

সমসাময়িক ইতিহাসবিদ মাইকেল পস্টান উভয়ের উপরোক্ত মতামত মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে, ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের মূল ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদি তারতম্যে। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষবিন্দু এবং অবসানের আলোচনাতেও মাইকেল পস্টান তাঁর জনসংখ্যা-বিষয়ক (demographic) তত্ত্বের অবতারণা করে দেখান যে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্কট তাঁর কাঠামোতে নিহিত ছিল না। তা ছিল সামন্ত সমাজের আয়তন এবং শক্তি বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

পস্টান বলেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে খদ্যের চাহিদাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু কৃষির উৎপাদনশীলতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে পূর্বের পতিত জমিগুলি তখন চাষ করা শুরু হয়। কৃষিজমির উপর চাপ বাড়তে থাকায় জমির উর্বরতা কমতে থাকে। পরিণামে খাদ্যমূল্য বাড়তে থাকে এবং সামন্তপ্রভুরা তাদের খাজনার পরিমাণ বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জমি ব্যবহারের বিনিময়ে ভূমিদাসের প্রদত্ত খাজনা নির্দিষ্ট থাকার ফলে সামন্তপ্রভুরা অন্যান্য খাতে বাড়তি খাজনা আদায় করতে সচেষ্ট হন। যেমন — অন্যান্য ধরনের জরিমানা, কর (taillage), সামন্তপ্রভুর জমিতে বাড়তি শ্রম (Labor Services)। জনসংখ্যা এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবনধারণের স্বার্থে কৃষিজীবী শ্রেণী সামন্তপ্রভুর উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শ্রমজীবী এবং জমির তুলনামূলক চাহিদা যোগানের নিরিখে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামন্তপ্রভুর অনুকূলে চলে যায়।

পস্টান এই মতামত তুলে ধরেন যে, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল জনসংখ্যাগত কারণেই। কৃষির উপর চাপ বৃদ্ধির কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতির কারণে ব্যাপক হারে জনসংখ্যায় হ্রাস পেতে শুরু করে। ফলস্বরূপ শ্রমের চাহিদা শ্রমের যোগানের তুলনায় বেশি হতে থাকে। চাষের কাজে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হারাবার আশঙ্কায় সামন্তপ্রভুরা খাজনার ভার কমানো ছাড়াও কৃষিজীবীদের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতেই খাজনার নগদীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রশস্ত হয় কৃষিজীবীর স্বাধীনতরা ক্ষেত্র। দুর্বল হতে থাকে ভূমিদাসপ্রথা এবং সামন্ততন্ত্র।

অপর একজন ব্রিটিশ মার্কসীয় ইতিহাসবিদ রবার্ট ব্রেনার সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ধনতন্ত্রের উত্থানের পথ ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে 'Past and present' পত্রিকায় ব্রেনার তাঁর 'Agrarian class structure and Economic Development in pre-industrial Europe' প্রবন্ধে 'বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্ব' এবং 'জনসংখ্যা তত্ত্ব'র মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের পতনের যুক্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, পশ্চিম ইউরোপের মত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও বাণিজ্য বিপ্লব সামন্তপ্রভুদের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে খাজনার নগদীকরণের ক্ষেত্র উপস্থিত ছিল। বাণিজ্যের পরিমাণ এতটা কম ছিল না যে, পূর্ব ইউরোপে নগরায়ণ সম্ভবপর হত না। ব্রেনার প্রশ্ন তুলেছেন যে, পূর্ব ইউরোপে তাহলে পশ্চিম ইউরোপের মত পরিবর্তন হল না কেন? অন্যদিকে জনসংখ্যা বিষয়ক বক্তব্য তুলে ধরে ব্রেনার আরো প্রশ্ন করেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপের দুটি দিকেই জনসংখ্যা বেড়েছিল, এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে দু'দিকেই জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। তাঁর মতে, একই ঘটনা পরম্পরার দুটি পৃথক পরিণত হবার কারণ কি?

ব্রেনার মনে করেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় রাজনীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাঁর মতে রাজনীতিক শক্তি সমাজের অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাজের আর্থ-সামাজিক চরিত্র নির্ধারণে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস খুব প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়ে থাকে। ব্রেনার বলেন যে, পশ্চিম এবং পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস একরকম ছিল না। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষ বিন্দুতেও পশিচম ইউরোপে (বিশেষত—ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল, নেদারল্যান্ডস) রাজশক্তি এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্ষমতার সংঘর্ষ তীব্র হয়। রাজশক্তি কোথাও সামন্ত শ্রেষ্ঠ হিসাবে (যেমন — ফ্রান্স) বা দেবাধিকার প্রাপ্ত শক্তি হিসাবে (যেমন— জার্মান শাসনাধীন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) রাজন্যবর্গের বা অভিজাতবর্গের মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয়। এর জন্য রাজাকে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হয় এবং তার সাধন যোগান দিতে পারত একমাত্র কৃষিজীবী মানুষ। তাই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর রাজশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় ছিল রাজকীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সামন্তপ্রভুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে রাখা। ঠিক এই কারণেই পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসত্বের তীব্রতম পরিস্থিতিতেও ভূমিদাসদের ন্যূনতম কিছু অধিকার ছিল যা সামন্ত প্রভুরাও লঙ্ঘন করতে পারত না। এছাড়া জনসংখ্যার চাপে অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার ব্যাপারে এবং নতুন বসতি পত্তনের ক্ষেত্রে এই কৃষিজীবীরা সামন্তপ্রভুদের অধিকার আরও সীমিত রাখতে সফল হয়। ফলে রাজশক্তি এবং প্রজাবর্গের মিলিত চাপে সামন্তপ্রভুরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা দেয় খাজনার নগদীকরণ, ভূমিদাস প্রথার অবসান এবং সামন্ততন্ত্রের পতন।

অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বাদ দিলে রাষ্ট্রশক্তি বলতে কিছু ছিল না। ফলে সামন্তশক্তির হাতেই সামগ্রিক নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত থাকার ফলে বণিকরা এই অঞ্চলে সম্পূর্ণত সামন্তশক্তির মুখাপেক্ষা হয়ে বাণিজ্য চালাত এবং এ থেকে লাভবান হয়েছিল শুধু সামন্ত শ্রেণী। এই কারণে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলেও রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে বলে মনে করতেন রবার্ট ব্রেনার।

উক্ত ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও মার্ক ব্লখ, রোদনী হিলটন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সামন্ততন্ত্রের পতনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, চতুর্দশ শতকেই সামন্ততন্ত্রের পতন তরান্বিত হয়। কারণ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপের অর্থনীতি এক সঙ্কটের মুখোমুখি হয় যা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে ধনতন্ত্রের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

১.৬.১৬.৩ ঃ ফরাসী বিপ্লব কি বুর্জোয়া বিপ্লব?

১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ফ্রান্সের ফরাসী বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরির্তনের সূচনা করেছিল। মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকারভোগী শ্রেণীর (যাজক ও অভিজাত) বিরদ্ধে অধিকারহীন শ্রেণীর (বুর্জোয়া, কৃষক, শ্রমিক, সাঁকুলেৎ প্রভৃতি) এই বিপ্লব ফ্রান্সে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সূচনা করেছিল। 'তৃতীয় এস্টেট' (অধিকারহীন) নিজেকে জাতীয় সভা হিসাবে ঘোষণা

করে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরোধিতা করেছিল। 'সাংবিধানিক সভা' ১৭৮৯ সালের ২৬শে আগস্ট 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা' (Declaration of the Right of Man and Citizen) করে সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে।

জাতীয় সভা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে ব্রতী হলে এই সভা সংবিধান সভায় রূপান্তরিত হয়। সংবিধান সভা ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে সংবিধান রচনার কাজ আরম্ভ করেছিল, ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তা শেষ হয়।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইতিহাসের যে বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তা হল ফরাসী বিপ্লবের চরিত্র বা প্রকৃতি নির্ণয় করা। উল্লেখ্য অর্থসঙ্কটে অসহায় এবং অভিজাত বিদ্রোহে ভীত ফরাসী রাজ ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অধিকারহীন তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছিল ধনী ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও চাকুরীজীবী বুর্জোয়ারা। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

ষোড়শ লুই জাতীয় সভা ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকে জাতীয় সভা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব ও অভিযোগগুলি জানাতে কেহিয়ার্স বা আবেদন পত্র পাঠাতে বলেন। উল্লেখ্য তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষ থেকে যে কেহিয়ার্সগুলি আসে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই কেহিয়ার্সগুলি রচনার সময় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরাই প্রধান ভূমিকা নেয়। ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে, শহুরে অধিবাসীদের কেহিয়ার্সে স্বচ্ছল কৃষকদের অভিমত প্রতিধ্বনিত হয়। কেহিয়ার্সগুলিতে জমি বন্টনের দাবী ছিল না। লাফায়েৎ বা মিরাব্যু (বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ) সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের বিপক্ষে ছিলেন না। প্রধানত অপ্রতিহত স্বৈরতন্ত্র থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণী মুক্তি চেয়েছিল। অর্থবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর বুর্জোয়ারা পুরানো ব্যবস্থায় নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের বাধাকে সরাতে চেয়েছিলেন।

জাতীয় সভার অধিবেশন বসলে দেখা যায় এই সভার ১২১৪ জন মোট সদস্যদের মধ্যে যাজক ও অভিজাতদের মোট সদস্য ছিল ৫৯৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য ছিল ৬২১ জন। তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে প্রধানত বুর্জোয়ারাই নির্বাচিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে আইনজীবী ছিল ২০%, চাকুরিজীবি ৫%, বণিক ও শিল্পপতি ছিল ১৩%, কৃষকের প্রতিনিধি ছিল ৭-৯%। ইতিমধ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের প্রচার ও যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেশ কিছু যাজক ও কিছু অভিজাত নিজ নিজ শ্রেণী ত্যাগ করে বুর্জোয়া সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়।

একদিক থেকে এই বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' বলা যায়। কারণ অভিজাত ও যাজক এই দুই সুবিধাভোগী শ্রেণীর চিরাচরিত বৈষম্যমূলক অধিকার নাশ করার কাজে বুর্জোয়া শ্রেণী সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি শ্রেণীসংগ্রামকে 'বিপ্লব' বলা হয়, তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সংগ্রাম ছিল বিপ্লব। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতারা যে বিপ্লবী সংবিধান রচনা করে তা সামন্তপ্রথার মৃত্যু ঘণ্টা বাজায়। বুর্জোয়া বিপ্লব দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন তরান্বিতহয়। বুর্জোয়া শ্রেণী যে নতুন সংবিধান রচনা করেন তাতে ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কুর 'ক্ষমতা বিভাজন নীতি' অনুসরণের মাধ্যমে রাজার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়লাভের ফলে কোনো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে ঘটেনি। এমনকি রাজতন্ত্রও বহাল ছিল। বুর্জোয়ারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার কেড়ে নিয়ে রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করে। তারা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দ্বারা গ্রামীণ কৃষক ও শ্রমিকদের ভোটাধিকার না দিয়ে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করে। ফলে সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করে। সুতরাং এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে 'প্রকৃত বিপ্লব' বলা যায় না।

কোনো কোনো গবেষক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব বলতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী রক্তপাত ও হিংসার পথে না গিয়ে রাজনৈতিক ও আইনের চাপে জাতীয় সভায় তাদের অধিকার আদায় করে। যদিও খুব শীঘ্রই সাঁকুলেৎ ও জনসাধারণ বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে। এইভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

সাংবিধানিক সভার বুর্জোয়া সদস্যরা সম্পত্তির অধিকারকেই একমাত্র পবিত্র অধিকার বলে গণ্য করত। এই কারণে এই সভা ফ্রান্সের সকল নাগরিককে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই কারণে বলেন যে, যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোকের পরিবর্তে এই সংবিধান পাউণ্ড, সিলিং ও পেনীর ভিত্তিতে নতুন শ্রেণী গঠন করে। ভোটাধিকার নীতির এই বঞ্চনার ফলে ফ্রান্সের প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়. মানব জাতির ঘোষণাপত্রে সাংবিধানিকসভা রুশোকে অনুসরণ করে বলে যে, 'সকল মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাহলে এই ৩০ লক্ষ নাগরিককে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সংবিধান সভা পরস্পরবিরোধী কাজ করেছিল। ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল নাগরিকদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কৃষক ও সাঁকুলেৎ সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে বুর্জোয়ারা সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। লেফেভর-এর মত ঐতিহাসিক বলেন যে, সংবিধান সভা ফ্রান্সে অর্থনৈতিক সমতার দিকে নজর না দিয়ে পুঁজিবাদী বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

১.৬.১৬.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

1. রীলা মুখার্জী—'রূপান্তরিত ইউরোপ'
2. Meenakshi Phukan—'The Rise of the Modern West'
3. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী—'ফরাসী বিপ্লব'
4. 'ইউরোপের যুগান্তর'—সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, ভাস্কর চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়
5. 'The Transition from Feudalism to Capitalism'—Paul Sweezy
6. The 'French Revolution' Vol-I—George Lefebvre

১.৬.১৬.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. ঐতিহাসিক বিতর্কে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃতি আলোচনা কর?
2. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলি আলোচনা কর?
3. মরিস ডব ও পল সুইজি কিভাবে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টি আলোচনা করেছেন?
4. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়ে মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার — এর বক্তব্যগুলি আলোচনা কর?
5. তুমি কি মনে কর যে, ফরাসী বিপ্লব একটি বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল?

ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্রপাঠ (CBCS) যুক্ত স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ২

Ancient Societies

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

পরামর্শদাতা

শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

ডিসেম্বর ২০১৮
মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয়

মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংর(িত। মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত(কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সং(ি-ষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

SYLLABUS

CC-2: ANCIENT SOCIETIES

CC-2, 4 Credits, 100 Marks, 120 Hours

CC-2: Ancient Societies

BLOCK-1: Journey of the Human Society

Unit-1: Theories related with the evolution of human society.

Unit-2: Stages of Human Society.

BLOCK-2: The Ancient Indian Society

Unit-3: Indus Valley/Harappan civilization-Town planning, Production system, Trade and commerce.

Unit-4: Vedic Society, *Varnashrama*, *Dharma*, position of women

BLOCK-3: Ancient Egypt

Unit-5: Sources, social structure, position of women.

Unit-6: Kingship, priesthood, Osyrian cult.

Unit-7: The Hittait invasion, Law of Punishment, Mummification.

BLOCK-4: The Age of Antiquity: Greece

Unit-8: The polis, Greek pantheon.

Unit-9: Social structure—Position of Helots, Periokois and women.

Unit-10: Olympic, Society and Culture reflected in the classical comedies tragedies.

BLOCK-5: The Birth of Classical Civilisation: Pax Romania

Unit-11: The Etruscans, Rise of the Romans, Relation between patrician and plebian.

Unit-12: The eclectic nature of the Roman culture and religion, Roman law.

Unit-13: Condition of slaves and women, Gladiator

BLOCK-6: The Oriental Society in Ancient times: China

Unit-14: Chinese Society during the Tsang and Han dynasties

Unit-15: Chinese pantheon, Confucius and ideology, Buddhism and Taoism, TsunZu.

Unit-16: Position of women.

Contents

Blocks	Titles	Pages
1	Journey of the Human Society	1-13
2	The Ancient Indian Society	14-27
3	Ancient Egypt	28-46
4	The Age of Antiquity: Greece	47-63
5	The Birth of Classical Civilisation: Pax Romania	64-80
6	The Oriental Society in Ancient times: China	81-88

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

Block / পর্যায়—১

Journey of the Human Society

মানব সভ্যতার যাত্রাপথ

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ ভূমিকা

৩ ঃ মানব সমাজ উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ (Unit-1)

৩.১ ঃ মানব সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ

৩.২ ঃ সভ্যতার উদ্ভব প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ

৩.৩ ঃ প্রতিবন্ধকতা ও মোকাবিলাতত্ত্ব।

৪ ঃ মানব সমাজের বিবর্তনের স্তরসমূহ (Unit-2)

৪.১ ঃ মানব সমাজের বিভিন্ন ধাপ।

৪.২ ঃ নব্যপ্রস্তর বিপ্লব ও তার গুরুত্ব

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

৭ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) মানবসমাজ বিকাশের প্রধান তত্ত্বসমূহ কি কি?

২) আদিম মানব জাতির জীবনযাত্রা।

৩) মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরায়ণ।

২ ঃ ভূমিকা

ইতিহাস হল সমাজ বদ্ধ মানুষের অতীত জীবন চর্চার পুনঃনির্মাণ। কিন্তু সমাজের উদ্ভব সংক্রান্ত ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ এই সংক্রান্ত কোন সমসাময়িক তথ্যসূত্র নেই, যা থেকে মানব সভ্যতা বা মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে এই আদিপর্বের পুনঃনির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়। মানব সমাজ বলতে আমরা কি বুঝি, সেই ধারণার ভিত্তিতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ন্যূনতম ৭০০০ বছরের প্রাচীন হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, যখন মানবজাতি কৃষিকাজ শুরু করে এবং স্থায়ী বাসস্থানের প্রচলন ঘটে। কিন্তু আবার অন্য তত্ত্ব অনুসারে, এই সময় আধুনিক মানব (হোমোসেপিয়েন্স-সেপিয়েন্স) এর পূর্ব পুরুষ হোমো-হাবিলিস বিবর্তনের মাধ্যমে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা হোমোসেপিয়েন্স-সেপিয়েন্স এর সমাজব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যেই আমাদের আলোচনা আবর্তিত করব। আধুনিক মানুষের উদ্ভব আনুমানিক ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার বছর পূর্বে হয়েছিল। এবং বর্তমানে যে মানবপ্রজাতিতে আমরা অর্ন্তভূক্ত তার উদ্ভব হয়েছিল আনুমানিক একলক্ষ বছর পূর্বে। আমরা মানব সমাজের উদ্ভব সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলি নিম্নে আলোচনা করব।

৩ ঃ মানব সমাজ উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ একক-১ (Unit-1)

৩.১ ঃ মানব সমাজ বিবর্তনের বিভিন্নতত্ত্বসমূহ ঃ

বৃহত্তরদৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষের মধ্যে, পারস্পরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণ প্রয়োজনে সংগঠিত হওয়া পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানবসমাজ গড়ে ওঠে। মানবসমাজ গড়ে ওঠার কারণ হিসাবে অর্থনৈতিকতত্ত্ব, সামাজিকতত্ত্ব এবং ধর্মীয় যেসব তত্ত্বসমূহের কথা জানা যায়, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। এবং প্রতিটি তত্ত্বই প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের নিজস্ব স্বাধীন মত প্রকাশের ফলে মানব সভ্যতার এই আদিতম পর্বের পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি ভিন্ন মতের তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। যার মধ্যে কোন তত্ত্বটি হয়তো অন্যগুলির চেয়ে কিছুটা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়।

মানব সভ্যতা ও সমাজের উদ্ভবের পশ্চাতে একটি অন্যতম প্রধানতত্ত্ব হল চার্লস ডারউইনের ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের’ তত্ত্ব ('Theory of Natural Selection')। 1871 খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'The desent of man' গ্রন্থে তিনি মানব সমাজের বিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি মানব ও অন্যপ্রাণীদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টির উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি সমমনস্ক লেখকদের সমর্থন করে মন্তব্য করেন যে নৈতিক চেতনাই মানুষ ও অন্য প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে, এবং সেই বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো মনে করেন, পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণা এবং নৈতিকতার চিন্তার বিবর্তন, গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সুবিধালাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই মত আধুনিককালের Boyd, Richerson, Clutton Brock প্রমুখে সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের সমতুল। তিনি আরো দেখিয়েছেন, মনুষ্যেতর জীবরাও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তি, নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন এবং পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে বেঁচে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি

নেকড়ের পালের কথা উল্লেখ করেছেন। নেকড়েরাও শিকার ধরার সময় পরস্পরকে সহায়তা করে, মাছেরাও দলবদ্ধভাবে থাকে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপনা করেন যে সামাজিকপ্রাণীরা নিজস্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক পর্বের মানুষ, নিজ খাদ্যসংগ্রহ ও জীবনরক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হয়েছিল, সেখান থেকে মানব সমাজের যাত্রার সূত্রপাত হয়। পাশাপাশি, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকেও বিভিন্ন মানব প্রজাতির উপস্থিতির দ্বারা প্রমাণ করা যায়। জীবাশ্ম দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আধুনিক মানব হোমো হাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, হোমোসেপিয়েন্স নিয়েন্ডারথাল প্রভৃতি পর্বের মধ্যে দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। উপরন্তু দেখা যায়, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মানব প্রজাতির ধারা পৃথিবীতে জীবিত ছিল। ডারউইনের তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দেখা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্য মানব প্রজাতি বিবর্তিত না হতে পেরে অবলুপ্তির পথে চলে যায়, এবং কেবলমাত্র AMM বা Anatomically Modern Man (হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স) টিকে রইল। এই আধুনিক মানব বিভিন্নভাবে নিজের গোষ্ঠী বা সমাজকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীপর্যায়ে মানুষের বিবর্তন আর ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সমগ্র সমাজের বিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

উনবিংশ শতকের অন্তিমভাগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে ডারউইনের থেকে স্বতন্ত্রভাবে অগাস্টে কমটে (August, Comte), হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer),এবং লুইস হেনরি মরগ্যান (Lewis Henry Morgan) তাদের সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তন তত্ত্বের অবতারণা করেন। যে সমাজ একটি অনুন্নত পর্যায়ে থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমশ বিবর্তনের মাধ্যমে, সময়ের সাথে সাথে উন্নত হতে থাকে। তারা পশ্চিমী সভ্যতার সংস্কৃতির ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। একে একে এই সমস্ত প্রাথমিক সমাজ-সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ (Socio cultural Evolution theories), যেমন—সামাজিক ডারুইনবাদ, বিজ্ঞানসম্মত জাতিবাদ, বিভিন্ন নিন্দনীয়, কার্যকলাপ যথা— দাসব্যবস্থা, ঔপনিবেশিকবাদকে সমর্থন করার জন্য বহুধা নিন্দিত হয়েছে। তবে মানব সভ্যতার বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বরূপে এর উদ্ভব হয়। অতপরঃ উনবিংশ শতক থেকে সমাজ ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ধ্রুপদী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে।

- সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তন।
- সামাজিক আবর্তন তত্ত্ব।
- মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

এই তত্ত্বগুলি একটি সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়, এই সমস্ত তত্ত্বই মনে করে মানব সমাজ একটি সুনির্দিষ্ট পথধরে সামাজিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেছে। সেই কারণে প্রতিটি অতীত ঘটনাক্রম কেবল মাত্র কালানুক্রমিকভাবে নয়, বরং কার্যকারণ সূত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত। এই তত্ত্বগুলির বক্তব্য অনুসারে, এই অতীত ঘটনাক্রমে পুনরুদ্ধার করে সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের মূল সূত্র বা Law of History-কে খুঁজে পাবে।

Socio cultural Evolution বা সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ হল সংস্কৃতি ও সমাজের বিবর্তনের সেই তত্ত্ব যা সময়ের সাথে সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের বিবরণ দেয়। এই তত্ত্ব কোন একটি সমাজের মধ্যে ক্রম বর্ধমান জটিলতার উদ্ভবের যেমন বিবরণ দেয়, অনুরূপভাবে, তার পাশাপাশি কোন সমাজের অবক্ষয়ের

প্রক্রিয়া সমূহের বিবরণ দেয়, এবং কোন বৃহৎ পরিবর্তন ছাড়াও কোন সমাজের মধ্যে বিবিধতার বর্ণনাও প্রদান করে। সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠনকে পর্যালোচনা করা হয়, এবং তার মাধ্যমে যে নতুন সমাজ কাঠামো উদ্ভূত হয়, তা তার পূর্ববর্তী সামাজিককাঠামো থেকে গুণগতভাবে আলাদা। অধিকাংশ উনবিংশ এবং বিংশ শতকের সমাজ-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব সভ্যতার বিবর্তনকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখতে চেয়েছেন। তাদের মতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বিভিন্ন পৃথক পৃথক পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরে সামাজিক বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। ট্যালকট পারসনস (Talcatt Parsons), সমাজ-সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরতত্ত্বকে বিশ্ব ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। বর্তমান সময়ের তাত্ত্বিকরা পৃথক সমাজের পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। সামাজিক বিবর্তনে যে সমাজ যতটা উন্নতি করেছে তার ওপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ধারণা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এবং সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকরা, নব্য বিবর্তনবাদ, সামাজিক জীববিদ্যা এবং আধুনিকতা তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে সমাজ বিবর্তনের আলোচনা করেছেন। অপর একটি সমাজবিবর্তনের তত্ত্ব হল **সামাজিক আবর্তন তত্ত্ব**। এটি হল সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম প্রাচীনতমতত্ত্ব। সমাজ-সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ যেমনভাবে সমাজের বিবর্তন ও মানুষের ইতিহাসকে নতুন, বিশেষ দিকে অগ্রগতি এবং ক্রমবিকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীতে সামাজিক আবর্তনতত্ত্ব অনুসারে সমাজ ও ইতিহাসে ঘটনাও বিবর্তন বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়। তবে এই তত্ত্ব সামাজিক উন্নতিকে নস্যাৎ করে না। Sima Qianand এর তত্ত্বে, P.R. Sarkar এর তত্ত্বে এই তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাচীন সমাজে এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ভারতীয় সমাজে সময়ের বারংবার আবর্তিত হয়। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, যুগের পর অবক্ষয়িত কলিযুগের আগমন ঘটে। এই চিরাচরিত যুগগুলি অতঃপর পুনরাবর্তিত হয়। অ্যারিস্টটল তাঁর On Philosophy গ্রন্থে ধ্বংসের পরে সভ্যতার পুনঃজন্মের কথা বলেছেন। তবে তিনি এই চক্রে সীমা কতবছর তা উল্লেখ করেননি। পলিবিয়াম তাঁর History গ্রন্থে ছয়ধরনের শাসন ব্যবস্থা পুনরাবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল, Monarchy, Tyranny, Aristocracy, Oligarchy, Democracy, Mob rule। এই চক্র প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তৈরী হয়। পরবর্তীকালে দিয়োভালি গিলোনির 'Chronicle of Florence' গ্রন্থে চক্রাকার তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলী তাঁর Discourses গ্রন্থে পলিবিয়াসের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। এছাড়া অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার এইতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক George Boas ইতিহাসের চক্রকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের সাথে তুলনা করেন, সেটি বারংবার একইস্থানে ফিরে আসে। ঐতিহাসিক ভিকো মনে করতেন অতীতে যা ঘটেছিল, তা ভবিষ্যতে ঠিক তাই ঘটবে। তিনি ইতিহাসের সমান্তরাল অগ্রগতির ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর Recurrence ঠিক অতীতের পূর্ণ প্রতিফলন নয়, এটি সময়ান্তরে সংগঠিত বিবর্তন।

মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণতত্ত্ব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল সমাজ এবং তাঁর বিবর্তনকেন্দ্রিক মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতিফলন। এইতত্ত্বের প্রথম প্রতিফলন ঘটে কার্লমার্কসের বস্তুগত ইতিহাসের ধারণার মাধ্যমে। মার্কসীয় মতার্দশে কোন সমাজের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সামাজিক বিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক হয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজ বিবর্তনের ও বিজ্ঞানের কারণ অনুসন্ধান করে উৎপাদনের উপকরণের সাথে সামাজিক শ্রেণী সমূহের সম্পর্কের মধ্যে। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীসমূহের

আন্তঃসম্পর্ক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক চিন্তাধারা সবই অর্থনৈতিকক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

মানব সমাজকে বংশ পরম্পরায় বেঁচে থাকতে হলে জীবনধারণের বস্তুগত উপাদান সমূহের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন খুবই জরুরী। মার্কস দেখিয়েছেন, উৎপাদন এবং বিনিময় বজায় রাখার জন্য মানুষকে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয়।

যদিও, উৎপাদন বিমূর্ত প্রক্রিয়ার সংগঠিত হয় না। উৎপাদন ভিত্তিক সম্পর্ক মানুষের অকস্মাৎ ইচ্ছায় সম্পাদিত হয় না। মানুষ সংগঠিত ও সমাজবদ্ধভাবে কর্ম সম্পাদন করেন, সমাজে কর্ম বিভাজন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। মার্কস আরও দেখিয়েছেন যে, কিছু মানুষ শ্রমদান না করে, অন্যের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে জীবন যাপন করেন। এই ধরণের মানুষরা সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকেন। সমাজের চরিত্রের ওপর এই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকেন। সমাজের চরিত্রের ওপর এই নিয়ন্ত্রকের চরিত্র নিরূপণ করা হয়। উৎপাদন মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই উৎপাদন সম্পর্ক নির্ধারিত হয় কোন নির্দিষ্ট সময়ে সহজলভ্য উৎপাদিকা শক্তির ওপরে ভিত্তি করে। মার্কসীয় মতে উৎপাদিকা শক্তি বলতে বোঝায় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, জমি, কাঁচামাল এবং পাশাপাশি মানুষের চিন্তা চেতনা কর্মক্ষমতা প্রভৃতি।

মানবসমাজের বিবর্তনে মার্কসীয় ঐতিহাসিকরা আদিম সাম্যাবস্থা, প্রাচীন সমাজ, সামন্তব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবধি বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই প্রতিটি স্তরে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে আদান প্রদান এবং তাদের জীবনযাত্রা ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচালনা করে। উৎপাদনে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ও প্রতিটি পর্বে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন দাস সমাজে একটি শাসক শ্রেণীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যারা দাস মালিক ছিলেন এবং তাদের অধীনে ছিল ক্রীতদাসরা। ভূমি মালিক ও ভূমিদাসদের কেন্দ্র করে সামন্ততন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যেখানে পুঁজিপতিরা পুঁজির মালিক। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ, যথা—শ্রম, ভূমি ও পুঁজি সমাজের উচ্চশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে দাসমালিকদের যেমন নিজের শ্রমের ওপর অধিকার ছিল না, ভূমিদাসদের জমিতে কোন অধিকার ছিল না, তেমনই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে পুঁজিপতিদের থেকে অর্থভিন্ন অন্যকিছু লাভ করে না। মার্কসের মতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনই সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেছে এবং সমাজের উদ্ভবে অর্থনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল। মার্কস আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে অর্থনেতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সামাজিকসংগঠন, রাজনৈতিকব্যবস্থা, আইন, সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, ধর্ম, প্রভৃতি উদ্ভূত হয়। অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তির ওপরে এই রূপ সামাজিক ও আদর্শগত উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে ধর্মবোধ পরিবর্তনশীল। ক্রীতদাস ব্যবস্থা বর্তমানে নিন্দিত কিন্তু সেই প্রথাকে অ্যারিস্টটলের মতো ব্যক্তিত্ব এই প্রথাকে একদা সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ মানবসমাজের সংগঠন অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তার ওপরে গড়ে ওঠা উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিকে নির্মিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বকে নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

(1) মানবসমাজের মূলভিত্তি হল জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির মধ্যে মানুষের উৎপাদনের প্রয়াস।

(2) সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক সমাজে শ্রেণীভিত্তিক কর্মবিভাজন দেখা যায়। যেখানে কিছু মানুষ অন্যের শ্রমের ওপর জীবন যাপন করেন।

(3) শ্রেণীবিন্যাসের প্রকৃতি, উৎপাদনপদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(4) উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(5) সমাজ একস্তর থেকে অন্যস্তরে বিবর্তিত তখন হয়, যখন একটি নতুন উদ্ভূত শ্রেণী পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুরাতন ক্ষমতাশীল শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। পুরাতন শ্রেণী সম্পর্ক, নতুন ব্যবস্থায় আর ক্রিয়াশীল থাকে না। এইভাবে সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে।

৩.২ ঃ সভ্যতার উদ্ভবপ্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ

মানব সমাজের উদ্ভবের বিভিন্নতত্ত্বের পাশাপাশি সভ্যতা কখন এবং কি পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠে সেই পরিস্থিতি সংক্রান্ত মতবাদগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। মানব সভ্যতা গড়ে উঠতে গেলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেইগুলিকে বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ক. জলবায়ু ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ভূগোলবিদ এসলওয়ার্থ হান্টিটনের মতে সভ্যতা গড়ে ওঠার প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল জলবায়ু। সভ্যতা গড়ে তোলার পশ্চাতে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা ও আদ্রতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনুকূল পরিবেশ সভ্যতা গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায় বলে এই মতের প্রবক্তরা মনে করেন অনুকূল আবহাওয়াকে কেন্দ্র করেই ভারতে হরপ্পীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। আবার মরুভূমির আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মিশরে মমি তৈরি হয়, নীলনদের বন্যা মোকাবিলায় মিশরে সেচব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। আবার আবহাওয়া পরিবর্তনে সভ্যতার অবক্ষয়ও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খ. ভূপ্রকৃতি ঃ ইংরেজ ঐতিহাসিক টমাস বাকল ও জার্মান ঐতিহাসিক কার্লরিচার মনে করেন যে অঞ্চলে পর্বত, বনভূমি ও মরুভূমির বৈচিত্র্যপূর্ণ সমন্বয় দেখা যায়, সেখানেই সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাদের মতে,এই ধরনের ভূ প্রাকৃতিক অবস্থান মানুষের বিভিন্ন চাহিদাপূরণ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি এখানে নদীর প্রাচুর্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষ উত্তরে হিমালয় ও তিনদিকে সাগরবেষ্টিত হওয়ায় স্বতন্ত্রদেশ হিসাবে এর আবির্ভাব সহজতর হয়ে ছিল। হিমালয় পর্বত যেমন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে, তেমনই বৃষ্টিপাতে সহায়ক হয়েছে। হিমালয়ে উদ্ভূত নদী ভারতবর্ষকে করেছে শস্যশ্যামলা। সমভূমির প্রাচুর্য থাকায় কৃষি সভ্যতা বিকশিত হতে পেরেছে।

গ. যাযাবরদের হাতে গড়ে তোলা সভ্যতা ঃ কৃষির উদ্ভবের পূর্বে মানুষ যাযাবর ছিল। এই যাযাবরদের হাতধরেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সভ্যতা গড়ে ওঠে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী এ. এল ওপেনহাইমার তাঁর 'Ancient Mesopotamia' গ্রন্থে মনে করেন, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠায় যাযাবরদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই মতবাদ অনুসারে, শিকারী যাযাবর গোষ্ঠীই নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে কৃষিকাজের প্রচলন ঘটান। এইভাবে সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

ঘ. প্রাকৃতিক নিয়ম মতবাদ ঃ রাশিয়ার বিজ্ঞানী নিকালাই দানিলেভস্কি সভ্যতার প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এইরকম বারোটি সভ্যতার পর্যালোচনা করে বলেছেন, প্রতিটি সভ্যতা স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে বিকাশ লাভ করে। ঐতিহাসিক ওসওয়াল্ড স্পেংলার তাঁর The decline of the west গ্রন্থে একই অভিমত পোষণ করে স্পেংলার মনে করেন, প্রতিটি সভ্যতার স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে, এবং চূড়ান্ত উন্নতির পর পতনের দিকে ধাবিত হয়। দার্শনিক ভিকো মনে করে প্রাকৃতিক নিয়মে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তার পেছনে আধ্যাত্মিক প্রেরণাও কাজ করে।

এইভাবে বিভিন্ন পণ্ডিত সভ্যতা গড়ে ওঠার বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

৩.৩ ঃ প্রতিবন্ধকতা ও মোকাবিলা তত্ত্ব ঃ

সভ্যতার উৎপত্তি সংক্রান্ত আধুনিক ও যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিক আর্নল্ড.জে. টয়েনবি। তিনি তাঁর দশ খণ্ডে প্রকাশিত Study of History গ্রন্থে সভ্যতা সংক্রান্ত মতামত পোষণ করেছেন। তার মতে, ভৌগলিক পরিবেশ বা মানুষের নৃতাত্ত্বিক উন্নয়নের ফল হিসাবেই সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। বরঞ্চ মানুষের প্রয়োজনের এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে সম্মুখীন হওয়া প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে গিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। তার তত্ত্ব পরিচয় পেয়েছে Adversity theory of Challenge and Response নামে।

তিনি উপস্থাপনা করেছেন যে পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশের কঠোরতাই শেষ পর্যন্ত বড় বড় সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। প্রাচীন মানুষ যখনই ভৌগলিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছে তখনই সেটিকে অতিক্রম করার প্রয়াস করেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সভ্যতার প্রয়োজনকে আরও স্পষ্ট করেছে। মানবসভ্যতা বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক, সামাজিক,অর্থনৈতিক বাধা অতিক্রম করতে নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। টয়েনবি প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সভ্যতা গড়ার ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রভাবক চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল— (১) রুক্ষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা (২) নতুন ভূমির প্রেরণা (৩) আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রেরনা (৪) দায়মুক্তির প্রেরণা (৫) চাপ মোকাবিলার প্রেরণা।

(১) রুক্ষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা ঃ টয়েনবির মতঅনুসারে কৃষি অনুকূল অঞ্চলে মানব বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই অবস্থায় উত্তরণ করতে মানুষকে শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করতে হয়েছে। নীলনদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মিশরে উন্নত সেচব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পাহাড়ি রুক্ষ জমি ও অপ্রতুল কৃষি জমির কারণেই আসীরিয়ার মেসোপটেমিয়ার মূল ভূখণ্ড নেমে আসে। খাড়া পাহাড়ের কারণে গ্রিস জুড়ে একক সভ্যতা গড়ে না উঠলেও সেই কারণে গ্রিসে গড়ে উঠেছে নগররাষ্ট্র ভিত্তিক সভ্যতা। ঈজিয়ান অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য নির্ভর সভ্যতা। এইভাবে রুক্ষ প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা একদিকে কৃষিজীবী গোষ্ঠীকে যোদ্ধা জাতিরূপে পরিবর্তিত করে, তেমনই যাযাবর গোষ্ঠীকে কৃষিজীবিতে পরিণত করে।

(২) নতুন ভূমির প্রেরনা ঃ অনেক সময় পুরানো স্থান ত্যাগ করে মানুষকে অন্যস্থানে যেতে হয়। ইহুদিদের প্রবক্তা আব্রাহাম নিজভূমি ক্যালডিয়াতে ধর্ম প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হন, পরে প্যালেস্টাইনে ধর্ম প্রচার করেন। তেমনি বৈদিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতারা নতুন ভূমি (সিন্ধু ও পাঞ্জাব) কে দেব নির্মিত দেশ বলে অভিহিত করে। রোম সাম্রাজ্যের মূলভূমিতে তা টিকে ছিল। যেখানে মধ্যযুগের সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেন।

(৩) দুর্যোগ মোকাবিলা প্রেরনা ঃ প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দুর্যোগে অনেক সময় মানুষকে প্রেরনা প্রদান করেন। স্পার্টার ভূমিদাস হেলটরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত, সেই বিদ্রোহ থেকে সতর্ক থাকতে স্পার্টাতে গড়ে ওঠে সমরতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র। গ্রিসের সভ্যতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল পার্সীয় সভ্যতার আক্রমণে, কিন্তু সেই অসম লড়াই লড়তে গিয়ে তারা পারসীক সভ্যতাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়।

(৪) দায়মুক্তির প্রেরনা ঃ টয়েনবির ধারণা মতে মানুষ যেকোনো বিরুদ্ধ অবস্থার মুখে টিকে থাকার জন্য নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যেমন—রোমে দাস ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও দাস নিগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় দাসরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ৭৩ খ্রিঃপূর্বাব্দে দাস বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। দক্ষিণ ইতালিতে

দুবছর স্পার্টাকাসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমে অভিজাতদের শ্রেণী শোষণের প্রতিক্রিয়ায় প্লেবিয়ান দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, তাতে জয়ী হয় শ্রমজীবি প্লেবিয়ানরা।

(৫) চাপ মোকাবিলার প্রেরনা ঃ যখন কোন জাতিগোষ্ঠীর সামনে স্নায়বিক বা দৃশ্যমানচাপ উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশে তারা নিজেদের প্রস্তুত করে। টয়েনবি এক্ষেত্রে বহিরাক্রমণ বা সামরিক চাপের কথা বলেছেন। মিশরের ক্ষেত্রে দ্বাদশ রাজবংশ অবসানের পর বহিরাক্রমণ হয়। বহিরাগত হিকসসরা অধিকার করলে মিশরের জনসাধারণ ও শাসকশ্রেণী সেই চাপের ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়। এবং তার ফলে তারা হিকসসদের বিতাড়িত করে। অন্যদিকে শশাঙ্ক পরবর্তী গৌড়ে যে অরাজক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, তার চাপ মোকাবিলায় অভিজাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গোপালকে সিংহাসনে মনোনীত করে পাল বংশের স্থাপন করেন।

টয়েনবি প্রতিবন্ধকতা ও মোকাবিলা তত্ত্ব পণ্ডিত মহলে অনেকটাই গৃহীত হয়েছে। তবে সমালোচকরা এর কিছু সীমাবদ্ধতার কথা ও উল্লেখ করেছেন। তারা মনে করেন সর্বদা যে মানুষ প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে পারবে তা নাও হতে পারে। যদি মোকাবিলা করতে না পারে, সেক্ষেত্রে সেই সভ্যতার বিনাশ ঘটবে। কারণ প্রতিবন্ধকতার চাপ যদি প্রবল হয়, তাহলে শ্রম ও মেধা সত্ত্বেও সেই প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে সে ব্যর্থ হয়।

সভ্যতার উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মন্তব্য করলেও প্রতিটি মতে কোন না কোন বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এদিক থেকে সমাজ বিজ্ঞানী পিতিমির সরোকিনের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চার খণ্ডে লিখিত Social Cultural Dynamics (1937-1947) এবং Society Culture and Personality (1947) গ্রন্থে সুস্পষ্টতই বলেছেন, পৃথিবীর সকল সভ্যতা কোন ঐক্যবদ্ধ বা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি, সভ্যতার উত্থান নিয়ে নির্দিষ্ট মত থাকা উচিত নয়। শুধু পরিবেশগত মিলের কারণে কখনো একাধিক সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে।

৪ ঃ মানব সমাজের বিবর্তনের স্তরসমূহ একক-২ (Unit-2)

৪.১. ঃ মানব সমাজের বিভিন্ন ধাপ

মানব সভতা বর্তমান স্তরে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করেছে। যদি বিশ্বের বিভিন্ন মানব সভ্যতার পর্যালোচনা করা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান সমাজের আবির্ভাব হয়েছে। মানব ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে এই স্তরগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। লেনস্কির মতে সামাজিক পরিবর্তনের মূল হল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। এই পদ্ধতিকে তিনি বলেছেন সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তন, যা সম্পাদিত হয় সমাজ নতুন প্রযুক্তি লাভ করলে। তিনি মানব ইতিহাসকে পাঁচটি সমাজ ব্যবস্থায় ভাগ করেন।

(১) **শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহক সমাজ ঃ** শিকারী ও খাদ্যসংগ্রাহক সমাজ পর্বটি মানব সভ্যতার সর্বপ্রথম স্তর হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মানব ইতিহাসের প্রায় ৯০ শতাংশ সময়কাল মানুষ, এই স্তরে অবস্থান করেছিল। এই সমাজের মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বংশগত গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতো।

অধিকাংশ সময়ে তারা খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন যাপন করতো। অভিপ্রয়ণকারী পশুপাখিদের সাথে তাদের ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হত বলে, সাধারণত তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করতো না, এই ধরনের সমাজ আকারে ক্ষুদ্র ছিল। এর সদস্য সংখ্যা ২৫ থেকে ৪০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমাজ ব্যবস্থায় বেঁচে থাকতে প্রত্যেক সদস্যকে পরিশ্রম করতে হত এবং আহরিত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে হত। মার্কস এই ব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষজন পাথরের হাতিয়ার তৈরী করত, এই ধরনের মানুষরা শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহক জীবন যাপন করত। খ্রীঃ পূর্ব 10000 অব্দে মধ্যপ্রস্তর যুগ শুরু হওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম। আদি প্রস্তর যুগের মধ্য পর্যায়ে কিছু শিকারীজীবি গোষ্ঠী শিকার ধরার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষত্ব অর্জন করতে শুরু করে যার ফলে মাছ ধরার বড়শি, জাল প্রভৃতির আবিষ্কার এই সময়ে দেখা যায়। এই ধরনের মানুষজন গুহাবাসী ছিল, তাদের জীবন যাত্রার প্রমাণ পাওয়া এই ধরনের বিভিন্ন গুহাবাসে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষে ভীমবেটকা গুহাচিত্রের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দ্বারা শিকার ধরার দৃশ্য সুন্দরভাবে চিত্রায়িত আছে।পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট গাছের ফলমূল সংগ্রহ করাও এই ধরনের গোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা ছিল।

(২) **উদ্যানপালক ও পশুপালক সমাজ ঃ** মানবসমাজ মধ্যপ্রস্তর (Mesolithic) যুগ থেকে বিভিন্ন প্রাণীকে পোষমানাতে শুরু করে। সর্বাধিক প্রাচীনতম পোষা প্রাণী হল কুকুর। অতঃপর বিভিন্ন প্রাণীকে পোষমানাতে শুরু করে। এই ধরনের গোষ্ঠীরাও একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাযাবর জীবন যাপন করতেন। উদ্যানপালক সমাজ বিভিন্ন ছোট ছোট উদ্ভিদ চাষ করার প্রবণতা দেখা যায়। এই সমাজের মানুষ যাযাবর হলেও খাদ্যের উৎসের নিকটে থাকার চেষ্টা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সমাজে সর্বপ্রথম প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রবণতা দেখা যায়। এই অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রবণতা সমাজের অগ্রগতির অন্যতম সূচক হিসাবে পরিগণিত হয়। এর ফলে প্রত্যেককে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করার প্রয়োজন হয় না। বৈদিক সমাজ এই রূপ পশুচারণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থায় পশুর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গো বা গাভী ছিল এই অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(৩) **কৃষিজীবী সমাজ ঃ** আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ সর্বপ্রথম স্থায়ী কৃষিকাজ ব্যবস্থার পত্তন ঘটায়। বিভিন্ন নতুন কৃষিজ যন্ত্রপাতি যথা পশুর টানা লাঙ্গল প্রভৃতির সাহায্যে অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং বস্তুগত উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মানবজাতির সক্ষম হয়। খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হবার কারণে নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষের কৃষিকাজের এই পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড 'নব্যপ্রস্তর বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। কৃষিকাজ প্রচলনের সাথে সাথে বিভিন্ন বড় সভ্যতা গড়ে ওঠে। কৃষির উদ্বৃত্তই মানুষকে বাণিজ্যের পথে নিয়ে যায় এবং তা থেকেই বিভিন্ন শিল্পকর্মের সূচনা আমরা দেখতে পাই। এই আদি কৃষি সভ্যতা থেকেই বৃহৎ নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকেই উদ্ধৃত ব্যবস্থা ও কৃষি

সমাজেই তা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনবিশ্বে হরপ্পীয়, মেসোপটেমিয়, মিশরীয়, চীন সকল সভ্যতাই ছিল কৃষিভিত্তিক।

(৪) **শিল্পোন্নত সমাজ ঃ** পূর্বেই বলা হয়েছে যে কৃষিজ উদ্ধৃত্ত উৎপাদনে মানুষ বাণিজ্য বিনিয়োগ করে। বাণিজ্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পজাতদ্রব্যের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি চলে আসে, প্রযুক্তিগত উন্নতির বিষয়টি। যার ফলে শিল্পের যুগের সূত্রপাত হয়। 1750 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ মনুষ্যও পশুশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে শুরু করে। ইহা খাদ্য উৎপাদন প্রভূত বদল আনে। খাদ্য উৎপাদনে ট্রাক্টর ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এনে দেয়। তবে শিল্পবিপ্লব সমাজের মূলকাঠামোতে বিস্তর বদল আনে, মানব সভ্যতার উদ্ধৃত্ত উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থা পুঁজিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিবর্তিত হয়।

(৫) **শিল্প পরবর্তী যুগ ঃ** শিল্প পরবর্তী যুগে আমরা বর্তমানে বাস করি, যেখানে প্রভূত নগরায়ণ, প্রযুক্তির অসামান্য উন্নতি দেখা যায়। এবং এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল যে মানুষ প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে আরো উচচস্তরে নিয়ে যাবার প্রয়াস সর্বদা বজায় রেখে চলেছে।

এইভাবে মানব সভ্যতা ক্রমশ বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছে।

৪.২ ঃ নব্যপ্রস্তর বিপ্লব ও তার গুরুত্ব

ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগের তৃতীয় বা শেষ পর্যায় হল নব্যপ্রস্তর যুগ। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, চিন্তাধারা, জীবিকা নির্বাহের জন্য নিত্য নতুন পরিকল্পনা সব কিছু বিকশিত হয়েছিল। এ যুগে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে, যদিও এই সামগ্রিক উন্নতি রাতারাতি সম্ভব হয়নি। উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে চলে আসা মানুষের প্রয়াস ধীরে ধীরে মধ্যপ্রস্তর যুগে অর্থাৎ সংগ্রহের পর্যায় থেকে খাদ্য উৎপাদনের পর্যায়ে এসে পৌঁছায়।

পাথর দিয়ে পাথরে আঘাত করে তৈরি হত মানুষের প্রথম দিকে অসম, অমসৃণ হাতিয়ার। এই পর্বের শেষ দিকে এল পাথর দিয়ে পাথর ঘষে বা একটা কঠিন পাথরের চাইয়ের উপর অপেক্ষাকৃত নরম পাথর হাতে ঘুরিয়ে নির্মিত মসৃণ হাতিয়ার বা 'Ground tool'। এই হাতিয়ারগুলি আগের তুলনায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মসৃণ, সুষম আকারযুক্ত এবং সূচালো ছিল। মসৃণ, লম্বা ও ধারওয়ালা কুঠার বা খননকারী লাঠির আগা কিংবা তীরের ফলা, যেমন ভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, প্রাচীন প্রস্তর যুগ অথবা মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের চেয়ে তা অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে উঠলো। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ডের মতে, এই সকল 'Neolithic' বা নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বস্তুনির্ভর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে গেল। একে তিনি নব্যপ্রস্তর বিপ্লব বলেছেন।

উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষ ছিল প্রধানত খাদ্য সংগ্রাহক। বন্য ফলমূল, লতা-পাতা, জন্তুর মাংস ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তখন জীবিকা নির্বাহ ছিল খুবই কঠিন। মধ্য প্রস্তরযুগে প্রস্তরায়ুধের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এলেও কিন্তু খাদ্য আহরণের ক্ষেত্রে নতুন কোন মৌলিক পরিবর্তন এ যুগে ঘটেনি। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, তখনও পর্যন্ত মানুষ

ছিল প্রধানত খাদ্য সংগ্রাহকই। চাইল্ডের যুক্তি হল, একবার যেই নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার তৈরি করা শুরু হয়ে গেল, অমনি তার পরে জমি কর্ষণ করা অনেক সহজ হয়ে গেল। মানুষ আবিষ্কার করলো যে কেবলমাত্র বুনো শস্যদানা সংগ্রহ করার মধ্যে আটকে না থেকে খাদ্যভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে হলে ঐ শস্যবীজ মাটিতে রোপণ করতে হবে। মসৃণ পাথরের কুঠার গাছ কাটতে অনেক বেশি সাহায্য করলো। খননকারী লাঠি বীজ রোপণের জন্য মাটিকে আরও নরম করতে সক্ষম হল। মসৃণ ও সূচালো বর্শার ফলা আর তীরের ডগা শিকার করার কাজকে আরও সহজতর করে তুললো। বাসস্থান, পোশাক এবং দরকারি বহু সামগ্রীর আবির্ভাব ঘটে এ যুগেই। ভাবলে অবাক হতে হয়, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ছাড়াই সে যুগের মানুষ শুধু পাথর, হাড় ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এই সকল অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষিকাজের যথেষ্ট উন্নতির ফলে গবাদি পশুর গৃহপালন একটা দৃঢ়তর ভিত্তি পেল। শস্য কাটা হয়ে যাবার পর সেই পড়ে থাকা জমিতে গরু-মোষের জাব বা খাদ্য পাওয়া গেল। আর গবাদি পশু থেকে দুধ আর মাংস দুটোই পাওয়া যাবার ফলে শিকারের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমে গেল। গ্রামে বসবাসকারী কৃষিজীবি গোষ্ঠী কালে কালে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হল। যারা উৎপাদন করতো না, তারাও তখন এই বাড়তি ভাগ পেল, গায়ের জোরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করল। পরে ধর্মীয় পদ্ধতি আর চালু রীতিনীতিতে এই অধিকার নিশ্চিত করা হল। উদ্বৃত্তের এমন বেদখলের ভিত্তিতেই আবির্ভূত হল শ্রেণী, ব্যক্তি সম্পত্তি ও রাষ্ট্র।

নব্য প্রস্তরযুগে খাদ্যোৎপাদন থেকে শুরু করে গ্রামের উদ্ভব ও অন্যান্য বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রথমেই নজর আসে, বালুচিস্তানের বোলান নদীর তীরে মেহেরগড়ের প্রথম ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রাপ্ত শস্যদানা চাষাবাদের স্পষ্ট নিদর্শন বহন করে। এখানে কয়েক ধরনের চাষা করা ও বুনো যব একত্রে পাবার ফলে অনুমতি হয় যে, বুনো থেকে চাষ করা পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল। বিপুল পরিমাণে পোড়া তুলো-বীজের প্রাপ্তি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করে এই কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্পাস চাষ হত। প্রথম পর্যায়ের শস্যভাণ্ডারগুলি পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিশাল রূপ নিয়েছিল। এই তথ্য নিশ্চিতভাবে সমকালীন যুগের কৃষি উন্নতির পরিচয় বহন করে। নানা ধরনের মসৃণ পাথরের উপকরণের মধ্যে কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার হল বিটুমেন খণ্ডের সঙ্গে আটকানো কাস্তের পাত। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত এটাই প্রাচীনতম হাতিয়ার। কৃষিজ উৎপাদনের কারণেই সম্ভবত পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করে তোলার বিষয়টি ত্বরান্বিত হয়েছিল। প্রাপ্ত হাড় থেকে গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু,ভেড়া ও ছাগলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্যায়েই মোষের হাড়ও পাওয়া গেলেও তা বুনো পোষ মানানো, তা স্পষ্ট নয়। কুঁজ-ওয়ালা ষাঁড়ের অস্তিত্বও ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত, মাংসের উৎস হিসাবে বুনো পশুর তুলনায় গৃহপালিত পশুর সংখ্যাই ছিল বেশি।

কৃষিজ উৎপাদনের সূত্র ধরে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শিল্পের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে অদ্ভুত রকমের মসৃণ বিচিত্র সব পাথরের হাতিয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হামানদিস্তা, গুঁড়ো করার পাথর, জাঁতা, টুকরো টুকরো ফলক প্রভৃতি। নলখাগড়ায় তৈরি ঝুড়ি এবং তার সঙ্গে উল অথবা পশু লোমের তৈরি কাপড় অর্থাৎ বয়ন শিল্পেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুনত্বের মধ্যে ব্যাপকভাবে মৃৎশিল্পের সঙ্গে কিছুটা পরে এসেছিল চুপড়ি, যা কাদামাটির পাত্রের ছাঁচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষদিকে কুমোরের ঘুরন্ত চাকার প্রচলন ঘটে, যা তৎকালীন যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই পর্যায়েই

তথাকথিত 'কারুশিল্পীর সমাধি'তে এই শিল্পী মানুষটির সমাধির সাথে একটি নব্যপ্রস্তর যুগীয় পালিশ করা কুঠার, তিনটি চকমকি পাথরের ভিতরের অংশ ও তার নয়টি জ্যামিতিক ছোট ছোট অংশ বা 'মাইক্রোলিথ' এবং ষোলটি ছোট ছোট ফলক পাওয়া গেছে।

এই যুগে সমাধি দেবার পদ্ধতিতে পাওয়া যায় নতুনত্বের ছোঁয়া। প্রথম পর্যায় থেকেই সমাধিতে গেরিমাটির প্রাপ্তির ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করতে পেরেছেন যে মৃত ব্যক্তিকে লাল রং মাখিয়ে সমাধিতে দেওয়া হত। মৃতের শরীরগুলি সব সময়েই কুঁকড়ে শোয়ান ও মাথাগুলি সবক্ষেত্রে এক দিকে নয়। অর্থাৎ একটা অজানা বা অজ্ঞাত কোনো শক্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল এবং সেই মতো কোনো নিয়ম পালন করতো। সমাধিতে মৃতের সাথে দেওয়া হত সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় জিনিসের লকেট, বালা ও মালা, পাথরের পুঁতি, লকেট, পাথরের ব্যাট এবং হাড়ের আংটি প্রভৃতির সঙ্গে নীলকান্ত মণি, নীলার মতো দামী পাথর যেগুলো সম্ভবত বাণিজ্য মারফৎ কোনো দূর দেশ থেকে আনীত। একটি বিশেষ কবরে মৃত ব্যক্তির পায়ের কাছে পাঁচটি ছাগলের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সমাধি পদ্ধতি এবং সমাধিগুলিতে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর উপস্থিতি, কিছু সমাধিতে মূল্যবান সামগ্রীর উপস্থিতি এবং অন্য সমাধিগুলিতে সেই সমস্ত সামগ্রীর অনুপস্থিতি, নিশ্চিতভাবে লোকাতীত জীবনের প্রতি আত্মা ও বিশ্বাস এবং সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের চিত্রকে প্রতিফলিত করে। শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা ও হস্তশিল্প সামগ্রীর প্রকারভেদ থেকেও শ্রেণীবিভাজনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

মেহেরগড়ের প্রথম পর্যায় নব্যপ্রস্তর যুগ হলেও শেষ দিকে মানুষ তাম্র ধাতুর ব্যবহার শেখে। মেহেড়গড় সভ্যতার তৃতীয় পর্যায়ে তাম্রশ্মীয় যুগের আবির্ভাব ঘটে। বালুচিস্তানের এর আশেপাশে আরও অনেক প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলিতে নব্য প্রস্তর যুগের ধারা বহমান। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বালুচিস্তানের উচচভূমিতে কোয়েডার কাছে মেহেরগড়ের অনুরূপ বা তার কিছুটা পরের সময়ে কিলি গুল মহম্মদ-এর কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে এখানে বসতির নিদর্শন আছে। কাদামাটির দেওয়াল দেওয়া বাড়ি, ছাউনিতে সম্ভবত লতাপাতার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশু হিসাবে গরু, ভেড়া, ছাগলের হাড় পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ের মৃৎপাত্রের নিদর্শন না থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাতে তৈরি মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পর্যায়েই ঢেউ খেলানো রেখাতে চিত্রিত কিছু হাড়ের হাতিয়াল ও তৃতীয় পর্যায়ে লালের উপর কালো চিত্রন বিশিষ্ট মৃৎপাত্রের বহু প্রচলন দেখা যায়। এছাড়াও মধ্য বালুচিস্তানের কালাত অধিত্যকায় আনজিরা ও সিয়াদামব নামক দুটি প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। এই কেন্দ্রদ্বয় প্রথম পর্যায়ের মৃৎপাত্রগুলি লাল রঙের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পাথরের ভিতরে উপর কাঁচা ইটের বাড়ি।

খ্রিষ্টপূর্ব 700 অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বালুচিস্তানের গ্রাম সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান ও পারস্যের সংস্কৃতির যে যোগাযোগ ছিল তা মৃৎপাত্র গুলির ধরণ, কলাকৌশল এবং লাপিস-লাজুলি, নীলকান্ত মণি প্রভৃতির ব্যবহার থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে। শুধু বালুচিস্তান নয়, কাশ্মীর উপত্যকার বুর্জাহোম প্রত্নকেন্দ্রে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 2800-2500 অব্দের মধ্যবর্তী প্রাচীন নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতার পরিচয় মেলে। এই পর্যায়ের মৃৎশিল্পের কোনো জ্ঞান ছিল না। ঐ অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে খ্রিষ্টপূর্ব 2500-2000 অব্দের মধ্যে, যেখানে রঙ করা মৃৎপাত্রগুলির প্রাপ্তির মাধ্যমে মৃৎপাত্রের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া

যায়। জন্তুর হাড় দেখে বোঝা সম্ভব হয়েছে যে গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, মোষ, শূকর এমনকি কুকুরও গৃহে পালিত হত। এক্ষেত্রেও পশুচারণ বা পালন শিকারের প্রবণতাকে ধীরে ধীরে হ্রাস করে। মাটি কর্ষণ করার ছুরির প্রাপ্তি কৃষিকাজের বিষয়কে প্রমাণিত করে। বিভিন্ন প্রত্নবস্তু থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই পর্যায়ে গম, বার্লি, ডাল ও কড়াইশুঁটি চাষ হত এবং পরবর্তী পর্যায়ে চালের অস্তিত্বের প্রমাণ নব্যপ্রস্তর যুগের শেষদিকে ধান চাষেরও বহন করে। পাঞ্জাবে ঘালিঘাই এর সোয়াট উপত্যকায় খ্রিষ্টপূর্ব 3000-1900 অব্দের মধ্যেকার নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির প্রথম দিকে হাতে তৈরি অতি সাধারণ মানের মৃৎপাত্র পাওয়া গেলেও পরের দিকে নির্মাণ শৈলীর ক্ষেত্রে যুর্জাহোমের সাথে এর কিছু মিলও লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সোয়াট উপত্যকায় যব ও গমের চাষ হতে থাকে। এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতীয় উপমহাদেশে সমস্ত অঞ্চলে পরিবর্তনগুলি একই সময়ে হয়নি। একটা অঞ্চলে যে সংস্কৃতি বহুদিন আগে প্রবেশ করেছে, অন্য এলাকায় সেই বিশেষ সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছে অনেক পরে।

৫ ঃ উপসংহার

এই পর্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে মানব সভ্যতা বিভিন্ন স্তরেরবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। সমাজের উদ্ভব বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা নিজস্ব মত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তর বিন্যাস ও বিবর্তন অধ্যয়ন করলে তবেই মানব ইতিহাসের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন সম্ভবপর হবে।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

১। Lenski : Human Societies : An Introduction to Macrosociology.

২। Marshal David Sadlins and Elman Service Ed.: Evolution and culture.

৩। এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ ঃ বিশ্বসভ্যতা।

৪। ইরফান হাবিব ঃ প্রাক ইতিহাস।

৭ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

১। মানব সভ্যতা বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি কি কি?

২। 'নব্য প্রস্তর বিপ্লব' কথাটির মানব জীবনে তাৎপর্য কি?

৩। সভ্যতা উদ্ভব-সংক্রান্ত মতগুলি আলোচনা কর।

৪। টয়েনবির মতে সভ্যতার বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

Block / পর্যায়–২

Ancient Indian Society

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ হরপ্পা সভ্যতা (Unit-3)

২.১ ঃ হরপ্পা সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার

২.২ ঃ হরপ্পার নগর পরিকল্পনা

২.৩ ঃ কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য

২.৪ ঃ হরপ্পার ধর্ম

২.৫ ঃ পতন।

৩ ঃ বৈদিক সভ্যতা (Unit-4)

৩.১ ঃ আর্য সমাজ

৩.২ ঃ বৈদিক সমাজ ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা

৩.৩ ঃ বৈদিক ধর্ম

৩.৪ ঃ বৈদিক যুগে নারীর স্থান।

৪ ঃ উপসংহার

৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী।

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) হরপ্পা সভ্যতা ও তার সামাজিক অবস্থা

২) বৈদিক সমাজ ও পরিস্থিতি।

২ ঃ হরপ্পা সভ্যতা

২.১ ঃ হরপ্পা সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার

সিন্ধু নদীর তীরে ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস ম্যাসনের দ্বারা কিছু প্রত্নবস্তু উদ্ধার এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মহেঞ্জোদারো উৎখননের ফলে একটি নতুন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। মূলত, সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে উৎখনন হয়ে বলে এই নতুন সভ্যতা 'সিন্ধু সভ্যতা' রূপে পরিগণিত হয়। পরে আরও অনেক অঞ্চলে এই সভ্যতার অবশেষ পাওয়া যায়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশে এই সভ্যতার নিদর্শন দেখে জন মার্শাল মনে করেছিলেন এই সভ্যতা আরও বিস্তৃত ছিল। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে পিগট হরপ্পার বিস্তৃতিক্ষেত্র হিসাবে মাকরাণ, কাথিয়াবাড় ও হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ৯৫০ × ৭০০ × ৫০০ মাইল মাপের একটি ত্রিভুজ কল্পনা করেন, যার মধ্যে কমপক্ষে ৪০টি গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একই ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। Gordon Childe মনে করেন, এই সভ্যতার বিস্তার প্রাচীন মিশরের দ্বিগুণ সুমেরু এর চারগুণ ছিল। সিন্ধুনদের পরিধির বাইরে এই সভ্যতার অবশেষ পাওয়ার ফলে সিন্ধু সভ্যতা নামটি পরিত্যক্ত হয়ে 'হরপ্পা সভ্যতা' নামে এর নামকরণ করা হয়।

হরপ্পা সভ্যতায় প্রায় ৩০০র বেশি কেন্দ্র এ পর্যন্ত উৎখনন করা হয়েছে। ১৬২২ টি আবিষ্কৃত কেন্দ্রের মধ্যে ৬১৬ টি ভারতে ও ৪০৬টি পাকিস্তানে। আধুনিক সীমারেখা অনুসারে এইসভ্যতা অবিভক্ত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এর পশ্চিম অংশে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বেলুচিস্তানের কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতার পশ্চিমতম সীমা ছিল ইরাণ সীমান্তের ৪০ কিমি, আগে সুতকাজেনদর। পূর্বসীমা দিল্লির নিকট আলমগীরপুর। পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান ১৫৫০ কিমি। উত্তরে এই সভ্যতা হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিন্তু কখনই হিমালয়কে অতিক্রম করেনি। এর উত্তরতম সীমা কাশ্মীরের গুফরাকোট এবং দক্ষিণতম সীমা মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদ। উত্তর দক্ষিণে এই সভ্যতার বিস্তার প্রায় ১৫০০ কিমি।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার অনুধাবন করতে হলে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। বালুচিস্থানের সীমান্তবর্তী হরপ্পীয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে মাকরান উপকূলের সুতকাজেনদর ও সুত কা-কোহ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি দাশত নদীর মোহনার নিকট ও পরেরটি শাদিকাউর নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত। সিন্ধুপ্রদেশের দিকে আসতে লাসবেলায় সমতভূমির বালাকোটে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। দক্ষিণ বালুচিস্থানের অন্যত্র এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া না গেলেও, সমসাময়িক গ্রামীণ বসতির সাথে সিন্ধু উপত্যকার আদান প্রদান ছিল। উত্তর বালুচিস্থানের দুটি কেন্দ্র ছিল ডাবরকোট ও পাঠানিদামব। বালুচিস্থান ও সিন্ধুর সীমান্তবর্তী অঞ্চল যা কাচ্চির সমতলভূমি নামে পরিচিত, সেখানে দুটি বড় কেন্দ্র হল নৌশারো ও জুদিরজোদারো।

সিন্ধুপ্রদেশে এ পর্যন্ত প্রচুর হরপ্পীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র পাওয়া গেছে। মূলত, এই সভ্যতার মূল কেন্দ্র সিন্ধু অঞ্চলেই ছিল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, অম্রি, চানহুদারো, কোট-দিজি, আলি-মুরাদ প্রভৃতি। মহেঞ্জোদারো এর অবস্থান ছিল লারকানা অঞ্চলে। এটি সিন্ধুপ্রদেশের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল ছিল। এখানে নগরের অবশেষ পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোর আয়তন প্রায় ২৫০ একরের মত। রাভিনদীর তীরবর্তী হরপ্পার আয়তন ছিল প্রায় ১৫০

একর। এদুটি বাদে বাকি কেন্দ্রগুলি বেশ ছোট। যেমন-নারুওয়ারাধারো প্রায় ৮৬ একর, চানহুদারো ১৬ একর। এই অঞ্চলে বৃষ্টির প্রাচুর্য ও উর্বর জমির প্রাধান্য এই অঞ্চলে লোকবসতি গড়ে ওঠার প্রধান কারণ।

চোলিস্থানে হাকরা প্রবাহ ধরে প্রায় ১৭৪ টি হরপ্পীয় কেন্দ্র পাওয়া গেছে। তাঁর মধ্যে ৭৪ টির আয়তনের হিসেব পাওয়া যায়। বেশিরভাগই আয়তনে ৫ থেকে ১০ হেক্টর এর মধ্যে। তবে একটি কেন্দ্র ৮০ হেক্টর বা ২০০ একর আয়তনের। পাক-পাঞ্জাবে হরপ্পা বাদে দুটি কেন্দ্র ও ভারতীয় পাঞ্জাবে পরিনত হরপ্পীয় কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৫টি। অমৃতসর, জলন্ধর, পাতিয়ালা, রোপার, লুধিয়ানাতে এই কেন্দ্র গুলি বিস্তৃত। হরিয়ানাতে অঞ্চলে পরিণত পর্বের কেন্দ্রর সংখ্যা ৪৪টি। আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, সোনপত, হিসার অঞ্চলে এই কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত। তবে এই সব অঞ্চলে হরপ্পার অন্তিম পর্বের সাক্ষ্য অনেক বেশি। ভারতীয় পাঞ্জাবে ১২৮টি ও হরিয়ানা তে২৭৭ টি অন্তিমপর্বের কেন্দ্র আছে।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুসারে রাজস্থানে ঘর্ঘর প্রবাহ ধরে পরিণত হরপ্পার কেন্দ্র হনুমানগড় এলাকাতে ২৮ টি। এদের মধ্য কালিবঙ্গান বিখ্যাত, এর আয়তন প্রায় ১১.৫ হেক্টর। উত্তরপ্রদেশে পরিণত কেন্দ্র ৩১টি, আবার শেষ পর্যায়ের কেন্দ্র ১৩০টি। পাঞ্জাবের ভাতিন্দা জেলায় মাত্র ৫০*২৫ কিমির মধ্যে ২১টি কেন্দ্র রয়েছে। জম্মুতে মান্ডা নামক একটি কেন্দ্র আছে। উত্তরপ্রদেশে আলমগিরপুর হরপ্পার পূর্বসীমা।

হরপ্পার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল গুজরাট। লোথাল ও রংপুরে হরপ্পা সভ্যতার প্রাক, পরিণত ও অন্তিম এই তিন পর্বের অবশেষ পাওয়া যায়। সম্ভবত লোথালে হরপ্পীয়দের বন্দর বা জাহাজঘাটার অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া আরও বেশ কিছু কেন্দ্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এই আলোচনাতে দেখা যায় যে এই সভ্যতার সর্বাধিক বিস্তার সিন্ধুনদী অপেক্ষা সরস্বতী নদী অঞ্চলে হয়েছিল। তাই এই সভ্যতাকে অনেকে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলে অভিহিত করেন। হরপ্পা সভ্যতা আনুঃ ৩০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে উদ্ভুত হলেও এর পরিণত রূপ পাওয়া যায় আনুঃ ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ইরফান হাবিব পরিণত হরপ্পার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।

১) কুম্ভকারের চাকে তৈরি লাল পোড়ামাটির মৃৎপাত্র। তাঁর গায়ে কিছু নক্শা, যেমন পিপুল পাতা, বৃত্ত, ময়ূর প্রভৃতি।

২) সীলমোহরে খোদিত বিশেষ ধরণের সিন্ধু লিপি।

৩) পোড়ানো ইট, সেই সঙ্গে পোড়া কাদামাটির ইট, আয়তনের ত্রিমাত্রিক অনুপাত ১; ২; ৪।

৪) ১৩.৬৩ গ্রাম এককের ভিত্তিতে আপাতভাবে আদর্শ ওজন।

৫) নগরে সোজা ও সমকোণে রাস্তা নির্মাণ। নিকাশী ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব।

৬) নগরে পৃথক নগরদূর্গের নির্মাণ।

৭) বাধানো কূপ ও জলাধার।

৮) মৃতদেহ উত্তর-দক্ষিণ মুখে চিত করে নগরের বাইরে সমাহিত করা।

২.২ ঃ হরপ্পা-সভ্যতায় নগর পরিকল্পনা

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে যে নগরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্ননিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে তাতে জানা গেলো যে, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান ছিলো নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা। নগরসমূহের গঠনশৈলী দেখে ধারণা করা হয় এই সভ্যতার মানুষেরা একটি উন্নত ও পরিকল্পিত নগরব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো এবং হরপ্পা সভ্যতা ছিলো তার সমকালীন মানব-সভ্যতায় অন্যতম উন্নত সভ্যতা। কেননা এই নগরসমূহের পরিকল্পনা দেখলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে সেই সভ্যতার নগরবাসী সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরায়ণ করার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলো।

মহেঞ্জোদারোর নগরসমূহ গড়ে উঠেছিলো প্রায় এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। আর হরপ্পা নগরের সমতল ভূমির সীমা ছিলো আড়াই মাইল। মহেঞ্জোদারো গড়ে উঠেছিলো সিন্ধুনদের তীর ঘেঁষে, অন্যদিকে সিন্ধুর উপনদী রাভী বা ইরাবতির তীরে গড়ে উঠেছিলো হরপ্পা নগরী। দুটো নগরই মোটামুটি একই পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছিলো। উভয় নগরই প্রধান দুই অংশে বিভক্ত ছিলো। একটি অংশ অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সেখানে ছিলো দুর্গ। বাকি অংশ ছিলো নিচু। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বাস করত দুর্গ এলাকায় এবং নিচু এলাকায় সাধারণ বা দরিদ্র মানুষের বসবাস ছিলো। প্রকৃত শহর ছিলো দুর্গের নিম্নাঞ্চলে। নগরগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিলো নিম্নরূপ—

ক) রাস্তা ঃ হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো এবং কালিবঙ্গানের রাস্তাগুলো ছিলো সোজা এবং তা বিস্তৃত ছিলো উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে। একদিকের রাস্তা অন্যদিকের রাস্তার সঙ্গে সমকোণে সংযুক্ত। প্রধান রাস্তাগুলো ছিলো ৯ ফুট হতে ৩৪ ফুট চওড়া। ৫ ফুট চওড়া ছোট ছোট গলিপথও ছিলো। নগরবাসীর সুবিধার্থে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরের রাস্তার পাশে সমান দূরত্বে খুঁটি স্থাপন করা হয়েছিলো এবং রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পথের পাশে ডাস্টবিন রাখার ব্যবস্থা ছিলো। রাস্তার প্রান্তসীমার বাড়িঘর বৃত্তাকারে নির্মিত হতো।

খ) গৃহ নির্মাণ ও দুর্গ-স্থাপত্য ঃ হরপ্পা সভ্যতায় বিভিন্ন আকৃতির বসতবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। নগরীর বেশির ভাগ বাড়ি পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত ছিলো। প্রত্যেকটি আবাস গৃহ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো। আকার ভেদে দুই কক্ষ থেকে পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন বাড়ি ছিলো বহুতল বিশিষ্ট। বাড়িগুলিতে নানা আকারের কক্ষ, কুয়ো ও স্নানাগার থাকতো। এছাড়াও শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, প্রক্ষালন কক্ষ, গুদামঘর ইত্যাদি থাকতো। বাড়ির প্রবেশ দরজা সাধারণত সড়কমুখী হতো। বাড়ির কক্ষগুলোতে আলো বাতাস আসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলো। রান্নাঘর ও স্নানাগারের ধার ঘেঁষে পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা হতো। এতে ধারণা করা যায় যে নগরবাসীরা বিসালবহুল, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতো।

বৃহৎ প্রাসাদ ঃ হরপ্পা সভ্যতায় বেশ কয়েকটি চমৎকার প্রাসাদের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত 'বৃহৎ হল' অন্যতম। এই হলঘরটির আয়তন ৮০ বর্গফুট। হলঘরের ভেতরে বসার জায়গা হিসেবে সারি সারি বেঞ্চ পাতা ছিলো এবং বেঞ্চগুলোর সামনে ছিলো প্লাটফরম। হলঘরের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা। ঐতিহাসিকদের ধারণা এটিকে হয়তো সভাগৃহ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাছাড়া মহেঞ্জোদারোতে সবচেয়ে বড় ২৩০ ফুট বাই ৭৮ ফুট আয়তনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আবিষ্কৃত হগয়েছে। প্রাসাদটির চারপাশে ছিলো পুরু দেয়াল। বিশ্লেষকদের মতে এটি ছিলো শাসকদের বাসগৃহ।

দূর্গ ঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে একটি করে দূর্গ নির্মিত হয়েছিলো। দূর্গ দুটোর স্থাপত্যিক পরিকল্পনা ছিলো একই রকম। দূর্গের দৈর্ঘ্য ছিলো ১২০০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০০ ফুট। দূর্গের চারদিকে কাদামাটি ও ও কাঁচা ইট দিয়ে পুরু করে ৪০ ফুট উঁচু প্রতিরক্ষা দেওয়াল ছিলো। দূর্গের বাইরের অংশে ৪ ফুট পুরু পোড়ানো ইটের আরেকটি অতিরিক্ত দেওয়াল ছিলো। চারপাশে নজরদারি করা জন্য তৈরি করা হয়েছিলো সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ ঘর।

শস্যাগার ঃ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার দূর্গ একটি করে দুটো বৃহৎ শ্যাগার পাওয়া গেছে। হরপ্পার শস্যাগারটি ছিলো বৃহত্তম। ১৬৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩৫ ফুট প্রশস্তের বৃহদায়তন শস্যাগারটি ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট প্রশস্ত বিশিষ্ট বেশ কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছিলো। সম্ভবত খাদ্যশস্য নদীপথে পরিবহনের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি শস্যাগার নদীর কাছাকাছি অবস্থিত।

বৃহৎ স্নানাগার ঃ নগর দুর্গের ঠিক মাথায় অবস্থিত মহেঞ্জোদারো নগরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি বৃহৎ স্নানাগার। ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১০৮ ফুট প্রশস্ত বিশিষ্ট আয়তনের এই বৃহৎ স্নানাগারের কেন্দ্রস্থলে সাঁতার কাটার উপযোগী ৩৯ ফুট লম্বা ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর একটি জলাধার বা চৌবাচ্চা ছিলো। এটি সংযুক্ত ছিলো একটি কুয়োর সঙ্গে এবং ব্যবহৃত জল ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিলো। স্নানাগারের দেওয়াল ছিলো ইটের তৈরি এবং দেয়ালের গায়ে সুরকি ও বিটুমিনের প্রলেপ দিয়ে জল নিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। স্নানাগারের চারপাশ ছিলো বারান্দা এবং বারান্দার পেছনে তিন দিকে ছিলো কক্ষ ও গ্যালারী। ধারণা করা হয়, বর্তমানেও টিকে থাকা পাঁচ হাজার বছরেরও আগে নির্মিত এই স্নানাগারটি দ্বিতল ছিলো এবং সেখানে অনেকগুলো কক্ষ ছিলো। কেউ কেউ মনে করেন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই স্নানাগারটি নির্মিত হয়েছিলো।

গ) জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালি ঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগরবাসীদের জন্য জল সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা ছিলো। পথের ধারে অনেক কূপ খনন করা হতো। অনেক বাড়ির উঠোনেও কূপ ছিলো। বেশিরভাগ কূপ পাওয়া যায় গলিপথের ধারে। মহেঞ্জোদারোর চেয়ে হরপ্পাতেই বেশি কূপ খননের নিদর্শন রয়েছে।

বেশিরভাগ নগরের পয়ঃপ্রণালি ছিলো উন্নতমানের। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য মাটির নিচে পয়ঃপ্রণালি বানানো হতো। নগরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি করে স্নানাগার ও ময়লা জল বের হওয়ার জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা ছিলো। এই পয়ঃপ্রণালিগুলো প্রধান পয়ঃপ্রণালি বা প্রয়ঃপ্রণালির সঙ্গে যুক্ত ছিলো। পয়ঃপ্রণালিগুলো মাটির উপরে বা নিচে তৈরি হতো। পয়ঃপ্রণালি তৈরিতে ব্যবস্হার করা হতো পোড়ানো ইট। ড্রেনের মুখ সংযুক্ত ছিলো নদীর সাথে। রাস্তার ভূঃগর্ভস্থ ড্রেনে ছিলো আধুনিককালের মতো ম্যানহোল। নগরায়নের এমন আধুনিক ধারণা অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতায় দেখা যায়নি। এজন্যই এ. এল. বাসাম বলেছেন, রোমান সভ্যতার পূর্বে অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতার এতো পরিণত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা ছিলো না।

২.৩ ঃ হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতি

হরপ্পা সভ্যতায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যে পরিচয় পায়য়ো যায় তাতে এখানে একটি জমজমাট অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করতো বলে ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন।

কৃষি ঃ হরপ্পা উপত্যকা, কালিবঙ্গান, হরপ্পায় শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ চাষাবাদের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত

হওয়ায় এ সভ্যতার আধিবাসীরা যে মূলত কৃষিজীবী ছিলেন এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তাছাড়া সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থার বিবেচনায় নগর-পত্তনকারী একটা স্থায়ী জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা কৃষিনির্ভর হওয়াটাই অতি স্বাভাবিক। এখানে গম, যব, মুগ, মসুর, সর্ষে, তিল, বার্লি, তুলা, বাজরা প্রভৃতি শস্য চাষের কথা জানা যায়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতো ষাঁড়। সিন্ধু সভ্যতায় বৃহৎ শস্যাগারের উপস্থিতি থেকে সভ্যতার কৃষি সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। ধান উৎপাদনের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া না গেলেও খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে লোথাবাসী ধান উৎপাদন করেছে অনুমান করা হয়।

পশুপালন ঃ সিন্ধু সভ্যতায় গৃহপালিত জন্তু হিসেবে কুঁজ বিশিষ্ট ষাঁড়, মহিষ, মেষ, শূকর, বিড়াল, হাতি উল্লেখযোগ্য ছিলো বলে মনে করা হয়। কুকুরকে প্রিয় পোষ্য জীব হিসেবে দেখা হতো। উট ও গাধা ছিলো ভারবাহী পশু। তবে সিন্ধু সভ্যতায় অশ্বের ব্যবহার ছিলো না বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক একমত।

শিল্প ঃ সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। তুলা ও পশমের সুতা কাটা ও বস্ত্র তৈরিতে মহেঞ্জোদারো ও হেরপ্পার বয়নশিল্পীরা পারদর্শী ছিলো। তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্য ধাতব শিল্পের অগ্রগতির কথা প্রমাণ করে। অঙ্কার তৈরিতেও তারা পারদর্শী ছিলো। তবে সেখান থেকে লৌহজাত কেন প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত না হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, সিন্ধুবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতো না। মৃৎশিল্পীরা নানারকম পাত্র তৈরি ছাড়াও কাঁচের মতো চকচকে ও মসৃণ চীনা মাটির পাত্র নির্মাণে দক্ষ ছিলো। নির্মাণ কার্যে ব্যবহার হতো কাঁচা এবং আগুনে পোড়া ইট। এসব ছাড়াও হাতির দাঁতের চিরুনি, হাতির দাঁতের সূঁচ, কাঠের হাতলবিশিষ্ট তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না, মৃৎপাতর, সীল প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পও গড়ে উঠেছিলো।

ব্যবসা ঃ বাণিজ্য-সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা পর্যাপ্ত দ্রব্য উৎপাদন করতো। ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং ভারতের বাইরে বহু দেশে এসব পণ্যের চাহিদা ছিলো। সিন্ধু সভ্যতার বিভন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ও কাথিওয়ারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। শি'রে কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। পারস্য, আফগানিস্তান, মিশর, চীন, সুমেরীয় ও ক্রিট সভ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার লোথালে একটি পোতশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যার দৈর্ঘ্য ৭১০ ফুট ও প্রস্থ ১২০ ফুট। সিন্ধু সভ্যতা থেকে হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র, মণিমুক্তা, ময়ূর রপ্তানি হতো। অন্যদিকে আমদানি হতো তামা ও রূপা। সিন্ধু সভ্যতার কিছু সীল সুমেরী অঞ্চলে এবং সুমেরীয় অঞ্চলের কিছু নিদর্শন হরপ্পায় পাওয়ায় উভয় সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের প্রমাণ স্বীকৃত। সুমেরীয় লিপিতে উল্লিখিত মেলুহাদের ঐতিহাসিকরা হরপ্পার সাথে এক করে দেখেছেন।

ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন দ্রব্যাদি ওজনের জন্য নানান সামগ্রী আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা বিভিন্ন ওজন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করতো। ছোট বাটখারাগুলির আকৃতি ছিলো চারকোণাকার এবং বড়গুলি ছিলো গোলাকার ও কিছুটা কৌণিক। বাটখারা তৈরি করা হতো শক্ত পাথর দিয়ে। বাটখারাগুলি সমমাপের হওয়ায় ধারণা করা হয় সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা সঠিক ওজনের ব্যাপারে সতর্ক ছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হয়, বড় বড় জিনিসের ওজন করার জন্য ব্রোঞ্জের স্কেল ব্যবহার করা হতো। খুব ভারী বস্তু ওজন করার জন্য ব্যবহার করা হতো কাষ্ঠখণ্ড।

কাষ্ঠখণ্ডের একপ্রান্তে দ্রব্য বেঁধে ওজন করা হতো। তাদের ওজন ছিলো ১৬ ভিত্তিক, যেমন ১৬, ৬৪, ১৬০, ৩২০, ৬৪০। কিছুকাল আগে আমাদের দেশে ১ আনায় ১ টাকা, বা স্বল্প ওজনের ক্ষেত্রে ১ আনায় ১ ভরি কিংবা বড় ওজনে ১ ছটাকে ১ সের ব্যবহৃত হতো। কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা স্কেলের মতো লাঠি ব্যবহার করতো। তাদের স্কেলের দৈর্ঘ্য ছিলো আধুনিক ২০ নির্দিষ্ট সদৃশ ইঞ্চি দণ্ডে পরিমাপ সমান। ইঞ্চির ৬২. থাকতো। কাটা ঘর এককের।

২.৪ ঃ হরপ্পার ধর্ম

হরপ্পার ধর্মীয় রীতি সম্পর্কিত ধারণা মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ থেকে পাওয়া যায়। লিখিত উপাদানের অভাবহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যথা—ধাতু বা মাটির মূর্তি (প্রচুর পোড়ামাটির নারী মূর্তি, তামা বা মাটির সিলমোহর, পাথরের লিপিচিত্র, চিত্রিত মৃৎপাত্র ইত্যাদি থেকে হরপ্পীয় ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তবে লিপির পাঠোদ্ধার না হবার কারণে এই সিলগুলির প্রকৃত অর্থ আমদের কাছে অধরাই থেকে গেছে।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন মার্শাল এই সভ্যতার ধর্মের কিছু মূল তত্ত্বের উল্লেখ করেন। যেগুলি থেকে হরপ্পার ধর্মের অস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। মার্শাল এই ধর্মের মধ্যে পরবর্তী হিন্দু ধর্মের বীজ লক্ষ্য করেছেন। যা পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে।

হরপ্পায় প্রাপ্ত বিভিন্ন নারী মূর্তি দেখে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেছে্ এখানে উর্বরতার উপাসনা করা হত। এই রকম নারীমূর্তি পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় পাওয়া যায়। এই থেকে মনে করা হয় হরপ্পীয়রা মাতৃকাদেবীর উপাসনা করতো। এই মূর্তিগুলি ছাড়াও একটি সীলে নগ্ননারীমূর্তি চিত্রায়িত হয়েছে, যার জননাঙ্গ থেকে একটি গাছর উৎপত্তি হয়েছে। এই সীলটি Proto type of Earth Mother নামে পরিচিত। আবার অনেক পোড়ামাটির মূর্তিতে গর্ভবতী নারী উপস্থাপিত হয়েছেন।

এই মূর্তিগুলি ছাড়াও এখানে অনেক পশু মূর্তি পাওয়া গেছে। পশুদের মধ্যে ষাঁড়, হাতি, সাপ, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি। আবার বেশ কিছু সীলে মিশ্র পশুর চিত্র পাওয়া যায়। এগুলি সম্ভবত তাদের ধর্মের সাথে যুক্ত ছিল।

একটি সীলে যোগাসনে বসা একটি পুরুষ মূর্তি পাওয়া যায়। এই পুরুষটিকে ঘিরে বন্য পশুদের পাওয়া যায়। এই চিত্রটিকে মার্শাল আদি শিব বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া এখানে বৃক্ষপূজার নিদর্শন পাওয়া যায়।

২.৫ ঃ পতন

আনু খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে উদ্ভুত হরপ্পা সভ্যতা, আনু ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে সমাপ্ত হয়। হরপ্পা সভ্যতা কেন ও কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। সম্ভবত সর্বত্র একই সঙ্গে বা একই কারণে পতন ঘটেনি।

(১) অনেকের মতে, নাগরিক জীবন যাত্রার মানের অবনতি ও বাণিজ্য হ্রাস এই সভ্যতার পতন ডেকে এনেছিল।

(২) অনেকের মতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে

রয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বন্যা। মহেঞ্জোদারোতে বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্শাল, ম্যাকে, রেইক্স, ডেল্‌স প্রভৃতিরা মনে করেন বন্যাই এই সভ্যতার পতনের কারণ।

(৩) অনেকে আবার মনে করেন বন্যা নয়, অনাবৃষ্টির জন্যই এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের কারণ ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদন ও নগরায়ণ বলে অনেকে মনে করেন।

(৪) রেইক্স সহ কেউ কেউ নদীর গতিপথের পরিবর্তনের মধ্যে পতনের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। এর ফলে মরুভূমির মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

(৫) কেউ কেউ মনে করেন ভূমিকম্প এই সভ্যতার পতন ডেকে এনেছিল।

(৬) অনেকের মতে, বিদেশি শত্রুর আগমন এই সভ্যতার অন্যতম প্রধান কারণ। বিদেশি শত্রু বলতে অনেকেই আর্যদের চিহ্নিত করেছেন। এই মতের প্রবক্তা গর্ডন চাইল্ড ও ডঃ হুইলার। বর্তমানে অবশ্য এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৩ ঃ বৈদিক সভ্যতা (Unit-4)

৩.১ ঃ আর্য সমস্যা

আর্য এই নাম বা অভিধাটিকে কেন্দ্র করে যে সম্যাস সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল ঐতিহাসিক সমস্যা নয় বরং প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সমস্যা নয়। সুতরাং এক বৃহত্তর আঙ্গিকে এই সমস্যাকে আলোচনা করা উচিত। এই সমস্যার দুটি দিক আছে, একটি ভাষাতাত্ত্বিক ও একটি প্রত্নতাত্ত্বিক। এই দুটি ধারার মাধ্যমে ঐতিহাসিকরা আর্যদের আদি বাসভূমি এবং তাদের উৎস নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিও বণিক ফিলিপ্পো সসেত্তি ভারতে এসে ইতালিও ভাষার সাথে ভারতীয় ভষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। একটি অঞ্চলের ভাষার সাথে অন্য অঞ্চলের বাষার মিল থাকে কেন, সেই প্রশ্ন থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চার সূত্রপাত। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাতে উেইলিয়াম জোন্স গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষার উদ্ভুত মিল লক্ষ্য করেন। তার রচনাটি ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'Asiatic Researches, Vol-I' পত্রিকায় 'The Aniversary Discourse' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মাক্সমুল্লার আর্য কথাটি প্রথমে ব্যবহার করেন। "The Home of the Aryans" নামক নিবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করতে চাইলেন, আর্য একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম, কোনো জাতিগোষ্ঠীর নাম নয়। সুতরাং আর্য তাকেই বলে যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কথা বলে। অনেকেই তাঁর মতের বিরোধিতা করেছিলেন। লিখিত বা সাহিত্যগত উপাদানে এবং লিপিতে আর্য শব্দটির বিবর্তনের দিকে তাকালে কিন্তু দেখা যায়, 'ঋগ্বেদ'-এ আর্যদের দস্যুদের থেকে পৃথক বলা হয়েছে এবং দস্যু বা দাসদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুমান করা যায় যে, বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরই প্রথমে আর্য নামে ডাকা হত। নৃপতি দারয়বয়ূস

তাঁর 'নকশ-এ-রুস্তম' লেখতে নিজেকে আর্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর বেহিস্তান লেখতে বলা হয়েছে, সেটি আর্য ভাষায় লেখা। সুতরাং সেখানে আর্যবংশ, আর্যজাতি ও আর্যভাষার ধারণা গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এখানে আর্য শব্দটি প্রাথমিকভাবে একটি ভাষা এবং পরে ঐ ভাষাভাষীদের এবং তাদের শাসিত অঞ্চলকে বোঝাত। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, আদি সাক্ষ্যসমূহে আর্য বলতে প্রাথমিকভাবে একটি ভাষাগোষ্ঠীকেই বোঝানো হত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মানী বা গথিক, তোখারীয়, সংস্কৃত ও প্রাচীন ইরানীয়।

১) **লিঙ্গুইস্টিক 'আর্য' ঃ** প্রাথমিকভাবে এই শব্দটি একটা ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষণ। এইটুকু বলা যায় যে গোটা ইউরেশিয়ায় যে অসংখ্য ভাষা আজকের দিনে প্রচলিত, এবং আরও যে সমস্ত হারিয়ে যাওয়া ভাষার কথা ঐতিহাসিক তথ্যে বা প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যে পাওয়া গেছে তাদের অনেকগুলোর মধ্যেই একটা নিবিড়, নিকট সম্পর্ক আছে। সেই নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তিতে এই ভাষাগুলোকে বেশ কয়েকটা ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়.... একই গোষ্ঠীর মধ্যের ভাষাগুলোর নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই কাছের, তুলনায় দুটো আলদা ভাষাগোষ্ঠীর দুটো ভাষার মধ্যে সম্পর্ক সাধারণভাবে তুলনায় দূরের এই ভাষাটি যখন বেঁচে ছিল, তখন সেই ভাষায় যারা কথা বলত তাদেরকে বলা হয় প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভাষী মানুষ (সংক্ষেপে PIE speakers)। এবার একটা ভাষা খুব পুরনো সময়ে খুব বড় ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে থাকতে পারে না, কারণ আঞ্চলিক ব্যারিয়েশনই বাড়তে বাড়তে এক সময় দুটো আলাদা ডায়ালেক্ট পরস্পর দুর্বোধ্য হয়ে যাবে... অর্থাৎ আলাদা ভাষা হয়ে যাবে PIE speaker দের culture একরকম কাছাকাছি ছিল, যাকে আমরা একটাই culture বলে ধরতে পরি। আর সেই culture কে আমরা বলব PIE culture। আবার জেনেটিকালিও এই মানুষগুলোর নিকট সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট.... তাই একই সংস্কৃতি ও জেনেটিকালিও নিকট সম্পর্কিত, এটা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে .... সেটাকে আমরা PIE ethnic group বলতে পারি। কিন্তু যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি যে PIE ethnic group ও PIE speakers একই, তাই সেটা আর বলব না।

ভারতীয় উপমহাদেশে IE ভাষাগোষ্ঠীর অনেকগুলোই অনেকগুলো ভাষা আজ বিদ্যমান (বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া ইত্যাদি, আবার তামিল IE নয়), বেশ কয়েকটা আজ নেই কিন্তু জানা আছে (Vedic Sanskrit, Classical Sanskrit ইত্যাদি)। এই সবকটার একটা latest common ancestor আছে... এবং সেই ভাষাটাও নিশ্চয়ই PIEর সন্তান ভাষাগুলোর একটা.... সেই ভাষাটাকে আমরা বলব ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan, সংক্ষেপে IA, অনেক সময় Old Indic বলেও এই ভাষাটাকে বোঝানো হয়).... সেই ভাষাভাষী মানুষদের আমরা বলব আর্য।

অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক ত্রিবেদ, কল্ল, গঙ্গানাথ ঝা, প্রমুখ মনে করেন ভারতীয় উপমহাদেশ আর্যদের আদি বাসভূমি। এই প্রসঙ্গে তাদের যুক্তি হল এই যে, বৈদিক সাহিত্যে কোথাও অভিপ্রয়ান বা আদি কোনও বাসভূমির কথা বলা নেই। সপ্তসিন্ধু বা পাঞ্জাবকেই তারা তাদের বাসভূমি রূপে উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদের সাথে জাতীয়তাবাদের যতটা সম্পর্ক রয়েছে, ইতিহাসের যুক্তির ততটা সম্পর্ক নেই। ঋকবেদে দ্রাবিড় ও মুণ্ডারি শব্দ রয়েছে প্রায় ৩০০টি, যা অন্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। এছাড়া মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, এই ভাষার ক্ষেত্রে। তাই অনেক ঐতিহাসিক আর্যদের আদি বাসস্থান হিসেবে ভারতের বাইরের অঞ্চলকে নির্দেশ করেন। বেদ ও আবেস্তার ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য, গ্রীক সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সাদৃশ্য তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসভূমির সন্ধানে জাইলস বার্চ গাছ ও সেইরকম শব্দের তুলনামূলক আলোচনা করে মনে করেন এদের আদিবাস ইউরোপের কার্পেথীয় পর্বত, বলকান অঞ্চলে ছিল। ব্র্যাণ্ডেস্তাইন এই মত মানেন না। তিনি অশ্ব এবং পশুচারণের মত শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করে মনে করেছেন, রাশিয়া বা ইউক্রেনের তৃণভূমি অঞ্চলে ইন্দো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি। এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন মারিয়া গিয়ামবুটাস। তিনি দক্ষিণ রাশিয়া ও ইউক্রেনের দক্ষিণাংশে দ্রুত সঞ্চরণশীল পশুপালক, সংস্কৃতির অবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। একে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয়দের সাথে আদি বাসভূমি মনে করেছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত বোঘাসকোই লিপি। যেখানে হিত্তি ও মিত্তানী শাসকদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্ত্য এই বৈদিক দেবতাদের উল্লেখ ছিল। আবার পারসিকদের আবেস্তা ও বেদের প্রচুর মিল থাকা সত্ত্বেও, আবেস্তায় দেব শব্দটি নিন্দনীয়, যার বিপরীতে অসুর শব্দটি ভারতে নিন্দনীয়। কিন্তু ঋকবেদে অনেক সুক্তে দেবতাদের অসুর অভিধা প্রদান করা হয়েছে। এই শব্দটি তেজশালী, শক্তিশালী অর্থে ব্যবহার করা হত। মনে করা হয়, বৈদিক ও আবেস্তীয়রা একটি সময়ে একগোষ্ঠী ছিল, পরে তাদের মধ্যে বিভাজনের ফলে একটি গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসভূমির প্রশ্নটি আজও সমাধান করা যায়নি। এদেরকে জাতিগোষ্ঠী রূপে না দেখে ভাষা হিসেবে আলোচনা করার কথা আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তবে সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, ইউরোপীয় বাসভূমি থেকে পারস্যের মধ্য দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

৩.২ ঃ বৈদিক সমাজ ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা

বৈদিক সমাজে উপজাতীয় ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋকবৈদিক সাহিত্যের যথাযথ বিশ্লেষণ করলে যে সমাজ ব্যবস্থার চিত্র উঠে আসবে, তা একটি গোষ্ঠী বিভক্ত সমাজ ছিল। রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ, একই পরিবার থেকে এই জাতি গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব। বেদে জাতি গোষ্ঠী বলতে পঞ্চ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাঁচটি জাতি ছিলেন অনু, যদু, পুরু, তুর্বশ, দ্রুহু। ঋকবেদে সপ্তম মণ্ডলে অষ্টাদশ সুক্তে এই পাঁচ জাতির সাথে তৃৎযু গোষ্ঠীর নেতা পিজবন পুত্র সুদাসের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। যা দশ রাজার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

সমাজ জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল পরিবার। এই পরিবার নিঃসন্দেহে পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের প্রবীণতম পুরুষ পরিবার পরিচালনা করতেন। পিতা ছিলেন পরিবারের প্রধান। এছাড়া তাঁর সন্তান-সন্ততি, পৌত্র-পৌত্রীরা একই পরিবারের বসবাস করতেন। বৈদিক সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল চতুর্বর্ণ প্রথা। দশম মণ্ডলের পুরুষ সুক্তে চারবর্ণের উৎপত্তি আদি পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হয়েছ। মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে। তবে এই বিভাজন জন্মভিত্তিক না হয়ে কর্ম ভিত্তিক ছিল। একটি কথা এই প্রসঙ্গে প্রনিধানযোগ্য যে দশম মণ্ডল ব্যাতীত ঋকবেদের অন্যত্র চতুর্বর্ণ প্রথার উল্লেখ নেই। ঋকবেদে বর্ণ দুটি, আর্যবর্ণ ও দাসবর্ণ। দাস বর্ণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে তাদের বলা হয়েছে 'কৃষ্ণত্বাচ' বা কালো গাত্রবর্ণের। ফলে অনুমেয় যে ঋকবেদে বর্ণভিত্তিক ব্যবস্থা চতুবর্ণকে নির্দেশ করেনি। ঋকবেদে একটি সূক্তে এক ব্যক্তির পরিচয় হল, তিনি কবি, তার পিতা চিকিৎসক (ভিষক), মাতা শস্যপেষণ করেন (উপল প্রেক্ষিণী)। অর্থাৎ বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসরনের বিষয়টি এই সময়ে প্রচলিত ছিল না।

অন্যদিকে সামাজিক সংগঠন হিসেবে বর্ণ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল জন, বিশ, গণ, প্রভৃতি। এই শব্দগুলি কৌম সংগঠনের আভাস দেয়। এর জীবনযাত্রা ছিল অনেক সহজ করল। সম্ভবত পশুচারণ ভিত্তিক সমাজে খাদ্যসম্ভার সকলের মধ্যে বন্টিত হত। R.S Sharma মনে করেন সামাজিক বৈষম্য এই সময় অনেক কম ছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক ব্যবস্থার জটিল রূপ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের মর্যাদা বৃদ্ধি হতে থাকে, শূদ্রের অবস্থান খারাপ হতে থাকে। তিন বর্ণ দ্বিজ নামে পরিচিত হয়। বর্ণব্যবস্থা কর্ম অনুসারে না হয়ে, জন্ম অনুসারে হতে শুরু করে। বংশগত পেশা ভিন্ন অন্য পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আধিপত্য সর্বাধিক হয়, তারপর ক্ষত্রিয় রাজাদের স্থান, বৈশ্যরা দ্বিজ মর্যাদা প্রাপ্ত হলেও, সমাজে এরা ওপরের দুই শ্রেণীর দ্বারা নিপীড়িত ছিলেন। তবে শূদ্রের অবস্থা ছিল শোচনীয়, তাকে যখন খুশি হত্যা পর্যন্ত করা যেত।

অর্থনৈতিক জীবনে ঋকবৈদিক যুগে পশুচারণভিত্তিক অর্থনীতি লক্ষ্য করা যায়। ঋকবেদে কৃষির উল্লেখ বিরল। রাজার এই যুগে অভিধা ছিল 'গোপতি', যা সমাজে গবাদিপশুর গুরুত্ব বর্ণনা করে, পাশাপাশি এই সময়ের যুদ্ধবিগ্রহ মূলত লুণ্ঠনকেন্দ্রিক, যেখানে গোষ্ঠীপতি রাজা লুণ্ঠনে নেতৃত্ব দিতেন, পরে সেই সম্পদ 'বিশ' বা কৌমের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হত। এই সময়ে অভিজ্ঞ কৌম সদস্যদের নিয়ে 'সভা' এবং সকল কৌমের মানুষদের নিয়ে 'সমিতি' নামক সামাজিক সংস্থা ছিল। এছাড়া ছিল 'বিদথ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজের ব্যাপক বৃদ্ধি সমাজ জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এই সময় জমির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজার অভিধা এই সময় 'ভূপতি', 'মহীপতি' অর্থাৎ পৃথিবীর অধিপতি। এইভাবে দেখা যায়, বৈদিক যুগে সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটি পরিবর্তনশীল সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।

৩.৩ ঃ বৈদিক ধর্ম

বৈদিক যুগের ধর্ম (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ৫০০ অব্দ) অথবা বৈদিক ধর্ম, বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা প্রাচীন হিন্দুধর্ম বা, প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম হল আধুনিক হিন্দুধর্মের আদি রূপ। ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্মের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।

চার বেদের মন্ত্র অংশে বেদের অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি রক্ষিত আছে। এই অংশটি বৈদিক সংস্কৃত ভাষার রচিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন পুরোহিতেরা। পূজার পদ্ধতি আধুনিক হিন্দুধর্মে অনেকাংশে অপরিবর্তিত থাকলেও, রক্ষণশীল শ্রৌতদের একটি অংশ এখনও মৌখিকভাবে স্তোত্র শিক্ষার পরম্পরা বজায় রেখেছে।

বৈদিক যুগে রচিত ধর্মগ্রন্থগুলি বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এগুলি প্রধানত চারটি বৈদিক সংহিতা। তবে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও কয়েকটি প্রাচীন উপনিষদ্ (বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য) এই যুগে রচিত বলে মনে করা হয়। বেদের অনুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা আছে। ১৬ বা ১৭ জন শ্রৌত ও বৈদিক পুরোহিত মিলে এই অনুষ্ঠান সম্পাদনা করতেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি এবং অন্যান্য বৈদিক স্তোত্রগুলি ঋষিদের কাছে দিব্য উপায়ে

প্রকাশিত হয়েছিল। তাই এই ঋষিদের ওইসব স্তোত্রের 'মন্ত্রদ্রষ্টা' (যিনি মন্ত্র দেখেন বা শোনেন) মনে করা হয়; রচয়িতা মনে করা হয় না। বেদকে অপৌরুষেয় মনে করা হয়। কারণ, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, কোনো মানুষ বেদ রচনা করেননি। তাছাড়া বেদকে অপরিবর্তনশীল ও মনে করা হয়।

হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া ঋগ্বৈদিক যুগ থেকে একই ভাবে প্রচলিত। তবে এই সব অনুষ্ঠান সেমেট্রি এইচ কালচারেও (Cemetery H Culture) দেখা যেত। ঋগ্বৈদিক যুগের শেষ দিকে মৃত (''অগ্নিদগ্ধ'') ও জীবিত (''অনগ্নিদগ্ধ'') পুর্বপুরুষদের আবাহনের একটি ক্রিয়া যুক্ত হয়।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বরুণ। তাকে ঋত বা পবিত্র নিয়মাবলির প্রধান বলা হয়েছ। তাঁর চক্ষু স্বরূপ ছিলেন সৌরদেবতা মিত্র। তাদের একত্রে দেব ও অসুরদের সম্রাট বলা হয়েছে। কিন্তু ক্রমশ তার মর্যদা হ্রাস পেয়ে, যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়েছিল ঋকবেদের রচনার সময় কালেই। সম্ভবত উপজাতীয় যুদ্ধকেন্দ্রিক সমাজে, যুদ্ধের গুরুত্ব বৃদ্ধি, ইন্দ্রের মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম সূচক ছিল। ঋকবেদে ইন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত সূক্তের সংখ্যা সর্বাধিক।

আগুনের দেবতা অগ্নিকে আরাধনা করা হত দেবতাদের সাথে মানুষদের মাধ্যম হিসেবে, পাশাপাশি জীবনে আগুনের গুরুত্ব এর থেকে পরিস্ফুট হয়। ঋকবেদে অগ্নিকে উৎসর্গীকৃত সূক্তের সংখ্যা ইন্দ্রের পরেই দ্বিতীয়। এছাড়া আকাশের দেবতা দ্যু এবং ভূমির দেবী পৃথিবী একত্রে পিতা-মাতা রূপে উপাসিত হতেন। দেবমাতা রূপে উপাসিত হতেন অদিতি। তিনি ও তাঁর সাত পুত্র একত্রে আদিত্য নামে পরিচিত।

পরবর্তী বৈদিক ধর্মে যেসব প্রধান যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানগুলি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল, সেগুলি হল ঃ সোম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি, অগ্নিষ্টোম, হবির্যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ঋতুকালীন চতুর্মাস্য যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ পুরুষমেধ, অথর্ববেদে লিখিত চিকিৎসামূলক ক্রিয়াকাণ্ড ও মন্ত্রপাঠ। আগুন বা নদনদীর পূজা, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতার পূজা, মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞ ছিল বৈদিক সমাজে প্রধান উপাসনার পদ্ধতি। পুরোহিতেরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করতেন। মানুষ দেবতার কাছ থেকে অধিক সন্তান, বৃষ্টিপাত, গবাদি পশু, দীর্ঘায়ু ও মৃত্যুর পর স্বর্গ কামনা করত। পুরোহিতদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। হোতা (যিনি মন্ত্রপাঠ করতেন), উদগাতা (যিনি সামগান করতেন), অধবযু (যিনি যজ্ঞে আহুতি দিতেন), ও ব্রাহ্মণ (যিনি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন)। আধুনিক হিন্দুধর্মেও পুরোহিতরা বৈদিক স্তোত্র পাঠ করে উন্নতি, ধনসম্পত্তি ও সর্বসাধারণের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এই ভাবে দেখা যায় বৈদিক ধর্ম যা প্রথম দিকে একটি সরল প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা হলেও, পরবর্তী কালে জটিল যজ্ঞানুষ্ঠান এই ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।

৩.৪ ঃ বৈদিক যুগে নারীর স্থান

সাধারণভাবে বলা হয় বৈদিক যুগে নারীর স্থান ছিল খুব উচ্চস্থানে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রসন্তানের জন্ম অভিপ্রেত হলেও কন্যার যত্ন ও লালনপালনে কোনো ত্রুটি থাকত না। তার শিক্ষার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হত। যে নারীরা বিবাহ না করে বেদ পাঠ করে জীবন কাটাতেন তাদের বলা হত ব্রহ্মবাদিনী, আর যারা বিবাহ অবধি বেদ শিক্ষাগ্রহণ করতেন তারা ছিলেন সদ্যবধু। সুকুমারী ভট্টাচার্য মনে করেন, ব্রহ্মবাদিনী নারীদের কথা

বলা হলেও, সংখ্যায় তারা খুব নগণ্য। ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারার মতো নারীরা বৈদিক শ্লোক রচনা করেছিলেন। উপনিষদের যুগে গার্গীর মতো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারীরা উপনয়নের অধিকারিণীও ছিলেন। উচ্চবর্ণের মহিলারা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে যাগযজ্ঞে অংশ নিতেন। তাঁরা সম্পত্তির অধিকারিণীও ছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা করলে পুনর্বিবাহ করতে পারতেন।

কিন্তু বৈদিকযুগে, বিশেষত পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা যে সবটাই ভাল ছিল তা নয়। সমাজে শূদ্র ও নারীদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। নারীকে বলা হত 'ভার্যা'; অর্থাৎ, ভরণীয়া বা যাকে ভরণ করতে হয়। তার স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। মনু বলেছেন, শিশুকালে নারী পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বয়সকালে বা বৈধব্য জীবনে পুত্রের অধীন। বিবাহকেই নারীর উপনয়নের সমতুল বলেছেন মনু। পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও নারীদের মধ্যে তা ছিল না। স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হত। অথর্ব বেদে অবশ্য নারীদের বহুবিবাহের কথা উল্লেখ আছে। ঋকবৈদিক যুগে বিবাহ নারীর পক্ষে বাধ্যতা মূলক না হলেও পরে তা হয়েছিল। এই সময়ে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল না। বিধবা অপুত্রক হলে দেওর বা অন্য কোন আত্মীয়ের সাথে বিবাহের নিয়ম ছিল। অথর্ব বেদের যুগে সহমরণ বা সতীদাহের কথা জানা যায়। বিবাহে কন্যাপণের কথাও জানা যায়। ঋক্‌বৈদিক যুগের গোড়ায় নারী গৃহে আবদ্ধ থাকত না; এমনকি মুদগলিনী, বিশপলা, শশিয়সী প্রভৃতি নারীর নাম পাই, তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে ক্রমশ নারীর স্থান হয়েছিল অন্তঃপুরে। পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়াই ছিল তার প্রধান কাজ। নিঃসন্তান বা শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়া নারীকে পরিত্যাগ করার অধিকার তার স্বামীর ছিল। সেক্ষেত্রে স্বামী আবার বিবাহ করতে পারত। নারীর মন বলে কিছু আছে, তা মনে করা হত না, এমনকি তাকে প্রহার করবার অধিকার তার স্বামীর ছিল। এক কথায় বলা যায়, প্রাচীন যুগে 'নারীস্বাধীনতা' ছিল বলে অনেকের যে ধারণা আছে, তা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। নারী ছিল পুরোপুরি পুরুষের অধীন এবং তারই ''সম্পত্তি''।

বেদ পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থান ক্রমশ অবনতি হয়। বৌধায়নের ''ধর্মশাস্ত্রে'', মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারদের রচনা, কৌটিল্যের 'অর্থাশাস্ত্র', বাৎসায়নের 'কামসূত্র', কালিদাসের বিভিন্ন নাটক, বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত', হর্ষবর্ধনের নাটক 'রত্নাবলী', মাঘের 'শিশুপালবধ', দন্ডির 'দশকুমারচরিত,' শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নারীর দুরাবস্থার কথা জানতে পারা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র পুত্রের মাতা। তার কোনা স্বাধীনতা ছিল না। স্বয়ংবর ও গান্ধর্ব বিবাহ পদ্ধতি ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং আর্য ও আসুর বিবাহ প্রথা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিধবা বিবাহ ক্রমশ উঠে যেতে থাকে এবং জীবনের বাকি অংশে তারা শোক এবং কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে থাকে। তবে পর্দাপ্রথা ছিল না। নারীরা উৎসব এবং খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করতে পারত। হর্ষবর্ধনের সময় (সপ্তক শতকে) সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। শিক্ষাদীক্ষা উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। তাদের বেদপাঠ নিষিদ্ধ হয়। সমাজে একমাত্র পতিতারাই শিক্ষিতা এবং স্বাধীন ছিল। তবে বৌদ্ধ ও জৈন পরিবারের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল। সাহিত্যে অবশ্য নারীকে প্রেমিকা রূপে দেখানো হয়েছিল। কলহন রক্ষণশীল ও নারী স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন। আবার এইযুগে লীলাবতী ও খনার মতো বিদূষী মহিলারও সাক্ষাৎ মেলে। নারী স্বাধীনতা না থাকলেও তাদের যথেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত। স্বামীকে তার সাধ্যমতো স্ত্রীর ভরণপোষণ, বিলাসসামগ্রী, এবং অলংকারের দায়িত্ব গ্রহণ

করতে হত। নারীদের তিরস্কার এবং প্রহার করা নিন্দনীয় ছিল। যে সব পুরুষ তাদের স্ত্রীদের প্রহার করেন, ঈশ্বর তাদের পূজা গ্রহণ করেন না বলে শাস্ত্রের বিধান ছিল। এইভাবে দেখা যায় নারীদের অবস্থান বৈদিক যুগ থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছিল।

৪ ঃ উপসংহার

বর্তমান পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম, হরপ্পা সভ্যতার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে নগরায়নের সূচনা হয়, এই সভ্যতার পতনের পরে বৈদিক সভ্যতার উত্থানের কথা আমরা জানতে পারলাম। পাশাপাশি এই দুই সভ্যতার সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই স্থানে করা হল।

৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Ranabir Chakraborty : Exploring Early India.

২। Romila Thapar : The Penguin History of Early India.

৩। Romila Thapar : Cultural past.

৪। রণবীর চক্রবর্তী ঃ ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব।

৫। ইরফান হাবিব ঃ সিন্ধু সভ্যতা

৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। হরপ্পার নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। ইন্দোইউরোপীয়দের আদি বাসভূমি সংক্রান্ত মতবাদগুলি কি কি?

৪। বৈদিক ধর্মের প্রকৃতি কেমন ছিল? নারীদের বৈদিক ও তার পরবর্তী যুগে কিরূপ মর্যাদা প্রদান করা হত?

Block / পর্যায়–৩

Ancient Egypt

প্রাচীন মিশর

সূচীপত্র ঃ

---

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ মিশরীয় সভ্যতার তথ্যসূত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও নারীরস্থান (Unit-5)

২.১ ঃ তথ্যসূত্র

২.২ ঃ সমাজ ব্যবস্থা

২.২.১ ঃ মিশরীয় সমাজ

২.২.২ ঃ পরিবারিক জীবন

২.২.৩ ঃ অর্থনৈতিক জীবন

২.৩ ঃ প্রাচীন মিশরে নারীদের অবস্থান

৩ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র পুরোহিততন্ত্র ও ওসিরিয়ান উপাসনা (Unit-6)

৩.১ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র

৩.২ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্রের প্রকৃতি

৩.৩ ঃ পুরোহিততন্ত্র ও ধর্মীয় চেতনা

৩.৪ ঃ ওসাইরিস আরাধনা

৩.৫ ঃ আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ

৪ ঃ হিট্টাইট আক্রমণ, মিশরীয় আইন ব্যবস্থা, মমিকরণ প্রথাসমূহ (Unit-7)

৪.১ ঃ মিশরীয় ইতিহাসে হিট্টাইট আক্রমণ, সন্ধি ও গুরুত্ব

৪.২ ঃ মিশরীয় আইন ব্যবস্থা

৪.৩ ঃ মৃত্যু ও মমিকরণ

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়টি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) মিশরীয় সভ্যতার সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল।

২) মিশরীয় রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের স্বরূপ কি ছিল?

৩) পিরামিড ও মমি কিভাবে নির্মিত হয়েছিল।

২ ঃ মিশরীয় সভ্যতার তথ্যসূত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও নারীর স্থান (Unit-5)

২.১ ঃ তথ্যসূত্র

ইতিহাস পুনঃনির্মাণের জন্য তথ্যসূত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। বিভিন্ন তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি। মিশরীয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন তথ্যসূত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। মিশরীয় সভ্যতার তথ্যসূত্রে মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল (i) প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ, (ii) নৃতাত্ত্বিক অবশেষ (iii) লেখমালা (iv) লিখিত পুঁথি।

i) **প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ ঃ** মিশরীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের মধ্যে নির্দ্বিধায় যে স্থাপত্যের কথা বলা যায়, তা হল পিরামিড, মিশরীয় ফ্যারাওদের সমাধি এই পিরামিড। এই স্থাপত্যকীর্তি মিশরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য বহন করে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেবতা ও পশুপাখির মূর্তি উদ্ধার করা হয় যা মিশরের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে পাওয়া যায়। পিরামিড, আসলে সমাধি হলেও এর মধ্যে বিভিন্ন মূর্তি, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া যায়। পাশাপাশি সমাধি গাত্রে বিভিন্ন অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে মিশরীয় সমাজের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট হয়। দেওয়াল চিত্রের ব্যবহার মিশরীয় ইতিহাসের প্রধানতম একটি তথ্যসূত্র। যেমন—অষ্টাদশ রাজবংশ রাজকর্মচারী গেবামুনের সমাধিতে দেখা যাচ্ছে, তার সম্মুখে অনেকগুলি গরু উপস্থিত করা হয়েছে। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মিশরীয় সমাজজীবনে পশুর মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়া বিভিন্ন মন্দির থেকে মিশরীয় ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মন্দিরে বা Cult tenple গুলি বিরাট নগরসভ্যতার ইঙ্গিতবাহী ছিল। এদের মধ্যে কার্নাকের আমুন (Amin) মন্দির, লুক্সরের আমুন মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ii) **নৃতাত্ত্বিক অবশেষে ঃ** ইতিহাসের উপজীব্য মানুষ, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতীতের মানুষ কেমন ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের নিকট সেই ভাবে থাকে না। কিন্তু মিশরীয় সভ্যতা সেই দিক দিয়ে ছিল উজ্জ্বল রকমের ব্যতিক্রমী। মৃতদেহ মমিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত হবার কারণে প্রাচীন মিশরীয় মানুষদের দেহ সুরক্ষিত অবস্থায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা লাভ করতে পারেন। মমির যথার্থ পরীক্ষণের ফলে যেমন মিশরীয়দের উৎস বা নৃতাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার সঙ্গে নিশ্চিত হওয়া যায়। যেমন—তুতেনখামেনের অল্পবয়সের মৃত্যুর প্রমাণ বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদানে যেমন বর্ণিত আছে, তেমনভাবে আমরা তাঁর মমির পরীক্ষা করলে তাঁর বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

iii) **লেখমালা ঃ** হায়রোগ্লিফিক লিপিতে রচিত মিশরের লেখমালাগুলি মিশরের সমসাময়িক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। Hieroglyphics এর অর্থ হল পবিত্র লেখনী। এই চিত্রলেখগুলির পাঠোদ্ধার হবার পর থেকে মিশরীয় সভ্যতার নানান তথ্য ঐতিহাসিকদের সামনে ফুটে উঠেছে। এই লিপি ছাড়াও মিশরে Hieratic, Demotic, Coptic লেখনী ব্যবহৃত হত। মূলত সমাধিগাত্রে এই ধরনের লিপি খোদিত থাকতো। 1799 খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কৃত দ্বিভাষিক লিপি Rosetta Stone মিশরীয় ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই লিপিটিতে গ্রীক ও হায়রোগ্লিফিকস দুটি লিপি অবস্থান করায় ঐতিহাসিকরা তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হায়রোগ্লিফিকস্ লিপির পাঠোদ্ধার করেন। 1819 খ্রিষ্টাব্দে Thamas Young এই গবেষণার সূচনা করেন, এবং পরবর্তীকালে 1822 খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী গবেষক Jeam-Francois Champollion এই পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ করেন। এই লেখমালাগুলিতে রাজবংশ ফ্যারাওদের কার্যকলাপ ও কীর্তি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

iv) **লিখিত পুঁথি ঃ** মিশরীয় সভ্যতায় লিখিত পুঁথির ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল। প্যাপিরাস পাতায় এই পুঁথি লিখিত হত। এটি নীলনদ অববাহিকায় জাত একধরনের গাছের পাতা থেকে তৈরী করা হত। সবচেয়ে দীর্ঘ papyrus হল Harris Papyrus যেটি 41 মিটার দীর্ঘ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে অনেক প্রত্নবস্তুর ন্যায়, প্যাপিরাসের ব্যবহার আদিরাজবংশীয় সময়কালের থেকে শুরু হয়ে ফ্যারাওদের সময় অতিক্রম করে অনেকদিন অবধি অব্যাহত ছিল।

Papyrus-গুলি মূলত ছিল ধর্মীয় গ্রন্থ পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে এর গভীর সংযোগ ছিল। প্যাপিরাস গাছ রাজকীয় বৃক্ষের মর্যাদা লাভ করেছিল। প্যাপিরাসে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল The Book of Dead। এই প্যাপিরাসগুলি অনেকসময় মমির সাথে সমাধিতে রাখা হত।

এইভাবে দেখা যায় মিশরীয় ইতিহাস চর্চার জন্য বিভিন্ন তথ্যসূত্রের বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকরা নির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত হয়েছেন। এই তথ্যসূত্রগুলির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ইতিহাসচর্চাকে দৃঢ়তাপ্রদান করেছে।

২.২ ঃ সমাজ ব্যবস্থা

২.২.১ ঃ মিশরীয় সমাজ

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে নীলনদের তীরে বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠী একটি সমাজ সংগঠন গড়ে তোলে। এই সভ্যতা মিশরের প্রধান নদী নীলনদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। নীলবিধৌত পালনভূমিতে মরুভূমি বেষ্টিত মিশরীয় সমাজের সূত্রপাত ঘটে। মূলত নদীঅঞ্চলে কৃষিসমাজের প্রাথমিক নির্দশন পাওয়া যায়, বদ্বীপ অঞ্চলের মেরিমদে অঞ্চলে। এই সময়ের কিছুপরে ফায়ুম নামক অঞ্চলে কৃষিজীবিদের সন্ধান মেলে। পাশাপাশি মরুঅঞ্চলে পশুপালন সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্যনীয় ছিল। সামাজিক সংগঠন লক্ষ্যকরলে দেখা যাবে মিশরীয় সমাজে বর্ণপ্রথা প্রমাণ নেই, আইনের দৃষ্টিতে সকলে ছিল সমান, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থানগত দিক থেকে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। রাজপরিবার ও ভূমিদাসদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য ছিল।

মিশরীয় সমাজে কয়েকটি শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন—(১) রাজপরিবার (২) পুরোহিত (৩) অভিজাত (৪) লিপিকর (৫) ব্যবসায়ী (৬) শিল্পী এবং (৭) কৃষক ও ভূমিদাস। সাম্রাজ্যের যুগে আরেকটি

শ্রেণী হিসাবে সৈন্যদের অর্ন্তভূক্তি ঘটে। এইসময়ে প্রচুর যুদ্ধবন্দী দাস হিসাবে মিশরে আনীত হয়, পরে তারাও একটি শ্রেণীরূপে পরিগণিত হয়। প্রাচীন সমাজে ফারাও তার আত্মীয়গণ রাজপরিবারের অর্ন্তভূক্ত হতেন। পুরোহিতরা মন্দিরে পূজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এদের সামাজিক প্রতিপত্তি শক্তিশালী ছিল। অভিজাতরাও সম্মানীয় অবস্থান প্রাপ্ত ছিল। লিপিকররা মিশরের সমাজের উচচস্তরে অবস্থান করতেন। তারা কেবলমাত্র পুঁথিচর্চার কাজে নিযুক্ত থাকতেন না, বরং সরকারী উচ্চদায়িত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। শিল্প ভাস্কর্যতে এই লিপিকরদের উপস্থাপনা করা হয়েছে। মধ্যরাজবংশ চলাকালে অভিজাতদের বিরুদ্ধে লেখক, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও ভূমিদাসদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে সকল শ্রেণীর মর্যাদা বৃদ্ধিপায়। এই সময় ব্যবসায়ীও শিল্পীরা উচ্চশ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে শুরু করে। সাম্রাজ্যের যুগে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতশ্রেণী একটি আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। জাদুবিদ্যা এবং কুসংস্কারের বিস্তার হলে পুরোহিতদের অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়।

কৃষক ও দাসরা সমাজের সর্বনিম্নস্তরের অবস্থিত ছিল। যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্যে দাসত্ব অপেক্ষাকরত। দাসদের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রাচীন মিশরে না থাকলেও দাসরা অভিজাতও ফ্যারাওদের গৃহভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত থাকতেন। এছাড়া মিশরীয় বৃহৎ নির্মাণকার্যে শ্রমিকহিসাবে তাদের নিযুক্ত করা হত। অন্যদিকে কৃষকরা জমিতে চাষ করতেন, পশুপালন করতেন, সেচও জলাধার গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। পাশাপাশি পাথর খাদান ও রাজকীয় নির্মাণে ও তাদের ব্যবহার করা হত। উৎপন্ন ফসলের প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষকদের কর হিসাবে প্রদান করতে হত।

সেনাদেরও একটি পৃথক শ্রেণী রূপে গণ্য করা হত। তারা বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত থাকতেন। শান্তির সময়ে সেনারা পিরামিড ও অন্য রাজকীয় স্থাপত্যের নির্মাণের কাজে নিযুক্ত কৃষক ও দাসদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করতেন। চিকিৎসক ও দক্ষশিল্পীরা মধ্যমবর্গীয় শ্রেণীরূপে পরিচিত ছিলেন। শিল্পীরা গহনা, মৃৎপাত্র প্যাপিরাস দ্রব্য এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতেন।

তবে সামাজিকভাবে বৃত্তিপরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। কৃষকদের কিছু অংশ অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। পরিবার থেকে অর্থ সাশ্রয় করে শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হত। এই বিদ্যালয়গুলি পুরোহিত ও লিপিকররা নিয়ন্ত্রণ করতেন। অক্ষর জ্ঞানলাভ করলে, ছাত্ররা লিপিকরের বৃত্তি গ্রহণ করে সরকারী পদে কাজ গ্রহণ করতে পারতেন। অর্থাৎ সামাজিকভাবে কারোবৃত্তি তার জন্মদ্বারা নির্ধারিত ছিল না।

২.২.২ ঃ পারিবারিক জীবন

প্রাচীন মিশরীয়রা পারিবারিক জীবনের ওপর প্রভূত গুরুত্ব প্রদান করতেন। পাশাপাশি শিশুদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত, এবং উচ্চশিশু মৃত্যুর হার থাকা সত্ত্বেও গড় আয়ু ছিল 35 থেকে 40 বৎসর। পরিবারে অন্ততপক্ষে গড়ে পাঁচটি শিশু থাকতো। সাধারণভাবে বিবাহিত দম্পতিরা স্বামীর পিতা-মাতার সাথেই বসবাস করতেন, যতদিন পর্যন্ত না স্বামীর নিজস্ব গৃহ ক্রয় বা নির্মাণের মতো আর্থিক সামর্থ্য হয়ে যেত।

বিবাহের সময়কাল বর্তমান যুগের তুলনায় অনেক পূর্বেই ছিল। বিবাহের আদর্শ বয়স নারীদের জন্য ছিল বারো বৎসর। পুরুষদের জন্য তা ছিল পনের বছর। কোন অনুষ্ঠানিক বিবাহ অনুষ্ঠান হত না। বরং একটি চুক্তি স্বাক্ষর হত, যেখানে উভয় কি পরিমাণ সম্পত্তি আনয়ন করবে তার বিবরণ রচিত হত। অনেক সময় স্বামী অনেক সময় স্ত্রীর

পরিবারকে উপহার প্রদান করতেন। স্ত্রীকেও উপহার প্রদান করতে হত। সম্পত্তি যাতে পরিবারের মধ্যেই থেকে যায়, তার জন্য জ্ঞাতি ভাইবোনের বিবাহ মিশরীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। নারী তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে পারতো, কিন্তু অনেক সময় তাদের পিতা-মাতা তাদের সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

পারিবারিক জীবনে পুরুষ বহুবিবাহের অধিকারী ছিলেন, তবে এই প্রথা বাস্তবে পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও নারীদের বিশ্বাসঘাতকতা বা পরকীয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। বিবাহবিচ্ছেদের সময়ে নারী চাইলে তার সম্পত্তি এবং যৌথ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিয়ে বিদায় নিতেন। কিন্তু যদি এক্ষেত্রে স্ত্রী তার অসুস্থ স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতেন সেক্ষেত্রে তার যৌথ সম্পত্তির ওপর অধিকার থাকতো না। অন্যদিকে, স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য স্ত্রীর ভরণপোষণ ও যৌথসম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করতে হত।

২.২.৩ ঃ অর্থনৈতিক জীবন

সমাজ জীবনের সাথে অর্থনৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও মিশরীয় অঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে শুষ্ক অঞ্চল ছিল, তবুও মিশরীয় অধিবাসীরা কৃষিকাজ পত্তন করে নীলনদ উপত্যাকায় গম, যব, ফল ও সবজি উৎপাদন করতেন। তাছাড়া মাংস, দুগ্ধ, চামড়া ও পশম এবং ভূমিতে ব্যবহারের জন্য তারা বিভিন্ন পশুপালন করতেন।

অত্যন্ত অল্প বৃষ্টিপাতের মধ্যে মিশরীয় কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে নীলনদের সেচের উপর নির্ভর করতে হত। কৃষির সময়কে তিনভাগে ভাগ করা হত। এটি নীলনদের জলের প্রবাহ অনুসারে নির্ণীত হত। এগুলি ছিল— i) আখেত (Akhet) বা প্লাবনের সময় ii) পেরেত (Peret) বা কর্ষণ ও বপনের সময় iii) শিমু (Shemu) বা ফসল কাটার সময়, যেটি শুখা মরসুম ছিল জুন বা জুলাই মাসে মিশরের বার্ষিক বন্যা হত। এই সময় জমি প্লাবিত হত। বন্যার জল নেমে যাবার পর অক্টোবর নাগাদ ভূমিকর্ষণ ও চারারোপণের কাজ করা হত। মার্চ -এপ্রিল নাগাদ ফসল কাটার কাজ করা হত। গম এবং বার্লির পাশাপাশি কার্পাস, সবজি, ফল, পেঁয়াজ প্রভৃতি উৎপাদিত হত। ফসল কাটার পর ফসলের একটি বৃহৎ অংশ করহিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হত।

মিশরীয় অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বাণিজ্য। ইজিয়ান দ্বীপ ক্রীট, ফিনিশিয়া, প্যালেস্টাইন, সিরিয়ার সঙ্গে মিশরের বাণিজ্য প্রসারিত ছিল। মুখ্য রপ্তানি দ্রব্য ছিল গম, লিনেন কাপড়, মৃৎপাত্র। সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত এবং কাঠ আমদানি করা হত। মেসোপটেমিয়ার সাথেও মিশরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময় কাল থেকে শিল্পের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। মিশরের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে ছিল পাথরশিল্প, নির্মাণশিল্প, মৃৎপাত্র, কাঁচ ও বয়নশিল্প। অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তার করে মিশর আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন সময় থেকে ব্যবসার ক্ষেত্রে মিশরীয়রা কিছু ব্যবহারিক পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করেছিল। হিসাবপত্র সংরক্ষণে তাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। বণিকরা তাদের পণ্যের প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করত এবং রশিদ গ্রহণ করত। সম্পত্তির দলিল, চুক্তি, দানপত্রের ব্যবস্থা ও করা হয়েছিল। তবে মুদ্রা অর্থনীতি মিশরে গড়ে ওঠেনি। বিনিময় মাধ্যম ছিল তামার টুকরো, বিভিন্ন ওজনের স্বর্ণখণ্ড প্রভৃতি। এগুলিকে প্রাচীনতম প্রতীকী মুদ্রা বলা যায়। তবে বৃহত্তর বাণিজ্যে এই মাধ্যম ব্যবহৃত হত। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিনিময় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। মিশরীয় অর্থনীতিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের যুগে অর্থনৈতিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েগিয়েছিল। এযুগে সামরিকশক্তির বিকাশ ঘটেছিল। ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিও নজর রাখার প্রয়োজন দেখা যায়। এসব কারণে অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিপদক্ষেপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। কৃষিভূমিগুলি ফারাওদের অধীনস্থ হয়।

ফারাও আখেনাতেনের সময়ে ফারাও পুরোহিতরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ক্ষমতা ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের জন্য তারা উদগ্রীব থাকতেন। ফারাও যুদ্ধ লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করতেন। পুরস্কার হিসাবে তারা যুদ্ধবন্দী দাস এবং প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হত। এছাড়া চাষযোগ্য জমি, গরু, ভেড়া, প্রভৃতি পশু লাভ করত। এর ফলে মিশরীয় অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছিল। এইভাবেই মূলত প্রাচীন মিশরের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল।

২.৩ ঃ প্রাচীন মিশরে নারীদের অবস্থান

সাধারণভাবে, প্রাচীন মিশরের সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ভূমিকা ছিল। তবে, অনেক প্রাচীন সভ্যতার বিপরীতে, নারীদের আইনের দৃষ্টিতে পুরুষদের সমান বলে মনে করা হয়। পুরুষদের মতোই, মহিলারা ব্যবসা চালাতে, ধার করতে এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারতেন।

শিক্ষা ঃ যেহেতু নারীরা শাসনকার্য বা সরকারে কাজ করতেন না, তাই সাধারণ ভাবে পড়তে বা লিখতে শিখতেন না। তাদেরকে গৃহের কাজের দক্ষতা শেখানো হয়েছিল এবং কীভাবে পরিবারকে পরিচালনা করতে হয় তাঁর শিক্ষা দেওয়া হত।

বিবাহ ঃ প্রাচীন মিশরে খুব অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া হত, যার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। সাধারণত বারো বা তের বছর বয়সী কন্যাদের বিবাহ দেওয়া হত। মিশরীয়দের জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠান হত না এবং বেশিরভাগ বিয়ের ব্যবস্থা দুটি পরিবারের দ্বারা পরিচালিত হত।

বৈশিষ্ট্যসূচক ভূমিকা ঃ নারী সাধারণত বাড়ির কাজ করতেন। তারা রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, পোশাক তৈরি করা এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার কাজ করতেন। দরিদ্র নারীরা তাদের স্বামীদের জমিতে কাজ করতে সাহায্য করতেন। পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা বেশিরভাগ কৃষক মহিলাদের অন্যতম কাজ ছিল। ধনী নারীদের গৃহের কাজে দাসদের ব্যবহার করতে পারতেন অথবা তাদের নিজস্ব ব্যবসা চালানোর অধিকার ছিল। ধনী মহিলারা ঘরের কাজ এবং রান্না করার বেশিরভাগ কাজ করতেন। কখনও কখনও ধনী উচ্চপদস্থ নারীরা মিশরীয় দেবীদের জন্য মন্দিরের কাজ করে যাজক হয়ে ওঠেন।

পুরোহিত ও দেবী ঃ শুধুমাত্র গুরত্বপূর্ণ এবং উচ্চমানের পরিবারের মহিলারা পুরোহিত হয়ে উঠতে পারতেন। একটি মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে কাজ একটি বিশেষ সম্মান হিসাবে গণ্য করা হত। আইসিস (মাতৃকা দেবী), হাথর (প্রেমের এবং মাতৃত্বের দেবী) এবং নুত (আকাশের দেবী) সহ মিশরীয় ধর্মের মধ্যে অনেক শক্তিশালী দেবী ছিলেন। যা মাতৃ পূজার ধারার উপস্থিত জানান দেয়।

অন্যান্য কাজ ঃ সমস্ত নারী মহিলাদের সাধারণ ভূমিকা অনুযায়ী পরিবারের বাড়িতে কাজ করতেন না। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে মহিলাদের মালিকানাধীন ব্যবসায় যেমন প্রসাধনী, সুগন্ধী, বা পোশাক হিসাবে বিনোদনকারী হিসাবে কাজ করতেন। আবার প্রশাসনে নারীদের উজ্জ্বল ভূমিকা দেখা দেয় যায়, রানি নেফারতিতি মিশরের

প্রশাসন পরিচালনা করে ছিলেন। শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে মিশরীয় সমাজে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, সন্তানের জন্মদান মা ও শিশু উভয়ের জন্য ছিল বিপজ্জনক। তবে মিশরীয়রা গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পেরেছিল। খুনুম, আইসিস, হাথর, বেস, প্রমুখ দেবীরা শিশুদের রক্ষার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। প্রসবের সময় মন্ত্রপাঠ করা হত, পাশাপাশি ব্যাথানাশক ঔষধের প্রয়োগ করা হত। সাধারণ পরিবারের নারীরা পরিবারের সাহচর্য্যে শিশুর জন্ম দিতেন। অন্যদিকে ধনী ও অভিজাত নারীদের শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য ধাত্রীমাতার ব্যবস্থা থাকত। পুত্র সন্তানের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত, কারণ তাদের বংশধর বলে মনে করা হত।

এই আলোচনাতে দেখা গেল যে মিশরীয় সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও নারীদের ভূমিকা সেখানে অস্বীকার করা যায় না।

৩ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র পুরোহিততন্ত্র ও ওসিরিয়ান উপাসনা (Unit-6)

৩.১ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র

প্রাচীন মিশরীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে মিশরীয় রাজতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক চেতনা থাকা প্রয়োজন। তবে মিশরীয় রাজতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০০ অব্দে নীলনদ উপত্যাকায় শিকারী পশুপালক গোষ্ঠী তাদের বসতি স্থাপন করে, এই সময় যাযাবর জীবনবৃত্তি ছেড়ে উর্বর নীল উপত্যকায় কৃষিকাজের গোড়াপত্তনের মাধ্যমে স্থায়ী বসতির সূত্রপাত দেখা যায়। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন পশুকে পোষ মানিয়ে নেয়, সাথে সাথে খড় ও মাটি দিয়ে বাসস্থান তৈরী করে। এগুলি বর্তমানে Nevada সংস্কৃতি নামে পরিচিত। দুটি প্রধান এলাকায় বসতি গড়ে উঠেছিল। একটি নিম্নমিশরীয় এলাকায় বা নীল অববাহিকা এবং একটি উচ্চ মিশরীয় অববাহিকা। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 3400 অব্দ সময়কাল থেকে এই দুটি পৃথক অঞ্চলে আদি রাজাদের উপস্থিতি দেখা যায়। এই সময়কাল (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 5500-খ্রিস্টপূর্ব 3100) রাজতন্ত্র পূর্ব সময়কাল বা Pre dynastic period নামে পরিচিত। 3100 খ্রিষ্টপূর্ব নাগাদ Mense এবং Narmer এর নেতৃত্বে দক্ষিণ বা উচ্চমিশর উত্তর মিশর অধিকৃত করে। এর ফলে মিশরীয় ঐক্য সুসম্পন্ন হয়।

ঐতিহাসিকরা Menes ও Narmer-কে এরও অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। তিনি মিশরের প্রথম রাজবংশের সূচনা করেন। এই সময় শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মেমফিস (Memphis)। এই সময়ে শাসন কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হয়। রাজাকে দেবতা Horus এর জীবিত সত্ত্বা বলে মনে করা হত। এই সময় Hieratic লেখমালার সূচনা হয়। পাশাপাশি মিশরীয় বর্ষপঞ্জীর ও উদ্ভব হয়। আনুমানিক 3100-2686 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশরীয় প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের শাসনকাল ছিল।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজবংশ (C.2686 BC-C 2181 BC) সময়কালে মিশরীয় ইতিহাসে 'পিরামিডের যুগ' নামে পরিচিত। এই সময় প্রাচীন রাজবংশের শাসনকাল ছিল। এই পাঁচশত বছরের সময়কালে মিশরীয় রাজনৈতিক, শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকাশ প্রথম উল্লেখযোগ্য রূপে দেখতে পাওয়া গেল। এই সময়ে পিরামিড নির্মাণ অন্যতম রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ রূপে পরিগণিত হয়। পাশাপাশি ফ্যারাও বা শাসকদের পিরামিড পরলোকের পথ রূপে মানুষের বিশ্বাসে স্থান পায়। তৃতীয় রাজবংশের শাসক Dioser (জয়ের) এর রাজস্থাপিত ইমহোটেপ

(Imphotep) সাকোয়ারা (Saqqara) তে প্রথম ধাপযুক্ত পিরামিড নির্মাণ করেন। চতুর্থ রাজবংশের অন্যতম শাসক ছিলেন স্নেফু (Sneferu) এবং Khufu গিজা (Giza) তে বিখ্যাত পিরামিড খুফুর আমলে নির্মিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠরাজবংশের সময়কালে স্থানীয় প্রশাসন ও যাযাবর গোষ্ঠীগুলি শক্তিসঞ্চয় করে ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল। ষষ্ঠরাজবংশের পতনের সময় মিশরীয় রাজকীয় কর্তৃত্ব অনেকটাই কমে যায়।

আনুমানিক 2181 BC-2055 BC সময়কাল প্রথম অন্তর্বর্তী সময়কাল নামে পরিচিত। এই সময়ে রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্বের উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছিল। আনুমানিক 2055 খ্রিঃপূর্বাব্দে একাদশ রাজবংশের নেতৃত্বে মিশরে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপিত হলে মধ্যরাজবংশের সূত্রপাত হয়। এই রাজবংশের মধ্যে একাদশ থেকে চতুর্দশ রাজবংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। Mentuhotep-1 থেকে Mentuhotep-1 পর্যন্ত শাসকরা একাদশ রাজবংশ পরিচালনা করেন। দ্বাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আমেনেমহাট (Amenemhat-1), Itjtaway তে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি যৌথ শাসক নিযুক্তিকরণের প্রথা প্রচলন করেন। তার হত্যার পর তার পুত্র Senusret-1 সিংহাসনে বসেন। পরবর্তী শাসক Senusret-III নুরিয়া অঞ্চল জয় করেন। মিশরের সীমার সুরক্ষার কথা চিন্তা করে, মিশরীয় সীমাকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন। পাশাপাশি কার্ণাক, আবিডোসের নির্মাণগুলি হতে থাকে। দাহশূরের পিরামিডগুলি নির্মিত হলেও সেগুলি গুণগতমানে প্রাচীন রাজবংশের মতো উন্নত ছিল না। অতপরঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ রাজবংশ আনুঃ 1650 BC পর্যন্ত মিশর শাসন করেন।

চতুর্দশ রাজবংশের অন্তিমপর্বে Hyksos নামে বিদেশী শাসকরা শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। তারা 'Desert Prince' নামে পরিচিত ছিল। তারা উন্নত অস্ত্রশাস্ত্র, অশ্ব ও রথের ব্যবহার করে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে মিশরের শাসনভারের দখল নিতে সক্ষম হয়। এইভাবে দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী পর্যায়ের সূত্রপাত হয়। তারা Avaris এ নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে পঞ্চদশ বংশের সূত্রপাত করে। ষোড়শ ও সপ্তদশ রাজবংশ তাদের সঙ্গে প্রায় সমসাময়িকভাবে মিশরে উপস্থিত ছিল। ষোড়শ রাজবংশ পঞ্চদশ বংশের অধীনস্থ ছিল। অন্যদিকে সপ্তদশবংশ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

প্রাচীন মিশরের শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিত নবরাজবংশ (আনুঃ 1550 BC- আনুঃ 1069 BC) অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশতম রাজবংশ দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এই প্রায় পাঁচশত বর্ষের সময় কালে মিশরে পুনরায় বাণিজ্য, শিল্প, স্থাপত্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। এই সময় থিবসে Valley of the kings অঞ্চলে সমাধিপ্রথা প্রচলিত করেছিল। এই সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ শাসকরা ছিলেন অষ্টাদশ বংশের Ahmose-I, ঊনবিংশতি বংশের Tuthmosis-I, Ththmosis-II, বিংশতি বংশের Ramesses III তৃতীয় Tuthmosis তাঁর নির্মাণ কার্য্যের জন্য সমধিক পরিচিত। তাঁর সময়ে আমুনের মন্দির নির্মীত হয়। আমুন প্রধান দেবতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে অষ্টাদশ রাজবংশের শেষদিকে আখেনাতেন এর সময়কালে সূর্যদেবতা আতেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তবে তুতেনখামেন পূর্ববর্তী ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করেন। ঊনবিংশ বংশের প্রথম সেটি (Seti-I) এবং দ্বিতীয় রামসেস (Ramesses-II) কার্নাকে আমুন মন্দির নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় রামসেস, যিনি মহান রামসেস নামেও পরিচিত, তিনি হিট্টাইটদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তবে বিংশতম বংশের শেষদিকে পুনরায় মিশরীয় রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অন্তর্বর্তী পর্বে (আনুঃ 1069 BC - আনুঃ 747 BC) একবিংশ থেকে চতুর্বিংশ রাজবংশের শাসনকালে মিশর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একবিংশ বংশের সময়ে ফ্যারাও এবং তাঁর উত্তরস্থিত সামন্তের মধ্যে বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। তবে এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে দ্বাবিংশ বংশের শাসক Sheshong-I মিশরে ঐক্যধরে রাখার প্রয়াস করলেও একই সময়ে সমান্তরাল 23তম বংশের বিস্তার ঘটে। পাশাপাশি 24তম বংশ (চতুর্বিংশ বংশের) একই সময়ে বিস্তার ঘটেছিল।

পঞ্চবিংশ থেকে ত্রিশতম বংশের সময়কাল পরবর্তী পর্যায় নামে পরিচিত। নুবিয়ানরা বিংশতম বংশের শাসনকালে স্বাধীনতা অর্জন করে। 730 BC নাগাদ নুবিয়ান রাজ Piankhi অববাহিকা অঞ্চলের শাসকদের পরাভূত করে শতবর্ষব্যাপী পঞ্চবিংশ বংশের শাসন স্থাপন করে। অতপরঃ আসীরিয়রা 671BC তে মেমফিস ও 664BC তে থিবস অধিকার করলেন এবং মিশরীয়দের আঞ্চলিক শাসক নিযুক্তকরণের মধ্যদিয়ে ষড়বিংশ বংশের সূত্রপাত ঘটায়। এই বংশ Saite বংশ নামে পরিচিত হয়। আনুঃ 525 BC সময় কালে ক্যামবাইসিস (Cambyses) এর নেতৃত্বাধীন পারসিকরা সপ্তবিংশ বংশের সূচনা করেন। এই রাজত্ব 120 বছর স্থায়ী হয়। মিশরীয়রা বিদেশী শাসনকে ভালোভাবে মানতে পারেন নি। তারা বিভিন্ন বিদ্রোহ করেন এবং 404 খ্রিঃপূর্ব Amyrtaeus অষ্টাবিংশ বংশ স্থাপন করেন। অষ্টাবিংশ থেকে ত্রিশতম বংশ মিশরে একশত বছরেও কম সময়ে শাসন করেন, অতপরঃ শেষ মিশরীয় বংশজাত ফ্যারাও Nectanebo-II পারস্যের Artaxerxes III এর বিশাল বাহিনীর হাতে 343 BC তে পরাস্ত হলে পুনরায় মিশর পারস্যের হস্তগত হয়।

অতপর 332 BC আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হলে, পারস্য সাম্রাজ্যভূক্ত মিশর আলেকজান্ডারের হস্তগত হয়। তিনি মিশরীয়দের কাছে আমুনের পুত্র এবং ত্রাতা হিসাবে অভিহিত হন। তাকে ফ্যারাওয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেকজান্দ্রিয়া নগর স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত বংশ ম্যাসিডোনিয় বংশ নামে পরিচিত হয়। c.323BC নাগাদ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের অল্পশাসনের পর, বিখ্যাত সেনাপতি টলেমি মিশরের শাসনকার্য গ্রহণ করেন। c.323BC- c.30BC সময়কাল টলেমির সময়কাল নামে পরিচিত। এই বংশের শেষ শাসিকা বিখ্যাত মহারাণী ক্লিওপেট্রা, রোমান শাসকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হন। রোমান সেনাপতি মার্ক এন্টনিকে বিবাহ করে, রোমান শাসক অক্টাভিয়ানের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আত্মহনন করলে, মিশরের স্বতন্ত্রতার অবসান হয়। মিশর রোম সাম্রাজ্যভূক্ত হয় (303 CE)।

৩.২ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্রের প্রকৃতি

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা মিশরীয় রাজতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারি। 3100BC থেকে 343BC পর্যন্ত মিশর প্রায় 170 জন স্বদেশী ফ্যারাওর দ্বারা শাসিত হয়েছিল। তবে মিশরীয় শাসকদের আমরা বর্তমানে ফ্যারাও (Pharaoh) রূপে চিহ্নিত করি। মিশরীয়রা তাদের শাসকদের কিরূপে জ্ঞান করতেন সেই বিষয়ে সম্যক অবহিত থাকা প্রয়োজন।

Pharaoh শব্দটি গ্রীকশব্দ। যার উদ্ভব হয়েছে মিশরীয় শব্দ 'Pre-aa' থেকে। যার অর্থ 'বড়গৃহ' কে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে রাজবাড়ি অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হত। পরবর্তীতে নতুন রাজবংশের সময়ে এই শব্দটি কেবল রাজার সমার্থক হয়ে ওঠে।

3000 বছরের ইতিহাসে মিশরীয় শাসন ব্যবস্থা ধর্মীয় রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছিল, যেখানে ফ্যারাও কেবল দেবতার প্রতিনিধি ছিলেন তাই নয়, অভিষেকের সময় থেকে দুইরাজ্যের শাসক পৃথিবীতে চলন্ত ঈশ্বররূপে পরিগণিত হতেন। রাষ্ট্রের ধর্মীয় প্রধান হবার পাশাপাশি ফ্যারাও সরকারের প্রধান, প্রধান বিচারক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে পরিগণত হতেন। তিনি মিশরের সমগ্র ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। এমনকি ইজিপ্টের মানুষদেরও তার মালিকানাধীন তারা হত। এই ভাবে মিশরীয় রাজতন্ত্রের শাসককে একটি অপ্রতিদ্বন্দী ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হত।

যদিও ফ্যারাওগণ দৈবক্ষমতা সম্পন্ন ও পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দীরূপে পরিগণিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন নাগরিক দায়িত্বপালনে সচেষ্ট থাকতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যেমন মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতেন। ফ্যারাওদের 'মতে' বা সুবিচারের আদর্শগুলিকে রক্ষা করে চলতে হত। পাশাপাশি মিশরীয় মানুষদের প্রতি দায়িত্বপালন করতে হত। তার শাসনকার্য মিশরীয়দের ভাগ্য নির্ধারণ করত। মৃত্যুর পর মনে করা হত যে তিনি দেবতাদের সাথে পুনর্মিলিত হবেন এবং মিশরীয়দের বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

এইভাবে দেখা যায় প্রাচীনমিশরে পবিত্র রাজতন্ত্রের ধারণা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়েছিল। শাসকরা প্রভূতক্ষমতার অধিকারী হন। যদিও এই ধারণার বিপরীতে বেশ কিছু সময়ে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা শাসককে হত্যার ইতিহাস মিশরে রয়েছে। তা সত্ত্বেও বৃহত্তর মিশরীয় জনতাকে শাসকের প্রভুত্বের ছত্রছায়া আনার জন্য মিশরীয় শাসন এই দৈবঅধিকারের অবতারণা করেছিল।

৩.৩ ঃ পুরোহিততন্ত্র ও ধর্মীয় চেতনা

মিশরীয় সমাজের ধর্মীয় বিস্তার প্রবল আধিপত্য ছিল। যদিও রাজতান্ত্রিক সময়কাল থেকে মিশরীয় ধর্মীয় ব্যবস্থার বিকাশ কিরূপে হইয়েছিল, তার কোন পর্যাপ্ত তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। প্রাচীন রাজবংশের সূচনাকালে বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠতে থাকে। এই কেন্দ্রগুলিতে উপাস্য দেবতাদের পুরোহিতরা তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য নিজেদের দেবতাকে কেন্দ্র করে স্বতঃপ্রণোদিত ধর্মতত্ত্বের অবতারণা করতে শুরু করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের এক পরিবারভুক্ত বা গোষ্ঠীভুক্ত করা হতে থাকে। মিশরীয় ধর্মে ধর্মীয় কেন্দ্রভিত্তিক দেবতা নিচয় দেখা যায়, যা অন্য সভ্যতাসমূহ অপেক্ষা ভিন্নতর। এই গোষ্ঠীগুলির কয়েকটি 'Ennesds' এবং 'Ogdoad' নামে পরিচিত। 'Ennead অর্থে যে দেবতা গোষ্ঠীতে নয়জন দেবতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং Ogdoad অর্থে যেই গোষ্ঠীতে আটজন দেবতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই রূপ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতমছিল হেলিওপোলিস (Heliopolis) যেখানে Atum কে প্রধান দেবতা জ্ঞান করে, নয়জন দেবতা ছিলেন। হারমোপোলিসেরা অষ্টদেবতার প্রধান ছিলেন Re, Memphis এ ছিল একটি অন্যতম কেন্দ্র, এখানে উপাসিত হতেন ত্রিদেবতা Path-Sekhmet-Nefertem। এদের প্রধান ছিলেন Path। অপর কেন্দ্র থিবস (Thebs) এ Amun-Mut-Kheonesu এ Khnum-Satet-Aniket এর মধ্যে প্রধান ছিলেন Khnum।

মিশরীয় ধর্মের রাজতন্ত্রের প্রাধান্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, যেখানে রাজাকে দেবতা ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি পশুদের মূর্তি দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা (Theimorphic উপাসনা) দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয়দের সামাজিক জীবনে ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্র সর্বদাই লক্ষ্য করা যায় এবং সেই ধর্মীয় জীবনে ফ্যারাওদের যেমন মুখ্যভূমিকা ছিল, তেমনি বিভিন্ন পুরোহিতদের উদ্ভব ঘটেছিল।

তত্ত্বগতভাবে ফ্যারাওকেই মন্দির সমূহের গর্ভগৃহে প্রবেশের সমতুল পবিত্র মনে করা হত। কিন্তু বাস্তবে অভিজ্ঞ পুরোহিতরা মন্দিরের দৈনন্দিন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিলেন। তারা প্রত্যহ দেবতাকে মন্ত্রপাঠ করে দেবতাকে জাগরিত করা, ধূপ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, দেবমূর্তিকে স্নান ও বস্ত্রবদল করানো, ভোগ নিবেদন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকতেন। পুরোহিতদের প্রত্যহ চারবার স্নান করতে হত। প্রধান পুরোহিতরা সারা সময় মন্দিরের মধ্যেই বসবাস ও কাজকর্ম করতেন, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান পুরোহিতরা মন্দিরের বাইরের অন্যান্য কাজকর্মে যথা কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে লিপ্ত হতে পারতেন। পুরোহিতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় লিপ্ত হবার ফলে নিঃসন্দেহে মিশরীয় সমাজে তাদের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। প্রাথমিকভাবে নারীদের পুরোহিত হতে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু নব রাজতান্ত্রিক সময় থেকে কেবল পুরুষরাই পুরোহিত হতে শুরু করেন। সাধারণভাবে মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। তারা সাধারণত প্রথম প্রাঙ্গণের অধিক অভ্যন্তরে যেতে পারতেন না। গৃহে তারা তাদের দেবতাদের উপাসনা করতেন তবে মন্দিরে তারা পূজা সামগ্রী দান করতে ও প্রার্থনা করতে আসতেন। এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মূর্তিগুলিকে বের করে শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হত। সেই সময় কাঠের মন্দির করে (চতুর্দোলা) তাদের বহন করা হত।

মন্দিরের মধ্যে দুই ধরনের মন্দিরের কথা বলা যেতে পারে। ১) উপাস্য দেবতার মন্দির (Cult temple) ২) স্মৃতি মন্দির (Mortuary temple)। উপাস্যদেবতাদের মন্দিরে (Cult temple) দেবতাদের মূর্তি স্থাপিত থাকতো এবং তাদের উপাসনা করা হত। Karnak এবং Luxor তে Amun এর মন্দিরের কথা জানা যায়। তৃতীয় আমেন হোটেপ বার্ষিক উৎসবে Karnak থেকে Luxor তে Amun মূর্তি নিয়ে যাবার প্রথা চালু করেন। অন্যদিকে স্মৃতি মন্দির বা Mortuary temple গুলি মৃত ফ্যারাওদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এগুলি নির্মাণ পরলোকে তার প্রবেশের জন্য আবশ্যিক ছিল। নতুন ফ্যারাও সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই এই নির্মাণ কার্য শুরু হত। মৃত্যুর পর দেবতা হয়ে যাওয়া ফ্যারাওর পৃথিবীতে মন্দিরের মত একটি ঘরের প্রয়োজনীয়তা এই ধরনের বিশ্বাসে প্রতিফলিত হয়।

মিশরের মূল দেবতাদের কথা চিন্তা করলে পূর্বোক্ত ধর্মীয় কেন্দ্রগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যিক। Ehliopolis এর মূল দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা ছিলেন সূর্যদেবতা Atum, তিনি Geb (পৃথিবী) ও Nut (আকাশ) সৃষ্টি করেন। তাঁকে Bennu নামক কিংবদন্তী পাখির রূপে কল্পনা করা হত। মনে করা হত Osiris, Isis, Seth এবং Nepthys তারই সন্তান। প্রাচীন রাজবংশের সময়ে এই উপাসনা জনপ্রিয় ছিল এবং এই সময়েই Heliopolis কে কেন্দ্র করে 'Re' সূর্যদেবতা রূপে আবির্ভূত হয়। Atum, Re এর সাথে ধর্মীয় আত্তীকরণের মাধ্যমে অস্তমিত সূর্য Re-Atum তে পরিণত হন। আবার তিনি Horus এর সাথে মিলিত হয়ে Re-Harakhte বা উদীয়মান সূর্যরূপে পরিগণিত হন। আবার Memphis এর পুরোহিত গণ Psth কে Atum এর পূর্ববর্তী দেবতারূপে অভিহিত করেন। Sekhmet তার স্ত্রী রূপে পরিচিত হত এবং তারা Re-Atum এর মাতা-পিতা রূপে পরিচিত হন।

৩.৪ ওসাইরিস উপাসনা (Cult of Osiris)

প্রাচীন রাজবংশের শেষভাগ থেকে ক্রমশ রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করে। পুরোহিততন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। মধ্যবর্তী রাজবংশের সময়ে দেশে ঐক্য পুনস্থাপিত হলেও সম্রাটের ওপর দেশের

ঐক্য বজায় রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা আর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হত না। মধ্যবর্তী শাসনে Re-Atum, Path, Amun এর মন্দির ও উপাসনা পুনরায় খ্যাতি লাভ করার পাশাপাশি, মিশরে অধিবাসীদের সুরক্ষা ও সুরক্ষিতভাবে পরলোকের পথে নিয়ে যাবার জন্য ওয়াইসিসের (Osiris) উত্থান হয়। প্রচলিত বিশ্বাসে ফ্যারাও মৃত্যুর পর তার সাথে মিলিত হন।

প্রাথমিকভাবে Osiris ছিলেন উর্বরতার দেবতা। শস্যের পুনরুৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তার নিজের মৃত্যু ও পুনর্জন্মেরকাহিনী তাঁকে পরলোকের সঙ্গে ও সংযুক্ত করে দিয়েছিলো। অ্যাবিডোস (Abydos) অঞ্চলকে কেন্দ্র করে Osiris এর সমাধি মনে করা হত এবং এই অঞ্চলে বৃহৎ সমাধি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মিশরীয়রা মনে করতেন Abydos এর সাথে নিজেদের সংযুক্ত করলে পরলোকে অমরত্ব লাভ করা যাবে। এই ভাবে Abydos মিশরীয়দের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে Osiris এর পুনর্জন্মের উৎসব মিশরে পালিত হতে থাকে। মনে করা হয় মৃত্যুর পর Osiris বিচার করে মানুষকে অমরত্ব দান করবেন।

ওসাইরিসের সাথেই উল্লেখ কার যায় তার পত্নী Isis ও পুত্র Horus এর কথা। Isis মিশরের মাতৃদেবী হিসাবে ফ্যারাওর দেবীমাতা রূপে প্রতিভাত হতেন। তিনি ওসাইরিসের পত্নী হিসাবে, তাঁর স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করণের কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি নিজ পুত্রকেও তিনি রক্ষা করেন। তাই তিনি মিশরীয়দের কাছে আদর্শ স্ত্রী ও মাতার প্রতিমূর্তি হিসাবে উপস্থাপিত হন। অনেক সময় তাকে ডানা যুক্তরূপে কল্পনা করা হয়। যেখানে ঘুড়িরূপে তিনি Osiris কে জীবিত করার প্রয়াস করেন। নতুন রাজতন্ত্রের সময় তিনি গাভী রূপে পূজিত হতে শুরু করেন। আইসিসের উপাস্থাপনা মিশর অতিক্রম করে রোম অবধি বিস্তৃত ছিল। এমনকি মিশরে খ্রিষ্টানদের প্রবেশের পরও তাকে উপাসনা করা হত।

ওসাইরিস পুত্র Horus মিশরীয় রাজতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে, পিতা Osiris তাঁর ভ্রাতা Seth কর্তৃক নিহত হলে মাতা Isis এর সাহায্যে দীর্ঘযুদ্ধের পর খুল্লতাতকে পরাস্ত করে ওসাইরিস পুত্র Horus সিংহাসন লাভ করেন। মিশরের জীবন্ত রাজারা Living Horus রূপে পরিচিত হতেন এবং মৃতরা Osiris এর সাথে সংযুক্ত থাকতেন। এইভাবে মিশরের রাজতন্ত্র বৈধতা পেত। মৃতরাজারা মমিকরণ ও সমাধিদানে নেতৃত্বদানকারী Horus হিসাবে কাজ করেছেন এইরূপ মনে করা হত। এইভাবে দেবতার কিংবদন্তী মিশরীয় রাজতান্ত্রিক বিকাশে ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩.৫ ঃ আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ

অষ্টাদশবংশীয় নবম ফ্যারাও আমেনহোটেপের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন। তিনি সৌরদেবতা হিসাবে আতেনকে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হন। মধ্যবর্তী রাজবংশের সময়কাল থেকে সৌরচক্র হিসাবে আতেনের কথা জানা যায়। তবে অষ্টাদশবংশের শাসনকাল থেকে আতেন Aten, সূর্যদেব Amun এর বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত হতে শুরু করে। Re-Herakhty ইহার সাথে আত্তীকৃত হন এবং আতেন ক্রমশ Heliolition Atum এবং Theban Amune-Re র চেয়েও উচচ মর্যাদার অধিষ্ঠিত হন।

কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আতেনকে তাঁর স্বীয় মর্যাদা পুরোহিততন্ত্র নয়, বরং রাজা স্বয়ং প্রদান করেন। চতুর্থ আমেন হোটেপ আতেনকে অন্য সমস্ত দেবতার থেকে উচচতম মর্যাদা প্রদান করেন। এই সময়কালে মিশরের

ইতিহাসে প্রথমবার একেশ্বরবাদের প্রচলন ঘটে। একে 'আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ' বলা যেতে পারে। তাঁর পঞ্চম বা ষষ্ঠ রাজ্যবর্ষে চতুর্থ আমেনহোটেপ আখেনতাতেন (আতেনের দিক চক্রবাল) নামক স্থনে (বর্তমান এল আর্মানা) স্থানান্তর করেন। এখানে আতেনকে উদ্দেশ্যেকরে মন্দির নির্মিত হয় এবং ফ্যারাও নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন, আখেনাতেন (আতেন ভৃত্য)। অতপর তিনি সক্রিয়ভাবে অন্য সকল দেবতাদের আরাধনা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হন। তিনি মন্দিরগুলি বন্ধ করতে আদেশ জারি করেন এমন আমুনমূর্তি ও নাম ভেঙ্গে দিতে বা মুখ বিকৃত করে দিতে চেষ্টা করেন।

সূর্যের পূর্ববর্তী রূপগুলি যথা Re, Herakhty, Khepri, Atum এবং amun কে বাদ দিয়ে আতেনকেই একমাত্র জীবনদায়ী শক্তি ও দেবতারূপে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি আখেনাতেন নিজ ও নিজপরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঘোষণা করেন যে আতেন তাকেই দর্শন দিয়েছেন। তিনি আতেনের নির্দেশ সকলকে প্রদান করেছেন।

তবে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন মিশরের জনসাধারণ থেকে শুরু করে পুরোহিততন্ত্র কেউই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। যদিও রাজদরবার এই নবধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, এবং এটি সেই সময়ে ছিল রাজধর্ম। এই দেবতার না ছিল মূর্তি না ছিল কিংবদন্তী, না সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ। সাধারণ মানুষ চিরাচরিত দেবতাদের উপাসনা করতেন। তাদের গৃহীত পুরাতন দেবতাদের উপাসন হত। কিন্তু আইনত রাজপরিবার ব্যতীত কারো মূর্তি এই সময় গৃহ বা মন্দিরে রাখার অনুমতি ছিল না। এই সময়ে আখেনাতেনের স্ত্রী নেফারতিতি রাজনৈতিকভাবে প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। আখেনাতেনের সময়ে মিশরীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ব্যপক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়েছিল।

তবে এই সংস্কারবাদী চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আখেনাতেন পুত্র তুতেনখাতেন ফ্যারাও হন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন তুতেনখামুন। তিনি আমুন উপাসনা পুনরুদ্ধার করেন। আখেনাতেনকে ধর্মদ্রোহীরূপে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর সমস্ত মূর্তি, রাজধানী ধূলিসাৎ হয় এবং আমুন প্রধান দেবতা হিসাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি, আতেনকে দেবতা নিচয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ তাঁর সময়কালের পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪ ঃ হিট্টাইট আক্রমণ, মিশরীয় আইন ব্যবস্থা, মমিকরণ প্রথা সমূহ (Unit-7)

৪.১ ঃ মিশরীয় ইতিহাসে বৈদেশিক হিট্টাইট আক্রমণ, সন্ধি ও গুরুত্ব

মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস হিট্টাইট আক্রমন এবং তাদের বিরুদ্ধে মিশরের যুদ্ধ এবং শান্তিস্থাপন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সংক্রান্ত তথ্য মিশর ও সিরিয়ার লেখমালার মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রধানত বিখ্যাত কাদেশের যুদ্ধ (Battel of Kadesh)-এর ষোড়শ বৎসর পর আনুমানিক 1259 খ্রিঃ পূর্বাব্দে মিশরীয় হিটাইটদের মধ্যে 'চিরস্থায়ী সন্ধি' (Silver treaty) স্বাক্ষরিত হয় এই সন্ধি, যাতে স্বাক্ষরকারী বিবাদমান দুই পক্ষের লেখমালাই ঐতিহাসিক খুঁজে পেয়েছেন। হিট্টাইট রাজধানী হাট্টুসা (বর্তমান তুরস্ক) তে পাওয়া গেছে, যা ইস্তানবুল প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে সংরক্ষিত। অন্যদিকে এই আবিষ্কারের বহু পূর্বে 1828 খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এইগুলি মূলত থিবসে

দ্বিতীয় রামেসিসের মন্দির সমূহ, কার্ণাকের আমুন মন্দির গাত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই লিপিগুলি মিশরীয় বৈদেশিক সম্পর্কের ইতিহাসের অধ্যয়নে উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

মধ্যসিরিয়া অঞ্চলে হিট্রাইট শক্তির উত্থানের মাধ্যমে হিট্রাইট ও মিশরীয়দের সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। মিত্তানি শক্তির পতনের পর হিট্রাইটরা কাদেশ বেং আমুররুতে মিশরীয় সামন্তদের ওপর স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করে। আখেনাতেন এর সময়কালে হাতছাড়া হওয়া এই রাজ্যগুলি মিশরীয়রা কখনোই মেনে নিতে পারেনি, সেই কারণে তারা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়েছেন এই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে। এই বিষয়ে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় প্রথম সেটির (Seti-I) এর রাজত্বকালে তিনি একটি আক্রমণ কাদেশ ও আমররু জয় করলেও তা ধরে রাখতে পারেননি, একটি সন্ধির মাধ্যমে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়।

1247 BC নাগাদ সেটিপুত্র দ্বিতীয় রামেসিস হিট্রাইট শক্তিকে উৎপাটিত করার জন্য প্রচুর সেনাবাহিনী নিয়ে কাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হন। হিট্রাইট রাজ দ্বিতীয় মুয়াতাল্লি তাঁর সহযোগীদের কাছ থেকে স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থে সেনা সংগ্রহ করেন। কাদেশের সন্নিকটে রামেসিস তাঁর সিংহভাগ বাহিনী অপেক্ষা অগ্রগমন করলেন। হিট্রাইট বাহিনী, মিশরীয় 'আমুন সেনা'-কে অতর্কিত আক্রমণে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। আমররু থেকে সাহায্যকারী বাহিনী এসে উপস্থিত হওয়াতে ফ্যারাও হিট্রাইট রথারূঢ় বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

যদিও এই যুদ্ধে মিশরীয়রা সসম্মানের প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিল, তা সত্ত্বেও রামেসিস যেভাবে নিজ মহিমা কীর্তনের প্রেক্ষাপট হিসাবে এই যুদ্ধের যা ফলাফল চেয়েছিলেন, তা সম্ভবপর হয় নি। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রামেসিস এই যুদ্ধে প্রদর্শিত আত্মবীরত্ব, স্বদেশে প্রচার করেন। বিভিন্ন মন্দির গাত্রে রথারূঢ়, ধর্ণুবাণধারী রামেসিস এর চিত্র অঙ্কিত হয়। যদিও যুদ্ধে তিনি আংশিক জয়লাভ করেন, কিন্তু তাঁর বৃহত্তর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। হিট্রাইটরা আমরু অধিকার করে তাদের ও মিশরের মধ্যে মধ্যবর্তী অঞ্চলের দৈর্ঘ্য আরো বিস্তৃততর করে।

সিরিয়ার অভিযানের ক্ষয়ক্ষতির পরেও রামেসিস তাঁর রাজ্যের অষ্টমবর্ষে পুনরায় অপেক্ষাকৃত সফল একটি অভিযান পরিকল্পনা করেন। সুরক্ষিত কাদেশ নগরটি বা আমবরু অভিযান না করে ফ্যারাও এবার দাপুর নগর অধিকার করেন। তিনি এই নগরকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। দাপুর জয় করে মিশরীয়রা ফিরে গেলে এই নগর পুনরায় হিট্রাইটদের আনুগত্য স্বীকার করে। তার রাজ্যের দশমবর্ষে দ্বিতীয় রামেসিস পুনরায় মধ্যসিরিয়ার হিট্রাইট সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণে প্রয়াসী হন, এই যুদ্ধেও একইভাবে অনেক অঞ্চল দখলীকৃত হলেও সেইগুলি পুনরায় হিট্রাইট অধিকারে ফিরে যায়। এই রকম কিছু বিক্ষিপ্ত যুদ্ধবিগ্রহ হলেও কাদেশের যুদ্ধই ছিল এই দুই শক্তির শেষ সম্মুখ সমর। এইভাবে হিট্রাইটদের বিনাশ সম্ভব পর নয় অনুমান করে রামেসিস উভয় শক্তির মধ্যে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শেষ পর্যন্ত 1259 BC নাগাদ তৃতীয় হাট্টুসিলিস ও দ্বিতীয় রামেসিস একটি চিরস্থায়ী শান্তিতে আবদ্ধ হন।

এই শান্তি চুক্তিতে প্রাচীন নিকেটপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ আর্ন্তজার্তিক শান্তিচুক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। উদ্দেশ্যরূপে এই চুক্তিতে উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার কথা বলেন। উভয়ে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করে যে তারা কেউ পরস্পরের রাজ্য অভিযান করবেন না। সিরিয়ার বিতর্কিত ভূখণ্ড নিয়ে তারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে অগ্রগামী হবেন। তারা এই ভূখণ্ডের অধিকারের জন্য কখনোই ব্যয়বহুল যুদ্ধ যাত্রায়, অগ্রগামী হবেন না।

দ্বিতীয় একটি ধারায় স্থির হয় যে, স্বাক্ষরকারী দুইপক্ষ যদি কোন তৃতীয় পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অথবা তাদের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা যায়, তাহলে একে অপরকে সেনা দিয়ে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক দেশদ্রোহীদের আশ্রয়দান না করে তাদের দেশের হাতে হস্তান্তরের কথা ঘোষিত হয়। হিট্টাইটদের লেখমালা অনুসারে রামেসিস, হিট্টাইট রাজ হাট্টুসিলিসের উত্তরসূরীদের সহায়তাদানের অঙ্গীকার করেন। সন্ধির সাক্ষী হিসাবে হাত্তি ও মিশরীয় দেবতাদের আহ্বান করা হয় এবং তাদের নামও এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করণের মাধ্যমে এই চুক্তিকে দৈবমর্যাদা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বংশ পরম্পরা পুত্র—পৌত্রাদি ক্রমে এই চুক্তি বজায় রাখার অঙ্গীকার করা হয়।

কোন কোন মিশরতত্ত্ববিদরা এই চুক্তিকে শান্তি হিসাবে দেখেছেন, আবার কেউ একে দেখেছেন মৈত্রী চুক্তি হিসাবে। James Breasted (1906) মন্তব্য করেন এটি কেবল মাত্র মৈত্রী নয়, বরং এটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তিচুক্তি ছিল। তবে Alan Gardiner এবং S.Langdon মনে করেন এটি কেবল যুদ্ধ বন্ধ করার চুক্তি ছিল। তাদের পূর্বসূরীরা অনুবাদের তারতম্যের জন্য শান্তির ভিক্ষাকে শান্তি হিসাবে কল্পনা করেছেন। অপর একটি বিষয়, ঐতিহাসিকরা গভীরভাবে আলোচনা করেন সেটি হল যে দুই শক্তির মধ্যে কে আলোচনা শুরু করেন। অনেকের মতে যেহেতু হিট্টাইটরা তাদের অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন তাই তিনি হয়তো আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু Donald Magnetti দেখিয়েছেন যে নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে 'maat' এর ঐতিহ্য ধরে রাখা ফ্যারাওয়ের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তাই রামেসিসের পক্ষে আলোচনা শুরু করায় বাধা ছিল না। সবশেষে বলা যায়, হিট্টাইট ও মিশরীয় শান্তিচুক্তি নিৎসন্দেহে তাদের যুগের তুলনায় অত্যন্ত অগ্রগামী এক পদক্ষেপ ছিল।

৪.২ ঃ মিশরীয় আইন ব্যবস্থা

মিশরীয় সমাজে আইন শৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থার ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। মিশরীয় প্রশাসন বিভিন্ন বিভাগে, মন্ত্রীপরিষদও সহকারী আমলাতন্ত্রের মধ্যে বিতাড়িত থাকলেও সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা রাজা বা ফ্যারাওর ওপর ন্যস্ত ছিল। চতুর্থ রাজবংশের সময় থেকেই তিনি Horus (হোরাস) এর জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে গণ্য হতে শুরু করেন। 'Maat' ছিল সততা, ন্যায় ও বিচারের দেবী কিন্তু এই শব্দটি স্থিতাবস্থা ও স্থায়িত্বকেও বোঝাত। ইহা নৈতিকতার ধারণার সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল। সেই কারণে যে কোন অন্যায় বোঝাত। ইহা নৈতিকতার ধারণার সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল। সেই কারণে যে কোন অন্যায় কার্যকে Maat এর ধারনার পরিপন্থী হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

মিশরে সেই অর্থে কোন রকম লিখিত আইন ব্যবস্থা ছিল না। এর পরিবর্তে ফ্যারাওদের বিচারের রায়ের ওপর ভিত্তি করে অলিখিত আচরণবিধি প্রচলিত ছিল।

যদিও আদালতের নথিগুলি লিপিকারদের দ্বারা রচিত এবং সংরক্ষিত থাকতো। এই রায়গুলি পরবর্তীকালে বিচারের সময় স্মরণে রাখা হত। বিচারের জন্য জেলা ও নগর আদালত রাখা হত। সেখানে স্থানীয় সম্মানীয় নাগরিক বা স্থানীয় কর্মচারীরা বিচার পরিচালনা করতেন। অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ মোকদ্দমাগুলির বিচার রাজার নিযুক্ত প্রতিনিধি বা স্বয়ং ফ্যারাও করতেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ আদালতে নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেতেন। পাশাপাশি নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির অধিকারী ছিলেন সকলে। তবে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া অধিক সন্দেভাজনদের নিরপরাধ নয় বরং অপরাধী মনে করা হত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের শারিরীক নির্যাতন করা হত। অপরাধ প্রমাণ না হলেও তাদের প্রহার করা হত।

বিচারের পর শাস্তিবিধান করা হত। অপরাধীকে শাস্তি হিসাবে প্রহারের দণ্ড দেওয়া যেত। পাশাপাশি অপরাধের মাত্রা অনুসারে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, নিলাম, হাত, নাক কর্তন প্রভৃতি করা যেত। অনেক সময় অপরাধিকে দেশত্যাগের আদেশ দেওয়া হত। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার একমাত্র ফ্যারাও রীতি ছিল। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার একমাত্র ফ্যারাওর ছিল। বৈবাহিক জীবনে বিশ্বাসভঙ্গকে তখনই গুরুতর অপরাধ মনে করা হত যদি যার সঙ্গে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তিনি যেটিকে নিয়ে ন্যায়ের আবেদন করতেন, পরকীয়ার লিপ্ত স্ত্রীকে স্বামী ক্ষমা করতে পারতেন, কিন্তু বিচারের জন্য আবেদন করা হলে এবং তাতে দোষী সাব্যস্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হত। স্ত্রীর নাসিকাছেদ এমনকি জীবন্ত দাহ করার বিধান ছিল। অপর পক্ষে স্বামীর একই অপরাধে সহস্র ঘা আঘাত করার বিধান ছিল, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না।

মিশরের কোন আইনজীবী ব্যবস্থা ছিল না। অভিযুক্তকে রক্ষীগণ এবং বিচারপতিরা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সাক্ষীদের বয়ান পরীক্ষা করা হত এবং সেই অনুসারে বিচার করা হত, তাই সাক্ষীদেরও মারধর করা হত, যাতে তারা সত্যি কথা বলে। এমনকি নিরপরাধ প্রমাণিত হলেও সরকারী নথিতে চিরকাল সেই ব্যক্তি কখনো অভিযুক্ত হয়েছিলেন সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকতো। এই বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক ছিল। সেই কারণে ব্যক্তিগত কারণে প্রতিবেশী বা পরিবারের কেউ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনলে, সেই অভিযোগ মিথ্য প্রমাণ হলেও অভিযুক্তকে অপমানিত হতে হত।

এই কারণে মিথ্যা অভিযোগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত। নিরপরাধকে শাস্তি বিধান করা হলে তা দৈবনির্ভর রাজততন্ত্র, দেবশাসক ফ্যারাও এবং তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারতো। সেই কারণে মিথ্যা সাক্ষ প্রদানকারীর ভাগ্যে অপেক্ষা করত কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তি। যেকোন আদালতকে স্বজ্ঞানে ভুল পথে পরিচালিত করার প্রয়াস করত, তাকে অঙ্গচ্ছেদ থেকে নিমজ্জন করে হত্যা যে কোন দণ্ড প্রদান করা হত। এইভাবে সন্দেহ ভাজনের সকল সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখে দোষী সাব্যস্ত করা হত এবং দণ্ডবিধঝান করা হত।

খুন, ধর্ষণ, চৌর্যবৃত্তি এবং সমাধিমন্দির লুণ্ঠনকে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গবিকৃতি যোগ্য অপরাধ বলে মনে করা হত। খুনিদের প্রহার করে কুমীরদের ভোজনের জন্য দেওয়া হত, অথবা জীবন্ত দগ্ধ করা হত। চোরদের হাত পা কেটে দেওয়া হত। পিতা-মাতাকে হত্যাকারী সন্তানদের ভয়ঙ্করতম মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, কিন্তু সন্তানঘাতী পিতা মাতাকে কেবল মৃত সন্তানকে তিন দিন রাত ধারণ করে থাকতে হত।

প্রখ্যাত মিশরবিদদের মতে, অন্যান্য সমকালীন সভ্যতা সমূহের তুলনায় মিশরীয় সভ্যতার আইনব্যস্থা তার পরিকাঠামো সম্পর্কে খুবই অল্প তথ্য সংরক্ষিত রেখেছে। তবে ইহা ধর্মীয় অনুশাসনকেন্দ্রিক ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এই রকম ধারণা করা হত যে মানুষদের স্বয়ং ঈশ্বর আইনের ধারণা প্রদান করেছেন। এবং আইনের শাসন দেবতারাই বহন করেন। এইভাবে মিশরে আইন ও তাকে কেন্দ্রকরে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

৪.৩ ঃ মৃত্যু ও মমিকরণ

মিশরীয়রা মৃত্যুর পর জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনে করতেন তিনটি প্রধান আত্মা মানবদেহে বাস করে। (1) জীবনী শক্তি (ka), (2) ভ্রাম্যমান আত্মা (Ba) ও (3) একটি পক্ষীরূপধারী আত্মা। তৃতীয় আত্মাটি মৃত্যুর

সাথেই নক্ষত্রলোকে যাত্রা করলেও প্রথমদুটি আত্মা তাদের ত্যাগকরা দেহের ওপর নির্ভর করে থাকে। তাই দেহের যথাযথ সংরক্ষণ হওয়া জরুরী। প্রাথমিক পর্বে মিশরীয়রা বালির মধ্যে দেহ কবর দিতেন, যেস্থানে অনেক দেহ সুরক্ষিতভাবে থাকতো। সেখান থেকে এই ধারণার সূত্রপাত বলে অনেকে মনে করেন।

মিশরীয় মতে দেবতা ওসাইরিস ছিলেন সেই দেবতা যিনি মৃত্যুর পর কিছুকালের জন্য জীবন্ত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি মৃত্যুলোকের অধিপতি হন। পাশাপাশি পুনর্জন্মের দেবতা বলেও তাকে অভিহিত করা হয়। এই থেকে ধারণা হয় যে মিশরীয়রা পুনর্জন্মের অধিকারী চতুর্থ রাজবংশের সময় থেকে প্রত্যেক ফ্যারাও দেবতা Horus এর জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যিনি মৃত্যুতে পিতা Osirisএর সাথে এক হয়ে যাবেন ও দেবতাদের সঙ্গে অমর জীবন প্রাপ্ত হবেন। প্রথমদিকে মনে করা হত কেবল ফ্যারাও অমরত্বের অধিকারী কিন্তু মধ্যবর্তী বংশের শাসক Senuret-I এর প্রভাবে এই রূপ ধারণা হয় যে সকল মানুষ অমরত্বের অধিকারী। অতপরঃ পূর্ববর্তীকালে রচিত 'Book of the Dead' এবং মধ্যবর্তী সময়ে রচিত 'Coffin text' এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দরিদ্রতম মানুষের সমাধিতেও 'Book of the Dead' দেওয়া হয়।

সময়ের সাথে সাথে মিশরীয়দের সমাধি দানের প্রথা উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। তারা মৃতদেহকে সংরক্ষিত করার জন্য নতুন ধরনের প্রক্রিয়ার অবতারণা করে। এই প্রথা মমিকরণ প্রথা নামে প্রসিদ্ধ। 'Mummmy' শব্দটি এসেছে আরবিক 'Mummya' শব্দ থেকে যা বিটুমেন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত রেজিন (Resin) আবৃত কিছু নিম্নমানের মমি থেকে এইরূপ ধারণা প্রাথমিকভাবে করা হত। মনে করা হয়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 2600 অব্দে চতুর্থ রাজবংশে সময়ে মমিকরণ সূত্রপাত হয় এবং প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এই সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল।

মমিকরণকারী মিশরীয়রা ইহা অনুধাবন করেছিলেন যে দেহ সংরক্ষণের জন্য দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি নিষ্কাশন ও দেহটি শুষ্ককরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তারা লবণ সংগ্রহ করতেন বিভিন্ন মরুহ্রদ থেকে যা এই সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারতেন। যেহেতু মনে করা হত পরলোক অস্তমিত সূর্যের দিক তাই নীলনদের পশ্চিমতটে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহকে নিয়ে যেতেন। সেখানে দেহটিকে স্নান করানো হত। অতপরঃ মমিকরণ ক্রিয়া শুরু করা হত। সহজতম সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল পাকস্থলী খালি করে, দেহগহ্বর পরিষ্কার করে, দেহটিকে চল্লিশদিন Natron (লবণ বিশেষ) দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা। এটি ছিল সবচেয়ে কমদামী পদ্ধতি। অপেক্ষাকৃত মধ্যমমানের পদ্ধতিতে দেহে একটি দ্রাব্য রাসায়নিক প্রবেশ করিয়ে সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে গলিয়ে বের করে নেওয়া হত। অতপরঃ লবণ দিয়ে দেহকে শুষ্ক করা হত। তবে এর চেয়ে সর্বাধিক মূল্যবান একটি পদ্ধতি ছিল, যাতে দেহ সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকতো।

এই মূল্যবান পদ্ধতিতে একটি কাঠের পাটাতনের ওপর দেহটি রেখে যকৃৎ, ফুসফুস, পাকস্থলী ও অন্ত্র সমূহ নিষ্কাশিত করা হত। দেহের পাশ্ববর্তী অঞ্চল ছেদ করে এগুলি বের করে আনা হত। অষ্টাদশবংশের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত মস্তিষ্ককে অবিকৃত রাখা থাকলেও এই সময় থেকে একটি ধাতব তারের সহায়তায় নাকের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কটি ও নিষ্কাশন করা হত। যদিও হৃদযন্ত্রটি সরানো হত না। দেহ গহ্বরটি মশলা ও মদ্যদ্বারা ধৌত হোত। এরপর দেহের ভেতরে কাঠের গুঁড়ো, খড় প্রবেশ করিয়ে শুষ্ক করার প্রক্রিয়া চালানো হত। এরপর সেই দেহটিকে একটি পাথরের টেবিলে শুইয়ে চল্লিশ দিন ধরে লবণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হত। এরপর দেহ থেকে খড়, বালি প্রভৃতি বের করে সেটিকে আবার ধৌত করা হত। এরপর রেজিন সিক্ত গজকাপড়, কাঠের গুড়ো ওNatron

খণ্ড দিয়ে সেটিকে পুনরায় ভর্তি করা হত। দেহটিকে বাইরের দিয়ে তেল, মোম, দুধ, মদ্য এবং মশলা মাখানো হত। এরপর কাটা অংশটি জুড়ে দিয়ে পুরোদেহটি রেজিন দিয়ে আবৃত করে, কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। অনেক সময় কাপড় দিয়ে মোড়ার পূর্বে গহনা, প্রসাধনী ও বস্ত্র দেওয়া হত। 'Wetyw' রা এই পদ্ধতির পালন করতেন। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শৃগালের মুখোশ পরিহত 'hevy Sesth' বা 'Controller of Mysteries' গণ। তারা শৃগাল মুখী দেবতা Anubis-এর অনুকরণ করতেন। ব্যাণ্ডেজ বাধাতে পনের দিন সময় লাগতো। কারণ প্রতিটি পর্যায়ে পুরোহিতরা নির্দিষ্ট প্রথা পালন করতেন। ব্যাণ্ডেজের বিভিন্ন স্তরে তাবিজ দেওয়া হত। এইভাবে দেহটিকে মুখোশ পরিয়ে কফিনে শোয়ান হত। এইভাবে মৃত্যুর সত্তর দিনের মাথায় মমিকরণ সম্পন্ন হত।

মমিকরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল পিরামিড। মৃত ফ্যারাওদের মমিকে তাদের নামাঙ্কিত পিরামিডে সমাহিত করা হত। তৃতীয় রাজবংশের ফ্যারাও Dioser-এর জন্য সর্বপ্রথম ধাপযুক্ত পিরামিড নির্মিত হয়েছিল 2650 BCE মেমফিসের নিকটস্থ সাকারাতে। এটি আদিমতম সমাধিক্ষেত্রের থেকে উন্নততর সমাধি ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ে চতুর্দশরাজবংশের Sneferu-র সময়েও ধাপযুক্ত পিরামিড ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরে প্রকৃত আকারের পিরামিড নির্মিত হয়। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যরূপে নির্মিত গিজার পিরামিড Khufu আমলে বানানো হয়। এখানে Khufu পুত্র Kfafre এবং পৌত্র Menkaure-র পিরামিড ছিল। Khufu-র পিরামিডটি প্রায় 146 মিটার (480 ফুট) উঁচু, এর ভিত্তিভূমি 230 মিটার (755 ফুট) বর্গক্ষেত্র। এটি এখনও বিশ্বের উচ্চতম প্রস্তর নির্মিত নির্মাণ।

মনে করা হয় সম্ভবত প্রায় ২০ বছর ধরে প্রায় ৪০০০ জন বা আরও অধিক শ্রমিক এই নির্মাণটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। পূর্বে মনে করা হত যে এই শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল দাস শ্রমিক বর্তমানে মনে করা হয়, অধিকাংশই দক্ষ শ্রমিক ও তখন শিল্পী ছিলেন, কেবল বন্দী ক্রীতদাস দ্বারা এইরূপ নিখুঁত পরিকল্পনা ও নির্মাণ সম্ভব নয়। পিরামিডের মধ্যে মমিকৃত দেহগুলি রাখা হত। বেশিরভাগ পিরামিড ও সমাধি পাওয়া গিয়েছে Valley of Kings-এ। এখানে ফ্যারাওদের সাথে তাদের রাণী, শিশু এ এমনকি অভিজাতদেরও সমাধি এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাজকীয় পিরামিডের বিপুল ধনৈশ্বর্য সঞ্চিত থাকত। যা পরলোকের জন্য ফ্যারাওদের অর্পণ করা হত। যদিও অধিকাংশই পরবর্তীকালের দস্যুরা অপহরণ করে, তা সত্ত্বেও তুতেনখামেনের সমাধিতে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি সেই সময়ের রাজকীয় সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। এইভাবে দেখা যায় প্রাচীন মিশরের সংস্কৃতিতে মমিকরণ ও পিরামিডের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেহ সংরক্ষণ ও পিরামিড নির্মাণের দক্ষতা মিশরীয়দের বিজ্ঞান চেতনার অগ্রগতিরও প্রমাণ বহন করে যেখানে দেহবিদ্যা, জৈবরসায়ণ এবং স্থাপত্যশৈলী, সবদিকেই তারা পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

৫ ঃ উপসংহার

বর্তমান আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে প্রাচীন মিশরে নীলনদকে কেন্দ্রকরে একটি শক্তিশালী মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যা মানবসভ্যতার ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিগণিত।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। এ.কে.এম. শাহনওয়াজ; বিশ্বসভ্যতা।

২। Published by Parra gem; Ancient Egypt.

৩। B. Trigger; Ancient Egypt: A Social History.

৪। Burns and Ralph, World Civilizations.

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। মিশরের ইতিহাস অধ্যয়নের সম্ভাব্য উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। মিশরের সমাজচিত্র ও সেই সমাজের নারীর অবস্থান কেমন ছিল?

৩। প্রাচীন মিশরীয় রাজতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা কর।

৪। হিট্টাইটদের সঙ্গে মিশরীয়দের সম্পর্কের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৫। মিশরীয় ধর্মব্যবস্থার উল্লেখ করে, আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদের বর্ণনা কর।

৬। মমিকরণের সাথে পরলোক বিশ্বাসের সম্পর্ক কি? মমিকরণের বিবরণ দাও।

Block / পর্যায়–৪

Age of Antiquity : Greece

প্রাচীনগ্রিস

সূচীপত্র ঃ

---

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ও গ্রীকধর্ম (Unit-8)

২.১ ঃ গ্রীসে সভ্যতার বিস্তার

২.২ ঃ নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ও আন্তঃসম্পর্ক

২.৩ ঃ গ্রীক ধর্মীয় চেতনা

৩ ঃ গ্রীসের সমাজ কাঠামো (Unit-9)

৩.১ ঃ সামাজিক ব্যবস্থা

৩.২ ঃ হেলট ও পেরিকোইসদের অবস্থান

৩.৩ ঃ নারীর স্থান

৩.৪ ঃ গ্রীক-পারসিক সংঘাতঃ

৪ ঃ ধ্রুপদী সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ব্যবস্থা (Unit-10)

৪.১ ঃ গ্রীকসাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি

৪.১.১ঃ কাব্য, সাহিত্য, নাটক

৪.২ ঃ অলিম্পিকস

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১) গ্রীসে সভ্যতার বিস্তার কিরূপে হল?

২) নগররাষ্ট্র সমূহ কিভাবে গড়ে ওঠে?

৩) তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল?

৪) গ্রীকদের ধর্মীয় চেতনা কেমন ছিল?

২ ঃ গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ও গ্রীকধর্ম (Unit-8)

২.১ ঃগ্রীসে সভ্যতার বিস্তার

বিশ্ব ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতা সমূহের অন্যতম হল গ্রীক সভ্যতা গ্রীকউপদ্বীপে মানব বসতির আদিমতম চিহ্ন পাওয়া যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০অব্দে। অনুরূপ সময়কালেই ক্রীট এবং সাইক্লেডে মিনাওয়ান সভ্যতার সূত্রপাত হয়। যদি এই সভ্যতা ছিল গ্রীক পূর্ব সভ্যতা (2000 BCE-1600BCE), ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপ ক্রীটে এই সভ্যতার আবিষ্কার করেন আর্থার ইভান্স। এই আবিষ্কার প্রাচীন ঐতিহাসিক থুকিডিডিসের মতকে সত্য প্রমাণ করে। তিনি ক্রীটে একটি প্রাচীন সভ্যতার উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন।

আনুমানিক 2000BC নাগাদ ক্রীটে প্রথম প্রাসাদ এবং বহুতল ও সভাগৃহকে কেন্দ্রকরে বহুতল গড়ে ওঠে। এই সমস্ত নির্মাণ Cnossus Phaestos এবং মালিয়া (Mallia) অঞ্চলে নির্মিত হতে থাকে। এই সমস্তক্ষেত্রে নিকট প্রাচ্যের মিশ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রীটবাসীরা হস্তীদন্ত ও অন্য বিলাসদ্রব্য আমদানীর জন্য রত্ন, সুরা ও বস্ত্র রপ্তানি করতে দক্ষিণ (মিশর) ও পূর্ব (আরব) দেশে বাণিজ্য করতে যেত। মিশরীয় নথিপত্রে ক্রীটবাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রীট সমাজ শান্তিপূর্ণ হলে প্রকৃতি কখনই এই সুন্দর সভ্যতার সাথে সদয় থাকে নি। 1700BC তে একটি ভূমিকম্পে প্রথমবারের জন্য সকল প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়।

খ্রীঃপূর্ব 1700-1500 BC সময়কাল, যাকে ঐতিহাসিক ইভান্স পরবর্তী মিনওয়ান সভ্যতা ও অন্যান্যরা পরবর্তী প্যালাশিয়াল বলেছেন, অতিদ্রুত সেই সমস্ত ভগ্নপ্রাসাদসমূহকে পুনর্নির্মাণ করেন। এই সভ্যতা সুন্দর মৃৎপার, রত্নসমূহ এবং শিল্প কার জন্য সমাদৃত। Cnossus এর বৃহৎ প্রাসাদে জলপ্রবাহের সুব্যবস্থা ছিল। গৃহগুলি চার থেকে পাঁচতলা অবধি সুউচ্চ ছিল। এবং দেওয়াল গাত্রে নারী, পুরুষ, পশু-পাখির চিত্র অঙ্কিত থাকতো। Cult of Bull (ষাঁড় উপাসনা) বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। ক্রীট ব্যতিরেকে সাইক্লেড ও অন্য ঈজিয়ান দ্বীপ সমূহে এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল থির (স্যান্টেরি) 1600 BC এর পর মূল গ্রীক ভূখণ্ডে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেলে Evans ও কোন কোন ঐতিহাসিক মিনাওয়ান সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু একথা উল্লেখ যে মাইসিনীয় গ্রীকরা সর্বদাই স্বতন্ত্র ছিল। সম্ভবত তারা মিনাওয়ান শিল্পীদের নিয়ে গিয়ে এই শিল্প কার্য সৃষ্টি করাতেন।

এই শান্তিপূর্ণ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র খিরা, প্রকৃতপক্ষে একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর গড়ে উঠেছিল। এই আগ্নেয়গিরি সহসা জাগ্রত হবার কারণে খিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই অগ্ন্যুৎপাত অন্য দ্বীপ সমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এবং খিরাকে লাভার তলার সমাধিস্থ করে। এই অগ্ন্যুৎপাতের সময় বিতর্কিত হলেও ঐতিহাসিক এবং ভূতত্ত্ব বিদগন আনুমানিক 1460BC সময়কে এই ঘটনার জন্য সঠিক বলে চিহ্নিত করেছেন। অতঃপর গ্রীক ভাষাভাষীরা 1450BC সময়ে ক্রীটের প্রাসাদ পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু 1380 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই প্রাসাদ পুনরায় ধ্বংস হয়। এই সময়কালে 'Post Palatial' কাল বলা হয়। অতঃপর c1100BC নাগাদ জেরিয়ান গ্রীকদের আক্রমণে এই সভ্যতার পতন হয়।

খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয় সহস্রকে গ্রীক উপদ্বীপে বিভিন্ন ছোট নগরকেন্দ্রিক সমৃদ্ধ ব্রোঞ্জযুগীয় সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। 2000BC নাগাদ বহিরাক্রমণে সেই সভ্যতার পতন ঘটে, অন্যদিকে C160BC নাগাদ মাইসীনিয়াতে নতুন সভ্যতার সূত্রপাত হয়। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি মাইসিনীয়া কে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। যে বক্তব্যটি সমর্থিত হয় সমসাময়িক হিট্টাইট শাসকদের নথিপত্রে। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হয় না, যে প্রাচীন গ্রীস মাইসিনীয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

প্রাক ধ্রুপদী গ্রীক সংস্কৃতি হিসাবে মাইসিনীয় সংস্কৃতিকেই চিহ্নিত করা যায়। মাইসিনীয় সংস্কৃতির ওপর পূর্ববর্তী ও উন্নততর মিনাওয়ান সভ্যতার প্রভাব স্পষ্ট ছিল। স্পার্টার নিকটে স্বর্ণপাত্রের গাত্রে ষাঁড় এবং লম্বাচুলের যুবকদের চিত্র এই প্রভাবকে নিশ্চিত করে। কিন্তু তারা শিকার ও যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। একটি সমাধি ক্ষেত্রে (c.160BC) প্রাপ্ত সুবর্ণ মুখোশ দাড়ি, গোঁফ সমন্বিত গ্রীক যোদ্ধার মুখ, ক্রীটের তুলায় সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। c.1460BC এর থিরা প্রলয়ের পর সম্ভবত পরিতক্ত মিনাওয়ান প্রাসাদ সমূহে গ্রীকরাই অধিকার করে। লিখনশৈলীর কিছু ধরণ ক্রীট থেকে গ্রীকরা গ্রহণ করেন টিরিয়ান, থিবস, অর্কমেনাস এবং এথেন্স, পাইলস প্রভৃতি কেন্দ্রে এই প্রভাব পাওয়া যায়। পাইলসে (Pylos) খননকার্য করে একটি মাইসিনীয় প্রাসাদ আবিষ্কৃত হয়। এইভাবে মাইসিনীয় সংস্কৃতি উত্তরে খেসালি, ঈজিয়ান অতিক্রম করে মিলেটাস এবং পূর্বে সাইপ্রাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

মাইসিনীয় সংস্কৃতি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই সমৃদ্ধি বাণিজ্য এবং লুন্টন উভয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল। এই সময়কাল মূলত কিংবদন্তীমূলক, থুকিডিডিসের রচনায় যার উল্লেখ মেলে। গ্রীক পুরাবস্তু, মূলত মৃৎপাত্রের নিদর্শন পশ্চিমে সিসিলি থেকে পূর্বে সিরিয়া অবধি পাওয়া গেছে। মাইসিনীয়রা মিনাওয়ানদের Outpost গুলি 1400BC এর মধ্যে অধিকার করে নিলেও অতিদ্রুত বাণিজ্যে আরো অগ্রগতি করতে শুরু করে। মাইসিনীয়রা তাদের নগরগুলিকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Citadel) কে কেন্দ্র করে নতুন নগর প্রকার গড়ে তোলেন। সিংহদুয়ারের ধারণা, দুটি স্তম্ভে সিংহের প্রতিকৃতি এই নতুন ভাবনার মূলে ছিল।

এই সময়কালের অন্যতম বিতর্কিত বিষয়গুলি ট্রয়ের যুদ্ধ। হোমারের রচিত ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্যে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু হোমারের রচনা (8th Centure BCE) যেহেতু প্রস্তাবিত অনেক পরবর্তী সময়কালের, তাই ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা সমূহের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্ধিহান। দীর্ঘকাল ধরে চারণ কবিদের দবারা গীত জনপ্রিয় লোকগীতিগুলি এবং কিংবদন্তীগুলির ঐক্যবদ্ধ করণে ফলে এই মহাকাব্যের রচনা হয়েছিল। উনবিংশ শতকের গবেষকরা ট্রয়কে অস্তিত্বহীন কাল্পনিক কাহিনী বলে নস্যাৎ করে দেন। প্রাচীন গ্রীসের মানুষদের

এই কাহিনীকে সত্য মনে করার প্রবণতাকে তারা শিশুসুলভ ভ্রান্তি বলে মনে করতেন। তাদের মতে, পুরো মহাকাব্যই ছিল হোমারের কবি কল্পনার স্ফুরণমাত্র। কিন্তু জনৈক্য জার্মান ব্যবসায়ী Heinrich Schleiemann হোমারের কাব্যের যথাযথ প্রমাণ করতে উত্তর পশ্চিম তুরস্কে খননকার্য শুরু করেন। তিনি সেই অঞ্চলে নগরের অবশেষ পান এবং 1873 খ্রিষ্টাব্দে একটি সম্পদভাণ্ডারের সন্ধান পান। সেটি ট্রয়রাজ প্রিয়ামের ভাণ্ডার বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু সেগুলি আরো প্রাচীন ছিল। অন্যদিকে 1876 খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাইসিনীয়া অঞ্চলে খনন করে একটি রাজমুখোশকে গ্রিকরাজ অ্যাগামেমন এক মুখাবয়ব রূপে চিহ্নিত করেন। তা সত্ত্বেও সেই আবিষ্কার ও ট্রয়ের সম্ভাব্য যুদ্ধের তারিখ থেকে বহুপূর্বের ছিল। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার গ্রীক কিংবদন্তী গুলিকে অনেকটাই প্রতিষ্ঠা দেয়। মূলত ট্রয় নগরীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

মনে করা হয়, ভূমধ্যসাগরে ট্রয় একটি বাণিজ্যিক রাষ্ট্র ছিল। যেটি কৃষ্ণসাগার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। যেটি গ্রীসের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই যুদ্ধের সম্ভাব্য তারিখ ছিল 1250BC - 1190 BC, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, উক্তস্থানে গ্রিকরাজ অ্যাগামেমনন, তাঁর পলায়নশীল স্ত্রীকে উদ্ধারের জয় এই নগরী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন কিমা, সেই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট, খ্রিঃপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে সাধারণ যুদ্ধের ফলে এই নগরীর পতন আসন্ন হয়ে পড়েছিল।

অতঃপর 1200BC-800BC গ্রীক ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে পরিচিত। এই সময়ে সমস্ত মাইসিনীয় কেন্দ্রগুলি অজানা শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। Pylos-এর মতে কিছু কেন্দ্র পরিত্যক্ত হয়, কেবল মাত্র এথেন্স নিজের নগরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, কিংবদন্তী অনুসারে রাজা Codrus এর আত্মবলিদানের বিনিময়ে। অন্য মাইসিনীয় নগরবাসীরা সাইপ্রাস, ইফিসাস প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করে। এই সময়কালে অক্ষরজ্ঞানহীন বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নতভাবে প্রবাহিত হয়।

এই সময় 1050 BC থেকে মৃৎপাত্র নির্মাণ কৌশল নতুন পরিবর্তন আসে। এথেন্সে এই নতুন Protogeometric/প্রাক জ্যামিতিক Style এর সূচনা হয়। এই নতুন শিল্পকলাকে হেলেনীয় শিল্পকলা হতে থাকে। এক্ষত্রে বলা প্রয়োজন যে 'গ্রীক' একটি রোমান শব্দ, প্রকৃত পক্ষে গ্রীকরা নিজেদের হেলেনীস বলত। 1100BC থেকে সহজ ডোরিয়ান বস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। কাঠের তৈরী গৃহ নির্মাণ হতে শুরু হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে গ্রীক সভ্যতা পুনরুত্থিত হতে থাকে যা c. 800BCE নাগাদ ধ্রুপদী সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল।

গ্রীকজাতি ঈজিয়ান অঞ্চলে ও গ্রীক উপদ্বীপে আধিপত্য স্থাপনকারী ইন্দো-ইউরোপীয়ান জাতি গোষ্ঠী ও ভূমধ্যসাগরীয় জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে তৈরী হয়। এর মধ্যে ক্রীয়, আগুনীয়, ইত্তলীয় ও গেরিয়দের মিশ্রণ ঘটে। গ্রীকরা নিজেদের, দেবতা ডিয়কেলিনের পুত্র হেলেন (Hellen) এর বংশধর মনে করত বলে তাদের সভ্যতা হেলেনিয় সভ্যতা নামে বিখ্যাত।

২.২ ঃ নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ও উদ্ভব

800 খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে গ্রীক সভ্যতা ক্রমশ উন্নত হতে শুরু করে। এই সময় থেকে গ্রীক অক্ষর ব্যবহৃত হয়, বিভিন্ন মহাকাব্য হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি রচিত হয়যএই সময় গ্রীসের রাজনীতিতে নগর কেন্দ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই ধ্রুপদী যুগে (c.500-c.300BC) গ্রীস কখনোই কেন্দ্রীয় শাসনাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্র

ছিল না। তার পরিবর্তে ইহা বিভিন্ন স্বতন্ত্র নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা পোলিশ (Polis) নামে পরিচিত। এই রাষ্ট্রগুলিকে নগররাষ্ট্র (City State) বলার পরিবর্তে নাগরিক রাষ্ট্র (Citizen State) বলা অধিক যুক্তি সংগত হবে।

এইরূপ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পশ্চাতে মূলত গ্রীসের ভৌগোলিক ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী ছিল। বৃহৎ নদী উপত্যকা অথবা সমভূমির অনুপস্থিতিতে গ্রীসে বিভিন্ন পর্বত বেষ্টিত উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত ছিল। সেইরূপ বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে এইরূপ স্বাতন্ত্র স্বাভাবিক ছিল। এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রীসের সভ্যতাকে পৃথিবীর অন্য সভ্যতা অপেক্ষা পৃথক রূপে চিহ্নিত করেছিল। গ্রীক সভ্যতা বিভিন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের বিভক্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। মূল ভূখণ্ডে এথেন্স, থিবস ও মেগরা ছিল নগররাষ্ট্র, পেলোপনেসাস অঞ্চলে ছিল স্পার্টা এবং কোরিন্থ, এশিয়া মাইনরের তীরে ছিল মিলেটাস ইত্যাদি। নগর রাষ্ট্রগুলি ছিল বিভিন্ন আকৃতির। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় ছিল এথেন্স ও স্পার্টা।

কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যাতীত গ্রীক নগর রাষ্ট্র সমূহের রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা ছিল প্রায় অভিন্ন। রাজনৈতিক, অভিজাততান্ত্রিক, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অতিক্রম করে সবশেষে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চমশতকে গ্রীসের একটি অংশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে।

যদিও প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচিত ছিল, তা সত্ত্বেও এগুলির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। নগর রাষ্ট্র (Polis) অধিকাংশ জনগণ নগরে বাস করতেন। নগরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণভাবে কোন পবিত্র ধর্মস্থান বা মন্দির থাকতো। এই মন্দিরটি সাধারণভাবে নগরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নির্মাণ ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে থেকে নগরপ্রাচীরের অস্তিত্ব দেখা যায় (ব্যতিক্রম—স্পার্টা), খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে এই নগররাষ্ট্র গুলিতে নগর পরিকল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়, যেখানে নগরের নির্দিষ্ট স্থান ব্যক্তিগত, সর্বজনীন বা ধর্মীয় স্থানরূপে পৃথকীকৃত হয়। অনেক নগররাষ্ট্র সাধারণ সভাগৃহ এবং প্রেক্ষাগৃহ থাকত। যা রাজনৈতিক এবং বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হত।

আবার বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের পৃথক সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। নগররাষ্ট্র কেন্দ্রিক বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে প্রতিটি নগররাষ্ট্র (Polis)-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ও একজন নগরদেবতা থাকতেন। উদাহরণ স্বরূপ এথেন্সের দেবী এথেনা। আরো কিছু বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্য থেকে এই নগর রাষ্ট্রগুলির পৃথক চরিত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমানা, লিখিত আইন ব্যবস্থা, মুদ্রায় নগরের চিহ্ন (এথেন্সের মুদ্রায় পেঁচা), বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য এবং বিভিন্ন নগরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে নগরগুলি পৃথক চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

অনেক সময় সমমনস্ক (বোলিস) নগররাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক সমঝোতায় মাধ্যমে সাধারণ স্বার্থরক্ষা করতেন। এই নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যের ধারা দেখা যায়, প্রতি চারবৎসর অন্তর অলিম্পিক ক্রীড়ার সময়, এবং অগ্রীক পারসীক শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য (খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চমশতক)।

এবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নগররাষ্ট্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। স্পার্টা গ্রিক নগররাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে স্পার্টার উত্থান হয়েছিল। ডোরীয় বংশীয় স্পার্টানরা ছিল মূলত যোদ্ধা জাতি। 800 খ্রিঃ পূর্বাব্দের মধ্যে তারা লোকেনিয়ার উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টমশতকের শেষার্ধে তারা

উর্বর মাইসেনীয় উপত্যকা নিজ দখলীকৃত করে। অতঃপর তারা আর্গস অধিকার করে। স্থানীয় বাসিন্দারা স্পার্টার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে স্পার্টানরা কঠোরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহীদের দাসে পরিণত করা হয়। বিদ্রোহ ও যুদ্ধের আশংকায় স্পার্টা একটি যুদ্ধকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থারক্ষেত্রে ভিন্ন পরিবার থেকে নিযুক্ত দুই জন রাজা রাষ্ট্রে সামরিক, ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ে নেতৃত্ব দিতেন। এছাড়া ৩০ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম, সভা আহ্বান এনব বিচার বিষয়ক দিকগুলি পর্যালোচনা করতেন। এছাড়া যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত হত সভা বা এসেম্বলী (Assembly)। Assembly থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হত যারা এফর (Ephor) নামে পরিচিত। এরা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সম্পত্তির বন্টন, নাগরিকদের জীবনযাত্রা প্রভৃতি ছাড়াও দেশের আইনব্যবস্থার ওপর খবরদারি করতে পারতো। এসেম্বলী কাউন্সিলের গৃহীত প্রস্তাব বর্জন করতে পারত। এফরদের পাঁচবছর অন্তর নির্বাচন করা হত। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ছিল দেশের জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। এই ব্যক্তিদের যোগ্যতা হিসাবে প্রচুর ধনশালী হতে হতো এবং সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করতে হত।

প্রাচীন গ্রীসের এটিকা অঞ্চলে এথেন্সের অভিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিংবদন্তীর রাজা Theseus এটিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। এটিকার বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা এথেন্সে এসে বসবাস শুরু করেন ও এথেনীয় নামে পরিচিত হন। প্রাচীন এথেন্সের রাজা কড্রস (Cordus) ডোরিয় আক্রমণ প্রতিরোধ কালে রাজ্য রক্ষার্থে নিজ প্রাণ উৎসর্গকৃত করেন। দেবী এথেনাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করার কারণে এই নগররাষ্ট্রের নাম হয় এথেন্স। এটিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এথেন্স রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এথেন্স অনেকগুলি পদের উদ্ভব হয়েছিল। প্রথমদিকে পোলেমার্চ নামক (Pole march) নামক প্রধান সেনাপতি পদ সৃষ্টি করা হয়। পরে রাজার বিকল্প একটি পদ সৃষ্টি করা হয় যার নাম ছিল আর্কন, তার মেয়াদ আজীবন, পরে তা দশবছর এবং খ্রীঃপূর্ব ৬৮৩ থেকে ৬৮২ নাগাদ তা কমে হয় একবছর। রাজা বেসিলিয়াস নামে পরিচিত ছিলেন। তাদের আর্কন বেসিলিয়াস বলা হত। তারা প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন।

ক্রমে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গোত্রপ্রধানের সংসদ শাসন পরিচালনা করতেন। এই সংসদের নাম ছিল 'এরিয়পেগম (Areopagus), ভূতপূর্ব আর্কনরা এই সংসদের সভ্য হতেন। গ্রামে এই সংসদ রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংস্থায় পরিণত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০ থেকে ৬৩০ অব্দের মধ্যে থেসমথেটিয়া নামক ৬টি পদের কথা জানা যায়। আর্কন, বেসিলিয়াস এবং পোলেমার্চ এই ৬টি পদ মিলে Nine Archons নামে গ্রীক রাজনৈতিক ইতিহাসে পরিচিত লাভ করেন।

২.৩ ঃ গ্রীক ধর্মীয় চেতনা

গ্রীকরা বিভিন্ন দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। প্রতিনগরের একজন করে মুখ্যদেবতা থাকলেও মোটামুটিভাবে গ্রীসের একটি একরকম দেবতা নিচয়, এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল।

গ্রীক কিংবদন্তী অনুসারে, গ্রীক দেবতাদের অনেকগুলি প্রজন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে গ্রীকধর্ম প্রাক্ ইন্দো ইউরোপীয় ধর্ম থেকে উদ্ভূত বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে অন্যান্য

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সাথে গ্রীক দেবতাদের নামগত কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন—গ্রীক দেবতা 'Zeus Pater' এর সঙ্গে বৈদিক 'দ্যৌপিতাঃ'। আবার 'Athena'-র সঙ্গে বৈদিক উষার অপর নাম 'অহনা'। সর্বপ্রথম উইলিয়াম জোনস এই বিষয়টি আলোকপাত করেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সম্ভবত সুপ্রাচীনকালের একটি একই ভাষাগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মানুষেরা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এরা ইন্দো-ইউরোপীয় বা প্রচলিত কথায় আর্য বলে পরিচিত।

গ্রীক কিংবদন্তীর মধ্যে দেবতাদের পিতৃঘাতী স্বত্বার উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিদেবতা Uranus (আকাশ) এবং Gaia (পৃথিবী)-র সন্তানরূপে জন্ম হয়, প্রথম প্রজন্মের দেবতাদের, যারা Titan নামে পরিচিত, উক্ত Titan দের প্রধান ছিলেন Kronos তিনি প্রথম জীবনে তার পিতার দ্বারা বন্দী ছিলেন ও পরে পিতা Uranus-কে হত্যা করে ক্ষমতায় আসীন হন। অতঃপর Kronos তার সন্তানদের ভক্ষণ করতেন। কনিষ্ঠ পুত্র কোনভাবে রক্ষা পান, এবং পরবর্তীকালে তিনি পিতাকে বাধ্য করেন তাঁর সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীদের পুর্নজীবিত করতে বাধ্য করেন। এরপর সকলে মিলে Kronos এবং Titan দের পাতালে নির্বাসিত করেন। এই কনিষ্ঠ পুত্রই Zeus.

কিংবদন্তীর অনুসারে এরপর থেকে Zeus এর নেতৃত্বে তাঁর ভ্রাতা ভগিনী ও পুত্রকন্যারা অলিম্পিক পর্বত থেকে শাসন শুরু করেন। এই কিংবদন্তীগুলি বিশ্লেষণ করলে একটি স্তরহীন সমাজব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেখানে দেবতা একত্রভাবে তাদের সাধারণ মানুষদের বিনাশ করেন।

গ্রীক দেবতাদের মধ্যে Zeus ছিলেন দেবরাজ ও আকাশের দেবতা, সমুদ্রের দেবতা ছিলেন Poseidon, পাতালের দেবতা ছিলেন Hades। যুদ্ধপ্রধান গ্রীকজাতি যুদ্ধদেবতা হিসাবে উপাসনা করত Zeus পুত্র Ares-তে Apollo ছিলেন সূর্যদেব, পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। Apollo-র যমজ ভগিনী Artemis-এর মধ্যে উপজাতীয় দেবীসত্ত্বা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন কুমারী দেবী। Hera ছিলেন Zeus পত্নী এবং তিনি দেবীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। Zeus কন্যা Athena জ্ঞান ও যুদ্ধ পরিকল্পনার দেবী ছিলেন। গৃহস্থালী ও উনুনের (অধি) দেবী ছিলেন Hestia। গ্রীকদের শিল্পী দেবতা বা নির্মাণ সম্পাদন করতেন Hephasteus। তিনি দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেন। এছাড়া প্রেমের দেবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন Aphrodite। শস্য ও ফসলেরদেবী বা ভূদেবী রূপে উপাসিতা হতে Demetor। এছাড়া Dionysus ও Hermes ছিলেন উল্লেখ যোগ্য দেবতা। এদের একত্রে Olympian God's বা অলিম্পিক পর্বত নিবাসী দেবতা বলা হত।

গ্রীসের ধর্মীয় আরাধনায় ফল, ফুল শস্য ও মদ্য উৎসর্গীকৃত করে হত। তবে প্রাচীন গ্রীসের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। পারিবারিক পূজায় পিতা পৌরোহিত্য করতেন। আর রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মঅনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতেন নগর ম্যাজিস্ট্রেট।

গ্রীসে পুরোহিতেরা যাবতীয় কর্তৃক রাষ্ট্রের হাতেই সংরক্ষিত ছিল। রাষ্ট্র নিয়োজিত কর্মকর্তারা মন্দিরের সম্পত্তি, অর্থ, দাস প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করত। মন্দিরের পুরোহিত হিসাবে কোন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হত। প্রাচীন গ্রীসে পারিবারিক দেবতা, সাধারণ নাগরিকের দেবতা ও রাষ্ট্রীয় দেবতাদের আলাদা সত্ত্বা ছিল।

নাগরিকদের দেবতা আরাধনার জন্য চমৎকার মন্দির তৈরি করা হত। মন্দিরের মধ্যে থাকতো দেবমূর্তি। উৎসবের সময় এ সমস্ত দেবমূর্তিকে পরিচ্ছন্ন করে কাপড় পরানো হতো। ধর্মীয় আরাধনা হিসাবে ধর্ম, শোভাযাত্রা, প্রার্থনা, উৎসর্গ প্রভৃতি করা হত।

রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত গ্রীসে সাংস্কৃতিক সমন্বয় বর্তমান ছিল। রাজাদের শাসনকালে (১২০০-৭৫০ খ্রিঃ) ডেলফিতে সমগ্র জাতির দেবতা Apollo-র আরাধনা শুরু হয়। ডেলফির এই দেবতাপূজা পরিচালনায় সকল নগররাষ্ট্র অংশ নিত। এই ঘটনা গ্রীকদের সংস্কৃতিগত ঐক্যের পথ সুগম করেছিল।

দর্শন

ধর্মের পাশাপাশি গ্রীক চিন্তাবিদরা মানুষ, সমাজ ও ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চিন্তাকরতে গিয়ে একটি সুচিন্তিত সমৃদ্ধ দর্শন উপহারদেন। বিভিন্ন দার্শনিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত কুসংস্কার ও কিংবদন্তী আশ্রিত ব্যাখ্যার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পৃথিবীর সৃষ্টির উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকে হোমারের মহাকাব্যে এইরূপ অভিমত পাওয়া যায় যে, দেবতারা মানবিক গুণ সম্পন্ন এবং তারা জগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দায়ী। বৈজ্ঞানিক ব্যাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন গ্রীকদার্শনিক থালেস (Thales)। তিনি সূর্যগ্রহণকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে জলকে সৃষ্টির উৎস বলে মনে করতেন।

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সফিস্ট গণ। তারা মনে করতেন কোন বক্তব্যই চিরসত্য নয়। তারা বর্ণিত বক্তব্যকে প্রমাণ করতে বলতেন। এইভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রচলন করেন তারা। সফিস্ট চিন্তার অনুসারী অন্যতম দার্শনিক ছিলেন সক্রেটিস। তিনি মনে করতেন প্রতিটি বিষয়ই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে। তিনি মনে করতেন সম্মানিত আসন, জ্ঞানী ব্যক্তিদেরই প্রদান করা উচিত। পরিবার বা রাষ্ট্রে বিধান নয়, নিজের বুদ্ধিও বিবেচনায় যা সঠিক তাই করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। ৩৯৯ খ্রীঃপূর্বাব্দে নগররাষ্ট্রে পূজ্য দেবতাদের অস্বীকার ও তরুণদের বিপদগামী (যুক্তিবাদী) করে তোলার অপরাধে শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সক্রেটিসের একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন প্লেটো। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Republic'-এর বিষয়াবলীতে শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপ যেমন রাজতন্ত্র, অভিজাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন কোন দেশের নেতৃত্বে দার্শনিকদের থাকা খুব জরুরী, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি দীক্ষাগুরু সক্রেটিসের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। এইভাবে গ্রীসে একটি দর্শন চিন্তাধারা গড়ে ওঠে।

৩ ঃ প্রাচীন গ্রীসের সমাজ কাঠামো (Unit-9)

৩.১ ঃসামাজিক ব্যবস্থা

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবনচর্চাই হল ইতিহাস। তাই প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস অধ্যয়ন করার সময় প্রাচীন গ্রীসের সমাজব্যবস্থা, তার বিভিন্ন স্তর বিন্যাস আঞ্চলিক প্রভেদ, প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা

একান্তভাবে প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে গ্রীকরাষ্ট্র অনেকগুলি পৃথক পৃথক নগররাষ্ট্র ছিল। নগররাষ্ট্রগুলির পরিস্থিতি অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালিত হত।

এথেন্সে প্রাথমিকভাবে সমাজ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। যথা— অভিজাতবর্গ (Euprtridae), সম্পন্নকৃষক (Georgi), এবং বণিক (Deminurgi) । এছাড়া কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমজীবি গোষ্ঠী ছিল, যারা দাস না হয়েও নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই সময় জন্ম সূত্রের অভিজাতবর্গ নির্ধারিত হত। কিন্তু খ্রীঃপূর্ব সপ্তম শতক থেকে এই ধারণায় বদল দেখা যায়। আর্থিক সমৃদ্ধির ওপর ভিত্তিকরে নাগরিকদের তিনভাগে ভাগ করা হতে থাকে। যথা— (i) সমৃদ্ধতম শ্রেণী (Pentacosimedimini) (ii) সমৃদ্ধ শ্রেণী (Hippes) (iii) অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ শ্রেণী (Zeugiae)

এছাড়া একটি চতুর্থত শ্রেনীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এদের বলা হত থাটেস (Thates)। নাগরিক হলেও এদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হত না। জমির মালিক হলেও এদের জমির এলাকা ও ফসলের দাম কমছিল। সালন এদের বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করেছিলেন।

চূড়ান্তভাবে বা সাধারণভাবে যদি গ্রীসের সমাজকে দেখা যায়, তাহলে একে সাধারণত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব।

(1) **পুরুষ নাগরিক ঃ** এরা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল (i) ভূম্যাধিকারী (Aristoi) (ii) দরিদ্র চাষী (Periokoi) এবং (iii) মধ্যবিত্ত বা (শিল্পী ও বণিক)

(2) **আধা দাস শ্রমিক ঃ** এই প্রসঙ্গে স্পার্টায় helot-দের কথা বলা যায়।

(3) **নারী ঃ** সমস্ত শ্রেণীর নারীরাই এর অন্তর্ভূক্ত কিন্তু নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তারা।

(4) **শিশু ঃ** ১৮ বছরের নিচের শিশুরা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(5) **দাস ঃ** 'douloi' গণ যারা নাগরিক ও সামরিক দায়িত্ব পালন করত।

(6) **বিদেশী অনাবাসী** (xenoi) রা বিদেশী নাগরিক (metoikoi) যারা নাগরিকদের তুলনায় নিম্নতর ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই অর্থবানদের সামাজিক অবস্থা দৃঢ়তর ছিল না। পাশাপাশি দরিদ্র কৃষক ও দাসদের অবস্থা ছিল সঙ্গিন। এই বিষয়টির মধ্যে চলে আসে স্পার্টার সমাজের দুই শ্রেণী helot ও periokoi এর অবস্থানের প্রসঙ্গ যেটি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

গ্রীকসমাজে অভিজাতদের অবস্থান ছিল সর্বোচ্চ। এরাই ছিল ভূসম্পদের মালিক। প্রশাসনিক উচ্চপদে এদের অবস্থান। এরা সাধারণ ও সামরিক উভয়শিক্ষায় পারদর্শী ছিল। তবে এথেন্সে অনেক সময় সাধারণ নাগরিকদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হত। বণিক শ্রেণী ছিল ধনবান গ্রিসের ভূমি অনুর্বর হওয়ায় খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিশর ও মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানী করা হত। বণিকরা এইসব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। অন্যদিকে কৃষিদ্রব্য কম থাকার ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার্থে শিল্পদ্রব্য গড়ে ওঠে। বিভিন্ন খনি, জাহাজ, তৈরী, মদ এবং মৃৎপাত্র নির্মাণে শ্রমিকদের দক্ষতা ছিল সবচেয়ে বেশি। মৃৎপাত্র নির্মাণ অত্যন্ত উৎকৃষ্টতা লাভ করে।

তাদের তৈরী সাধারণপাত্র, তৈলপাত্র, পানপাত্র প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। এগুলি প্রাচীন গ্রীসে বস্তুগত সংস্কৃতির উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে। কৃষিজীবী সম্প্রদায় গম ও বার্লি উৎপাদন করত। এছাড়া প্রচুর পীচ ও মসুর ডাল উৎপাদন করত। অন্য ফসলের মধ্যে ছিল জলপাই ও ডুমুর। এছাড়া গবাদি পশুপালন করা হত। গ্রীসের কৃষিজীবী সম্প্রদায় ছিল মুক্তনাগরিক এবং এরা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত। অন্যদিকে ভূমিদাসরা ছিল মালিকদের অধীনস্থ। স্পার্টা ও পেলোপনেসীয় অঞ্চলে অভিজাতরা প্রচুর ভূমিদাস রাখত। এরা জীবনের বিনিময়ে প্রভুর জমিতে শ্রম দিত। এই ভূমিদাসদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। গ্রীক সমাজে এদের অবস্থান ছিল অসহায়। অনেকে ঋণ শোধ করতে না পেরে ভূমিদাসে পরিণত হন। ৫৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সলোন তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছিলেন। গ্রীক সমাজ ক্রীতদাস ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কায়িক শ্রমের বেশিরভাগ তাদের দিয়ে করান হত। সমাজে তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

শিশুদের অল্পবয়স থেকে কঠোর নিয়মে রাখা হত। স্পার্টার সমাজ ব্যবস্থায় সকল শিশুর বাঁচার অধিকার ছিল না। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রকে শ্রম দিতে পারবে এমন শিশুকেই জীবিত রাখা হত। বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিলে বা কোন শিশু অসুস্থ বা দুর্বল প্রতিপন্ন হলে তাকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করার বিধান ছিল। প্রত্যেক শিশুকে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য তাদের পিতা বাধ্য ছিলেন। বালকদের সাতবৎসর থেকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। তাদের পর কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা আরোপ করা হত। সহ্যশক্তি বাড়াতে তাদের স্বল্প পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হত। সারা শরীরে নির্মম ভাবে চাবুক মারা হত। এইভাবে তাদের যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলার প্রবণতা ছিল। এইভাবে স্পার্টার সমাজে একটি রাষ্ট্রেনিয়ন্ত্রণ যোদ্ধা শ্রেণী গড়ে তোলা হয়।

অন্যদিকে এথেন্সে পূর্ববর্ণিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এথেন্সের কাইলন, অন্যএকটি নগররাষ্ট্র মোগরার সাহায্যে ক্ষমতা দখলে চেষ্টা করেন। অতঃপর সেই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ড্রাকো (৬২১ খ্রিষ্টপূঃ) একটি সামাজিক বিধান সংকলন করেন। তবে কঠোর ও নির্দয় আইন ছাড়া এই ব্যবস্থা দেশের নাগরিকদের দুর্দশা মেটাতে পারেনি। কৃষকরা ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় গ্রীসের সমাজ সংস্কার করেছিলেন সলোন। তিনি জমিদারির সীমা নির্দিষ্ট করা কৃষকদের সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করেন এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে বউল নামে নতুন নির্বাহী সংসদ গঠন করে, প্রতিজাতি থেকে একশ জন সদস্য মিলে চারশত জন নির্বাচন করা হত। এই চারজাতি, যারা মিলে এটিকা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সালোনের পর পিসিশট্রেটস এবং তারপর ক্লিমস্থেনিস (৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এথেন্সের সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যান। ক্লিসথেনিস প্রাচীন গোষ্ঠীবর্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র নাগরিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্যে তিনি চারজাতির বদলে এথেনীয়দের দশ জাতিতে বিভক্ত করেন। বউলের সদস্য সংখ্যা ৪০০ থেকে বাড়িয়ে ৫০০ করা হয়। তিনি বছরকে দশভাগে ভাগ করেন। সেই প্রত্যেকটি সময়ে সভ্যদের মধ্যে ৫০ জন বউলকে পরিচালনার ভার পেতেন। এই রকম দশটি কমিটি গঠিত হয়, যেগুলি প্রাইটেনিস নামে পরিচিত ছিল। তবে তখনো পোলমার্চের কর্তৃত্ব স্বীকৃত ছিল।

এইভাবে দেখা যায় গ্রীসের সামাজিক ব্যবস্থা অনেকটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সামাজিক বিন্যাস্কে অনেকটা বদলে দিত।

৩.২ ঃ হেলট ও পেরিকোইসদের অবস্থান

প্রাচীন গ্রীসের সমাজ কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হল, সমাজ কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। এই অংশ ছিল সর্বাধিক অবহেলিত নগররাষ্ট্র হিসাবে রাজ্যবিস্তারকালে স্পার্টা Loconia (ল্যাকোনিয়া) এবং Messenia (মেসেনিয়া) অধিকার করলে সেই অংশের আদি অধিবাসীদের Helot বলা হত।

যদিও তাদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ক্রিটিয়াস (Critias) এর মতে তারা সম্পূর্ণ রূপে দাস। অন্যদিকে Pollux এর মতে তারা মুক্ত নাগরিক ও দাসদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত। তারা সাধারণভাবে ছিল ভূমিতে আবদ্ধ। মূলত কৃষিকাজে যুক্ত ছিল। হেরোডোটাসের মতে ৪৭৯ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে প্ল্যাটাইয়া যুদ্ধের সময় হেলট জনসংখ্যা স্পার্টানদের সাতগুণ ছিল।

যদিও হেলটগণ কৃষিতে যুক্ত থেকে স্পার্টান অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ ছিল, তাসত্ত্বেও স্পার্টানরা হেলটদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক মনে করতেন। স্পার্টানরা হেলটদের অবদমিত করে রাখতেন, এবং শরৎকালে হেলটদের সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, হত্যালীলা সংঘটিত করতেন অ্যারিস্টটল হেলটদের স্পার্টার চিরশত্রু রূপে চিহ্নিত করেন। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ও ভয় তাদের মধ্যে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ করত। ঐতিহ্য অনুসারে হেলটদের আক্রমণে ভয়ে স্পার্টারা সর্বদা তাদের বর্শা এবং বর্ম সর্বদা সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। প্লুটার্কের বর্ণনা অনুসারে স্পার্টানরা হেলটদের প্রতি কঠোর ও নির্দয় আচরণ করতেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক Prience এর মতে হেলটদের কুকুরের চামড়ার তৈরী পোশাক পড়তে বাধ্য করা হত। খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হত সীমিত।

তবে কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক ঐতিহাসিকরা হেলটদের অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ণের কথা বলেছেন। কুকুরের চামড়ার পরিবর্তে তারা মনে করেন চর্মজাত বস্ত্র হেলটদের পরিধান করতে হত। ছিল দরিদ্র কৃষকদের ব্যবহার্য পোশাক। আবার হেলটদের খাদ্য সীমিত ছিল, এই ধারনাও সম্ভবত ঠিক নয়, কারণ তাদের কায়িক পরিশ্রমের পরিমাণ ছিল প্রচুর। ঐতিহাসিক J. Ducat এর মতে হেলটদের প্রতি স্পার্টানদের আচরণ অনেকটাই আদর্শগত সংঘাত ছিল। যেখানে হেলটদের বাধ্য করা হত, নিজেদের মানসিকভাবে হেয়রূপে মনে করতে।

অনেক সময় হেলটদের নিযুক্ত করা হত, নাগরিকদের ব্যক্তিগত কাজ সম্পাদন করতে। এছাড়া স্পার্টানদের ব্যক্তিগত Kteroi তে তাদের কাজ করতে হত। আবার অনেক helot স্পার্টানদের শিক্ষালাভের সময় তাদের সাথে থাকতেন। আবার কিছু হেলটকে শিল্পী হিসাবেও নিযুক্ত করা হত। স্পার্টানদের বিস্তৃত জমিতে হিলটরা বাস করত, এবং সেই জমিচাষ করে উৎপন্ন ফসলের একাংশ মালিককে দিত। এ্যানডরুজের মতে সব হিলটদের অবস্থা আর্থিক দিক দিয়ে খারাপ ছিল না। কেননা উদ্বৃত্ত ফসলের একটা অংশ এরা নিজেদের জন্য রাখত। এ্যানডরুস এদের সম্পূর্ণ রকমের ক্রীতদাস বলেছেন। প্রাচীন লেখকদের বর্ণনা সেখানে তাদের ক্রীতদাসও স্বাধীনদের মধ্যবর্তী বলেছেন তার অর্থ হল এই যে হিলটদের কেবল ইচ্ছামত ক্রয় বিক্রয় করা যেত না। তারা ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ক্রিটিয়াসের মতে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলানায় স্পার্টায় স্বাধীনরা ছিল বেশী স্বাধীন এবং ক্রীতদাসরা ছিল পূর্ণতরভাবে ক্রীতদাস। আবার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হিলটরা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও তাদের বলা হত নূতন নাগরিক। এরা অন্য হিলটদের ঘৃণা করত। প্রয়োজনে সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত হিলটদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে

ব্যবহার করা হত। এই হিলটদের সংখ্যা নাগরিকদের তুলনায় কম ছিল না। আবার স্পার্টান পিতাও হিলট মাতার সন্তান ছিল, নাগরিক আর না হিলট ।

পেরিকোইস ঃ পেরিকোইসরা ছিল স্পার্টার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা ছিল ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে পরাধীন। স্পার্টান নাগরিকদের সাথে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। তাদের ওপর ছিল অতিরিক্ত করভার। উইল ডুরানটের মতে, ভৌগোলিক দিক দিয়ে তারা স্পার্টানদের পরিবেষ্টিত করেছিল। সামাজিক দিক দিয়ে তারা ছিল স্পার্টান অ হিলটদের মধ্যস্থলে। তারা ডোরিয় ভাষা ব্যবহার করত। তাই জাতিগতভাবে ল্যাকি মিডিয়ান বলতে স্পার্টান অ-পেরিওকোইস উভয়দেরই বোঝাত। সম্ভবত প্রথমে অল্পসংখ্যক ডোরিয়ান স্পার্টায় বসতি স্থাপন করেন পড়ে সেখান থেকে তাদের অধিকার প্রসারিত হয়, সেই সময় পেরিওকোইসদের তাদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। এরা ছোট শহর ও গ্রামে বাস করত। স্পাটানদের তত্ত্বাবধানে তারা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে তারা সাধারণ গ্রীকদের মত শান্ত জীবন যাপন করত। স্থানীয় বিষয় পরিচালনার ভার তাদের ওপর ছিল। ফিনলের মতে, পেরিওকোইস সম্প্রদায়গুলি ছিল অসমাপ্ত নোলিস। তারা হিলটদের মত কখনও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেনি। শান্তি, সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগের জন্য তারা স্পার্টানদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে স্পার্টানদের জন্য প্রয়োজনীয় বাণিজ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য তারা উৎপাদন ব্যবস্থা তাদের হাতে ছিল।

এইভাবে স্পার্টায় হেলট ও পেরিওকোইস সম্প্রদায় তাদের সামাজিক অবস্থান বজায় রেখেছিল।

৩.৩ ঃ নারীর স্থান

যেকোন সমাজের অধ্যয়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল নারীর স্থান। প্রাচীন গ্রীসে নারীদের অধিকার পুরুষদের তুলনায় সংকুচিত ছিল। তারা ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার বা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভের থেকে বঞ্চিত ছিল। নারীর অবস্থান ছিল গৃহস্থলীতে এবং তার জীবনের লক্ষ্য ছিল শিশুদের লালন পালন করা। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এ প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য সূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে এথেন্সের পুরুষ লেখকদের থেকে প্রাপ্ত। সকল নগররাষ্ট্রের সামাজিক চরিত্র সর্বদা এরকম ছিলনা। স্পার্টায় নারীদের কিছুটা ভিন্নভাবে দেখা হত। তাদের পুরুষদের মতই শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হত। তারা ভূমির অধিকারী ছিলেন এবং মদ্যপানের ও অধিকার তাদের ছিল।

এছাড়াও আরো কিছু ধরনের নারীদের কথা জানতে পারা যায়, যাদের সম্পর্কে লিখিত তথ্য খুবই সীমিত। এরা মূলত বিভিন্নধরনের কার্যকলাপে যুক্ত থাকতেন। এছাড়া বেশকিছু ব্যতিক্রমী নারী যেমন লেবসের সাপ্পো কবি হিসাবে, সাইরেনের অ্যারেট দার্শনিক হিসাবে, যোদ্ধা হিসাবে স্পার্টার গোরগো (Gorgo) এবং এথেন্সের Aspasda এবং চিকিৎসক হিসাবে, এথেন্সের Agnodica উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের নমুনা রেখেছিলেন।

অন্য অনেক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মতো শিশুকন্যাদের পরিত্যক্ত হবার সম্ভাবনা গ্রীসে অনেক উজ্জ্বল ছিল। নাগরিকদের শিশুদের পঠন, লিখন, গণিতের শিক্ষা দেওআ হত। কন্যাদেরও অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হলেও নৃত্য, সঙ্গীত ও জিমন্যাস্টিকের ওপর জোর দেওয়া হত, যাতে তারা নাগরিক উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাকে পরিবার প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত তৈরী করা।

বিবাহযোগ্য নারীকে বিবাহদানের বিষয়টি তার পিতা পরিচালনা করতেন। নারীর জন্য স্বামী নির্বাচন করতেন পিতা এবং হবু জামাতার কাছ থেকে কন্যাপণ গ্রহণ করতেন। যদি কন্যা পিতৃহীন হত, তাহলে অন্যকোন অভিভাবক পিতার দায়িত্ব পালন করতেন। বিবাহের বিধান ছিল, গ্রীক সমাজে পূর্ণবয়স্কনারীর অবিবাহিত থাকার অধিকার ছিল না।

বিবাহিত গৃহী নারীদের মূলকাজ ছিল গার্হস্থ্য কার্যকলাপ সম্পাদন করাও সন্তানদের প্রতিপালন করা। যদি তাদের আর্থিকঅবস্থা সম্পন্ন হত, তাহলে তারা ক্রীতদাসদের সহায়তা পেত। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষদের সাথে যোগাযোগকে সুদৃষ্টিতে দেখা হত না। নারীদের উলের কাজে ও বুননের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। তারা আত্মীয় স্বজনের কাছে যেতে পারতেন। গৃহ থেকে বাইরে যাবার স্বাধীনতা তাদের ছিল। পাশাপাশি নাগরিকদের উৎসবে ও ধর্মীয় কার্যকলাপ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তবে নাগরিকদের উৎসবে ও ধর্মীয় কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তবে নাগরিক রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি কোন নারীর নাম উচ্চারণ জনসমক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

আইনি দৃষ্টিতে বিবাহিত নারী স্বামীর অধীনস্থ ছিলেন। অ্যারিস্টটলের মতে নারীর নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে। তবে বাস্তব জীবনে পরিবারে নারী পুরুষ সমতার জীবন যাপন করতেন। অন্যদিকে নারীকে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হলেও পুরুষরা বহুনারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারতেন। পরিবারের মর্যাদা হানিকারণ নারীকে সামাজিক উৎসব থেকে বহিষ্কার করা যেত।

নারীর যদি ভ্রাতা জীবিত থাকতেন তাহলে পিতার সম্পত্তির কোন অংশ তিনি পেতেন না। তিনি যদি একমাত্র সন্তান হতেন তাহলে তার স্বামী বা অভিভাবক সেই সম্পত্তির অধিকার পেত। এইসব ক্ষেত্রে কোন অবিবাহিত নারী কোন সম্পত্তির অধিকার পেলে তাকে কোন পুরুষ আত্মীয়কে বিবাহ করতে হত। তবে উপহার হিসাবে প্রাপ্ত গয়না ও বস্ত্র তার নিজস্ব সম্পত্তি রূপে গণ্য হত।

নাগরিক শ্রেণী ব্যতিরেকে ও অন্য অনাগরিক শ্রেণীদের অবস্থান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । দাসী হিসাবে তারা সবধরনের কাজকের্ম লিপ্ত থাকতো। তারা দোকানের কাজ করত। এই সমাজে গণিকাদের বিষয়ে অনেকের তথ্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলায় পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু নারী পূজারিনীর কথা পাওয়া যায়। মূলত, এরা Demeter, Aphredite,ও Dionysos এর উপাসক ছিলেন। এরা সম্ভবত কুমারী ছিলেন। Thesmophoria fertility উৎসবে কেবল নারীদের প্রবেশধিকার ছিল। এথেন্সে প্রতিবছর চারজন নারীকে নির্বাচন করা হত এথেনার উপাসনা করার জন্য। অন্যদিকে ডেলফির Oracle ছিলেন একজন বয়স্কা নারী।

এইভাবে দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিসে নারী পুরুষের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা বেশি অধিকার ভোগ করতেন, সেই তুলনায় নারীদের অধিকার ছিল সীমিত। তবে স্পার্টার মতো কিছু ব্যতিক্রম ও আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

৩.৪ ঃ গ্রীক-পারসিক সংঘাত

গ্রীক সভ্যতার বিকাশমান পর্যায়ের পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী সভ্যতা পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে গ্রীক সভ্যতার সংঘাতের

পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই সময়ে পারস্য বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগ্রাস করে গ্রীসের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছিল। পারস্য সম্রাট দারিয়ুসের নেতৃত্বে এশিয়ামাইনরের গ্রীক উপনিবেশ আইওনীয়া পারসীকদের হস্তগত হয়েছিল। অতঃপর দূরবর্তী রাজধানী সুসা থেকে এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এই বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে এই স্থানের নিয়ন্ত্রণের ভার তিনি প্রাদেশিক শাসকদের অর্পণ করেন। আইওনীয়া ও লিডীয়াকে একজন স্যাট্রাপের অধীনে শাসন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই শাসক ছিলেন গ্রীক। এরা পারস্যের প্রতি অনুগত্য থাকতেন। অতঃপর শক্তিবৃদ্ধি করে দারায়ুস অধিকার করেন থ্রেস ও ম্যাসিডোন। এটি ছিল পারস্য কর্তৃক গ্রিস আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ।

ইতিমধ্যে এথেন্সের স্বৈরশাসক হিপিয়াস জনগণ কর্তৃক ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে স্বীয় হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের মানসে পারসীক শাসকদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সার্দিসের স্যাট্রাপ Artaphernes-এর সাহায্যে প্রার্থনা করলে তিনি এথেনীয়দের নির্দেশদেন হিপিয়াসকে সসম্মানের ফিরিয়ে নেওয়া জন্য। অবশেষে এথেনীয়দের সাথে পারসিকদের দ্বন্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ছিল ভিন্ন। ন্যাকসস দ্বীপে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটায় পরাধীন গ্রীকরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ এথেন্স জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে নগররাষ্ট্র থেকে স্বৈরাচারীরা বিতাড়িত হতে থাকেন, অতঃপর পারস্যের বিরুদ্ধে নগররাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান করা হত। এই আহ্বানে এগিয়ে আসে এথেন্স ও ইরিত্রিয়া।

বিদ্রোহী সার্দিস নগরী অধিকার করার পর বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দক্ষিণ দিকে ক্যারিয়া থেকে পার্সীয়দের বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু প্রাথমিক আঘাত কিছুটা আত্মস্থ করে পার্সীয়রা বেশ কিছু অঞ্চল পুনার অধিকার করে। গ্রীকদের প্রতিরোধের মুখেও দারায়ুসের সেনারা মাইলেটা অঞ্চল অধিকার করে। মূলত গ্রীকদের সম্মিলিত শক্তি ছিল বিশৃঙ্খল, ফলে তারা পরাজিত হয়। এভাবে সমস্ত দ্বীপ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এইভাবে বিদ্রোহ অবদমিত হলে, পারস্যরাজ দারায়ুস ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পর পুনরায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। একই সাথে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিকে শাস্তিপ্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে পারস্যের নৌবহর অগ্রসর হয়ে থ্যাসোস, থ্রেম, ও ম্যাসিডনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দারায়ুসের মূল উদ্দেশ্য ছিল এথেন্স ও ইনিরনিয়াকে শাস্তি দেওয়া। এই দুই রাষ্ট্র বিদ্রোহীদের সমর্থন করে সার্টিক নগরী ধ্বংস করেছিল। এই সময় বিতাড়িত হিপিয়াস দারায়ুসকে প্ররোচিত করতে থাকে এথেন্স আক্রমণ করার জন্য।

পারসিকরা ঈজিয়ান সাগর অতিক্রম করে গ্রিস আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। যেসব নগররাষ্ট্র পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তাদের আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ মাটি ও জল পাঠাতে বলা হয়। এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পারস্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ডেটিস ও দারায়ুসের ভ্রাতুষ্পুত্র আটাফার্নেস। এর সাথে যুক্ত হন হিপিয়াস। পারস্য ৬০০ জাহাজের একটি বিরাট নৌবহর গড়ে তোলে। একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে দারায়ুস এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিভিন্ন দ্বীপ জয় করে তারা ইরিত্রিয়াতে উপস্থিত হয়, সাতদিন প্রতিরোধের পর কিছু নগরবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় এই নগররাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর দ্রুত পার্সীয় দ্রুত এথেন্সের দিকে অগ্রসর হয়, তারা ম্যারাথন উপসাগরে ঘাঁটি স্থাপন করে। এথেনীয়রা শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা ও নগররক্ষার্থে প্রতিবেশী স্পার্টার কাছে সাহায্যের আবেদন করে, কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্পার্টার পূর্ণিমা অতিক্রান্ত না হলে আক্রমণে অস্বীকার করে। প্লেটিয়াবাসীদের সাহায্য নিয়ে মাত্র

৯০ টি যুদ্ধজাহাজও আট হাজার সেনা নিয়ে তারা প্রবল পরাক্রান্ত পারসীক শক্তির মুখোমুখি হয়। এথেন্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ম্যারাথন প্রান্তরে শত্রুসেনাকে আক্রমণের কথা বলা হয়।

৪৯০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সেপ্টেম্বরে ম্যারাথনে গ্রীক পার্সীয় চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়, শক্তিরদিক থেকে অনেক পিছিয়ে থাকলেও দেশাত্মবোধকের উদ্দীপনা ও সফল যুদ্ধ কৌশলের প্রয়োগের ফলে এথেন্স জয় ছিনিয়ে আনে। ১৯২ জন গ্রীক সৈন্যের মৃত্যু হলেও পারসীক সৈন্যরা নিহত হয় ছয় হাজার চারশত জন। পারসিকরা এই অপ্রত্যাশিত পরাজয় মেনে নিতে পারেনি।

দারায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম জারক্সেস (Xeroxes-I) তাঁর বাহিনী নিয়ে গ্রীসের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। এদিকে সম্ভাব্য পারসিক আক্রমণ মোকাবিলার জন্য গ্রীকরা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি পুনরায় অধিকার করতে শুরু করে। তাঁর অধীনে ছিল ষাট হাজার সৈন্য। ৪৮০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ জুলাই মাসে পার্সীয় স্থলবাহিনী থার্মোপলীতে এসে পৌঁছায়। অন্যদিকে তাদের নৌবাহিনী ক্যাসথানীয়াতে এবং সেপিয়াস অন্তরীপের মধ্যে উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রবল ঝড়ের মধ্যে তাদের উল্লেখযোগ্য জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। থার্মোপলিতেও ম্যারাথনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। অতঃপর Xeroxes প্রতিশোধের মানসে এথেন্সের দিকে অগ্রসর হলে এথেন্সের দূর্গরক্ষী বাহিনী প্রবল প্রতিরোধ করেন। অন্যদিকে গ্রীকবাহিনী সামামিস এ সমবেত হয়। এই অঞ্চলে গ্রীকনৌবহর পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করে, অতঃপর ২০সেপ্টেম্বর সংঘটিত সালামিসর ঘোরতর নৌযুদ্ধ পার্সীয়দের চূড়ান্ত বিপর্যয় সংঘটিত হয়।

গ্রীক-পারসিক যুদ্ধের অন্তিম পর্ব দেখা যায় আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে পারসীক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে । ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নেতৃত্বে গ্রীসে ঐক্যসাধন হয়। তিনি নগর রাষ্ট্রদের নিয়ে হেলেনীয় সংঘ গঠন করেন, কিন্তু ৩৩৮ খ্রীঃ পূর্বে তিনি গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

অতঃপর আলেকজান্ডার পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৩৩৩ খ্রীঃ পূর্বে তিনি পার্সীয়দের পরাস্ত করে তাদের অধিভূক্ত এশিয়ামাইনর ও মিশরের অংশ দখল করে নেন। আরবেলার যুদ্ধে ৩৩১ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস পরাস্ত হন। ৩৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তৃতীয় দারায়ুস তাঁর নিজ লোকের হাতে নিহত হলে আলেকজান্ডার বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব প্রাপ্তহন এবং গ্রীকের সঙ্গে পারসীরদের অবলুপ্ত হয়।

৪ ঃ গ্রীকসাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি (Unit-9)

কোন প্রাচীন সভ্যতা ও তার সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য আমাদের সমকালীন সাহিত্যিক তথ্য সূত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। সমকালীন সাহিত্যসূত্র যেহেতু সেই সময়ের মানুষদের রচনা সেই কারণে এই তথ্য সূত্রগুলিতে সমকালীন সমাজের অনেকাংশের প্রতিফলন পাওয়া যায়। গ্রীকসাহিত্যকে বর্তমান আলোচনায় আমরা দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব, যথা (১) ধ্রুপদী কাব্য-সাহিত্য-নাটক এবং (২) গ্রীক ইতিহাস চর্চা।

৪.১.১ গ্রীক কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে গ্রীকরা তাদের ঐতিহ্যময় বীরদের জীবনকাহিনীর প্রতিশ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাদের প্রাথমিক কাব্যসাহিত্যে বীরগাথা মূলক সাহিত্যের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক সাহিত্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ্য কবি হলেন হোমার। তার বিখ্যাত কাব্য ছিল খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকে রচিত মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসি।

এইকাব্যসমুদয়ে এশিয়া মাইনরে ট্রয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। ট্রয়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে গিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দেলিপ্ত গ্রীকরা যে স্বজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছিল, তার প্রতিফলন হোমারের লেখায় পাওয়া যায়।

গ্রীক জীবন যাত্রায় জটিলতা বৃদ্ধি পেলে তা কাব্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। এযুগের কবি হিসাবে প্রথমেই হেসিয়ডের (Hesiod ৭৫ খ্রীঃপূর্ব)। তার কবিতায় কৃষকদের জীবনযাত্রার চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছিল। হোমারের রচনায় যেমন কিংবদন্তী ও দৈব নির্ভর উপাদান অনেক বেশি ছিল হেসিয়ডের রচনায় তার পরিমাণ অনেক কমে আসে। তার পড়ে কাব্য জগতে উল্লেখযোগ্য নাম হল গীতিকবি সাপজো ও কবি পিন্তার। গীতিকাব্যে গ্রীক জনগণের জীবনযাত্রা তারা প্রতিফলিত করেছেন।

নাট্য সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এসকাইলাসের রচিত দুটি নাটক প্রমেথুয়াস বাউন্ত ও আগামেমনন। নাটকে সাধারণত গ্রীক ধর্ম ও সাধারণ জীবনের প্রতিফলন ঘটে। উন্মুক্ত মার্কে ও প্রায় বৃত্তাকার মঞ্চে নাট্য অভিনয় করা হত। গ্রীক জগতে সৃজনশীল নাট্যকার ছিলেন সফোক্লিস, তিনি প্রায় একশতর বেশী নাটক রচনা করেন। দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল এন্টিগনে (Antigone) ও ইলেকট্রা (Electra) ।

এইভাবে দেখা যায় গ্রীক সৃজনশীল সাহিত্য গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার সুন্দর চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল।

৪.২ ঃ অলিম্পিকস

ক্রীড়া জগতে অলিম্পিকস অত্যন্ত প্রাচীন ও সুবিধিত ক্রিড়া প্রতিযোগিতা। প্রাচীন গ্রীসে দেবতা জিউসের সম্মানার্থে এক ধরনের উৎসব আয়োজিত হত। পরবর্তীকালে দৌড়, জ্যাভলিন এবং কুস্তিপ্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। এই অলিম্পিকস প্রতিযোগিতা বিভিন্ন নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবস্থা ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে প্রথম অলিম্পিকস এর তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৭৭৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। রোমান সাম্রাজ্যে ৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট থিওডোসি কর্তৃক বাধা প্রদত্ত হবার পূর্বে প্রতি চারবছর অন্তর ইহা অনুষ্ঠিত হত।

এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীসের অভ্যন্তরীণ কূটনীতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। অলিম্পক চুক্তি অনুসারে, এই সময় বিভিন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিনাবাধায় যেতে পারতেন। এই ক্রীড়া পইতযোগিতা গুলি নগররাষ্ট্রদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণের চাবিকাঠি রূপে প্রতিভাত হত। এইসময় নগররাষ্ট্রদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকতে এই উৎসব কেবলমাত্র অলিম্পিয়াতেই অনুষ্ঠিত হত। বিজয়ীকে অলিভ পাতার মানপত্র এবং মুকুট উপহার দেওয়া হত।

এই প্রতিযোগীতাতে কেবল গ্রীসের অধিবাসী যাদের পূর্বপুরুষ গ্রীক তাদেরই অংশ গ্রহণ করতে হত। গ্রীসের প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও মত পার্থক্যের জন্য যে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দিয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এক নগররাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার বদলে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

৫ ঃ উপসংহার

প্রাচীনকালে গ্রীসে একটি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে তোলে। সেই সভ্যতার প্রভাব পরবর্তীকালে রোমান ও অন্যান্য সভ্যতার উপরে পড়েছিল। ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রীক সভ্যতা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে প্রতিভাত হয়েছে। এই হেলেনীয় সভ্যতা পরবর্তীকালে ভারতীয় ইতিহাসেও আলেকজাণ্ডারের মাধ্যমে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। প্রাচীন গ্রীসের সমাজ ও সংস্কৃতি—সুজাত ভদ্র ও কুনাল চট্টোপাধ্যায়।

২। বিশ্বসভ্যতা—এ কে এম শাহ নওয়াজ।

৩। প্রাচীন যুগের গ্রীসের ইতিহাস—সুনীল চট্টোপাধ্যায়

৪। গ্রীসের ইতিহাস — সুপ্রতীম দাস।

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। নগররাষ্ট্র বলতে কি বোঝ? গ্রীসে নগর রাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। গ্রীক পার্সীয় যুদ্ধের গতিপথ আলোচনা কর।

৩। গ্রীক সমাজে হেলট ও পেরিকোইসদের কিরূপ অবস্থান ছিল?

৪। গ্রীক দেবতাদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। গ্রীসে সভ্যতার বিস্তার কি প্রকার হল?

৬। গ্রীক ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে টীকা লেখ।

Block / পর্যায়–৫

The birth of Classical Civilisation : Pax Romania

রোমন সভ্যতার ইতিহাস

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ রোমন সভ্যতার বিকাশ, পাত্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক (Unit-11)

২.১ ঃ এট্রুসকান

২.২ ঃ রোমান সভ্যতার বিকাশ

২.৩ ঃ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক

৩ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আইন (Unit-12)

৩.১ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি

৩.২ ঃ রোমান আইন

৪ ঃ রোমান দাসপ্রথা ও নারীদের অবস্থান, গ্ল্যাডিয়েটর (Unit-13)

৪.১ ঃ রোমান দাসপ্রথা

৪.২ ঃ নারীদের অবস্থান

৪.৩ ঃ স্পার্টাকাস ও গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহ

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) রোমান সভ্যতার বিকাশ কেমন করে হল?

২) রোমান সমাজ সংস্কৃতি কেমন ছিল?

৩) দাস ব্যবস্থা ও দাস বিদ্রোহের প্রকৃতি কেমন ছিল?

২ ঃ রোমান সভ্যতার বিকাশ, পাত্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক (Unit-11)

২.১ ঃ এট্রুসকান

দুই লক্ষ বছর আগের প্যালিওলিথিক যুগেও সমগ্র ইতালি জুড়ে আধুনিক সভ্য মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। রোমান পূর্ববর্তী ইতালীয় জাতিসমূহ যেমন উম্ব্রিয়ান, ল্যাটিন (যারা রোমানদের কাছ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলো), ভোস্কি, সামনিট, চেলটিক এবং লিগুইররা ছিলো ইতালির উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা, অনেকে ছিলো ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রের; তবে মূল ঐতিহাসিক মানুষগুলো ছিলো উত্তরাধিকারসূত্রে ইস্ট্রুস্কান, ইলিত্মিময়ান ও সিসিলীয় সিকানী এবং প্রাক-ঐতিহাসিক সার্দিনিয়ান গোত্রের।

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তদশ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে মাইসেনিয়ান গ্রিকরা ইতালির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে গ্রিকরা সিসিলীয়ার উপকূলের পুরো জায়গা জুড়ে ও ইতালি উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে মানিয়া গ্রেয়েসিয়া নামে উপনিবেশিক বসতি গড়ে তোলে। এদের সাথে ফোনেসিয়ানরাও সারদিনিয়া ও সিসিলিয় উপকূলে বসতি নিবাস স্থাপন করে। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচীন রোমে একটি ক্ষুদ্র কৃষি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো। পুরো শতাব্দী জুড়ে মেডিটারিয়ান সাগর বেষ্টিত বিশাল সাম্রাজ্য, যেখানে আদি গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। এই সভ্যতার একটি অংশ বর্তমান আইন, প্রশাসন, দর্শন এবং কলার মধ্যেই টিকে আছে পশ্চিমীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হিসেবে।

এযুগে আল্পসের উত্তরে পার্বত্যাঞ্চল থেকে সর্বপ্রথম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর জনগণের আগমন ঘটে। পশুপালক ও পৃথিবী এই জনগোষ্ঠী ইতালিতে ঘোড়া ও ও দুই চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে আসে এরা ব্রোঞ্জ সংস্কৃতির ধারক ছিল পরে এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সময়কাল থেকে ইতালিতে লোহার ব্যবহার শুরু হতে থাকে। ধারণা করা হয় ইটালি ও রোমের জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ ছিল এই ইন্দো ইউরোপীয় জাতি। এট্রুসকান নামে পরিচিত জাতি ইতালির ইতিহাস গড়ে তুলেছিল।

এট্রুসকানরা কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেননি, টাইবার নদীর উত্তর ও দক্ষিণে এরা বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের শহর ছিল পাহাড়ের ওপর, তাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ়। শহরগুলি ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এক পাশে ছিল সমাধি ক্ষেত্র। এদের নিজস্ব বর্ণরীতি ছিল, তবে তাদের বেশি লিপি পাওয়া যায় না। রাজধানী ইত্তুরিয়াতে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল এদের সময়।

এদের শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক, অভিজাতরা রাজাকে সাহায্য করত। জনসাধারণের বেশীরভাগ মানুষ ছিলেন দাস বা ভূমিদাস। ইটালিতে বারোটি এট্রুসকান নগর জোটবদ্ধ হয়েছিল বলে জানা যায়। তারাই রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করে তাদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। পরে রোমের নেতৃত্বে ইটালীয় জাতিসমূহের উত্থানে এদের পতন ঘটে।

২.২ ঃ রোমান সভ্যতার বিকাশ

আমরা এই আলোচনার আরম্ভে সমৃদ্ধ রোমান সভ্যতার কথা বলেছি। বিশ্বসভ্যতায় এক বিস্ময়কর নাম

রোমান সভ্যতা। আমাদের মনে রাখতে হবে একটি বিশেষ সময়ের, অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী অবধি রোমান সভ্যতার নারীর জীবন পর্যালোচনা করা হয়েছে এই পর্যায়ে। রোমান সভ্যতা দুই অংশে বিভক্ত। (ক) রোমান রিপাবলিক ও (খ) রোমান সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৫০৯ সালে রোমান রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে রোমান রিপাবলিকের পত্তন হয় এবং টিকে ছিল সুদীর্ঘ ৪৮২ বছর। খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে রোমান রিপাবলিকের পতন হয় যখন রোমান সিনেটের পক্ষ থেকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম শাসক জুলিয়াস সিজারকে অপরিমেয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

রোমান সাম্রাজ্য প্রাচীন রোমান সভ্যতার একটি পর্যায় ছিল, সাম্রাজ্যটি একজন সম্রাটের নেতৃত্বে থাকা সরকারের দ্বারা পরিচালিত হত এবং রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন অঞ্চলসমূহ ভূমধ্যসাগরের চারিদিকে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রিঃপূঃ ১০০-৪০০ খ্রিঃ পর্যন্ত রোম পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম নগরী ছিল, এবং রোমান সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ৫০-৯০ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছিল (যা তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ২০% ছিল)। এর আগে গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে রোমে বিরাজমান ৫০০০ বছরের রোমান প্রজাতন্ত্রে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অস্থিরতার ঐ সময়ে জুলিয়াস সিজারকে স্থায়ী ডিক্টেটর বা ন্যায়পালিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। খ্রীঃ পূঃ ৪৪-তে তাকে কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করে। ফলস্বরূপ গৃহযুদ্ধ এবং হত্যালীলা অব্যাহত থাকে। সিজারের পোষ্য পুত্র অক্টাভিয়ান খ্রীঃ পূঃ ৩১-এ এক্টিয়ামের যুদ্ধে মার্ক এন্টনী এবং ক্লিয়পেট্রাকে পরাজিত করে। এরপর অক্টাভিয়ান অদমনীয় হয়ে উঠে এবং খ্রীঃ পূঃ ২৭-এ রোমান সিনেটে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অসীম ক্ষমতা দেয়ার সাথে অগাস্টাস উপাধি প্রদান করে যা রোমান সাম্রাজ্যের শুরুর একটি মাইফলক।

রোমান প্রজাতন্ত্র প্রায় ১৪০০ বছর ধরে প্রচলিত ছিল। এর প্রথম দুই শতক রাজনৈতিক সুস্থিরতা এবং সমৃদ্ধির কারণে এদের ''রোমান শান্তি''র যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অক্টেভিয়ানের বিজয়ের পর রোমান সাম্রাজ্যের পরিসর নাটকীয়ভাবে সম্প্রসারিত হয়। ৪১ সালে কেলিগুলার হত্যার পর সিনেটে পুনরায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রেইটোরিয়ান দেহরক্ষী বাহিনী ক্লডিয়াসকে সম্রাট ঘোষণা করে। ক্লডিয়াসের নেতৃত্বে রোমানরা ব্রিটানিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে। অক্টেভিয়ানের পর এটাই ছিল সর্ববৃহৎ রাজ্য বিস্তারের ঘটনা। ক্লডিয়াসের পরবর্তী সম্রাট নীরো ৬৮ সালে আত্মহত্যা করার পর পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হয়। গৃহযুদ্ধ এবং বিদ্রোহের (ইহুদী-রোমান যুদ্ধ) সময় চারজন সেনাধ্যক্ষকে সম্রাট ঘোষণা করা হয়। ৬৯ সালে ভেসপাসিয়ানে বিজয় লাভ করে এবং ফ্লেভিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। তার পুত্র পরবর্তী সম্রাট টাইটাস রোমের বিখ্যাত কলোসিয়াম নির্মাণ করেন। টাইটাসের অল্প সময়ের রাজত্বের পর তার ভাই ডমিটিয়ান রোমান সিংহাসনে আরোহণ করে এবং দীর্ঘকাল রাজত্বের পর হত্যার বলি হয়। এরপর সিনেট পাঁচজন সম্রাটকে বাছাই করে। এর দ্বিতীয় সম্রাট ট্রাজানের শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়।

কমডাসের রাজত্বকালে অস্থিরতা আর পতনোন্মুখ গতি পুনরায় আরম্ভ হয় এবং ১৯২ সালে তাকে হত্যা করা হয়, পঞ্চম সম্রাটের শাসনামলে। এরপর সেপ্টিমাস সেভেরাস সম্রাট হয়। ২৩৫ সালে আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের হত্যার পর রোমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং রোমান সিনেটে মাত্র ৫০ বছরের ভিতরে ২ জন লোককে সম্রাট ঘোষণা করে। ডিয়ক্লেটিয়ানের শাসনকালে দেশ চার ভাগে ভাগ করে

প্রত্যেকটি অংশে একজন নির্দিষ্ট শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় যার ফলস্বরূপ দেশে পুনরায় সুস্থিরতা আসলেও প্রথম কনস্টেন্টাইন-এর শাসনকালে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে এর অবসান ঘটে, এবং সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে তিনি একছত্র সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। কনস্টেন্টাইন রোমান রাজধানী বাইজেন্টাইনে স্থানান্তর করেন এবং তার সম্মানার্থে কনস্টান্টিনোপল হিসেবে জায়গাটির নতুন নামাকরণ করা হয়। নগরীর পতনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এটি ছিল প্রাচ্যের রাজধানী। তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এটা গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল (বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য) বিশ্বের এক অগ্রণী শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। সংযুক্ত রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট প্রথম থিয়ডসিয়াসের মৃত্যুর পর ক্ষমতার অপব্যবহার, গৃহযুদ্ধ, বহিরাগত আগ্রাসন, অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ইত্যাদি কারণে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য ক্রমশ হ্রাস পায় বলে মনে করা হয়।

২.৩ ঃ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক

অভিজাত শ্রেণীর হাতে অধিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হওয়ায় রোমে জনগণ কর্তৃক আন্দোলন শুরু হয় এসময় রোমের জনসাধারণ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদের বংশধর ভূস্বামী ও অভিজাতরা ছিল প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীভুক্ত। এরা একচেটিয়াভবে সিনেটের সদস্য পদ দখল করেছিল অপরদিকে ক্ষুদ্র কৃষক ও বণিকদের সমন্বয়ে সাধারণ নাগরিকরা ছিল প্লেবিয়ান শ্রেণীভুক্ত। এরা প্যাট্রিসিয়ানদের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্লেবিয়ানরা এদের রাজনৈতিক সমর্থন দান করতো, প্লেবিয়ানরা প্যাট্রিসিয়ানদের খামারে কাজ করত। এদের এদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। সাধারণত এসেম্বলীর সদস্যভুক্তি ছাড়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের আর কোন ভূমিকা ছিল না। প্লেবিয়ানরা শোষিত হতেন। প্যাট্রিসিয়ানদের পক্ষে সহজ ছিল তাদের শোষণ করা। ঋণীগ্রহীতাকে দাস হিসেবে বিক্রি করার অনুমতি ছিল। অত্যাচারিত প্লেবিয়ানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

প্যাট্রিসিয়ানরা চাপের মুখে কিছু অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। 450 খ্রিষ্টবূর্বাব্দে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। প্লেবিয়ানরা সিনেটে তাদের 10 জন প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার লাভ করে। এরা ম্যাজিস্ট্রেট নামে পরিচিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন সিদ্ধান্তের উপর ভেটো প্রয়োগ করতে পারত বলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ বিরোধী সিদ্ধান্তের উপর ভেটো প্রয়োগ করা হতে থাকে। সাধারণ জনগণের সভা অ্যাসেম্বলি আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করে। প্লেবিয়ানদের আন্দোলনে অপর একটি সাফল্য ছিল রোমান আইনের সংকলন। এতদিন মুখে মুখে প্রচলিত আইনকে ধারাবাহিকভাবে সংকলিত করার ব্যবস্থা নেন রোমান সম্রাট। 12টি ব্রোঞ্জের পাতে এই আইন লিখিত হয়। হেবিয়াস কর্পাস নামে পরিচিত এই আইন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সাধারণ মানুষের অন্তিম বিজয় হয়েছিল নিজের শ্রেণী থেকে নির্বাচন করার অধিকার প্রাপ্তি। এছাড়াও উচ্চপদে নিয়োগ কার্যকর হয়। এভাবে রোমান প্রজাতন্ত্রে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমে কমে আসে। খ্রিঃ পূঃ 390 অব্দের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থা উন্নত হয় ফলে সরকারি কাজে সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করতে থাকে এভাবে ধীরে ধীরে অভিজাত রোমান প্রজাতন্ত্র একটি গণতান্ত্রিক চরিত্র লাভ করে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় রোমান প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য প্রতিবেশীর অধিকার খর্ব করে নাই।

৩ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আইন (Unit-12)

৩.১ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি

প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের লোকেদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল, তেমনই তারা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করত। যদিও রোমীয়দের কাছে ইহুদি ধর্মকে হয়তো অদ্ভুত বলে মনে হতো, কিন্তু তারা এটাকে রিলিজিও লিকিটা অর্থাৎ এক স্বীকৃত ধর্ম বলে বিবেচনা করত আর তাই এটাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

বিভিন্ন ধরনের পৌত্তলিক উপাসনা, স্থানীয় ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে প্রচলিত ছিল। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল আর ভবিষ্যৎবাণী জনপ্রিয় ছিল। প্রাচ্যের তথাকথিত রহস্যজনক ধর্মগুলো ভক্তদেরকে অমরত্ব প্রদানের, সরাসরি দর্শন দানের এবং রহস্যময় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলত। এই ধর্মগুলো সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। প্রথমদিকে মিশরীয় দেবতা সেরাপিস ও দেবী আইসিস, অরামীয় মৎস্যদেবী আটারগাটিস এবং পারসিক সূর্য দেবতা মিত্র উপাসনাকারী ধর্মীয় দলগুলো রোমে জনপ্রিয় ছিল।

বাইবেলের প্রেরিত বইটি প্রাথমিক খ্রিষ্ট ধর্ম ধর্ম ছাড়াও চারিদিকে বিদ্যমান পৌত্তলিক পরিবেশ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ, কুপ্রের (সাইপ্রাসের) রোমীয় দেশাধ্যক্ষের সঙ্গে একজন ইহুদীর যোগাযোগ ছিল। লুস্ত্রার স্থানীয় লোকেরা পল এবং বার্ণবাকে ভুলবশত ভুলবশত গ্রিক দেবতা মারকুরি (হার্মিস) ও জুপিটার (জিউস) বলে মনে করেছিল। ফিলিপীতে থাকাকালীন পল এক দাসীর মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা ছিল বা ভবিষ্যৎ বলত। আথীনীতে (এথেন্সে) প্রেরিত উল্লেখ করেছিলেন যে, এর অধিবাসীরা ''বড়ই দেবতাভক্ত।'' এছাড়, সেই নগরে তিনি একটা বেদিও দেখেছিলেন, যেটার ওপরে লেখা ছিল, ''অপরিচিত দেবের উদ্দেশে।'' ইফিষের অধিবাসীরা দীয়ানা (আর্টিমিস) দেবীর উপাসনা করত। মিলিতা দ্বীপে লোকেরা বলেছিল যে, পল ছিলেন একজন দেবতা কারণ সাপের কামড়ে তার কিছুই হয়নি। এই ধরনের পরিবেশে, খ্রিষ্টানদের সেই প্রভাবগুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকার প্রয়োজন ছিল, যেগুলো তাদের বিশুদ্ধ উপাসনাকে কলুষিত করতে পারত।

রোমীয় ধর্ম ঃ তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রোমীয়রা এই নতুন দেবদেবীদের গ্রহণ করে নিয়েছিল কারণ তারা মনে করেছিল যে, তাদের দেবদেবীরাই ভিন্ন রূপে অন্যত্র বিদ্যমান। বিদেশি ধর্মীয় দলগুলোকে নির্মূল করার পরিবর্তে, রোমীয় বিজয়ীারা সেগুলো গ্রহণ করে নিয়েছিল। যার ফলে সাংস্কৃতিক একীকরণ সম্ভবপর হয়ে ছিল। এভাবে রোমের ধর্ম এর বিভিন্ন সংস্কৃতির জনসংখ্যার মতোই বিবিধ হয়ে উঠেছিল। রোমানরা একই সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করতে পারত।

রোমের আদি দেবদেবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল জুপিটার, যাকে অপ্টিমাস ম্যাক্সিমাস বলা হতো, যে-অভিব্যক্তিটির অর্থ হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বমহান। তিনি নিজেকে বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতেন বলে মনে করা হতো। জুপিটারের বোন ও স্ত্রী জুনো, যিনি চাঁদের দেবী ছিলেন তিনি নারীদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নজর রাখতেন বলে কথিত ছিল। জুপিটারের কন্যা মিনার্ভা ছিলেন বিভিন্ন হস্তশিল্প, বৃত্তি, কলা ও যুদ্ধের দেবী।

রোমীয়রা বহু সংখ্যক দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। ল্যারেস এবং পিনাটেস ছিল পরিবারের দেবতা। ভেস্তা ছিলেন চুল্লির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুই মুখবিশিষ্ট জেনাস ছিলেন সমস্ত কিছুর আরম্ভের দেবতা। প্রতিটা পেশার নিজ নিজ রক্ষক দেবতা বা দেবী ছিল। রোমীয়রা এমনকী বিশ্বাস করত যে, বিভিন্ন ধারণা, মতবাদ ও গুণাবলির জন্যও দেবদেবী রয়েছে। প্যাক্স (শান্তি), স্যালুস (স্বাস্থ্য), পুডিকিটিয়া (বিনয় ও সতীত্ব), ফিডেস (বিশ্বস্ততা), ভারটুস (সাহস) এবং ভলুপ্টাস (আনন্দকে) রক্ষা করত। রোমীয়দের প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটা কাজ দেবতাদের ইচ্ছাতেই সম্পাদিত হয় বলে বিশ্বাস ছিল। তাই, কোনো কাজে এক অনুকূল ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য রীতিগত প্রার্থনা, বলিদান এবং উৎসবের মাধ্যমে উপযুক্ত দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চল ছিল।

দেবদেবীদের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার একটা উপায় ছিল, শুভ-অশুভ লক্ষণ খোঁজা। এই অভ্যাসগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, বলিকৃত পশুর অন্ত্র পরীক্ষা করা। এইরকম মনে করা হতো, এই অঙ্গগুলোর অবস্থা ও বাহ্যিক রূপ ইঙ্গিত করে যে, দেবদেবীরা তাদের কাজকে অনুমোদন করেছিল নাকি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে, রোমীয়রা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, তাদের প্রধান দেবদেবীরা ও গ্রিকদের নির্দিষ্ট কিছু দেবদেবী একই ছিল—জুপিটারই ছিলেন জিউস, জুনোই ছিলেন হেরা ও এইরকম আরও অন্যান্য দেবদেবী। এছাড়া, রোমীয়রা গ্রীকদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোকেও গ্রহণ করেছিল। এই কাহিনীগুলো কোনোভাবেই দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করত না, যাদের মানুষের মতো একইরকম দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা উপস্থাপিত করা হয়েছিলও।

সম্রাট উপাসনা ঃ অগাস্টাসের শাসনকালে (খ্রিঃ পূঃ ২৭ থেকে খ্রিঃ পূঃ ১৪ সাল পর্যন্ত) সম্রাট উপাসনা শুরু হয়। বিশেষ করে প্রাচ্যের গ্রিকভাষী প্রদেশগুলোতে, অনেকেই অগাস্টাসের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল, যিনি দীর্ঘদিনব্যাপী যুদ্ধের পর শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনগণ এমন একজন কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থায়ী সুরক্ষা পেতে চেয়েছিল, যাকে তারা সম্মান করত। তারা এমন একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চেয়েছিল, যা ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করতে, দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে এবং সেটার ''পরিত্রাতার'' অধীনে বিশ্বকে একতাবদ্ধ করতে পারবে। ফল স্বরূপ, সম্রাটকে একজন দেবতা হিসেবে দেখা হতে শুরু হয়।

যদিও অগাস্টাস জীবিত থাকাকালীন তাকে একজন দেবতা বলে ডাকতে অনুমতি দেননি কিন্তু তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রোমের মূর্ত প্রতীক হিসেবে এক দেবী—রোমা দিয়াকে—যেন উপাসনা করা হয়। অগাস্টাসের মৃত্যুর পর তাকে একজন দেবতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এভাবে এই প্রদেশগুলোতে রোম ও সেইসঙ্গে এর শাসকদের প্রতি উপাসনা প্রদান করা ও দেশপ্রেম দেখানো হয়েছিল। এই নতুন সম্রাট উপাসনা, যা শীঘ্র সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশের এক উপায় হয়ে উঠেছিল।

ডমিশিয়ান, যিনি খ্রিঃ ৮১ থেকে খ্রিঃ ৯৬ সাল পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন, তিনিই ছিলেন প্রথম রোমীয় শাসক, যিনি দেবতা হিসেবে উপাসনা পেতে চেয়েছিলেন। তার সময়েই, রোমানরা ইহুদিদের থেকে খ্রিস্টানদের আলাদা করেছিল এবং তাদেরকে একটা নতুন ধর্মীয় দল হিসেবে মনে করে তাদের বিরোধিতা করেছিল। সম্ভবত ডমিশিয়ানের শাসনকালেই, প্রেরিত জনকে ''যীশুর সাক্ষ্য'' প্রযুক্ত পাট্‌ম দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য বইটি জন এর নির্বাসনে থাকাকালীন লেখা হয়েছিল। এই বইয়ে তিনি আন্তিপার এর বিষয়ে উল্লেখ করেন, যিনি সম্রাট উপাসনার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পর্গামে নিহত হয়েছিলেন। সেই সময়েই হয়তো সম্রাট-শাসিত সরকার এইরকম বিষয় চালু করেছিল, যেন খ্রিষ্টানরা রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান পালন করে। এটা হোক বা না হোক, এই আলোচনার শুরুতে উল্লেখিত ট্র্যাজেনের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছিল, খ্রিঃ ১১২ সালের মধ্যে প্লিনি দাবি করেছিলেন, যেন বিথুনিয়ার খ্রিষ্টানরা এই ধরনের আচারঅনুষ্ঠান পালন করে।

তার কাছে আনা বিষয়গুলোকে প্লিনি যেভাবে মীমাংসা করেছিলেন, সেইজন্য ট্র্যাজেন প্লিনির প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে-খ্রিষ্টানরা রোমীয় দেবদেবীদের উপাসনা করতে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ''কিন্তু'', ট্র্যাজেন লিখেছিলেন, ''একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে খ্রিস্টান বলে অস্বীকার করেন এবং আমাদের দেবদেবীর কাছে মিনতি করার দ্বারা প্রমাণ দেন যে, তিনি একজন খ্রিষ্টান নন, তখন তার অনুতাপের জন্য যেন তাকে (পূর্বের যেকোনো সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও) ক্ষমা করে দেওয়া হয়?''

রোমীয়রা এমন কোনো ধর্মের কথা কল্পনাই করতে পারত না, যে-ধর্ম এর অনুসারীদের কাছ থেকে একাগ্র ভক্তি চায়। রোমের দেবদেবীরা এইরকম একাগ্র ভক্তি দাবি করেনি, এইরকম মনে করা হতো যে, রাষ্ট্রীয় দেবদেবীর উপাসনা করা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত করত। তাই, তাদেরকে উপাসনা করতে অস্বীকার করা দেশদ্রোহিতা বলে বিবেচনা করা হতো। প্লিনি যেমন বুঝতে পেরেছিলেন, অধিকাংশ খ্রিস্টানকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছু করানোর কোনো উপায়ই ছিল না। অসংখ্য প্রাথমিক খ্রিস্টান প্রতিমাপূজারূপ সম্রাট উপাসনার পরিবর্তে বরং মৃত্যুবরণ করাকে বেছে নিয়েছিল।

৩.২ ঃ রোমান আইন

রোমান সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রোমান আইন ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বড় অবদান হিসেবে দেখা হয়। সিনেটের সদস্যগণের সম্মতিক্রমে প্রণীত আইনগুলো রোমান সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। রোমানদের আইনব্যবস্থায় গ্রিক আইনের কিছুটা অবদান রয়েছে। গ্রিকদের ন্যায় রোমে বিশ্বাস করা হতো, আইন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ নিজের অধিকার রক্ষা করার সুযোগ পাবে। রোমানদের আইনগুলো লিখিতরূপে সংরক্ষিত থাকতো। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে সর্বপ্রথম লিখিত রোমান আইন প্রচলিত হয়। ইতিহাসের পাতায় Twelve Tables বা বারো টেবিল নামে পরিচিত সেই আইনের মাধ্যমে রোমে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

প্রায় বারোটি ধাপে রোমের সকল নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রণীত সেই বারো টেবিল আইনটি আজও ইতিহাসবিদ্‌গণের নিকট এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু শুরুর দিকে রোমানদের আইনগুলো কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল রাজ্যজুড়ে। ফলে সঠিকভাবে আইন প্রণয়ন সম্ভব হতো না।

৫৩৪ সালে সম্রাট জাস্তিনিয়ান সর্বপ্রথম রোমান সাম্রাজ্যের সকল আইন একীভূত করার প্রকল্প হাতে নেন। বর্তমান পশ্চিমী আইনে রোমানদের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তা মূলত সম্রাট জাস্তিনিয়ানের পদক্ষেপের

ভবিষ্যৎ ফসল হিসেবে গণ্য হয়। রোমের আইনের ক্ষমতাবলে কোনো নাগরিক সরাসরি রোমের রাজদরবারে ফরিয়াদ জানাতে পারতো। নাগরিক ব্যতীত সাধারণ জনগণের জন্য অবশ্য সেই সুযোগ ছিল না। তাদের ভরসার পাত্র হিসেবে থাকতেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ। কিন্তু মাঝে মাঝে আইনের কোপানলে পড়েই অত্যাচারিত হতো সাধারণ জনতা। অত্যাচারী শাসকগণ নিজেদের সুবিধামতো আইন প্রণয়ন করতেন। যেমন—সম্রাট ইচ্ছে করলেই কাউকে হত্যা করতে পারবেন। এজন্য তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। এর ফলে ভুক্তভোগী হতো রোমের শ্রমজীবী জনতা।

৭৫৪ খ্রিস্টপূর্বের আগে রোমে স্বেচ্ছাচারীদের দাপট বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ করা হত। বিশৃঙ্খল রোমে ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য তখন রোমান পণ্ডিতগণ বারো টেবিলের আইনের সূত্রপাত করেন। সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত একটি বিশেষ কমিশনের তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম দশ ধারার আইন প্রস্তুত করা হয়। ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বে তখন দ্বিতীয় আইন বিষয়ক কমিশন গঠিত হলে আরো দুটি টেবিল যোগ করে মোট ১২ ধারার আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম শ্রমজীবী জনতার জন্য কিছু অধিকার এবং প্রয়োজনে বিচারের ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। বারো টেবিল আইনকে রোমান আইনি ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর রূপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এই আইন প্রণয়নের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল রোমের সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য। রোমের অভিজাত শ্রেণীর নাগরিক ব্যতীত অন্য কেউ যোগ্যতা থাকলেও ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা এর সমতুল্য পদে আসীন হতে পারতো না। তাই অবদমিত শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহ করার হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু রোমের রাজনৈতিক কাঠামোতে সেই নেতাদের অবদান ছিল অনেক। তাই সম্রাট সিদ্ধান্ত নিলেন, সবার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে যেমন সমাজের সাধারণ নেতৃত্ব এবং জনগণের অধিকার বাস্তবায়িত হলো, তেমনি অভিজাত শ্রেণীর সাথে বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর হল।

বারো টেবিল আইন তৈরি করার পূর্বে রোমের দশজন বিশেষজ্ঞ গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে পরিভ্রমণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে তারা গ্রিসের বিভিন্ন আইন, অনুশাসন ও প্রথা নিয়ে অনুসন্ধান করেন। গ্রিক সাম্রাজ্যের বর্তমান দক্ষিণ ইতালি অঞ্চলের বিভিন্ন আইনের অনুকরণে তৈরি হয় বারো টেবিল আইন।

রোমকে প্রথম পেশাজীবী আইনজীবীদের জন্মস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। নতুন আইন ব্যবস্থা প্রণীত হলে এরা জনগণের নিকট সহজ ভাষায় তা উপস্থাপন করত। প্রাচীন গ্রিসে কিছু মানুষ আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য হতো, এরা আসামীদের আইনের বিভিন্ন নিয়ম শিখিয়ে দিতেন। বিচারকার্যে তারে আর কোনো ভূমিকা ছিল না। আসামীর নিজে থেকেই মামলায় লড়াই করতে হতো।

কিন্তু রোম গ্রিক সাম্রাজ্যে এই চমৎকার কৌশলকে আরো একধাপ এগিয়ে নিলো। রোমের আসামীরা নিজেদের হয়ে মামলা লড়তে পারতেন না। বরং আইন শিখিয়ে দেয়া মানুষগুলোই আসামীর হয়ে মামলা লড়তে পারতো। এভাবে শুরু হয় ওকালতি নামক একটি পেশা। উকিলদের অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের উপর ভিত্তি করে অ্যাডভোকেট, কসিদিসি (Causidici), জুরিস প্রুদেন্ত প্রভৃতি পদবী চালু হয়। আইনজীবীরা রোমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকে। ফলে খুব দ্রুত পেশাটি সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিছুদিন পর উকিলরা চড়ামূল্যের বেতন নেওয়া শুরু করলেন। এর মাধ্যমে রোমানদের অনেকেই আইনজীবীদের উপর থেকে ভরসা হারিয়ে

ফেলেন। প্রাচীন রোমে যেকোনো মামলা দুই ভাগে পরিচালিত হতো। প্রথমে সিনেটের সামনে আসামী এবং তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো একসাথে বলা হতো। তখন একজন ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত নিতেন মামলা পরিচালনা করবেন কি না।

মামলা চলাকালীন সময়ে যদি কোনোপক্ষ কোনো ভুল শব্দ উচ্চারণ করে কিংবা নিয়ম ভঙ্গ করে, সেক্ষেত্রে মামলার রায় তার বিরুদ্ধে যেত। মামলায় শুনানি এবং উকিলদের আক্রমণ, যুক্তি খণ্ডন শেষে বিচারপতি হিসেবে বিবেচনা অনুসারে একজন সিনেটর মামলায় দণ্ড প্রদান করতেন।

প্রাচীন রোমে প্রতিটি নাগরিকের পদমর্যাদা অনুযায়ী আইন ভিন্ন হতে। সাম্রাজ্যের নীতি অনুযায়ী একজন রোমান হয় নাগরিক, না হয় মুক্ত মানুষ হিসেবে সমাজে বাস করে। এমনকি পরিবার প্রধান কিংবা সদস্যদের জন্যেও ভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। রোমান জনপ্রশাসন আইন অনুযায়ী শুধু একজন রোমান নাগরিকই পারবেন সাম্রাজ্যের সকল সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, প্রাচীনকালে সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হতো না। এখন যেমন জন্মগতভাবে যে কেউ একটি দেশের নাগরিক হতে পারে, পূর্বে সে নিয়ম প্রচলিত ছিল না। নাগরিকরা পদমর্যাদা অনুযায়ী সিভিস, ল্যাতিনি, পেরেগ্রিনি ইত্যাদি পদবীর অধিকারী ছিলেন। বিদেশিদের জন্য রোমান সাম্রাজ্য কোনো বিশেষ সুবিধ প্রদান করতে বাধ্য ছিল না। রোমানরা সাম্রাজ্যের বাইরের যেকোনো ব্যক্তিকে 'বর্বর' হিসেবে অভিহিত করতে পারত। তাছাড়া সমাজে আরেক শ্রেণীভুক্ত মানুষ ছিল, যাদের জন্য বলতে গেলে কোনো আইন ছিল না। এরা হচ্ছে দাস শ্রেণীভুক্ত মানুষ। তবে আইন প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ দাসদের নিয়ে আনি রাখার কথা কল্পনাও করেনি।

রোমানদের সবচেয়ে ভয়ানক শাস্তি ছিল ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা। রোমান শাসকগণ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহী কিংবা দস্যুদের ক্রুশবিদ্ধ করতো। খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টকেও এরা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল বলে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাস করেন। একবার ক্রুশবিদ্ধ করা হলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দোষীকে ঝুলিয়ে রাখর বিধান ছিল। মৃত্যুর পর রোমের ক্ষুধার্ত শকুন এসে বসতো মৃতদেহের গায়ে। কখনো কখনো মরার পূর্বেই শকুনের আক্রমণে চোখ হারাতো দোষীরা। এমন পাশবিক উপায়ে শাস্তি দেওয়ার কারণে রোমান বিচারকদের কুখ্যাতি ছিল। তাছাড়া রোমে সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী সজার পরিমাণ কম বেশি করা হত। দাসরা কোনো অপরাধ করলে তাদের প্রহার করার বিধান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে দাসদের মাথায় জ্বলন্ত লোহা দ্বারা বিভিন্ন চিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো।

রোমান নাগরিকদের সাধারণত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো না। তবে দেশদ্রোহী নাগরিকের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সাধারণত নাগরিকদের ক্রুশবিদ্ধ করার রীতি প্রচলিত ছিল না। নাগরিকদের জরিমানা করার বিধান ছিল। চুরির অপরাধে দোষী যেকোনো ব্যক্তি তার সামাজিক পদমর্যাদা হারাতো। এমনকি তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি সম্রাটের আজ্ঞায় বাজেয়াপ্ত করা হতো। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অপরাধীকে নির্বাসনে পাঠানো হতে পারত। কোনো ব্যক্তি যদি অপর আরেক ব্যক্তির সম্পত্তির কোনোপ্রকার ক্ষতিসাধন করে, সেক্ষেত্রে তাকে সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হতো।

প্রাচীন রোমান শাসন নীতি এবং বারো টেবিল আইন বাতিল হয়ে গিয়েছে আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে। হয়তো বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিচার করলে রোমান আইনসমূহকে বেশ বর্বর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু

প্রাচীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন আইনগুলো যুগের আবর্তে পরমার্জিত হয়ে তা আধুনিক যুগের আইনে পরিণত হয়েছে। রোমান আইন ছিল যাত্রার শুরু। ধীরে ধীরে আইনের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ অধকার ফিরে পাচ্ছে। একদিন হয়তো পৃথিবীজুড়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এর জন্য প্রাচীন রোমান আইনের পরোক্ষ ভূমিকা কখনোই অস্বীকার করা যাবে না।

তথ্যসূত্র ঃ hppts://roar.media/bangla/main/history/roman-court-how-was-ancient-roman-laws-and-order/

৪ ঃ রোমান দাসপ্রথা ও নারীদের অবস্থান, গ্ল্যাডিয়েটর (Unit-13)

৪.১ ঃ রোমান দাসপ্রথা

রোমান সমাজে সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত ছিল দাস সমাজ। তাদের কোনো সামাজিক অধিকার ছিল না। এদের অধিকাংশ সময় কায়িক পরিশ্রম কাজ করান হত। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে মনে করা হয় যে, রোমানরা তাদের বিজিত রাজ্যগুলি থেকে পরাজিত যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে ব্যবহার করতেন। কার্থেজ থেকে অনেক কার্থেজের নাগরিক, ভাগ্যের পরিহাসে রোমান দাসে পর্যবসিত হল। এদের রোমান মালিক ক্রয় বিক্রয় করতে পারতেন। এমনকী গবাদি পশুর ন্যায় এই মানুষদের বাজারে কেনা বেচা চলত। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে এদের দাম অনুসারে বিক্রয় করা হত। যুদ্ধবন্দি ছাড়াও কোন মানুষ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় নিজ স্ত্রী-সন্তানদের এমনকি নিজেকে কারও নিকট বিক্রয় করতেন, তবে স্বাধীনভাবে জন্মালেও তারা ক্রীতদাস হয়ে যেতেন।

আবার কোন ক্রীতদাস প্রভুর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলে মুক্ত হতে পারতেন। তবে সেরকম ভাগ্যবান খুবই কম দাস হতে পেরেছিলেন। দাসদের হত্য করলে মালিকদের সেভাবে বিরাট শাস্তি পেতে হত না। কিন্তু এর বিপরীত হলে দাসদের দেওয় হত মৃত্যুদণ্ড। তখন দাসরে প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হতো। সধারণ মানুষ হত্যার চেয়ে দাস হত্যায় নাম মাত্র জরিমান ধার্য করা হয়েছিল। রোমান আইনে দাসদের ব্যক্তিস্বত্ত্বাকে অস্বীকার করা হয়। আইনানুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে দাসদের বস্তু হিসেবে গণ্য করা হতো।

৪.২ ঃ নারীদের অবস্থান

রোমান সভ্যতার নারীদের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য নেই। কেননা, তৎকালীন রোমান সমাজটি পুরুষতান্ত্রিক ছিল আর তখনকার দিনে নারীদের সম্পর্কে অধিক বিবরণ লিখিত হত না। সুতরাং বৃহৎ রোমান সাম্রাজ্যের নারীদের জীবনের তথ্যাদি সুলভ নয়। এসব কারণে প্রাচীন রোমের নারীদের জীবন সম্পর্কে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। তবে সে অনুমান অযৌক্তিক নয়। বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়েই করা। রাজনৈতিক বিষয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত, অভ্যুত্থান, দাসপ্রথা ও বিবাহ সম্পর্কে মেয়েরা কি ভাবত–সে ব্যাপারে জানার উপায় নেই। রোমান সভ্যতায় মেয়েদের নিজেদের ওপর ও সন্তানের ওপর আইনগত অধিকার ছিল না—এ বিষয়েও তারা কি ভাবত সে ব্যাপারে জানার উপায় নেই।

অভিজাত রোমান নারীর নিজের ওপর সন্তানের ওপর অধিকার না-থাকলেও নাগরিক বলে গণ্য হত। তৎকালীন রোমান সমাজে শিক্ষার অধিকার ছিল কেবল অভিজাত শ্রেণির পুরুষদের। তারা তাদের অবসর সময়ে

নিজস্ব অভিজ্ঞতাই লিখত। মেয়েদের প্রসঙ্গ এলে আত্মীয়স্বজনের কথা লিখত—যারা ছিল রোমান অভিজাত শ্রেণির। বলাবাহুল্য অভিজাত নারীরা রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র অংশ এবং অল্পবিস্তার হলেও এদের সম্বন্ধেই তথ্য পাওয়া যায়। দরিদ্র রোমান নারীদের সম্বন্ধে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। পাওয়া যাওয়ার কথাও না। তবে অভিজাত ও দরিদ্র মেয়েদের ভূমিকা একই—সন্তান ধারণ। রোম নগরের অভিজাত মেয়েরা ছিল কার্যত বন্দি। রোমান সমাজের অভিজাত মেয়েদের বিবাহ হত ১২ বছর বয়সে। কখনও কখনও আর কম বয়েসে।

তৎকালে রোমানদের গড় আয়ু ছিল অল্প, কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে। একজন রোমান নারীর জীবনধারা ছিল এরকম ঃ বিবাহ হত কম বয়েসে, মৃত্যু হত সন্তান জন্ম দানের সময় অথবা অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার সময়। ভেতুরিনা নামে এক নারীর সমাধিলিপিতে লেখা আছে ঃ ভেতুরিনার ১১ বছর বয়েসে বিবাহ হয়েছিল; সে ছিল ৬ সন্তানের জননী এবং তার মৃত্যু হয়েছিল ২৭ বছর বয়েসে। আয়ুর স্বল্পতার কারণে ক'জন শিশু বড় হবে বেঁচে থাকবে এটি নিশ্চিত ছিল না বলেই নারীকে গর্ভবতী হয়েই থাকতে হত। কর্লেনিয়া নাম এক অভিজাত রাজমাতার ছিল ১২টি সন্তান। অবশ্য মাত্র দুটি ছেলে ও এক মেয়ে বেঁচে ছিল কর্লেনিয়ার।

অভিজাত পরিবারগুলি পুত্রসন্তান আশা করত। কারণ পুত্রসন্তানই বংশের বংশের নাম ও ধারা বজায় রাখতে পারে। রোমান পুরুষেরা চাইত তাদের স্ত্রীরা যেন গর্ভধারণে বিরতি না দেয়। অবশ্য অভাবের কারণে দরিদ্র শ্রেণির নারীর অধিক সন্তান কাম্য ছিল না। পরিবারের ভরণপোষণ করতে গিয়ে অধিক আয় করতে হত। এ কারণে দরিদ্রশ্রেণির রোমান মেয়েদের বাইরে কাজ করতে হত। পরিবারটির বাস গ্রাম হলে চাষাবাদের সাহায্যের জন্য পুত্রসন্তানই ছিল কাম্য, মেয়েরা তো ঐ কাজে দুর্বল! এইপরও রোমান সমাজের অভিজাত সমাজের সঙ্গে নিম্নবর্গের নারী তফাৎ ছিল। অভিজাত সমাজের নারীদের সন্তান ছিল বেশি।

বন্ধ্যাত্ব ছিল বিবাহবিচ্ছেদের অনিবার্য কারণ। তবে সে কারণ ঘটনা ঘটলে মেয়েরাই বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করত যাতে তাদের স্বামী অন্য কারও মাধ্যমে পিতৃত্বের অধিকার অর্জন করতে পারে। সন্তানের জন্ম দেবে কি দেবে না এ বিষয়ে রোমান অভিজাত নারীদের কোনও ভূমিকা ছিল না। স্বামী নবজাতককে (এই ক্ষেত্রে যদি নবজাতকটি কন্যাশিশু হয়) লালনপালন করতে না চাইলে স্ত্রীর সে বিষয়ে বলার কিছু ছিল না। কারণ, তৎকালে সন্তানের ওপর রোমান নারীর আইনগত অধিকার ছিল না। বিয়ের সময় যৌতুক দিতে হবে আবার বংশও রক্ষা করবে না এই অজুহাতে শিশুকন্যাকে হত্যা করা হত। এ কারণে রোমের জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। এই রকম পরিস্থিতিকে রোমান সম্রাট অগাস্টাস উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আইন করে অবিবাহিত থাকাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিবাহ ও অধিক সন্তানের জন্মদানকে উৎসাহ দেওয়া হল।

গ্রিসের নারীদের তুলনায় রোমান নারীদের অবস্থান ছিল উন্নত। গ্রিসের নারীরা নাগরিক ছিল না। রোমের নারীরা নাগরিক ছিল না এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মেয়েদের পুরুষের অধীন বন্দি করে রাখার নানান প্রথা ছিল রোমান সমাজে। রোমান মেয়েদের নিজস্ব নাম থাকত না। তারা পিতা নামের মধ্যাংশ ব্যবহার করত। তবে সেটিকে স্ত্রীবাচক করে নিতে হত। মেয়েদের নাম শুনেই বোঝা যেত মেয়েটির পিতা কে এবং কী তার সামাজিক মর্যাদা। মেয়েরা পরিবারেই ভিতরেই থাকত এবং তার আলাদা কোনও পরিচয় ছিল না।

মেয়ের ওপর পিতা ছিল নিরুঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ, পিতা ইচ্ছে করলে মেয়েকে দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারত

কিংবা মেয়ের বিবাহবিচ্ছেদ কার্যকর করতে পারত। সন্তান থাকলেও সেই সন্তানকে ফেলে আসতে হত। সন্তানের ওপর রোমান নারীর বৈধ অধিকার ছিল না কখনও ওদের দেখতেও পেত না। বিবাহের সময় কন্যাদের সম্পদের ওপর অধিকার ছিল পিতার, অর্থাৎ মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তি শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে পারত না। পুরুষের অধীনে নারীদের বন্দি করে রাখার নানা প্রথা মিছল রোমান সমাজে।

তবে, অভিজাত রোমান নারীরা সন্তানের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। শিশুদের রোমান সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নারীদের উৎসাহ দেওয়া হত। শিশুকন্যাদেরও শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল; কেননা তারাও পরবর্তীকালে সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবে। পুত্রসন্তান বড় হলে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এজন্য মায়েরা তাদের ছেলেদের জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করত। তবে 'ওপিয়ান ল' নামে একটি আইন হয়েছিল। যে আইন অনুযায়ী মেয়েরা ভোগ্যপণ্য—যেমন অলঙ্কার কিনতে পারত না। এর কারণ ছিল যুদ্ধের ব্যয় মেটানো। অবশ্য ১৯৫ খ্রিষ্টপূর্বে অর্থাৎ আইনটি প্রণয়নের ২০ বছর পর তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৫ খ্রিস্টপূর্বের পর অধিবেশন চলাকালে রোমান নারীদের রোমান ফোরামে দেখা গেল। এমন কী নির্বাচনের আগে ভোট দেওয়ার জন্য আত্মীয়দের পক্ষে প্রচার চালায়।

তা সত্ত্বেও রোমান মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। তাদের গতিবিধির ওপর বাবা কিংবা পুরুষ আত্মীয় কিংবা স্বামী নজর রাখত। রোমান সমাজে মেয়েদের মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। মদ্যপানের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। রোমান পুরুষরা মনে করত মদ মেয়েদের পরকীয়ায় উৎসাহিত করবে। তবে রোমান সমাজের অভিজাত স্তরে পরকীয়ার ঘটনা ঘটত। কেননা, বিবাহগুলি হত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশে, সেখানে প্রেম বলে কিছু ছিল না। রোমান নারীদের কখনও অনেক অধিক বেশি বয়সের লোকের সঙ্গে বিবাহ হত। আসলে যার সঙ্গে বিবাহ ঠিক করা হত একজন রোমান নারীকে তাকেই বিবাহ করতে হত।

পরকীয়া জানাজানি হলে পুরুষকে কিছু না বললেও নারীটিকে হত্যা করা হত! রোমান নাগরিক স্নানাগার ছিল চোমান সমাজের অন্যতম বিনোদনকেন্দ্র। রোমান পাবলিক স্নানাগার-এ নারীরাও স্নান করত। কেননা, রোমান জনস্নানাগারটি সব বয়সের সামাজিক শ্রেণি ও লিঙ্গের জন্য ছিল উন্মুক্ত। কখনও কখনও মেয়েদের আলাদা স্নানাগার ছিল। তা না হলে নারীরা সকালে পুরুষরা বিকালে স্নান করতে যেত।

রোমান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারত। নাগরিক স্নান ও সামাজিক নৈশভোজ ছিল উচ্চবিত্ত রোমানদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ডিনার পার্টিতে মেয়েরা স্বামীদের সঙ্গে থাকত। মেয়েরা এম্পিথিয়েটারেও যেত। সেখানে গ্লাডিয়েটর-এর যুদ্ধ ও সার্কাস অনুষ্ঠিত হতো। এমন কী নারী গ্লাডিয়েটর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে নাট্যমঞ্চে তাদের দেখা যেত না। অবশ্য কোনও কোনও রোমান নারী অন্যদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর ছিল, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও ছিল বেশি। সার্বিক বিচারে রোমান সভ্যতায় রোমান নারীদের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। একাধারে সন্তান ধারণ, মা, কন্যা ও স্ত্রী ভূমিকা। নারীদের রোমান নাগরিক মনে করা হত ঠিকই তবে ভোটাধিকার ছিল না। রাজনীতিতেও অংশ নিতে দেওয়া হত না। অবশ্য কোনও কোনও রোমান নারী অন্যদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর ছিল, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও ছিল বেশি।

তথ্যসূত্র ঃ http://britbanglanews.com/?=5723

৪.৩ ঃ স্পার্টাকাস ও গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহ

ইতিহাসের পাতায় বীর হিসেবে আবির্ভূত স্পার্টাকাস ছিলেন মূলত একজন রোমান ক্রীতদাস। ইতিহাসের পাতায় তার শৈশব জীবন সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাই তার বিদ্রোহপূর্ব জীবনের অধিকাংশ তথ্যই অজানা। ইতিহাসবিদগণের মতে, স্পার্টাকাসের জন্ম রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থ্রেস অঞ্চলের এক গ্রামে, আধুনিক মানচিত্রের বুকে যার অবস্থান বলকান অঞ্চলে। ধারণা করা হয়, তরুণ স্পার্টাকাস তার শক্তিশালী গড়নের কারণে রোমান সেনাবাহিনীতে চাকরি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে অজানা কারণে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল।

অনেকের মতে, তিনি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে ডাকাত দলের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তাই তাকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি রোমান সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। চাকরিচ্যুত স্পার্টাকাসের ঠাঁই মিললো দাস বিক্রির হাটে। খুব দ্রুত তিনি এক দিনমজুর ঠিকাদারের নিকট বিক্রি হয়ে যান। বেশ কয়েক বছর ক্রীতদাস হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন করেন তিনি।

তৎকালীন রোমে শক্তিশালী ক্রীতদাসদের বাছাই করে বিভিন্ন যুদ্ধকৌশল প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ‘গ্ল্যাডিয়েটর’ নাম যোদ্ধায় পরিণত করা হতো। এই গ্ল্যাডিয়েটরদের রোমের বিভিন্ন স্থানে মল্লযুদ্ধে ব্যবহার করা হতো। সেই নৃশংস ক্রীড়ায় গ্ল্যাডিয়েটররা বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষায় অন্য গ্ল্যাডিয়েটরদের হত্যা করতো। খেলার শেষে একমাত্র জীবিত গ্ল্যাডিয়েটরকে বিজয়ী ঘোষণা করা হতো। রোমের সভ্য নাগরিকগণ এই পাশবিকতাকে বিনোদন মাধ্যম হিসেবে উপভোগ করতেন। সম্রাটের সামনে যুদ্ধ হলে, তার নির্দেশ মোতাবেক পরাজিতর ভাগ্য নির্ধারিত হতো। ভাগ্যক্রমে স্পার্টাকাসও একজন গ্ল্যাডিয়েটর বিক্রেতার নজরে পড়েন। এদের রোমানরা ‘ভাটিয়া’ নামে ডাকতো। সেই ভাটিয়া স্পার্টাকাসকে ক্রয় করে ল্যাপলসের বিখ্যাত নেউস লেন্টুলুস গ্ল্যাডিয়েটর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে স্পার্টাকাস হয়ে গেলেন এক গ্ল্যাডিয়েটর যোদ্ধা। ক্রীতদাসের শেকল থেকে মুক্ত স্পার্টাকাস জড়িয়ে পড়লেন রোমান পাশবিকতার ফাঁদে।

গ্ল্যাডিয়েটর স্কুলের চার দেওয়ালে বন্দি স্পার্টাকাস খুব দ্রুত হাঁপিয়ে উঠলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বহু সৈনিককে হত্যা করেছেন, কিন্তু এই পাশবিক হত্যাযুদ্ধ তার কাছে সম্পূর্ণ অনৈতিক লাগলো। তার ভেতরে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের আগুনি জ্বলতে লাগলো। রোমানদের স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কোনো লাভ হবে না, এ কথা তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন। তৎকালীন বিভন্ন সম্রাটরা শত চেষ্টা করেও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেননি। তবে স্পার্টাকাস ভয় পেলেন না। তিনি অন্যান্য সহযোদ্ধাদের তার আক্রোশের ব্যাপারে অবহিত করলেন। প্রাথমিকভাবে কেউ সাড়া না দিলেও একদিন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যোদ্ধাদের সাথে প্রশিক্ষকদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ঘটনা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। স্পার্টাকাস এই সুযোগে প্রায় ৭৮ জন গ্ল্যাডিয়েটরকে একতাবদ্ধ করে পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষকদের উপর হামলা করে বসেন। স্কুলের বিভিন্ন অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে স্পার্টাকাস তার দলবল নিয়ে ভিসুভিসাস পর্বতের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যান।

বিখ্যাত দার্শনিক প্লুটার্কের মতে, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহী গ্ল্যাডিয়েটররা অস্ত্র হিসেবে রান্নাঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন লোহার সরঞ্জামকে বেছে নিয়েছিলো। কিন্তু পথিমধ্যে তারা গ্ল্যাডিয়েটরদের অস্ত্র বোঝাই একটি গাড়ি

আবিষ্কার করে। বুদ্ধিমান স্পার্টাকাস সেই অস্ত্র লুট করেন। এর ফলে বিদ্রোহীদের নিয়ে ছোটখাট সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন তিনি। স্পার্টাকাস নিজে একজন রোমান সেনা ছিলেন। তাই সেনাবাহিনীর আক্রমণের ধরণ সম্পর্কে তিনি সম্যক ধারণা রাখতেন। এই পুরো ঘটনার সময়কাল ছিল ৭৩ খ্রিষ্টপূর্ব।

স্পার্টাকাসের তত্ত্বাবধানে ভিসুভিয়াসের পাদদেশে ক্রীতদাসদের সামরিক প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ততদিনে সমগ্র রোমে স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে ক্রীতদাস এবং গ্ল্যাডিয়েটররা গোপনে পালিয়ে এসে সেই দলে যোগ দিতে থাকে। দল ভারী হওয়ার পর স্পার্টাকাস তিনজন গ্ল্যাডিয়েটরকে নেতা হিসেবে নিযুক্ত করলেন। স্পার্টাকাসের সাথে তার স্ত্রী পলায়ন করেছিলো। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তার নাম সম্পর্কে কোনো ধরনের তথ্য লাভ করা যায়নি। ইতিহাসবিদ্‌রা ধারণা করেন, স্পার্টাকাসের স্ত্রী একজন থ্রেসীয় ক্রীতদাসী ছিলো। প্রাচীন পুরোহিতদের ন্যায় সে বিভিন্ন লক্ষণ বিচার করে ভবিষ্যদ্বণী করতে পারতো।

স্পার্টাকাস এবং দাস বিদ্রোহীদের পলায়নের খবর রোমান সিনেটের কাছে পৌঁছে গেলো। কিন্তু তারা দাসদেরকে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে নারাজ ছিলেন। অন্যদিকে স্পার্টাকাসের বাহিনী ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী কোহর্টের সমতুল্য হয়ে উঠলো। ঠিক সেই সময় রোমের বিখ্যাত সেনারা দুটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই রোমে অবস্থানরত সেনা সদস্যের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। তবে সিনেটের বিশ্বাস ছিল রোমের সাধারণ যোদ্ধারাই পারবে স্পার্টাকাসকে হত্যা করতে। তারা গাইয়াস ক্লডিয়াস গ্লেবার নামক এক সেনাধ্যক্ষের অধীনে প্রায় তিন হাজার বৃদ্ধ এবং অপ্রশিক্ষিত সৈনিকের একটি দল প্রেরণ করে।

প্রাথমিক আক্রমণের ধাক্কায় নব্য প্রশিক্ষিত গ্ল্যাডিয়েটর এবং দাস বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। খণ্ড খণ্ড আক্রমণে বার বার পরাস্ত হতে থাকে দাসরা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্লেবার দাসদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কোণঠাসা করতে থাকেন। কিন্তু স্পার্টাকাস মনোবল হারালেন না। দিনের শেষে যুদ্ধ বিরতি পড়লো। রাত্রিকালে গোপন আক্রমণে ঘুমন্ত রোমান সৈনিকদের বিধ্বস্ত করেন। অতর্কিত হামলায় রোমান সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ওদিকে দাসরা ভিসুভিয়াসের বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে অগ্নিতীর নিক্ষেপ করে রোমানদের শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে। গ্লেবার কিছু সৈনিকসহ পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করেন। স্পার্টাকাস এবং তার বাহিনী রোমানদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র লুট করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। গ্লেবার রোমে ফিরে গিয়ে অন্যান্য সিনেটরদের স্পার্টাকাসের শক্তিবলের কথা জানান। কিন্তু সিনেটররা তার কথা বিশ্বাস করলো না। সিনেটে অনেকেই তার বিরুদ্ধে কথা বলে তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যা দেয়। রোম স্পার্টাকাস দমনের উদ্দেশ্যে এবার পাঠালেন সেনাধ্যক্ষ পাবলিয়াস ভ্যারিনিয়াসকে।

ভ্যারিনিয়াস নিজের দলকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। স্পার্টাকাস পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন তার দলবল নিয়ে। ভ্যারিনিয়াস বাহিনী দাসদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। স্পার্টাকাস ছেলেখেলার মতো ভ্যারিনিয়াসকে এক ধাক্কায় ঘোড়া থেকে ফেলে অপমান করেন। তারপর স্পার্টাকাস বেশ কয়েকটি রোমান অধ্যুষিত অঞ্চল (নোরা, নুসেরিয়া, থুরি এবং মেটাপন্টিয়াম) আক্রমণ করে সিনেটরদের বাসস্থান ধ্বংস করে দেন। এসময়ে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং রাখালরা স্পার্টাকাসের বাহিনীতে যোগ দেয়। এই জয়ের মাধ্যমে স্পার্টাকাসের বাহিনীতে অশ্বরোহী বাহিনীর সংযোজন হয়। ৭২ খ্রিস্টপূর্বের শেষে স্পার্টাকাসের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি হয়েছিল।

রোমানদের অট্টহাসি এবং পরিহাস ধীরে ধীরে গুপ্ত আতঙ্কে পরিণত হয়। এভাবে হয়তো একদিন পুরো রোম স্পার্টাকাসের অধীনে চলে আসবে। কিন্তু রোমান সিনেট এই পরিণতি রুখে দিতে তৎপর হলো। এবার সিনেটররা বেশ শক্তিশালী ফৌজ গঠন করলো। সেনাবাহিনীর সেরা যোদ্ধাদের সমন্বয়ে তৈরি হলো প্রায় বিশ হাজার সদস্যের এক ফৌজ। এবার এই ফৌজকে দু'ভাগ করে রোমান কন্সাল লুসিয়াস গেলিয়াস পাবলিকোলা এবং নেয়াস কর্নেলিয়া ক্লডিয়ানাসের অধীনে ভিসুভিয়াসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো।

তখন স্পার্টাকাস তার সহ-অধিনায়ক ক্রিক্সাসের সাথে পুরো বাহিনী নিয়ে আল্পস পর্বতমালা অভিমুখে সফররত ছিলেন। পথিমধ্যে তারা গেলিয়াস বাহিনীর সাথে মুখোমুখি হয়। কন্সাল গেলিয়াসের সুসজ্জিত বাহিনী দুদিক থেকে স্পার্টাকাসদের ঘিরে ধরে। যুদ্ধে ক্রিক্সাস মৃত্যুবরণ করলে স্পার্টাকাস কিছুটা ভয় পেয়ে যান। দক্ষিণ দিক থেকে গেলিয়াস বাহিনী স্পার্টাকাসদের পিছু হটাতে থাকে। কিন্তু বিধিবাম! পেছনে যাওয়ারও সুযোগ নেই। কারণ, উল্টো দিক থেকে ঘিরে রেখেছে লুসিয়াস। স্পার্টাকাস শেষ সম্বল হিসেবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তার নির্দেশে দাসদের অশ্বারোহী বাহিনী পুরাদমে আক্রণণ শুরু করে। ইতিহাসের পাতায় থ্রেসীয়রা অশ্বারোহী হিসেবে সুপরিচিত। তাই তাদের অশ্বারোহীদের সামনে মুখ থুবড়ে পড়লো বোমান প্রতিরোধ।

একের পর এক রোমান সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দাসদের আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠলো। তাদের সামনে আর কোনো বাধা রইলো না। স্পার্টাকাসের পরিকল্পনা ছিল আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে গাউল প্রদেশে প্রবেশ করা। গাউল প্রদেশে প্রবেশ করা। গাউল প্রদেশ রোমান সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হওয়ায় দাসরা সেখানে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবে। এক অজানা কারণে পুরো বাহিনী নিজেদের গতিপথ পরিবর্তন করে পুনরায় রোমে ফেরত আসলো।

ইতিহাসবিদ্দের নিকট আজ পর্যন্ত এই ঘটনার পেছনে মূল কারণ অজ্ঞাত রয়েছে। নেতা স্পার্টাকাসের এই অদ্ভুত আচরণ সত্যিই রহস্যজনক ছিল। অনেকেই ধারণা করেন, দাসদের প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে তারা পালিয়ে যেতে চায়নি। এমনকি রোমে ফিরে আসার সময় তারা বিভিন্ন রোমান প্রদেশে আক্রমণ করে এবং বিজীয় হয়। স্পার্টাকাস এবার নতুন পরিকল্পনা করলেন। তিনি পুরো বাহিনী নিয়ে মেসিনা প্রণালী অঞ্চলে অবস্থান করলেন। সেখান থেকে জলপথ পাড়ি দিয়ে শ্যামল দ্বীপ সিসিলিতে দাসদের স্বপ্নভূমি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন তিনি। কিন্তু স্পার্টাকাসের এজন্য প্রয়োজন বেশ কিছু জাহাজ। পরিচালনার সুদক্ষ নাবিকেরও প্রয়োজন।

স্পার্টাকাস এবার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি সিসিলির জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ করলেন। লুট করা ভিন্ন মূল্যবান অলঙ্কার এবং মোহরের বিনিময়ে বেশ কিছু জাহাজ এবং নাবিক ক্রয় করলেন। জলদস্যুরা অল্প সময়ের মধ্যে স্পার্টাকাসকে জাহাজ এবং নাবিক প্রস্তুত করে দিবে বলে কথা দেয়। কিন্তু এক অজানা কারণে জলদস্যুরা বিশ্বাসঘাতকরা করে বসে। এর ফলে বিপদে পড়ে যায় স্পার্টাকাস। রোমান সাম্রাজ্যের আবদ্ধ ভূমিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে দাসদের ঐতিহাসিক বাহিনী।

স্পার্টাকাস সিসিলি প্রত্যাবর্তন ব্যর্থ হওয়ার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় পেছন দিক থেকে ধাবমান হাজার হাজার রোমান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওদিকে রোমান সেনা নেতৃত্বে আবির্ভাব ঘটলো নতুন নেতা মার্কাস লিসিনিয়াস ক্রেসাসের। স্পার্টাকাসের পরবর্তী প্রতিপক্ষ

এই ক্রেসাস রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম নিষ্ঠুর সেনাপ্রধান হিসেবে পরিচিত। এর পূর্বে স্পার্টাকাস তার অধীনস্ত দুই লিজিয়নকে পরাজিত করেছিলেন। সরাসরি নেতৃত্ব না দিলেও ক্রেসাস এই পরাজয়ে অপমানিত বোধ করেছিলেন। তাই তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মুখ ছিলেন। শাস্তি হিসেবে নিজের পরাজিত দুই সেনাধ্যক্ষকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ছাড়াও লিজিয়নের প্রতি দশজনের একজনকে জনসম্মুখে হত্যা করেছিলেন তিনি।

স্পার্টাকাস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানতেন ক্রেসাস তার সবচেয়ে সেরা বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই তিনি প্রথমেই ক্রেসাসকে শান্তি চুক্তির আহ্বান করেন। কিন্তু ক্রেসাস জানতেন তিনি দাসদের থেকে শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এসেছেন। তাই তিনি এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্পার্টাকাস বাহিনীর সীমান্তের চারদিকে দেওয়াল নির্মাণের নির্দেশ দেন। স্পার্টাকাস তাৎক্ষণিকভাবে সুড়ঙ্গের সাহায্যে পলায়ন করার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হাজার হাজার দাস সৈনিক পেছনে পড়ে যায়। এর ফলে স্পার্টাকাসের বাহিনী শক্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। দিনশেষে হতাশ স্পার্টাকাস গোধূলির রক্তাক্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। কিন্তু তিনি অশনি সংকেত ব্যতীত আর কিছুই ধরতে পারেন না। ওদিকে ক্রেসাস তৃপ্তির হাসি হেসে চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

স্পার্টাকাসের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি আর পালাতে রাজি হলেন না। যেহেতু তার রোম ত্যাগ করার কোনো পথ খোলা নেই, তাই তিনি ক্রেসাসের মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার সৈনিক নিয়ে তিনি ক্রেসাসকে আক্রমণ করে বসেন। ক্যালেণ্ডারের হিসেবে সময় তখন ৭১ খ্রিস্টপূর্ব। স্পার্টাকাস দুই ধাপে আক্রমণ করার পরিকল্পনা দিলেন। প্রথম ধাপে অশ্বারোহীরা ক্রেসাসের তীরন্দাজদের আক্রমণ করবে। দ্বিতীয় ধাপে স্পার্টাকাস পদাতিক বাহিনী নিয়ে সরাসরি ক্রেসাসকে হত্যা করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু যে উদ্যমে দাসরা যুদ্ধ শুরু করেছিলো, অচিরেই সেই উদ্যম হারিয়ে আহত সৈনিকদের আর্তনাদে পরিণত হলো। অশ্বারোহী বাহিনী তীরন্দাজদের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যর্থ হলো। ওদিকে স্পার্টাকাসের পদাতিক বাহিনী লিজিয়নদের মুহুর্মুহু আক্রমণে দিশেহার হয়ে পড়লো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্পার্টাকাস বাহিনী পরাজিত হলো। যুদ্ধে স্পার্টাকাস প্রাণ হারালেন। ঠিক কীভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে অধিকাংশের মতে, তাকে শত্রুরা চারপাশ থেকে ঘিরে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছিলো। অন্যান্য দাসদের রোমান আইন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম সাহসী সংগ্রামের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে। ইতিহাসবিদ্‌গণ স্পার্টাকাসের শেষ যুদ্ধকে 'তৃতীয় সারভিল যুদ্ধ' নামে চিহ্নিত করেছেন। এইভাবে স্পার্টাকাসের পতনের ফলে গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহের পরিসমপ্তি হয়।

৫ ঃ উপসংহার

এইভাবে দেখা যায়, প্রাচীন রোমে একটি উন্নত সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য ইউরোপের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। রোমান সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সেই সময়কার সবথেকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহের অন্যতম ছিল। এটি ছিল প্রাচীনকালের এবং পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যসমূহের একটি। ট্রাজানের সময়কালে এর আয়তন ছিল ৫০ লাখ বর্গ

কিলোমিটার, যা ২১ শতকের ৪৮টি জাতিগোষ্ঠীর সম পর্যায়ের। এবং প্রায় ৭ কোটি লোকের বসবাস ছিল যা তৎকালীন বিশ্ব জনসংখ্যার ২১% ধারণ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং স্থায়ীত্বই লেটিন এবং গ্রীক ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আবিষ্কার, স্থাপত্য, দর্শন এবং সরকার গঠনের বিস্তৃতি এবং স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করেছিল।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। **বিশ্বসভ্যতা ঃ** এ কে এম শাহনওয়াজ।

২। The History of the Ancient World : From the Earliest Accounts to the Fall of Rome : Susan Wise Bauer.

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। রোমান ধর্ম ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা কর।

৩। দাস বিদ্রোহের বিবরণ দাও।

Block / পর্যায়—৬

Ancient China

প্রাচীন চীন

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ সাং, হান ও অন্য প্রাচীন চীনা রাজবংশ (Unit-14)

৩ ঃ চীনা ধর্ম, কনফুসিয়াস, বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম (Unit-15)

৪ ঃ নারীর অবস্থান (Unit-16)

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক প্রশ্নাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী।

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) চীনের প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস কেমন ছিল?

২) কনফুসীয় মতবাদ কি?

৩) চীনের সমাজ চিত্র কেমন ছিল?

২ ঃ সাং, হান ও অন্য প্রাচীন চীনা রাজবংশ (Unit-14)

চৈনিক সভ্যতাকে হুয়াংহো নদীর দান বলা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে হুয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা অনেক আঞ্চলিক সংস্কৃতি চীনের সভ্যতাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এই কয়েক হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাসে চৈনিক সভ্যতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদিমতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই কারণে মানব সভ্যতার অন্যতম সুতিকাগার রূপে চৈনিক সভ্যতা পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে চীনের শাং সাম্রাজ্যের (১৬০০ থেকে ১০৪৬ খ্রিস্টপূর্ব) আমলে লিখিত ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ যেমন 'রেকর্ড অব গ্রাণ্ড হিস্টোরিয়ান' (১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এবং 'বাম্বু এ্যানালস' এ সিয়া সাম্রাজ্য

এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন থেকে শাং সাম্রাজ্যের আমল পর্যন্ত লিখিত কোন দলিল দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার পদ্ধতি চীনাদের অবগত ছিল না।

ঝউ রাজবংশের (১০৪৬ থেকে ২৫৬ খ্রিস্টপূর্ব) সময়কালে চীনের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী থেকে ঝউ শাসকরা নানারকম অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সমস্যার নিকট নতি স্বীকরা করতে বাধ্য হয় এবং এক সময় সাম্রাজ্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা চীনা পরিভাষায় 'শরৎ' ও 'বসন্ত' পর্যায় (Spring and Autumn period) থেকে শুরু হয় এবং 'আন্তঃরাজ্য যুদ্ধাবস্থা' (Warring States period) এর সময়ে পূর্ণরূপ লাভ করে। এই সময়কালটি ছিল চীনের ইতিহাসের অন্যতম 'ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় শাসনকাল'। এই ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় শাসনকালের সর্বশেষ সময়কাল ছিল ১৯২৭ সালে চীনের গৃহযুদ্ধের সময়।

বহু ক্ষুদ্র রাজ্য ও যুদ্ধবাজ শাসকদের শাসনকালে চৈনিক রাজবংশগুলো চীনের একটি অংশ শাসন করত। যার সীমানা বর্তমান জিংজিয়ান এবং তিব্বত পর্যন্ত ছিল। ২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিন শি হুয়াং বিভিন্ন যুদ্ধরত রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে কীন বংশের একটি ক্ষুদ্র ''সাম্রাজ্য'' (হুয়াংডি) প্রতিষ্ঠা করে, চৈনিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে শুরু করেন। পরবর্তী রাজবংশগুলো একটি জনপ্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যা ক্রমে তৎকালীন চীনের বিশাল এলাকায় চৈনিক সম্রাটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। চীনের সর্বশেষ সাম্রাজ্য ছিল কিং সাম্রাজ্য (১৬৪৪ থেকে ১৯১২), যার উচ্ছেদের পর ১৯১২ সালে রিপাবলিক অব চায়না, এবং ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচলিত চৈনিক ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ঐক্য এবং অনৈক্যের চিত্র দেখা যায়, আরো দেখা যায় স্তেপ জাতি দ্বারা চীন শাসিত হবার ইতিহাস। পরবর্তীকালে যারা চৈনিক হান জাতির জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতির ও রাজনৈতিক প্রভাব, অভিবাসন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও চুক্তি ইত্যাদি আধুনিক চীনের সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা পালন করেছে।

সিয়া সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ থেকে ১৬০০ অব্দ) ঃ প্রাচীন চৈনিক শাসকদের মধ্যে সিয়া সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ থেকে ১৬০০ অব্দ) প্রামাণ্য ইতিহাস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এর তথ্যসূত্র সিমা কিয়ান এর 'রেকর্ডস অব গ্রন্ড হিস্টোরিয়ান'' ও ''ব্যাম্বু এনালস''-এ সংরক্ষিত আছে। যদিও প্রকৃতই এই রাজবংশের অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল কিনা সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে এই রাজবংশের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিমা কিয়ান লিখেছিলেন যে সিয়া সাম্রাজ্য আনুমানিক ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীন শাসন ক্ষমতায় ছিল। যদিও এই তথ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি। অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক সিয়া রাজবংশকে এর লি থৌ এবং Henan এর সাথে সম্পর্কিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সেখান থেকে উৎখননের মাধ্যমে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালে নির্মিত একটি ব্রোঞ্জ গলানোর যন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত কিছু মৃৎপাত্রে কিছু প্রাচীন প্রতীক দেখা যায় যা আধুনিক চৈনিক অক্ষরের আদিরূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ঐতিহাসিকরা। ইয়ু দ্য গ্রেট এ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি খাল খননের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে, এই রাজবংশ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে মিঙতিয়াও যুদ্ধে বিলুপ্ত হয়।

শাং সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১০৪০ অব্দ) ঃ প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ নির্দেশ করে যে শাং সাম্রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১০৪৬ পর্যন্ত চীন শাসন করে। সাং শাসনামলের প্রমামসমূহ মূলত দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি, Erligang, Zhengzhou এবং Shangcheng উৎস থেকে এসেছে।

চৌ রাজবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ১০৪৬ থেকে ২৫৬ অব্দ) ঃ চৌ রাজবংশ চীনের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে পীত নদী অববাহিকায় সাং বংশের অধিকৃত এলাকার উপর চৌ রাজবংশের উত্থান আরম্ভ হয়। একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আদলে চৌ শাসন শুরু হয়েছিল। চৌ শাসকরা সাংদের পশ্চিম দিকে বাস করত। চৌ সেনাপতিদেরকে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। Muye এর যুদ্ধে চৌ শাসক রাজা উইউ, তার ভ্রাতা চৌ এর ডিউকের সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্য লনিয়ে সাং বাহিনীকে পরাস্ত করে। চৌ রাজা এই সময়ে তার ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে 'স্বর্গাদেশ' ধারণার প্রচার করেন। এ ধারণাটি তখনকার সময়ে অধিকাংশ সম্রাটকে শাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করেছিল। সাংডি মতে, স্বর্গ (tian) সকল দেবতাদের প্রধান এবং তিনিই নির্দেশ দেন কে পরবর্তী শাসক হবেন। জনমনে বিশ্বাস ছিল যে যদি ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় তাহলে নিশ্চিতভাবে সম্রাট তার স্বর্গাদেশ হারিয়েছেন। তার ফলে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করা হত, এবং তথাকথিত স্বর্গাদেশ প্রাপ্ত অন্য কোন শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শাসন পরিচালনা করতেন।

শরৎ-বসন্ত যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৭২২ থেকে ৪৭৬ অব্দ) ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে, চৈনিক শরৎ ও বসন্তকালে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। এ যুগের নামকরণ করা হয় চীনে তৎকালীন প্রভাবশালী শরৎ বসন্ত ইতিবৃত্ত এর নামে। এই সময়ে, আঞ্চলিক সামরিক প্রধানরা চৌ সম্রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষমতা লাভ করার জন্য পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কিছু বহিরাগত (যেমন কিন জাতি) আক্রমণ শুরু করলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। চৌ শাসকরা তাদের রাজধানী আরো পূর্বে সরিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে চৌ রাজবংশের দ্বিতীয় ধারা ঃ পূর্ব চৌ এর জন্ম হয়। শরৎ-বসন্ত যুগ ছিল অবিভক্ত চৌ সাম্রাজ্যের বিভক্ত হওয়ার কাল। এ সময়ে কয়েক শত ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান হয়। এই রাজ্যগুলো নামে মাত্র চৌ শাসনধীনে ছিল। তারা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে শাসন করত। কিছু রাজ্যের শাসকগণ রাজকীয় পদবীও গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার চীন ছিল এসব ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের সমষ্টি। যাদের মধ্যে কিছু রাজ্যের আয়তন একটি গ্রাম এবং একটি কেল্লার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ে অনক দার্শনিক মতবারে জন মহয়। এসব মতবা বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, কনফুসীয় ধর্ম, তাও ধর্ম, লিগালিজম এবং মহিজম। তৎকালীন রাজনৈতিক ক্রমধারা ও ঘটনাপ্রবাহ আংশিকভাবে এসকল মতবাদের পিছনে কাজ করেছিল।

আন্তঃরাজ্য যুদ্ধাবস্থা (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৬ থেকে ২২১ অব্দ) ঃ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার পরে, খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর শেষে সাতটি প্রভাবশালী বৃহৎ রাজ্য স্বাধীন চরিত্র বজায় রেখেছিল। বেশ কিছু বছর এই সাতটি রাজ্য পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই সময়টিকে বলা হয় আন্তঃরাজ্য যুদ্ধাবস্থার যুগ বা Waring States period। খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬ পর্যন্ত স্থায়ী হলেও চৌ রাজবংশ মূলত আনুষ্ঠানিক রাজা ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা তাদের কাছে ছিল না।

এই যুগের চূড়ান্ত সম্প্রসারণ আরম্ভ হয় কীন শাসক ইং জেং এর শাসনকালে। তিনি অন্য ছয়টি শক্তিশালী রাজ্যকে একত্রিত করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২১৪ সালে তিনি পার্শ্ববর্তী আরো বেশ কিছু এলাকা, যেমন আধুনিক চীনর Zhejiang, Fujan, Guangdong এবং Guangxi তার রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। তার সম্রাজ্যের আকার

বৃদ্ধি পায় এবং তিনি নিজেকে চীনের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। চীনের ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম সম্রাট (কিন শি হুয়াং)।

কিন সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২২১ থেকে ২০৬ অব্দ) ঃ চীন তখন হান, ওয়েই, চাই, ছি, ছু এবং ইয়ান এই ছয়টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজা কিন শি হুয়াং এই ছয়টি রাজ্যকে একত্রিত করে কিন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সফল হন। ইতিহাসে তিনি প্রথম চৈনিক সম্রাট হিসেবে পরিচিত। দুর্ধর্ষ তাতার জাতির (মোঙ্গল জাতি) হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য তিনি সমগ্র চীনের উত্তরে সীমান্ত জুড়ে একটি বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যা চীনের মহাপ্রাচীর নামে পরিচিত ছিল। যদিও বর্তমানে সেই প্রাচীরের সামান্য কিছু অংশের অস্তিত্ব অবশিষ্ট আছে। কিন সি হুয়াং তার প্রধানমন্ত্রী লী সিং এর সহযোগিতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর। এছাড়া শি হুয়াং এর অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা, এক আইন ব্যবস্থা ও ধারা প্রণয়ন, লেখ্য ভাষার প্রবর্তন, এবং মুদ্রার প্রচলন।

পশ্চিম হান ঃ লিউ বাং হান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এক গৃহযুদ্ধে স্বল্পস্থায়ী কিন বংশের পতন হয়। হান শাসনকাল ছিল চীনের ইতহাসের স্বর্ণযুগ। হান শাসকগণ রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব ও উন্নতির পাশাপাশি পরবর্তি দুই সহস্রাব্দের জন্য চৈনিক সম্রাজ্যকে একটি কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। এই শাসনকালে প্রকৃত অর্থে 'মূল চীন' (China proper বা চীনের ১৮ প্রদেশ) চীনা সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। পশ্চিমের ভূখণ্ডও চৈনিক সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কনফুশীয়, মতবাদ সরকারিভাবে মৌলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মতবাদ চৈনিক সভ্যতার সঠিক রূপায়নে অবদান রাখে। এই শাসনামলে কলা, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন হয়। হান সম্রাজ্যের গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণে সমগ্র চীন জাতির মানুষ একসময় ''হান'' হিসাবে পরিচিত ছিল। এই হান জাতি বর্তমান চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী।

সিন সাম্রাজ্য ঃ ৯ম খ্রীস্টাব্দে, দখলদার ওয়াং মাং দাবী করেন যে হান বংশের উপর স্বর্গাদেশ আর বলবৎ নেই। তিনি হান শাসনামলের সমাপ্তি ও স্বল্পস্থায়ী 'সিন' (নতুন) বংশ প্রতিষ্ঠার ঘোষনা দেন। ওয়াং মাং ভূমি ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি দাস প্রথা রোহিতকরণ এবং ভূমি জাতীয়করণ পুনর্বন্টনসহ বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সাধারণ কৃষকদের স্বার্থে গৃহীত এ সকল প্রকল্প ভূমির মালিক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও পরিবারের সমর্থন পায়নি। ক্ষমতার অস্থিরতা বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহের জন্ম দেয় সেই সাথে অনেক অঞ্চল সম্রাটের হাতছাড়া হয়ে যায়। হলুদ নদীর আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায়; বন্যা ও পলিমাটির আস্তরণ বিশাল এলাকায় কৃষক জনগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করে। ২৩ খ্রিস্টাব্দে একদল ক্রুদ্ধ কৃষক, ওয়াং মাংকে তার Weiyang প্রাসাদে হত্যা করে।

পূর্ব হান ঃ সম্রাট গুয়াংউ জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যে হান বংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন রাজধানী জি'য়ানের কিছু পূর্বে নতুন হান রাজধানী স্থাপন করার জন্য এই নতুন হান সম্রাজ্যের নামকরণ করা হয় পূর্ব হান বংশ। সম্রাট মিং ও জাং, আরো অধিক কর্মক্ষম প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে হানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। পাশাপশি সামরিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও প্রচুর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হানদের হাতে জিয়ংজু সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাষ্ট্রদূত ও সেনাপতি বান চাও পামীর পর্বতের মধ্য দিয়ে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেন সিল্ক রুটের সূচনা হয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ সুগম হয় সেই সাথে চীনে বৌদ্ধ মতবাদের আগমন হয়।

পূর্ব হান শাসনামল ছিল প্রাচীন চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির কাল। বিশেষ করে কাই লুনের কাগজের আবিষ্কার এবং বহুবিদ জ্যাং হেং-এর অগণিত অবদান।

রাজ্যত্রয় (২২০ থেকে ২৮০ খ্রিস্টাব্দ) ঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভূমি দখল, বিদেশী আক্রমণ এবং বিভিন্ন গোত্র ও খোজাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদের কারণে চৈনিক সম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ১৮৪ সালে 'হলুদ পাগড়ি বিদ্রোহ' দেখা দেয়, সেই সাথে সূচনা হয় যুদ্ধবাজ শাসকদের যুগ। এসব সংঘাতের সময়, তিনটি সম্রাজ্য তাদের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। এ সময়টি চৈনিক ইতিহাসে রাজ্যত্রয় (Three Kingdoms) হিসাবে পরিচিত। 'রোমান্স অব দ্যা থ্রি কিংডমস্' সাহিত্যকর্মে এসময়কার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চাও কারও ২০৮ সালে চীনের উত্তর অংশ ঐক্যবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে তার পুত্র ২২০ সালে উই বংশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। উই এর বিরোধী শু এবং উ বংশ তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যার ফলে চীন তিনটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমশ কিন হান শাসনকালের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছু বৃহৎ পরিবারের হস্তগত হল।

২৬৫ সালে জিন বংশ উইদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে এবং ২৮০ সালে তারা চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে। তবে এই ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল না।

জিন সাম্রাজ্য (২৬৫ থেকে ৪২০ খ্রিস্টাব্দ) ঃ অ-হান অভিবাসীদের বিদ্রোহের পর উত্তর চীন হাতছাড়া হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা Luoyang এবং Cdhang'an দখল করে নেয়। এছাড়া রাজপরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত জিন শাসনকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলে। ৩১৭ সালে, একজন জিন রাজকুমার, নানজিং সম্রাট হন। ইতিহাসে এই নতুন সাম্রাজ্য পূর্ব জিন সম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্য পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।

উত্তর চীন কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যের বেশীরভাগই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Xiongnu, Xianbei, Jie, Di এবং Qiang শাসকদের দ্বারা। এসব শাসকরা হান জাতিভূক্ত ছিল না। তার ছিল তূর্কী, মঙ্গল এবং তিব্বতীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

তথ্যসূত্র ঃ Wikipedia.

৩ ঃ চীনা ধর্ম, কনফুসিয়াস, বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম (Unit-15)

চীনা সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। ধর্মাচরমের মূল আধার ছিল কিছু সামাজিক সম্পর্ক। যেগুলি হল 'সান কাং'; অর্থাৎ ১) পিতামাতা-সন্তান, ২) রাজা-প্রজা, ৩) স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বন্ধন। এছাড়া ছিল লু-চি বা ছয় বিভাগ ১) ভাইবোন, ২) পিতা-পিতৃব্য, ৩) বংশানুক্রম, ৪) মাতা-মাতুল, ৫) শিক্ষক-ছাত্র, ৬) বন্ধু-বান্ধবী। চীনা মনীষীরা সামাজিক নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মূলত পাঁচটি নীতি যথা উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্টাচার, জ্ঞান ও সত্যবাদীতার কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া পাঁচটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব নীতিগত শিক্ষার মূল প্রবক্তা চীনের ইতিহাসে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি কনফুসিয়াস।

কনফুসিয়াস নামটি বিশ্বজুড়েই অনেক পরিচিত। চীনে কয়েক হাজার বছর ধরে অনেক সম্মানিত এবং আদৃত মহামানব হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছেন। কনফুসিয়াস ছিলেন একই সাথে একজন রাজনীতিবিদ, একজন কবি, একজন ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং সাধু। একই সাথে অনেক কিছুর মিশেল।

৫০১ খ্রিঃপূঃ এ ছোট্ট একটি শহরের গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার মাধ্যমে কনফুসিয়াসের রাজনীতিতে প্রবেশ। তখন বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ। তার জ্ঞান এবং শিক্ষার খ্যাতি নিশ্চয়ই এর আগে থেকেই ছড়াচ্ছিল। সেই ধারাবাহিকতাতেই রাজনীতির দুনিয়াতে আরোহণ শুরু হয়েছিল। রাজনীততে খুব দ্রুতই তার মেধার পরিচয় রেখেছিলেন। এজন্য একেবারে রাজ্যের বিচারমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সম্রাটকে কয়েকবার রক্ষা করেছিলেন। আবার তার এই দ্রুত উত্থান সমকালীন অনেক ক্ষমতাসীনদের চোখের পীড়ার কারণ হয়েছিল। এজন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই শুরু হয়েছিল। সম্রাট থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কনফুসিয়াসের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে এটা একেবারে পরিবার থেকে শুরু। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসংহত ও সুন্দর সম্পর্ক থাকলে সবচেয়ে বড় পরিবার যে রাষ্ট্র সেখানেও সে বৃহৎ পরিবারের সদস্যরা নিজেদের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিবারের শিক্ষা বৃহৎ পরিবারে অনেক কাজে লাগে। তিনি পাঁচটি নৈতিক বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন, যথা দান, শুচিতা, জ্ঞান, ন্যায়বোধ ও বিশ্বাস।

এজন্য একটা শিশু প্রথম বড় শিক্ষাটা পায় তার পরিবার থেকে। সেখানে পিতা-মাতার আচার-আচরণ শিশুর জীবনে প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকা রাখে। পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর মন-মগজ-মনন ও চরিত্র গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষকদেরকে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা। এজন্য শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে খুব সতর্কভাবে নিজেদেরকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়। কনফুসিয়াস বলেন, 'পচা কাচে নকশা করা যায় না'। এজন্য নষ্ট শিক্ষক, নষ্ট শিক্ষা কাঠামো থেকে বড় মানুষ, ভালো মানুষ বের হওয়া অনেক কঠিন।

একটা দেশের রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থার সাথে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সে দেশের কৃষ্টি কালচার অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ভালো সরকার ব্যবস্থার জন্য এ সবকটি উপাদন একসাথে কাজ করতে হবে। জু কুং নামে এক শিষ্য কনফুসিয়াসকে জিজ্ঞেস করেছিল — 'ভালো সরকার কেমন?' এর উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন ঃ 'জনগণকে পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া, দেশের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য সামন্ত রাখা এবং দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করলেই তাকে ভালো সরকার বলা যাবে। এখন এ তিনটি জিনিসের মধ্যে যদি একটিকে ত্যাগ করতে হয় তাহলে প্রথমে সৈন্য-সামন্তকে ত্যাগ করতে হবে। তারপর বাকি দুটোর মধ্যেও যদি একটিকে ত্যাগ করতে বলা হয় তাহলে সেটা হবে খাবার। কারণ শুরু থেকেই মানুষকে তো মরতে হবে কিন্তু জনগণের আস্থা ছাড়া কোন সরকারই টিকে থাকতে পারে না।'

তাওবাদ একটি ঐতিহ্যবাহী চৈনিক ধর্ম। ঘটনার স্বাভাবিক গতি, নিয়মিত বিবর্তন ও স্বাভাবিক পরিণতি তাওবাদের মূল বিষয়। তাও শব্দের অর্থ ''বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক উপায়'', ''পথ'' বা ''নীতি''। তাও দর্শনের উদ্ভবের কয়েক শত বছর পরে প্রাচীন চৈনিক ধর্মগুলো এই ধর্মের মতবাদগুলো গ্রহণ করেছিল। এই মতবাদ মনে করে জগতে অস্তিত্ব আছে এমন সব কিছুর পিছনেই একটি শক্তি বিদ্যমান থাকে। তাওবাদের মহাজাগতিক ধারণাটি এসেছে Yin Yaang মতবাদ থেকে।

তাও হচ্ছে প্রাচীন চীনের দর্শনের একটি মৌলিক সূত্র। তাও বলতে স্বাব, প্রকৃতি এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক বিধান বুঝাত। একে নীতির সূত্র বা আদর্শ হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। চীনের দর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'তাও' সূত্রের অর্থেরও বিকাশ ঘটেছে। চীনের ভাববাদী দার্শনিকগণ 'তাও'কে একটি ভাববাদী সূত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, আবার লাওজু, সুনজু, ওয়াংচাং প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিক তাওকে বস্তুর প্রকৃতি এবং বস্তুর পরিবর্তনের নিয়ম বা বিধান বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম চীনের বৌদ্ধ ধর্মের একটি শাখা। তা প্রধানতঃ তিব্বতী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ছিংহাই প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। তিব্বতী জাতি, মঙ্গোলিয়া জাতি, ইউকুও জাতি, মেনবা জাতি, লোবা জাতি আর থুবা জাতির লোকেরা তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করে। তাদের লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ। পারিভাষা ব্যবস্থার বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশের সিসানপেননান তাই জাতির স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল, তেন হোন তাই জাতির চিংফু জাতির স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল আর সি মাও প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাই জাতি, পু লাং জাতি, আ ছাং জাতি আর ওয়া জাতির বেশীর ভাগ লোকেরা পালি ভাষা ব্যবস্থার বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করেন। এই ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশী। হান জাতির লোকভিত্তিক হানভাষা ব্যবস্থার বৌদ্ধধর্মালম্বী চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

Source : Wikipedia and other internet sources

৪ ঃ নারীর অবস্থান (Unit-16)

চিনের প্রাচীন সমাজে নারীদের বস্থান ছিল গৌণ। তাদের বিশেষ অধিকার কিছু ছিল ন। কনফুসিয়াসের মতে ''আনুগত্যই নারীর মূল কাজ, শৈশব কৈশোরে পিতার, বিবাহের পর স্বামীর এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের। এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র'' সেই খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পথটি রুদ্ধ করে দিতে চীনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অজস্র নিয়মাবলী রচনা করেছে। নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্ভাবন করেছে অসংখ্য পদ্ধতি। চীনা মেয়েদের পা ছোট করে রাখার প্রথা সেই নির্মম ইতিহাসেরই অংশ। অথচ এই অমানবিক মানবতাবিরোধী বিষয়ের প্রতি তৎকালীন চৈনিক দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল এবং সেই সব দার্শনিকদের রচনা নারীদের সম্বন্ধে হীন মন্তব্যে পরিপূর্ণ। যেমন দার্শনিক কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন : A husband may marry twice, but his wife must never remarry. এভাবে নারীকে হীন এবং অধঃপতিত করে দেখালে নারীকে বিকলাঙ্গ করে রাখতে সহজ হত।

চীনে মেয়েদের পা ছোট করে রাখার প্রথা প্রচলিত হয় সুং শাসনামলে। সময়কাল-৯৬০ থেকে ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। কারও কারও মতে অবশ্য সপ্তম শতকে এই প্রথার উদ্ভব। প্রথম প্রথম এর চর্চা ছিল সীমিত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ দশম শতকের পর ব্যাপর হারে ছড়িয়ে পড়ে। কেবলমাত্র অভিজাত সমাজই নয়, এমনকী মধ্যবিত্ত সমাজেও পদ্মপায়ের লোভে মেয়েদের পা বিকৃত করে ফেলা হত। কেবল মাত্র নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরা রেহাই পেয়েছিল। যেহেতু এদের কাজ করে খেতে হত। তিন বছর বয়েসি শিশুর পা বিকলাঙ্গ করা হত; এসময় পায়ের বাঁকা হাড় ও আঙুল ঠিক মতো বিকাশ লাভ করে না। সাধারণত শীতকালে এই বিকৃতিকরণ করা হত। এ সময় ঠান্ডায় পা জমে থাকত বলে ব্যথা কম হত। প্রথমে দুটি পা-ই উষ্ণ ভেষজ ও পশুরক্তে ভিজিয়ে নেওয়া হত। এতে পা নরম হত, আঙুলগুলি বাঁকিয়ে বেঁধে ফেলতে সুবিধে হত। এরপর যতটা সম্ভব পায়ের আঙুলের নখ

কেটে ফেলা হত। তারপর ম্যাসেজ করা হত। তুলার ব্যান্ডেজে উষ্ণ ভেষজ ও পশুরক্তে ভিজিয়ে নেওয়া হত। এরপর আঙুল ও বাঁকানো হাড় নীচের দিকে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলা হত। ভাঙা পায়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ পেঁচিয়ে বাঁধা হত। শিশু তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাত। মেয়েরা গোড়ালির ওপর ভর রেখে হাঁটত। পুরুষশাসিত সমাজে পা বিকৃত না করে উপায় ছিল না। কর্মহীন পায়ের মর্যাদা গড়ে উঠেছিল। পা যত ছোট তত অভিজাত। মধ্যবিত্ত সমাজেও চলত প্রতিয়োগিতা—কার মেয়ের পা কত ছোট। যদিও মেয়েরা সংসারের কাজ ঠিকঠাক করতে পারত না। বিকলাঙ্গ পায়ের জন্য নির্মিত বিশেষ জুতা। উচ্চবিত্ত সমাজে কন্যার পা ছোট না থাকলে বিয়েই কঠিন হয়ে পড়ত। তবে পা বিকৃতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেলা করতে না পারে।

চিনা সমাজে কনফুসীয় এই নারী বিদ্বেষী কুপ্রথা টিকেছিল প্রায় ১০০০ বছর। ১৯১১ সালে চিনে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের পর নতুন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। তার পর এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। পথাটিকে 'চাইল্ড অ্যাবিউজ' বলে আখ্যাহিত করা হয়। তবে সে সময় যাদের পায়ের বাঁধন খুলে ফেলা হয়েছিল তা সত্ত্বেও তাদের পায়ে দীর্ঘকাল ক্ষত বহন করতে হয়েছিল। এমন কী ১৯৯০ সালেও কোনও কোনও চৈনিক বৃদ্ধার পায়ের সমস্যা ছিল।

এইভাবে দেখা যায় যে, প্রাচীন চৈনিক সমাজে যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায়, সেখানে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তাদের কোন মর্যাদাময় স্থান ছিল না।

তথ্যসূত্র ঃ http:/sufiborshan.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

৫ ঃ উপসংহার

এইভাবে দেখা যায়, প্রাচীন চীন দেশে একটি উন্নত সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। সেই সংস্কৃতি একটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পাশাপাশি কনফুসীয় দর্শন চীনা সভ্যতার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। এ কে এম শাহনওয়াজ ঃ বিশ্বসভ্যতা

২। Immanuel Hsu : Rise of Modern China.

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। চীনা রাজতান্ত্রিক ইতিহাস উল্লেখ কর।

২। চীনের ধর্মব্যবস্থার অপর একটি টিকা লেখ।

৩। চীনা সমাজে নারীদের অবস্থান লেখ।

৪। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তার বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে কি জান?

ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্রপাঠ (CBCS) যুক্ত(

স্নাতকোত্তর পাঠত্র(ম

এম. এ. প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ৩

Medieval Societies

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বি(বিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

পরামর্শদাতা

শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

ডিসেম্বর ২০১৮

মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয়

মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংর(িত। মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত(কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সং(িষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

SYLLABUS

CC-3: MEDIEVAL SOCIETIES

CC-3, 4 Credits, 100 Marks, 120 Hours

CC-3: Medieval Societies

BLOCK-1: Christian Church in Europe

Unit-1: Evolution of Christian Church.

Unit-2: Prevailing of anti-church feeling in Europe.

BLOCK-2: Feudalism in Europe

Unit-3: Definition of feudalism.

Unit-4: Nature of European Feudalism.

Unit-5: The process of decline.

Unit-6: Debate on the decline of feudalism.

BLOCK-3: Crusades

Unit-7: Causes of Crusades.

Unit-8: It's impact on medieval European society.

BLOCK-4: Traditional societies of the Far East

Unit-9: The conservative society of China.

Unit-10: Social strata of medieval Japan.

BLOCK-5: Structure of medieval society of India

Unit-11: Definition and nature of Indian feudalism.

Unit-12: Its difference from the European type.

Unit-13: Debate on the village community.

Unit-14: Production relations—potentiality for capitalist growth.

BLOCK-6: Religion and Caste structure

Unit-15: Changes in social psyche under the impact of Islam.

Unit-16: Debate on syncretism and reformism in the medieval society of India.

Contents

Blocks	Titles	Pages
1	Christian Church in Europe	1-12
2	Feudalism in Europe	13-25
3	Crusades	26-36
4	Traditional societies of the Far East	37-49
5	Structure of medieval society of India	50-65
6	Religion and Caste structure	66-75

পর্যায়-১

একক-১

খ্রিষ্টীয় চার্চের বিবর্তন

একক-২

ইউরোপে চার্চ বিরোধী মানসিকতার প্রাদুর্ভাব

সূচীপত্র :

৩.১.১ : উদ্দেশ্য

৩.১.২ : ভূমিকা

৩.১.৩ : খ্রিষ্টীয় চার্চের বিবর্তন

৩.১.৩.১ : মধ্যযুগীয় চার্চের বিকাশ

৩.১.৩.২ : ক্যাথলিক ইউরোপের অবস্থা ও পোপতন্ত্রের দুর্নীতি

৩.১.৪ : ইউরোপে চার্চ বিরোধী মানসিকতার প্রাদুর্ভাব

৩.১.৪.১ : মধ্যযুগের আদিপর্বে ক্যাথলিক সংস্কারের রূপরেখা

৩.১.৪.২ : মার্টিন লুথার ও চার্চ-বিরোধী আন্দোলন

৩.১.৪.৩ : চরমপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলন

৩.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.১.৬ : নমুনা প্রশ্ন

৩.১.১ : উদ্দেশ্য

এই বিভাগটি অধ্যয়নে মাধ্যমে শিক্ষার্থী মধ্যযুগীয় ইউরোপের বহুল চর্চিত বিষয় অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় চার্চের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হবে। মধ্যযুগের চুড়ান্ত পর্যায়ে চার্চের নিয়ন্ত্রক তথা যাজকমণ্ডলীর আচরণ ও নীতির অবনতি, অনৈতিকভাবে সংগৃহীত বিপুল সম্পদ কিভাবে চার্চের প্রতি সাধারণ

মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থী এই বিষয়টি জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে যে, কিভাবে ধর্ম ক্রমে যান্ত্রিক ও বস্তুগত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে খ্রিষ্টীয় চার্চের বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। শিক্ষার্থী এই বিষয়ে অবগত হবে যে, দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে ইউরোপে সর্বত্র চার্চ বিরোধী মানসিকতার প্রসার ঘটে—যা শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বন্ধনমুক্ত জীবনমুখী দর্শনে সন্ধান দিয়েছিল।

৩.১.২ : ভূমিকা

ঐতিহাসিক যুগ বিভাজন ঐতিহাসিকদের কাছে এখানো পর্যন্ত জটিল এবং অস্পষ্ট। তা সত্ত্বেও প্রাচীন এবং আদি-মধ্যযুগের পর্ব অতিক্রম করে মধ্যযুগ সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা এখানো পর্যন্ত প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ-উভয়ক্ষেত্রেই মধ্যযুগ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীয় দিক দিয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে মধ্যযুগ প্রধানত সামন্ততন্ত্র, মুসলিম শাসকদের আধিপত্য, রাজনৈতিক, অর্থনীতি এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদির কারণে প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে ইউরোপে মধ্যযুগ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামন্ততন্ত্রের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, চার্চের মাধ্যমে খ্রিষ্টান ধর্মে অনৈতিক প্রথা ও দুর্নীতির অনুপ্রবেশ, কালক্রমে খ্রিষ্টানধর্মের দুই প্রধান শাখা ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সংঘাত, চার্চের বিবর্তন, ইউরোপে চার্চ বিরোধী মানসিকতার প্রসার, মুসলিমদের কাছ থেকে পবিত্র খ্রিষ্টীয় জমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সংঘটিত ধর্মীয় যুদ্ধ বা ক্রুসেড ইত্যাদির কারণে। উল্লেখ্য, মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের দুইটি প্রধান গুরুত্ব ছিল। একদিকে বিস্তীর্ণ ইউরোপীয় ভূ-খন্ডে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক আধিপত্য। অন্যদিকে প্রতিটি অঞ্চলের রাজশক্তি তাদের অনুগত সামন্তপ্রভুদের অনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। বস্তুতপক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এই সামন্তপ্রভুরা ছিল রাজশক্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ।

এই পরিস্থিতিতে আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পথ প্রস্তুত হয়েছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকবর্গ প্রভুর আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। উল্লেখ্য চার্চের দুর্নীতির বিরোধীতা করে ষোড়শ শতকে যখন ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, তখন সেই আন্দোলনকে সমর্থন যুগিয়েছিল আঞ্চলিক রাজন্যবর্গ। প্রস্তুত হয়েছিল জাতীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি।

অন্যদিকে ইউরোপে মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে যাজকতন্ত্র সম্পর্কে যে বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল তা সর্বত্র যাজক বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন স্থানীয় অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। ষোড়শ শতকে জার্মানির ধর্মযাজক মার্টিন লুথার চার্চের অর্থনৈতিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এই ধরনের প্রতিবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে ‘anticlericalism’ মানসিকতা সঞ্চারিত করেছিল।

৩.১.৩ : খ্রিষ্টীয় চার্চের বিবর্তন

৩.১.৩.১ : মধ্যযুগীয় চার্চের বিকাশ

মধ্যযুগের খ্রিষ্টানতন্ত্র একটি সর্বাধিক বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছিল। নিপীড়িত ও অসংগঠিত মতাবলম্বীদের হাত থেকে খ্রিষ্টানতন্ত্র সংগঠিত এবং বহুস্তরীয় পদমর্যাদা সম্পন্ন স্তরগুলিতে উন্নীত হয়েছিল। প্রায় সাত শতাব্দীর বেশি সময় ধরে খ্রিষ্টানতন্ত্র চার্চের উপর আধিপত্য করতে সক্ষম হয়েছিল। উত্তর রোমানীয় ইউরোপের পরিবর্তে রাজনৈতিক পরিবেশে খ্রিষ্টানতন্ত্র নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। ক্যাথলিক চার্চের বিকাশ এবং সমস্ত ইউরোপে খ্রিষ্টান মতবাদের প্রসার মধ্যযুগীয় সমাজজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং শাসক ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে চার্চ রোমান এবং বাইজান্টিয়ান শাসকদের আধিপত্যকে অস্বীকার করেছিল। এটি উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর—রোমানীয় ইউরোপের শাসকদের উপর খ্রিষ্টান চার্চ তাঁর নিজস্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই বিষয়ে অবগত হওয়া উচিত যে, চার্চের মাধ্যমেই ইউরোপীয় খ্রিষ্টানতন্ত্র সংগঠিত হতে শুরু করেছিল।

রোমান প্যালেস্টাইনে খ্রিষ্টানতন্ত্র একটি ধর্মীয় ধারণা হিসাবে বিকশিত হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের পূর্বতন অংশের মাধ্যমে এটি পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল। আবির্ভূত হওয়ার প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে খ্রিষ্টানতন্ত্র অসংগঠিত ছিল এবং মূলত শহরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর ৩১২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রিষ্টানতন্ত্রের গঠনকে পরিবর্তন করেন এবং এই মতবাদকে একটি সংগঠিত ও অর্ধ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। বস্তুতপক্ষে বহুবিভক্ত ইউরোপকে একত্রিত করতে কনস্ট্যানটাইন চার্চকে ব্যবহার করেছিলেন। এটি সম্রাটের অধীনে এসেছিল। আইন এবং বিচার ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রিষ্টান বিশপদের রাজকীয় আধিকারিক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে চার্চের উপর সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়েছিল। খ্রিষ্টান ধর্ম তথা চার্চের উপর সাম্রাজ্যিক আধিপত্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসের সময়কালে যিনি পরবর্তী শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ধর্মকে সরকারী ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন।

চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে আত্মপ্রকাশ করে বর্বর রাজ্যগুলি, যারা নিজেদের রোমান হিসাবে গণ্য করত এবং একাধিক প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করত। রোমান সাম্রাজ্য টিকে থাকার সময়েই এই সমস্ত বর্বর শাসকেরা মিশনারীদের দ্বারা খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিকতন্ত্রের পরিবর্তে তারা আর্যতন্ত্র অনুশীলন করত। বর্বর জার্মান শাসকদের সময়কালে খ্রিষ্টান মতবাদ আরও সম্প্রসারিত হয়। ৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক শাসক ক্লভিস খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাঁর প্রজা এবং যোদ্ধা সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে। ৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ভিসিগথিক রাজা রিকার্ড খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। বর্বর জার্মান শাসকেরা রাজা

এবং রোমান নাগরিকদের মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসাবে বিশপদের ব্যবহার করতেন। কালক্রমে এই বিশপরা আরো ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং বৃহত্তর প্রজাবর্গের প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে। রাজা তাদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং পূর্বতন রোমানদের দাবীদাওয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্য বিশপদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও প্রদান করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে মঠগুলিও শাসকগোষ্ঠীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রধানত সংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মঠগুলি পরিচিতি লাভ করে।

গ্রামাঞ্চলে নিজেদের প্রভাব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শাসক এবং অভিজাতরা রাজকীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করে। 'খ্রিষ্টীয় মতাবলম্বী শাসকদের কার্যকর শাসন পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য খ্রীষ্টিয় ঈশ্বর তাদের সাহায্য করবেন'—এই ধারণা খুব দ্রুত পশ্চিম ইউরোপে বিকশিত হয়।

খ্রিষ্টানধর্মের সম্প্রসারণ এবং বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ইউরোপের শাসক সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এক্ষেত্রে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের ফ্রাঙ্ক শাসক শার্লাম্যান খ্রিষ্টান ধর্মকে শক্তিশালী করেন। ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে সংযোগসাধিত হয়েছিল তাঁর সময়কালেই। প্রকৃতপক্ষে 'Christian Kingship' বা 'খ্রীষ্টীয় রাজতন্ত্র'-এর ধারণা শার্লাম্যান-এর সময়কাল থেকেই শুরু হয়। এই ধারণা চার্চকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে সাহায্য করেছিল। ইতিপূর্বে শার্লাম্যানের পিতা পিপিন ফ্রাঙ্কদের শাসক হওয়ার জন্য ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে পোপের সমর্থন এবং আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। প্রধানত এই ঘটনাটিই চার্চ এবং ফ্রাঙ্ক রাজাদের ক্যারোলিঞ্জীয় বংশের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র রচনা করেছিল। এই কারণেই ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকগণ পোপতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়। তাঁরা ইতালিতে লোম্বার্ডদের ক্ষমতা ধ্বংস করে রোমের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় লিও-র দ্বারা ফ্রাঙ্কদের শাসকপদে শার্লাম্যানের-এর অভিষেক সম্পন্ন হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র খ্রিষ্টান মতবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ইতিপূর্বে ভিসিগথদের ন্যায় শার্লাম্যানও রাজতন্ত্রকে 'ধর্মীয় দপ্তর' (Religious Office) এবং রাজ্যকে 'চার্চ হিসাবে অভিহিত করেন। ধর্মনিরপেক্ষ আইনের পরিবর্তে খ্রিষ্টীয় নিয়মকানুন প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বিশপরা পূর্বের তুলনায় আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।

শার্লাম্যানের পুত্র লুই-দ্য-পায়াসের মৃত্যুর পর তাঁর তিন দৌহিত্র সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে শার্লাম্যানের সাম্রাজ্য তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। তিন দৌহিত্র শার্লাম্যানের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেও তাঁরা ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য এই সময়কালেও 'খ্রিষ্টীয় রাজতন্ত্রের' ধারণা পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকলেও শাসকের দক্ষতা অনেকাংশে হ্রাস পেতে শুরু করে। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও দ্বন্দ্ব এবং শাসকপদের অস্তিত্বের অপ্রসাঙ্গিকতা ইউরোপের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকে রূপান্তরিত করে তোলে। ইউরোপের এই সময়কাল সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করে

তোলে। চার্চের স্বাধীনতা হ্রাস পায় এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানীয় অংশে স্বাধীনতার দাবী ওঠে। কেন্দ্রীয় শাসকের পরিবর্তে বিভিন্ন স্থানীয় এবং স্বাধীন অভিজাতরা গ্রামাঞ্চলে শাসন করতে শুরু করে। কালক্রমে ধর্মীয় মঠ, খ্রিষ্টীয় চার্চ এবং বিশপরা এই সমস্ত স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের অধীনে চলে আসে। ক্ষমতাশীল মঠ স্থানীয় এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শুরু করে এবং স্থানীয় শাসক হিসাবেই শাসন পরিচালনা করতে থাকে। লুসিগনান অঞ্চলের সমসাময়িক লেখক হুগ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিশপরা আঞ্চলিক ক্ষমতা অধিগ্রহণ করতে শুরু করে, এবং রোম ও অন্যান্য ধর্মীয় কেন্দ্রগুলির স্বাধীন শাসক হয়ে ওঠে। স্থানীয় অভিজাতদের মাধ্যমে যাজকরা চার্চের মালিকানায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে চার্চ সামন্ততন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ ভ্যাসালেজ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়। পরবর্তী ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই রোমান চার্চের ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে। বলাবাহুল্য তখনও পর্যন্ত ইউরোপে একমাত্র আধিপত্যকারী ধর্ম ছিল খ্রিষ্টান ধর্ম। কিন্তু শার্লাম্যানের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক চার্চ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় আবর্তিত হয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৩.১.৩.২ : ক্যাথলিক ইউরোপের অবস্থা ও পোপতন্ত্রের দুর্নীতি

পশ্চিম ইউরোপের চার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যাজকমণ্ডলীর আচরণ ও নীতির অবনতি। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু হয় হিংসা, অবজ্ঞার মত অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ। যাজকদের উপপত্নী ও অবৈধ সন্তান থাকত। তারা প্রচুর পরিমাণে আহার ও মদ্যপান করত। তারা ছিল অলস ও উদ্ধত। প্রকৃতপক্ষে পোপতন্ত্রের দুর্নীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যাজকদের দুর্নীতি, ঘুষের বদলে গির্জায় যাজকত্ব প্রদান, স্বজন পোষণ প্রভৃতির প্রবণতা বাড়তে থাকে। পোপ ইতালির অস্থায়ী শাসকের সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ধীরে ধীরে তারা এক শুল্ক ব্যবস্থাও গড়ে তোলে। রাজস্ব আদায়ের প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে অন্যায়ভাবে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে যাজকদের প্রতি ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এইভাবেই ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

আলোচ্য সময়কালে পোপের আয় বিচারব্যবস্থা জনিত মুনাফা থেকে বৃদ্ধি পায়। তাই যখনই সম্ভব হত, বিচার সংক্রান্ত মামলা রোমে পাঠিয়ে দেওয়া হত। পোপতন্ত্রের আয়ের আরেকটি উৎস ছিল বিভিন্ন যাজকীয় শুল্ক, যেমন—'এ্যানটিস' (annates) এবং 'টেনথ' (tenths)। এছাড়া বিভিন্ন অপেশাদার ব্যক্তিদের থেকেও আদায় করা হত। যেমন—শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অর্থ নেওয়া হত। উল্লেখ্য পোপকে সাহায্য করার জন্য একটি সন্ন্যাসী সংঘ গড়ে উঠেছিল—যা 'কার্ডিনাল' নামে পরিচিত ছিল। পোপরা বিবাহ করতেন না। বর্তমান পোপের মৃত্যুর পর কে পোপ হবে তা কার্ডিনালরা স্থির করতেন। অষ্টম শতকে এক পোপ সাতজন বিশপকে নির্বাচন করে 'কার্ডিনাল' উপাধি প্রদান করেন। কালক্রমে এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পঁচাত্তর হয়। সকল ক্যাথলিক দেশ থেকেই কার্ডিনাল মনোনীত করেন পোপ। উল্লেখ্য Fugger নামে পরিচিত জার্মানির অন্যতম

ব্যাঙ্কিং পরিবার এর আনুকুল্য বিক্রয় করা হত। এইসব ঘটনাই লুথারকে তাঁর আন্দোলন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। চার্চ ব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে একটি পতন এসেছিল যা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল। মঠ ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং দুর্নীতির জন্য বহু মঠ কুখ্যাত হয়ে ওঠে।

কালক্রমে চার্চের সঙ্গে স্থানীয় শাসক এবং নাগরিক শক্তির সংঘর্ষ দেখা দেয়। কেন্দ্রীকরণের নতুন প্রবণতা, অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির ফলে স্থানীয় শাসকরা সাধারণ মানুষকে তাদের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থার অধীনস্থ করতে চায়। ইতালিতে পোপ নিজের আয় বৃদ্ধির ও অবস্থানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করলে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে চার্চ সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। বিরাট পরিমাণ অনৈক্যের জন্য পোপের আদায়কৃত রাজস্ব ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের নতুন নতুন উৎসের সন্ধান করত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পোপরা এমন অনেক কার্যালয় স্থাপন করেছিল যা প্রায়শই বিক্রয় হয়। প্রকৃতপক্ষে অভিজাততন্ত্রের উপস্থিতি চার্চের সংস্কারের পথে বড় বাধা ছিল। ফলস্বরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরুতে পোপতন্ত্রের জনপ্রিয়তা একেবারে হ্রাস পায়।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কবলে পড়েছিল। গ্রাম থেকে অনেকেই শহরে পালিয়ে আসে এবং ভবঘুরের জীবন বেছে নেয়। এই অস্থির পরিবেশে সাধারণ মানুষকে একটা পাপবোধ আচ্ছন্ন করে। এই প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্তরে নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পাপস্থালনের চেষ্টা অব্যাহত ছিল, অন্যদিকে যাজক শ্রেণী তাদের ব্যয়বহুল ও ভোগী জীবনের জন্য ক্রমাগত সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সৎ ধর্মাচরন যদি পাপ থেকে মুক্তির উপায় হয়, তাহলে খ্রিষ্টান চার্চ এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িত মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে পারে নি। বরং পোপদের ব্যক্তিগত জীবন বিলাস-ব্যসনে পূর্ণ হয়ে ওঠে। নবজাগরণ পর্বের মানবতাবাদী পেত্রার্কের লেখাতে এই বিলাসী জীবন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের বিলাসী জীবন যাপনের উপাদান সংগ্রহ করার জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করতেন।

পোপ নির্বাচন নিয়েও চার্চের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। ১৩০৯ সালে পোপ অষ্টম বনিফেস রোম ছেড়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের আভিননে বাস করতে শুরু করেন। ১৩৭৭—এ একাদশ গ্রেগর্যার রোমে ফিরে আসেন। ১৩৭৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পোপ হিসাবে কে নির্বাচিত হবেন, তা নিয়ে একটা সংঘর্ষ বেঁধেছিল। রোমের কার্ডিনালরা ষষ্ঠ আরবনকে নির্বাচিত করেন, যা পরে তাঁরা নিজেরাই অস্বীকার করে আরেকজনকে পোপপদে অভিষিক্ত করেন। ফলে কিছুদিন আরবান ছিলেন রোমের পোপ এবং সপ্তম ক্লোমেন্ট, যিনি পরে নির্বাচিত হলেন, তাঁরা বাসস্থান ছিল আভিনন। পোপ নির্বাচন নিয়ে এই সংঘর্ষ চার্চের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছিল।

রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রশ্নেও যাজকতন্ত্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল। মধ্যযুগে পোপতন্ত্র তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমর্থনে রোমান সম্রাট এবং পোপদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নানা ধরনের দাবি করত। প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন, যিনি সম্রাটদের মধ্যে প্রথম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তিনি স্বেচ্ছায় পোপের হাতে কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দেন। এটি হল 'Donation of Constantine'। পঞ্চদশশতকে অনেকে পোপের এই দাবীকে জাল বলে চিহ্নিত করেছে। পরে ৭৫৬ সালে শার্লাম্যানের পূর্বসূরী পিপিন আরেকটি দানপত্রের মধ্যে দিয়ে এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্বীকার করে নেন। এর ভিত্তিতে শার্লাম্যান যখন রোমান সাম্রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে, তাঁকে অভিষিক্ত করার অধিকার ছিল পোপের। পরবর্তীকালে আঞ্চলিক রাজশক্তির উত্থানের ফলে পোপদের এই ধরনের দাবী অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত পোপের রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করেন। জন নামক একজন ফরাসি ডমিনিকান তাঁর 'Papal and Royal Power' গ্রন্থে বলেন যে, রাজশক্তি সৃষ্টি করেছে সাধারণ মানুষ, তাই ধর্মযাজকদের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার কোনো অধিকার নেই। কয়েকদিন পর পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রোমান আইনের বিশেষজ্ঞ মার্সিলিয়ো তাঁর 'Defender of the peace' গ্রন্থে বলেন যে, পোপতন্ত্বর ইউরোপে ধর্মীয় সংঘাত তৈরী করে শান্তি নষ্ট করেছে। তাই শান্তির প্রয়োজনে পোপেদের এই ক্ষমতা ধ্বংস করা প্রয়োজন। তৎকালিন ইতালির বিখ্যাত কবি আলিঘেরি তাঁর 'On Monarchy' নামক প্রবন্ধে পোপেদের রাজস্ব আদায়ের অধিকারের সমালোচনা করেন।

৩.১.৪ : ইউরোপে চার্চ বিরোধী মানসিকতার প্রাদুর্ভাব

দুর্নীতিগ্রস্ত পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত ইউরোপে চার্চ বিরোদী মানসিকতার প্রসার ঘটে এবং খ্রিষ্টান ধর্মে সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। উল্লেখ্য সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপকতা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকের গোড়ায় জার্মানির মার্টিন লুথার-এর নেতৃত্বে। সাধারণত ষোড়শ শতকের শুরু থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইউরোপের ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই চেতনার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। এই চেতনা প্রচলিত ধর্মীয় প্রথা ও বিশ্বাসকে আঘাত করার সাথে সাথে তা তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকেও প্রভাবিত করেছিল। এই ঘটনাই ইউরোপের ধর্মসংস্কার বা Reformation নামে পরিচিত লাভ করেছে। যে সমস্ত অঞ্চলে এই চার্চ বিরোধী আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল, সেখানে পোপদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিনষ্ট হয়। অনেকক্ষেত্রেই প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিক এবং উদীয়মান প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘাত গৃহযুদ্ধের আকার নিয়েছিল। সংস্কারপন্থীরা রাজশক্তির সমর্থন পেলে নব্য ধর্মীয় সংগঠন সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ যে তৎক্ষণাৎ নতুন ধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিল, তা নয়। ফলত ধর্মীয় সংঘাতের পাশাপাশি ধর্মীয় সমঝোতার নজিরও লক্ষ্য করা যায়।

৩.১.৪.১ : মধ্যযুগের আদিপর্বে ক্যাথলিক সংস্কারের রূপরেখা

খ্রিষ্টীয়ধর্মে সংস্কারের উদ্যোগ যে সর্বপ্রথম জার্মানিতে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে হয়েছিল, তা নয়, এর পূর্বেও ইউরোপে একাধিকবার ক্যাথলিক যাজক শ্রেণীর কিছু ব্যক্তি ধর্মীয় সংগঠনকে পাপমুক্ত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। দ্বাদশ শতকে পোপ ক্লুনির নেতৃত্বে ক্যাথলিক চার্চকে দোষমুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য ষোড়শ শতকের ন্যায় দ্বাদশ শতকের সংস্কারপন্থীরাও ভাবতেন যে, শুরুতে খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বে চার্চ ছিল সৎ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সম্মেলন। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এর কোনো নিয়ন্ত্রণবাদী ভূমিকা থাকে না। এই কারণে ষোড়শ শতকের সংস্কারপন্থীরা খ্রিষ্টধর্মের আদিযুগে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কারণ মধ্যযুগে চার্চ যেভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ছিল প্রাচীন খ্রিষ্টানধর্মতত্ত্বের পরিপন্থী। এই কারণে ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডের ললার্ডরা খ্রিষ্টীয় আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করার ডাক দিয়েছিলেন। ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই সংস্কার আন্দোলনের আগে থেকেই এই যাজক বিরোধী মানসিকতা নানা ধরনের স্থানীয় অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে প্রকটিত হয়। ঐতিহাসিকদের কাছে এটি 'anti-clericalism' নামে পরিচিত। স্থানীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হওয়ার পর ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চেতনাও আরো প্রসারিত হয়। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যাজকদের নির্দেশিত আচার-অনুষ্ঠান আর্থিক স্বার্থ প্রসূত। ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে উইলিয়াম টিন্ডেল বাইবেল অনুবাদ করার পর যাজক বিরোধী আন্দোলন আরো তীব্র হয়েছিল।

ইংল্যান্ড ও বোহেমিয়াতে খ্রিষ্টান চার্চকে আবার তাঁর মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন জন ওয়াইক্লিফ (১৩৩০-১৩৮৪)। 'Morning star of Reformation' নামে পরিচিত ওয়াইক্লিফকে তাঁর সংস্কারপন্থী মতবাদের জন্য ইংল্যান্ডের চার্চ সংগঠন থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রচার করেন, তার মূল কথা হল দুর্নীতি পরায়ণ যাজকদের তাঁদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার ইংল্যান্ডের রাজার আছে। বাইবেলে যাজকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা স্বীকৃত নয়। ওয়াইক্লিফের এই ধররে চিন্তাধারা বোহেমিয়ার জন হাসের মত সাধারণ গ্রাম্য যাজকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাস যাজক এবং পোপেদের অনৈতিক জীবনের তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁর এই চার্চ-বিরোধী কাজের জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয়। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডারে নীতিহীন জীবন সে সময়ের ইতালিতে একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩.১.৪.২ : মার্টিন লুথার ও চার্চ-বিরোধী আন্দোলন

জার্মানিতে সর্বপ্রথম ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয় জার্মানির ধর্মযাজক মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে। ১৫১৭ সালে লুথার চার্চের যে আর্থিক দুর্নীতির সমালোচনা করেন সেটি ছিল 'Indulgence' বা মার্জনাপত্রের বিরোধিতা। এটি ছিল একধরনের অর্থমূল্য যা সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ক্ষেত্রে পাপস্থালন এবং স্বর্গলাভের

পাথেয় হিসাবে যাজক শ্রেণী গ্রহণ করতেন। এর ফলে সর্বত্র চার্চ বিরোধী মানসিকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'Indulgence' বা মার্জনাপত্রের ধিক্কার দিতে গিয়ে লুথার বলেন, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য কোনো দান-ধ্যান, আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। বরং ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসই মানুষের মুক্তি সাধন ঘটাতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর এই আঘাত এমন একটি বিদ্রোহী বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল যেখানে জার্মানির উত্তরাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

লুথারের চার্চ বিরোধী আন্দোলনের দুটি মূল ভিত্তি ছিল—(১) সবাই নিজের পুরোহিত এবং (২) ঈশ্বর বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র পথ। উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন লুথার শিক্ষাবিস্তারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন যাতে মানুষের আত্মচেতনা বৃদ্ধি পায়। যদিও ধর্মবিশ্বাসী লুথার মনে করতেন মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য হল ঈশ্বরের অনুগমন করা। তবে তিনি মনে করতেন যে, মানুষ এমন একটি জগতের অধিবাসী যেখানে তার জীবনের প্রয়োজনে সে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। জীবনকে সংগঠিত করতে মানুষ নির্ভর করে যুক্তির উপর। মানুষের ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন অবস্থান লুথারকে সন্ত্রস্ত করেছিল। এই ভীতি থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তিনি বলেন যে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলে ঈশ্বর বিশ্বাস। লুথার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বাইবেলে যে ধর্মীয় জীবনের উল্লেখ রয়েছে তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই লুথার লেখেন 'Nienty Five Thesis'—যার উদ্দেশ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক যাজকদের সঙ্গে সদ্ ধর্মের চরিত্র কি সেই প্রসঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া। পোপতন্ত্র ঈশ্বরের সৃষ্টি—এই প্রচলিত মত তিনি খণ্ডন করেন। একজন ভাল মানুষের মুক্তির জন্য কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো মধ্যবর্তীর প্রয়োজন নেই, সে নিজেই নিজের পুরোহিত। লুথারের এই তত্ত্ব মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টধর্মচর্চার মৌলিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর আক্রমণ হেনেছিল। পরবর্তীকালে লুথারের বন্ধু মেলাংকথন—এর প্রচেষ্টায় এই ধর্মীয় তত্ত্ব ইউরোপ জুড়ে প্রসারিত হয়।

১৫২০ সালে লুথার 'Babylon's Captivity of the Church' নামক একটি পুস্তিকা লেখেন। এই গ্রন্থে তিনি পুরোহিততন্ত্রের অবসানের কথা বলেন। তাঁর মতে, ঈশ্বরের প্রকৃত বাণী জানার পরেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। ঐ একই বছরে লুথার 'Appeal to the Christian Nobility of the German Nation' নামক আরেকটি গ্রন্থ লেখেন, যেখানে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিপুল বৈভব, সম্পদ ও রাজকীয় ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য তিনি জার্মানির শাসকবর্গকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাছাড়া 'Concerning the Liberty of Christian Man' নামক অপর একটি গ্রন্থে লুথার ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং এক্ষেত্রে ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীনভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী থেকে ধর্মপালন একজন খ্রিষ্টীয় ধর্মাবলম্বীর স্বাভাবিক অধিকার। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ইরাসমাস যেভাবে সদ্ ধর্মকে মানবচেতনার অভিব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, ১৫২৫ সালে প্রকাশিত 'Bondage of the will' প্রবন্ধে লুথার তার সমালোচনা করেন।

বলাবাহুল্য পাপবোধের উল্লেখ করলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে পাপীরও মুক্তি সম্ভব—লুথারের এই বাণী সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছিলেন।

৩.১.৪.৩ : চরমপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলন

মার্টিন লুথারের মৃত্যুর পর তার ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। তাঁর অনুগামীদের একটি অংশ লুথারবাদের সীমানা অতিক্রম করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত ব্যক্তিদের চিন্তাধারা অনেক বেশি বৈপ্লবিক ছিল। এই 'বৈপ্লবিক সংস্কার' কালক্রমে চরমপন্থী ধর্মসংস্কারক (Radical Reformation) আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। এর অন্যতম পথ প্রবর্তক ছিলেন উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুথারের অন্যতম সহযোগী অধ্যাপক কার্লস্টাড। তাঁর প্ররোচনায় উইটেনবার্গ সংস্কার আন্দোলন একটি গণঅভ্যুত্থানের আকার ধারণ করেন। স্থানীয় গীর্জা ধ্বংস করা হয় এবং এই গণঅভ্যুত্থান ধর্মীয় দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়।

এই গণঅভ্যুত্থানে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা লুথার প্রদর্শিত সদ্ ধর্ম প্রতিষ্ঠার পথে সমস্ত বাধা অপসারণের উদ্যোগ নেন। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের সৈনিক হিসাবে গণ্য করতেন। এই সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁরা খ্রিষ্টবিরোধী ধর্মের বিনাশে উদ্যত হন। সমাজের দরিদ্র এবং অন্ত্যজ মানুষ তাঁদের এই সংগ্রামে যোগ দেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ধর্মীয় আচরণে যারা সংস্কারপন্থী ভাবধারার সমর্থক ছিলেন, তারা ব্যাপটিজমকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু যারা ধর্মীয় আচরণে চরমপন্থী ভাবধারার সমর্থক ছিলেন তারা ব্যাপটিজম সহ সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে বিরোধিতা করেন। তাই এরা 'অ্যানাব্যাপটিস্ট' নামে পরিচিত ছিলেন।

এই ধরনের চরমপন্থী ধর্মীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন টমাস মুনজের। প্রথমে তিনি লুথারের অনুগামী থাকলেও পরে তিনি ব্যাপটিজম এর বিরোধিতা করেন। বস্তুতপক্ষে দরিদ্র মানুষের কাছে এই আচার বর্জিত ধর্মচর্চার অনেক বেশি আবেদন ছিল। কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে ধর্মীয় সংস্কার শুধুমাত্র পারলৌকিক মুক্তির বিশ্বাসী নয়, বরং তা সমস্ত রকমের সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তির পথ ছিল। এই ধরনের প্রতিবাদী চেতনা জার্মানিতে কৃষক অভ্যুত্থানের প্রেরনা হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৫২৪—এর কৃষক বিদ্রোহকে মুনজের ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে বর্ণনা করেন। তিনি বিদ্রোহীদের নতুন সমাজ গঠন করার সৈনিক বলে বর্ণনা করেন।

তবে এই বৈপ্লবিক প্রতিবাদী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ১৫২৫ সালে তা দমন করা হয় এবং মুনজের কে হত্যা করা হয়। এর পর এক দশক পর মুনস্টার এ বৈপ্লবিক প্রতিবাদী আন্দোলনের পুনরুত্থান ঘটতে দেখা যায়। এই এলাকার আন্দোলন ছিল নগরভিত্তিক এবং সেখানে একটি সদ্ ধর্মে বিশ্বাসী স্বনির্ভর সম্প্রদায় গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এটি আধুনিক নৈরাজ্যবাদী চেতনার সঙ্গে তুলনীয়। উল্লেখ্য, মুনস্টারের অ্যানাব্যাপটিস্টরা আদর্শ খ্রিষ্টীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ার যে চেষ্টা করেছিলেন, তার সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজ চেতনার অনেক মিল আছে। ১৫৩৪ সালে নগরের প্রাশসনিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে এই বিপ্লবীবাদী সংস্কারকগণ। এদের নেতৃত্বে

ছিলেন ইয়ান ম্যাথিস ও জন নামে দুজন হল্যান্ডের ব্যক্তি। এই চরমপন্থী অ্যানাব্যাপটিস্টরা শহর জীবনে যে ধরনের পরিবর্তনের সূত্রপাত করেন তা পরবর্তীকালের সাম্যবাদী বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করেন ঐতিহাসিক কুইন্টেন স্কিনার। শ্রেণীভেদ এবং সম্পদজনীত বৈষম্যকে তাঁরা যাবতীয় সামাজিক ভেদাভেদের অন্যতম উৎস বলে মনে করেন। তাই তাদের মতে, একটি ঈশ্বরবিশ্বাসী খ্রিস্টীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিসম্পত্তির অবসান প্রয়োজন। এছাড়াও তারা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার বিরোধিতা করেন। কালক্রমে এই ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চরমে উঠলে তা সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। আঞ্চলিক রাজশক্তি এই সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হানে। জার্মান রাজাদের দ্বারা মুনষ্টার আক্রান্ত হয়।

এরপর উগ্রবাদী ধর্মসংস্কারকরা কয়েকটি অঞ্চলে ছোটো ছোটো শান্তিবাদী গোষ্ঠী গড়ে তোলে। ১৫২৫ সালে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ-এ কনরাড গ্রেবেল নামে একজন অ্যানাব্যাপটিস্ট সৎধর্মীদের জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি স্বনির্ভর সমাজ গড়ে তোলেন। এদের আরেকটি কেন্দ্র ছিল মোরাভিয়া যেখানে জ্যাকরহুটার নামে একজন চরমপন্থী সংস্কারবাদী প্রটেস্টান্ট এই ধরনের একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলেন—যা আধুনিক সাম্যবাদী সমাজের সাথে তুলনীয়।

জার্মানির উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরমপন্থী আন্দোলন শুরু হওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এর প্রভাব জার্মানির অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল জার্মানির কৃষকশ্রেণীর মত সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা। কারণ তারাই বিভিন্নভাবে রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের করভার ও আর্থিক নিষ্পেষণে অত্যাচারিত হত। ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে মুনজের 'Sermons before the Princes' নামক একটি লুথার বিরোধী প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য হল মধ্যবর্তী যাজক বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনাবশ্যক একথা প্রচার করা ছাড়াও সদধর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা প্রদানকারী রাজশক্তির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া দরকার বলে মুনজের মনে করতেন।

অন্যদিকে অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলনের অপর একটি ধারা—যা কনরাড গ্রেবেল ও তাঁর সহযোগী মাজঁ প্রচার করেন—যেখানে একটি রাষ্ট্রবিহীন বিচ্ছিন্ন, সাম্যবাদী সমাজগঠনের নৈরাজ্যবাদী অলীকতত্ত্ব প্রচার করা হয়েছিল। তাঁরা মূলত ছিলেন শান্তিবাদী ও অল্পবিস্তর পলায়নি মনোবৃত্তি সম্পন্ন। তাঁরা রাষ্ট্রপ্রীতির সমালোচনা করেন। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে 'শ্লাইটহাইমের ম্যানিফেস্টো'তে (Schleitheim manifesto) নৈরাজ্যবাদী মতের মূল তত্ত্বগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। রাষ্ট্রশক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত এই মত মেনে নিলেও তাঁরা রাষ্ট্রের চিরন্তন অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের মতে যে সমাজে অসদাচার অনুপস্থিত, সেই সুসংস্কৃত শান্ত পরিবেশে রাষ্ট্রীয় শাসনের কোনো প্রয়োজন নেই। সমাজে অসম ধনবন্টনকে তাঁরা সামাজিক অশান্তি ও দ্বন্দ্বের উৎস মনে করে যৌথ সম্পত্তির আদর্শকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

(১) পৃথিবীর ইতিহাস—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(২) ইউরোপে যুগান্তর—ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়।

৩.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

(ক) ইউরোপে যুগান্তর—ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়।

(খ) রূপান্তরিত ইউরোপ—রীলা মুখার্জী।

(গ) The Rise of the Modern west—Menakshi Phukan.

(ঘ) পৃথিবীর ইতিহাস—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩.১.৬ : নমুনা প্রশ্ন

(ক) মধ্যযুগে খ্রিষ্টানতন্ত্রের সার্বিক বিকাশ কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল?

(খ) পোপতন্ত্রের দুর্নীতি কিভাবে চার্চ বিরোধী মানসিকতার প্রসার ঘটিয়েছিল?

(গ) মধ্যযুগের আদিপর্বের ক্যাথলিক সংস্কার সম্পর্কে যা জান লেখো?

(ঘ) ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে মার্টিন লুথারের অবদান আলোচনা করো?

(ঙ) চরমপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূল ধারাগুলি বিশ্লেষণ কর?

পর্যায়-২

ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

একক-৩

সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা

একক-৪

ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি

একক-৫

পতনের প্রক্রিয়া

একক-৬

সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কিত বিতর্ক

সূচীপত্র :

৩.২.১ : উদ্দেশ্য

৩.২.২ : সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা

৩.২.৩ : ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি

৩.২.৪ : পতনের প্রক্রিয়া

৩.২.৫ : সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কিত বিতর্ক

৩.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.২.৭ : নমুনা প্রশ্ন

৩.২.১ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রথা তথা সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, আঞ্চলিক বৈচিত্র এবং তাঁর পতন সম্পর্কে জানতে পারবে। সামন্ততন্ত্র তথা বিশেষ ধরনের ভূমি

ব্যবস্থাপনা কিভাবে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রীয় শক্তিকে অগ্রাহ্য করে সামন্ত প্রভুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সর্বোপরি এ হেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথার পতন সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারবে। সামন্ততন্ত্রের পতনের পরই ইউরোপে ধনতন্ত্রের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এটি Transition Phase বা 'যুগান্তর পর্ব' নামে অভিহিত। এই প্রথা এবং তাঁর পদ্ধতি কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক মহলে যে বিতর্ক আছে তা শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করবে। উল্লেখ্য, পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের চরিত্র একই রকম ছিল না। এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী জানতে পারবে যে, পশ্চিম ইউরোপের যখন সামন্ততন্ত্র পতনের পথে ধাবিত হচ্ছে তখন পূর্ব ইউরোপে তা কিভাবে টিকেছিল।

৩.২.২ : সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা

সামন্ততন্ত্র ইউরোপের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। মধ্যযুগে ইউরোপে তিনটি স্তম্ভের (জার্মান জাতিগোষ্ঠীর রাজ্য শাসন পদ্ধতি, খ্রিষ্ট ধর্ম ও সামন্ততন্ত্র) উপর ভিত্তি করে তাদের সমাজ ও সভ্যতার সৌধ নির্মিত হয়েছিল। সেই তিনটি স্তম্ভের মধ্যে নিঃসন্দেহে সামন্ততন্ত্র বিশেষভাবে আলোচিত। কারণ সামন্ততন্ত্র ইউরোপের ইতিহাসে এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, মধ্যযুগকে অনেক সময় সামন্ততন্ত্রের যুগ বলেও চিহ্নিত করা হয়।

সামন্ততন্ত্র ছিল প্রধানত এক প্রকার ভূমি ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থা সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী অর্থাৎ নবম শতক থেকে পনের শতক পর্যন্ত ইউরোপবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং তাদের আচার-আচরণ ও ভাবধারার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উৎপত্তিগত ভাবে দেখতে গেলে দেখা যায়, 'সামন্ততন্ত্র' একটি ল্যাটিন শব্দ Feud am থেকে এসেছে। এখানে 'Feud am' এর অর্থ 'Fief' বা 'ক্ষুদ্র জমি।' অন্যদিকে হস্তান্তরিত ক্ষুদ্র জমিকে অথবা শর্তাধীনে জমি দানকে বলা হতো 'Fief' বা 'Feud।' আর এই 'Feud' থেকে 'Feudal' (সামন্ত) এবং 'Feudal' শব্দ থেকেই সামন্ততন্ত্র বা Feudalism শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে।

সামন্ততন্ত্র বিকশিত হয়েছিল এমন একটি সময়ে যখন সম্পদ ও ক্ষমতার উৎস ছিল একমাত্র জমি। জার্মান অভিবাসনের সময় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ সময় মূলত জমি কেন্দ্রিক উৎপাদন গুরুত্ব লাভ করায় জমির মালিকের নিকট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। সামন্ত প্রথার উৎপাদনের কাজে সামন্ত প্রভুদের কোনো ভূমিকা থাকতো না। উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকতো কৃষক ও ভূমিদাসগণ অথচ উৎপাদিত ফসলের এক বিরাট অংশ লাভ করত সামন্ত প্রভুরা।

'সামন্ততন্ত্র' একটি ভূকেন্দ্রিক সরকারী ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিবর্তে স্থানীয় ভূস্বামীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়েছিল। যদিও যথাযথভাবে সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার। কারণ একক কোন সংজ্ঞায় সামন্ততন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এছাড়া ঐতিহাসিকদের

মধ্যেই এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, দশম ও এগারো শতকে ইউরোপে যে বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাই সামন্তব্যবস্থা। এছাড়া জার্মান ঐতিহাসিক গ্যানশফ বলেন, মধ্যযুগে ইউরোপে এমন কতগুলো অদ্ভুত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল যা একখণ্ড জমিকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। এর অর্থ হল একজন আর একজনকে জমি দান করবে এবং জমি দাতা হচ্ছেন 'লর্ড আর যিনি গ্রহীতা তিনি হলেন 'ভ্যাসাল।' এই 'লর্ড' ও 'ভ্যাসালে'র মধ্যে যে সম্পর্ক এবং তার ফলে যে ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল তাই হলো সামন্ততন্ত্র বা সামন্ত ব্যবস্থা। সুতরাং সামন্ততন্ত্র বলতে এমন কতকগুলো প্রথা, বিধি ও ব্যবস্থার সমষ্টিকে বোঝায় যেখানে শক্তিশালী মানুষ দুর্বল মানুষকে সাহায্য করবে এবং এর বিনিময়ে দুর্বল মানুষ শক্তিশালী মানুষকে সেবা করতে বাধ্য থাকবে।

৩.২.৩ : ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি

সামন্ততন্ত্র (ইংরাজি : Feudalism) মানুষের সামাজিক আর্থিক বিকাশের একটি পর্যায়। মানুষের সামাজিক বিকাশ তার জীবিকার উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ভিত্তিতে প্রধানত নির্দিষ্ট হয়। জমির কর্ষণ থেকে জীবন ধারণের প্রধান উপায় শস্য লাভের কৌশল মানুষের আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দাস সমাজের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে নতুন সামন্ত সমাজের উদ্ভব হয়। সামন্ত সমাজের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি জমি। জমির মালিকানার ভিত্তিতে জমির প্রভু বা সামন্তপ্রভুর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই প্রাচীন দাস সমাজের পরে সামন্ত সমাজের বিকাশ ঘটেছে। উৎপাদনের উপায়ে নতুনতর বিকাশে সামন্তসমাজের স্থানে আধুনিককালের পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং মধ্যযুগীয় ইউরোপের আর্থিক সংগঠন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মূল সম্পদ বা উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্রই ছিল জমি। জমিকে মূলধন হিসাবে কেন্দ্র করে সম্পদের উৎপাদন হত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবাদর্শগত উৎপাদনগুলি সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল—যার মূলে ছিল অক্ষমতা।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিযুক্ত শ্রেণী হিসাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাজার নাম উল্লেখ করা যায় যিনি কেন্দ্রীয় শক্তির মালিক, তাঁর অধীনস্থ বা নিম্নস্থ কর্মচারীরা হলেন সামন্তপ্রভু, করণ এবং নাইট—যারা নিম্নস্তরের কৃষিমজুর ও কেন্দ্রীয় শক্তির মধ্যবর্তী শক্তিরূপে অবস্থান করত। এই 'বিন্যাস ব্যবস্থাকে' 'ত্রিস্তরীয় পিরামিড' বা 'Three tiered Pyramidal System' বলে অভিহিত করা হয়।

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় যে, অষ্টম শতকে ক্যারোলিঞ্জীয় বংশের সম্রাট শার্লাম্যানের সময়কালে এর উদ্ভব। বস্তুতপক্ষে আলোচ্য সময়কালে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের আর্থিক ভিত্তি ছিল দুর্বল। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন ছিল। ফলস্বরূপ ভূমির উপর চাপ বাড়তে থাকে। কারণ ভূমিই ছিল কৃষি উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম। শার্লাম্যান বেশীরভাগ কৃষিজমি শক্তিশালী ব্যারণদের দিয়ে দিতেন। বিনিময়ে তারা সম্রাটের সার্বোভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল 'Proviso' নীতির মাধ্যমে। এই সমস্ত ব্যরণ বা স্থানীয় প্রভুরা নিজেদের অধীনে সেনাবাহিনী রাখতে

পারত যার ভরনপোষণের জন্য সাহায্য আসত সম্রাট বা সার্বোভৌম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। এই জাতীয় অনুদান (জমি) প্রচুর নিয়মনীতির অনুশাসন (Codes of Conduct) এর দ্বারা পরিচালিত হত। দান গ্রহীতা জমি প্রদানকারী ব্যক্তির অনুগত পাত্র বা আজ্ঞাবহ কর্মচারীতে (Fief or vassal) পরিণত হত। তাদের দ্বারা গৃহীত জমি বা এস্টেট 'ম্যানার বা খাসতালুক' (Demesne) নামে পরিচিত ছিল। এই এস্টেট কালক্রমে তাদের নিজস্ব জমি বা 'Fiefdom'—এ পরিণত হয়। ঐতিহাসিক রীলা মুখার্জী এ প্রসঙ্গে বলেন যে, সার্বভৌম শক্তির সঙ্গে তালুকদারদের সম্পর্কে পিতৃতন্ত্রের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছিল যার প্রধান বন্ধন ছিল আইনের কিছু অনুশাসন এবং নিয়মনীতি (Codes of Conduct) এবং 'শিভ্যালরি' (Chivalry) প্রথা। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট এবং তাঁর অনুগৃহীত শক্তি উভয়ের কাছেই এই সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন ছিল কল্যাণকর এবং সুবিধাজনক। কারণ অষ্টম এবং নবম শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ব্যবস্থা ছিল অর্জিত সম্পদ সমানভাবে ভাগ এবং ভোগ করার এক ব্যবস্থা যখন রাজা বা কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল দুর্বল ও ভারসাম্যহীন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র সমানভাবে সুশাসন বজায় রাখা ছিল অসম্ভব। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য নিকটবর্তী জঙ্গল এলাকা পরিষ্কার করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ঐতিহাসিক আঁরি পিরেন (Henry Pirenne) তাঁর 'Muhammad and Charlemagne' (1922) প্রবন্ধে বলেন যে, ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্রপথে আরবদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতি অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়লে বাণিজ্য সংকুচিত হয় এবং এর ফলে ইউরোপে দেখা যায় এক 'রুদ্ধদ্বার অর্থনীতি' (Economy of no out less)। নবম শতকে রাষ্ট্রযন্ত্র বিশেষ করে সামরিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এমনভাবে করা হয় যাতে ভূসম্পত্তি এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। এই কারণে পিরেন বলেন যে, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভাঙন এবং জমির অধিকারের ভিত্তিতে উদ্ভূত সমান্তরাল আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের উত্থান ছিল ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের মূল প্রকৃতি। এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পিরেনের একটি বিখ্যাত উদ্ধৃত ছিল যে, 'Charlemagne would have been inconceivable without Muhammad' (মহম্মদ না থাকলে শার্লাম্যানকে—যিনি সমস্ত শক্তির প্রতীক-কল্পনা করা যেত না।)

জার্মান ঐতিহাসিক আলফন্স ডপশ দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে পিরেন তত্ত্বের মধ্যে কিছু সংশোধন আনেন। তাঁর মতে, পশ্চিম ইউরোপে ভূমধ্যসগারীয় বাণিজ্য এবং নগর সভ্যতার পতন অষ্টম শতাব্দীতে হয়নি, হয়েছিল নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এছাড়া ডপশ দাবি করেন যে, পিরেন শুধু ঘটনাকাল সম্বন্ধে নয় ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের পতনের কারণও ভুল নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র আরব আক্রমণ নয়, পশ্চিমে ম্যাগিয়ার (Magyar) এবং উত্তর দিক থেকে ভাইকিং-দের ক্রমাগত আক্রমণের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় পশ্চিম ইউরোপ। বহিঃশত্রুর এই ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে এবং অবাধ লুঠতরাজের ফলে ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। এই চরম নিরাপত্তাহীনতার যুগে ইউরোপীয় অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। সামাজিক প্রতিপত্তি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা জমিনির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। জন্ম নেয় সামন্ততন্ত্র।

সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তালুকদার বা সামন্তপ্রভুর পরবর্তী স্তরে সার্ফ বা ভূমিদাসদের সম্পর্ক ছিল না, বিশেষ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণও তাদের উপর আরোপ করা হয়েছিল। তারা সামন্তপ্রভুদের জমিতে খাটতে ও ফসল ফলাতে বাধ্য ছিল। সামাজিক এবং আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে তাদের জন্ম এমনকি বিবাহও নিয়ন্ত্রণ করতে সামন্তপ্রভুরা। তারা 'জমির প্রতি আবদ্ধ' (tied to their land) ছিল এবং পালাবার চেষ্টা করলে বলপূর্বক খামারে ফিরিয়ে আনা হত। এমনকি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সামন্তপ্রভুদের প্রভাব শক্তিশালী ছিল। ভূমিদাসদের ক্ষুদ্র জমি দেওয়া হত জীবন যাপনের জন্য, জমি থেকে তারা উৎপাদন করত এবং বেশিরভাগ দিনই তারা প্রভুর জমিতে খাটতে বাধ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক খাজনা বা ভাড়া ছিল একপ্রকার যান্ত্রিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অসম সম্পর্কের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে 'শ্রম' বা ভূমিদাসরা প্রভুদের দিতে বাধ্য থাকতো। এটি শ্রমকর বা খাজনা নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে 'শ্রমকর' বা 'খাজনা' উপহার বা 'করের বিনিময়ে জিনিষ' এ পরিণত হয় যার নাম ছিল 'rent in kind'.

একটি বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের কোনো প্রকৃতিগত সাযুজ্য নেই। যেমন—ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ মনে করেন যে ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ছড়িয়ে পড়লেও প্রকৃত সামন্ততন্ত্র কেবল প্রাক্তন ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যেই (বর্তমান ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি এবং মধ্য-পশ্চিম ইউরোপ) দেখা যায়। এর বাইরে প্রকৃত সামন্ততন্ত্র কোথাও ছিল না। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আলোচনায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মার্ক ব্লখের মতে, পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে 'প্রথম সামন্ত যুগে' অর্থাৎ নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। এই পর্যায়ে বর্তমান জার্মানির পশ্চিমাংশ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্র সীমিত ছিল। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র না থাকলেও সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বাদশ শতাব্দীর পর ছড়িয়ে পড়ে, যার মূল ভিত্তি 'fief' এবং 'vassalage' ছিল না, ছিল 'manorialism'। ব্লখ এটিকে 'দ্বিতীয় সামন্ত যুগ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সে দেখা যায়, দশম শতাব্দীর নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতিতে (আরব ও ভাইকিংদের আক্রমণের ফলে) সামরিক শক্তির অধিকারী সামন্তপ্রভুরা তাদের এলাকার সংলগ্ন কৃষি অর্থনীতি তথা কৃষি সমাজের উপর রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে খন্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্সে রাজশক্তি নামমাত্রই ছিল। সামরিক কারণে বিভক্ত ডাচি (Duchy) বা সীমান্তবর্তী (March)—তে আঞ্চলিক সামরিক নেতারা যথাক্রমে ডিউক বা মারগ্রেভ হিসাবে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শাসনভার করায়ও করে ফেলেন।

ইতালিতে আবার দশম শতাব্দীতে জার্মান শাসন প্রতিষ্ঠা হলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু হয়। একাদশ শতাব্দীর গোঁড়ায় জার্মান শাসন শিথিল হয়ে পড়লে জার্মান আমলে যারা আঞ্চলিক শাসনভার লাভ করেছিল তারা পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করাতে ইতালিতে সামন্তীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু বিদেশী

শক্তির উপস্থিতি, নগরজীবন তথা বাণিজ্যিক গুরুত্ব ইতালিতে অনেক বেশি ছিল, এইসব কারণেই ইতালির সামন্ত সমাজ কখনোই তীব্রতা লাভ করে নি।

ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব হয় ১০৬৬ সালে হেস্টিংসের যুদ্ধের দ্বারা। নর্মানরা ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ইংল্যান্ডে আরোপ করেছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের এই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো অনেকটাই অনমনীয় ছিল। এখানে রাজশক্তি, সামন্তপ্রভু এবং সামন্তের পারস্পরিক সম্পর্ক কাঠামোর মধ্যে যতটা সুস্পষ্টতা ছিল, কার্যক্ষেত্রে তা অতটা সহজ ছিল না। এর ফলেই মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের ইতিহাসে রাজশক্তি এবং সামন্তশক্তির মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চোখে পড়ে।

অন্যদিকে জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলে সামন্তীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইনভেস্টিচার দ্বন্দ্বের সূত্রে। ক্যারোলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের বিভাজনের পর ফ্রান্স বা ইতালির মত খন্ডরাজ্যে জার্মানি বিভক্ত না হয়ে পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই পাঁচটি অঙ্গরাজ্য কার্যত সামরিক বিভাগ বা ডাচি হবার কারণে এদের বৈধ শাসনকর্তা ডিউক শুরু থেকে ভাইকিং, ম্যাগিয়ার এবং আরব আক্রমণের মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হন। এই পাঁচটি অঙ্গ রাজ্য মিলিত হয়ে জার্মানি রাজ্য সৃষ্টি করে। ১০৭৫ সাল নাগাদ জার্মান সম্রাট হেনরীর সাথে পোপের সংঘাত শুরু হলে জার্মান অভিজাতবর্গ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। পোপ চতুর্থ হেনরিকে খ্রিষ্টান দুনিয়া থেকে বহিষ্কার করলে অভিজাতবর্গ হেনরিকে রাজা হিসাবে মানতে অস্বীকার করে। এই চরম বিশৃঙ্খলার সময়ে রাজার খাসজমি থেকে শুরু করে স্বাধীন কৃষক-সর্বত্র অভিজাতরা সামন্ততন্ত্র সুলভ নিরাপত্তা-আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করেন।

পূর্ব ইউরোপের সামন্তীকরণ ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে। উল্লেখ্য এই সময় জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও কৃষি উৎপাদনের হার সেভাবে বাড়েনি। জার্মানির সামন্তপ্রভু এবং সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্বে 'পূর্বমুখী যাত্রা' শুরু হয়, যার প্রভাবে জার্মান কৃষকরা পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। এই অঞ্চলে কৃষি-সম্প্রসারণ এবং সামন্ত সমাজের সীমা বিস্তারের মূল উদ্যোক্তা জার্মান সামন্তশ্রেণী হবার ফলে ইউরোপের এই অংশে রাজশক্তি কার্যত অনুপস্থিত ছিল। সামন্ত শ্রেণীর প্রবল প্রতাপ অচিরেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক চরিত্রও অচিরেই পাল্টে দিতে থাকে। এই কারণেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভিতরে এবং বাইরে সমগ্র পূর্বে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য দশম থেকে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির সামন্তীকরণের ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক রীতি এবং প্রতিষ্ঠানের মূলগত চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। এর মধ্যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ছিল জনসভা বা Assembly র প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ। ইতিপূর্বে শার্লাম্যানের অধীনে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যে সামরিক অভিযানের পূর্বে এই ধরনের জনসভার আয়োজন করা হত। কিন্তু দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ায়

সমস্ত ইউরোপ জুড়ে রাজার ডাকা জনসভার আয়তন ক্রমশ কমতে থাকে। জনসভার প্রকৃতিতেও কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছিল। রাজশক্তি দুর্বল হওয়ার ফলে কম শক্তিধর সামন্তপ্রভু তার থেকে শক্তিশালী সামন্তপ্রভুর কাছে স্বাধীনতা হারাবার আশংকা করত। বস্তুতপক্ষে এই ধরনের দুর্বল সামন্তপ্রভুরা আত্মরক্ষার জন্য রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাজাই হয়ে ওঠেন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বৃহত্তম সামন্তশক্তি বা 'Feudal Superir'। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ফিলিপ অগাস্টাস এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নবম লুই এইভাবেই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে রাজশক্তিকে শক্তিশালী করেছিলেন। রোমান রাজনৈতিক মতানুসারে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার তত্ত্বকে অস্বীকার করে রাজশক্তির সামন্ততান্ত্রিক আইন মেনে চলতে বাধ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। উল্লেখ্য, যে রাজ্যে এই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা রাজার উপর চাপিয়ে দিতে সামন্তশক্তি সফল হয়েছিল, সেরাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে যেখানে রাজশক্তি এই কাঠামোর সদ্ব্যবহার করে সামন্ততান্ত্রিক আইনের সাহায্যে শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর চরিত্র ছিল কেন্দ্রভিমুখী (Centripetal)। আবার, সামন্তশক্তি যেখানে এই কাঠামোর বিবর্তনের গতি নির্ধারণ করতে পেরেছিল সেখানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রবহির্মুখী (Centrifugal)।

৩.২.৪ : পতনের প্রক্রিয়া

১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে সামন্ততন্ত্রের চরম সময়সীমা বলে মনে করা হয়। কারণ বারো শতকের পরবর্তী দুটি শতকে সামন্তপ্রথার মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা উন্নয়নমুখী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। চোদ্দ শতকের আর্থিক মন্দা ইউরোপীয় অর্থনীতির উপর সামগ্রিক চাপ ফেলেছিল যা তার অতিরিক্ত উৎপাদনশীলতাকে এবং গতিবেগকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। এর ফলে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার পরিকাঠামোতেও পরিবর্তন আসে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি, নগরায়ন এবং রাজনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তনশীলতার মিলিত ফল হিসাবেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এক সংকটের সম্মুখীন হয়। যদিও এই সময় কৃষি জমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং জমির মালিকানায় সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রশক্তি আর পুরোপুরি সামন্তশক্তির সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল না। একথা বলা যেতে পারে যে, রাজনীতির ভরকে ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে সরতে থাকে।

এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ইঙ্গিত ছিল রাজার দ্বারা আহ্বান করা সমাবেশের পরিবর্তিত কার্যাবলী। ইতিপূর্বের আয়োজিত সভায় প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকত। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ক্রমশ এটি রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় অঙ্গ হিসাবে গণ্য হতে থাকে। পূর্বের সভাগুলিতে বণিকদের উপস্থিতি বা গুরুত্ব তাদের অর্থনৈতিক তাৎপর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কিন্তু নগরাঞ্চলের উপর রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর মূল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নাগরিক বণিক গোষ্ঠীর উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

কারণ এই প্রথম রাষ্ট্র বলতে সামন্তব্যবস্থার বাইরের নাগরিক সমাজকে গণ্য করা শুরু হয়েছিল। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল রাষ্ট্রচিন্তনে। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই রাজ্যশাসকরা নিজেদের নিছক জনগোষ্ঠীর রাজা বলে পরিচয় দেওয়া ছাড়াও তাঁরা নিজেদের 'রাষ্ট্রনায়ক' বলে ভাবতে চাইতেন। সর্বোপরি এই সময় থেকে তারা সামন্তশক্তির উপর প্রভুত্ব কায়েম করাকে শুধুমাত্র সামরিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ না রেখে ক্রমশ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দাবী করতে শুরু করেন। এছাড়া নাগরিক সমাজ ও সামন্তসামজ উভয়ের কাছ থেকেই রাজস্ব আদায়ের অধিকারও অগ্রাধিকার পেতে শুরু করে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যেই রাজকীয় সভাকে নিয়মিত ব্যবহার করা হতে থাকে।

ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রূপে রাজকীয় সভা অনুষ্ঠিত হত। ফ্রান্সে এই ধরনের রাজকীয় সভা বছরে দুবার অনুষ্ঠিত হত। একবার ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলগুলির জন্য এবং আরেকবার দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রদেশগুলির জন্য। স্পেনে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সামন্ত সমাজ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজকীয় সভার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান রাজ্যগুলিতেও এই ধরনের রাজকীয় সভা বারংবার অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ইংল্যান্ডে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই ধরনের সভার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে—যা কিছুদিনের মধ্যেই 'পার্লামেন্ট' (ইংল্যান্ড) বলে অভিহিত হতে থাকে। রাজার প্রনীত আইন রাষ্ট্রের সব স্তরের মানুষকে মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করা হতে থাকে। উল্লেখ্য, নতুন কর আরোপ করার আগে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্মতির যে প্রয়োজন রয়েছে, তা এই সময় থেকেই অনুভূত হতে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ জানানোর রীতিও এই সময় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তবে সর্বত্র যে রাজশক্তি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সফল ব্যবহার করতে পেরেছিল তা নয়। জার্মান অভিজাতবর্গ এই ধরনের রাজকীয় সভা ব্যবহার করে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, চতুর্দশ শতকের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এক ব্যাপক সংকটের সম্মুখীন হয়। ইতিপূর্বে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র তীব্রতম হয়ে উঠেছিল। উক্ত সময়ের উল্লেখ্যযোগ্য অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল কৃষিজমির উপর সামন্তপ্রভূদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ, জমির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকা ইত্যাদি। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। ইউরোপের দূরপাল্লার বাণিজ্যের প্রসার এবং ফলস্বরূপ নগরজীবনে শুরু হওয়া প্রাণের সঞ্চার সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভাঙন ধরায়।

৩.২.৫ : সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কিত বিতর্ক

রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক—যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঐতিহাসিকেরা একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন। এটি হল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সামন্ততন্ত্র তীব্র হয়ে উঠেছিল। তবে ত্রয়োদশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। উল্লেখ্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। কারণ এটি শুধু এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসানই নয়, বরং এর সঙ্গে অপর একটি যুগব্যবস্থার উত্থানের প্রশ্নও জড়িত আছে। যা ধনতন্ত্র নামে পরিচিত। এই রূপান্তরের ঘটনা এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিংশ শতকের গোঁড়ায় এক বিতর্ক দেখা দেয়—যা 'যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক' বা 'transition debate' নামে পরিচিত। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের হাত ধরে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রথাকে, তার পদ্ধতিকে, এবং নিয়মপ্রনালীকে ঘিরে পণ্ডিত মহলে প্রচুর মতামত আছে। তিনপ্রকার গোষ্ঠীর মধ্যে এই বিতর্ক দেখা যায়-প্রথমতঃ ডব-সুইজি; দ্বিতীয়তঃ মাইকেল পষ্টান ও রর্বাট ব্রেনার এবং তৃতীয়তঃ হবসবম—ট্রেভর—রোপার। এক্ষেত্রে প্রথম দুটি বিতর্ক বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

মরিস ডব ও পল সুইজি

ব্রিটিশ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ মরিস ডব ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'Studies in the Development of Capitalism' গ্রন্থে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার পতন সম্পর্কে দুটি অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভরকেন্দ্র ভূমিদাসপ্রথার অবসানই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পচনের সূচক। দ্বিতীয়তঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের জন্য দায়ী ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর নিহিত অন্তর্বিরোধ। মূলত ডবের আলোচনায় সামন্ততন্ত্রের পতন উৎপাদন সম্পর্কের বা 'Production relation' এর মধ্যে নিহিত ছিল।

ডবের মতে, দশম শতাব্দীতে কৃষি নির্ভর ইউরোপীয় অর্থনীতিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত মানুষ স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির চাপে সামন্তপ্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে ভূমিদাসে পরিণত হয়। প্রতিটি সামন্তপ্রভুর অধীনস্ত এলাকা বা 'ম্যানর'-এ বসবাসকারী ভূমিদাসপ্রথাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ম্যানরের বাইরে বা বন্দরে কেনাবেচার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের কোনো তাগিদ ছিল না। তাই সামগ্রিকভাবে এই ধরনের অর্থনীতিকে বলা হত 'Economy of no out less.'

কিন্তু সাধারণত ম্যানরে ব্যবহার হয় এমন অধিকাংশ বস্তু ম্যানরে প্রস্তুত হলেও দৈনন্দিন জিনিসপত্র যেমন —নুন, মশলা ইত্যাদি ম্যানরের বাইরে থেকে আনতে হত। যা যোগান দিতে বনিকেরা। দুপ্রাপ্য পণ্যের বিনিময়ের পরিবর্তে এঁরা ম্যানর থেকে শস্য এবং খাদ্য বা পণ্যদ্রব্য নিয়ে নগরবাসীদের চাহিদা মেটাতেন। একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে ইউরোপীয় দুরবাণিজ্যের প্রসার ঘটলে এই বণিকদের দ্বারা সুদূর এশিয়া থেকে আমদানি করা পণ্যদ্রব্য (যেমন—মশলা, রেশম, মসলিন, ধূপ ইত্যাদি) ইউরোপের প্রায় সর্বত্র পৌঁছাতে থাকে।

তবে ডবের মতে, উন্মুক্ত বাণিজ্যিক দিগন্তই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়ার একমাত্র কারণ নয়। তাঁর মতে, বণিকদের দ্বারা ম্যানরের বাইরে থেকে আনীত নতুন নতুন এবং মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য সামন্তপ্রভুরা প্রজাদের উপর বাড়তি কর চাপাতে থাকেন। পশ্চিম ইউরোপ বাড়তি করের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় ভূমিদাস ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী নগরাঞ্চলে বা জঙ্গলে গা ঢাকা দিত। ভূমিদাস

প্রথার আইন অনুসারে কোনো ভূমিদাস যদি পালিয়ে গিয়ে একবছর গা ঢাকা দিতে সফল হত, তবে সে ভূমিদাসস্থ থেকে মুক্তি পেত। এহেন পরিস্থিতিতে সামন্তপ্রভুরা তাদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে চাইতে শুরু করে। একে বলে 'খাজনার নগদীকরণ।' ডবের মতে, এটিই ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের সূচক। কারণ নগদীকরণের পরে সামন্তপ্রভূদের উৎপাদনের উপর পূর্ববৎ নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ আর ছিল না। ইতিমধ্যে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে প্রজারা ম্যানরের বাইরের বাজারের জন্য উৎপাদন করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ডব বলেছেন, 'there seems in fact, to me as much evidence that the growth of money economy per se led to an intensification of serfdom as there is evidence that it was the cause of the feudal decline.'

ডবের মতে, মাসুলি প্রযুক্তি, সাধারণ উৎপাদনের সাধন দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন বিশাল বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না বলেই ভূমিদাসরা পালাতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে সামন্তপ্রভুরাও উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে চাহিদা এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভবপর ছিল না। চাহিদা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিরোধকেই ডব সামন্ততন্ত্রের 'অন্তর্বিরোধ' (Internal Contradiction) বলেছেন। ডবের মতে যেসব ভূমিদাসরা পালাতে পারত না, তাদের পুরানো ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত শ্রম দিতে হত। এছাড়া তাদের সংখ্যাও খুব অল্প ছিল। এই পরিস্থিতিতেই সামন্তপ্রভুদের কিছু কিছু উপযোগী উপায় যেমন—শ্রমের নগদ মজুরী, ভাড়াটিয়া কৃষকদের খাসজমি লিজ দেওয়া প্রভৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল—যা শেষ পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল সুইজি ডবের এই অন্তর্বিরোধের তত্ত্ব জানেন না। সুইজির দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্রের অবসানে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে দূরবাণিজ্যের প্রসারই ছিল একমাত্র চালিকাশক্তি। ১৯৫০ সালে 'Science and society' নামক পত্রিকায় সুইজি 'Feudalism : A Critique' প্রবন্ধে বলেছেন, একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে পৃথকভাবে ভূমধ্যসাগরীয় এবং উত্তর সাগরীয় বাণিজ্য বাড়তে থাকার ফলে পশ্চিম ইউরোপের নগরজীবন জঙ্গম হয়ে উঠতে শুরু করে। ধর্মযুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকে খ্রিষ্টীয় চেতনা ইউরোপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে ইতালিয় বণিকেরা ভূমধ্যসগারীয় এলাকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার পণ্যসম্ভার নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে প্রবেশ করতে থাকেন। ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স, রাইনল্যান্ড প্রমুখ অঞ্চলের বণিকদের সঙ্গে এই ইতালিয় বণিকদের বাৎসরিক মিলনক্ষেত্র ছিল শম্পান (Champagne) মেলা। এই আন্তঃইউরোপীয় বাণিজ্যপথকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-মধ্য ইউরোপে অসংখ্য নতুন নগরের পত্তন হয় বা ক্ষয়িষ্ণু বহু নগর পুনর্গঠন লাভ করে।

সুইজির মতে, এই নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ। এই সময় নগরবাসীদের চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। নগরাঞ্চলে ম্যানরের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের (শস্য,

সবজি ইত্যাদি) চাহিদা বাড়ার কারণে নগদীকরণ প্রক্রিয়াও কার্যকরী হয়েছিল। অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ পলায়োন্মুখ প্রজারা পশ্চিম ইউরোপের নগরাঞ্চলে আশ্রয় নিলে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এর ফলে ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্রও আয়তনে বাড়তে থাকে। উৎপাদন এই সময় ক্রমশ বাজারমুখী হয়ে পড়লে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অবসান ঘটে সামন্ততন্ত্রের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'It seems to me that the important conflict in this connection is nor between ''money economy'' and ''national economy'' but between production for the market and production for use''. যদিও তিনি বলেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতনে অর্থনৈতিক বাণিজ্যকরণ ছিল এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

মাইকেল পষ্টান ও রবার্ট ব্রেনার

সমসাময়িক ইতিহাসবিদ, মাইকেল পষ্টান উভযের উপরোক্ত মতামত মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে, ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের মূল ব্যাখা খুঁজে পাওয়া যায় জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদি তারতম্যে। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষবিন্দু এবং অবসানের আলোচনাতেও মাইকেল পষ্টান তাঁর জনসংখ্যা-বিষয়ক (demographic) তত্ত্বের অবতারনা করে দেখান যে, সামন্ততন্ত্রের সংকট তার কাঠামোতে নিহিত ছিল না। তা ছিল সামন্তসমাজের আয়তন এবং শক্তি বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

পষ্টান বলেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু কৃষির উৎপাদনশীলতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে পূর্বের পতিত জমিগুলি তখন চাষ করা শুরু হয়, কৃষিজমির উপর চাপ বাড়তে থাকায় জমির উর্বরতা কমতে থাকে। পরিণামে খাদ্য মূল্য বাড়তে থাকে এবং সামন্তপ্রভুরা তাদের খাজনার পরিমাণ বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জমি ব্যবহারের বিনিময়ে ভূমিদাসের প্রদত্ত খাজনা নির্দিষ্ট থাকার ফলে সামন্তপ্রভুরা অন্যান্য খাতে বাড়তি খাজনা আদায় করতে সচেষ্ট হন। যেমন—অন্যায় ধরনের জরিমানা, কর (tillage), সামন্তপ্রভুর জমিতে বাড়তি শ্রম (labour serviecs)। জনসংখ্যা এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবন ধারণের স্বার্থে কৃষিজীবি শ্রেণী সামন্তপ্রভুর উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শ্রমশক্তি এবং জমির তুলনামূলক চাহিদা যোগানের নিরিখে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামন্তপ্রভুর অনুকূলে চলে যায়।

পষ্টান এই মতামত তুলে ধরেন যে, চতুর্দশ- পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল জনসংখ্যাগত কারণেই। কৃষির উপর চাপ বৃদ্ধির কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতির কারণে ব্যাপকহারে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে। ফলস্বরূপ শ্রমের চাহিদা শ্রমের যোগানের তুলনায় বেশি হতে থাকে। চাষের কাজে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হারাবার আশঙ্কায় সামন্তপ্রভুরা খাজনার ভার কমানো ছাড়াও কৃষিজীবীদের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতেই খাজনার নগদীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রশস্ত হয় কৃষিজীবীর স্বাধীনতার ক্ষেত্র। দুর্বল হতে থাকে ভূমিদাসপ্রথা এবং সামন্ততন্ত্র।

অপর একজন ব্রিটিশ মার্কসীয় ইতিহাসবিদ রবার্ট ব্রেনার সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ধনতন্ত্রের উত্থানের পথ ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৭০ এর দশকে 'Past and present' পত্রিকায় ব্রেনার তাঁর 'Agrarian class structure and Economic Development in preindustrial Europe' প্রবন্ধে 'বাণিজিকীকরণ তত্ত্ব' এবং 'জনসংখ্যাতত্ত্ব'-র মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের পতনের যুক্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। বাণিজিকীকরণ তত্ত্বের ব্যাখা করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, পশ্চিম ইউরোপের মত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও বাণিজ্য বিপ্লব সামন্তপ্রভুদের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে খাজনার নগদীকরণের ক্ষেত্র উপস্থিত ছিল। বাণিজ্যের পরিমাণ এতটা কম ছিল না যে, পূর্ব ইউরোপে নগরায়ন সম্ভবপর হত না। ব্রেনার প্রশ্ন তুলেছেন যে, পূর্ব ইউরোপে তাহলে পশ্চিম ইউরোপের মত পরিবর্তন হল না কেন? অন্যদিকে জনসংখ্যা বিষয়ক বক্তব্য তুলে ধরে ব্রেনার আরও প্রশ্ন করেন যে, দ্বাদশ- ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপের দুটি দিকেই জনসংখ্যা বেড়েছিল, এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে দুদিকেই জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। তাঁর মতে, একই ঘটনা পরম্পরার দুটি পৃথক পরিণতি হবার কারণ কি?

ব্রেনার মনে করেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় রাজনীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাঁর মতে রাজনৈতিক শক্তি সমাজের অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাজের আর্থ-সামাজিক চরিত্র নির্ধারণে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস খুব প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়ে থাকে। ব্রেনার বলেন যে, পশ্চিম এবং পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস একরকম ছিল না। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষ বিন্দুতেও পশ্চিম ইউরোপে (বিশেষত—ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল, নেদারল্যান্ডস) রাজশক্তি এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্ষমতার সংঘর্ষ তীব্র হয়। রাজশক্তি কোথাও সামন্ত শ্রেষ্ঠ হিসাবে (যেমন—ফ্রান্স) বা কোথাও দেবাধিকার প্রাপ্ত শক্তি হিসাবে (যেমন—জার্মান শাসনাধীন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) রাজন্যবর্গের বা অভিজাতবর্গের মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয়। এর জন্য রাজাকে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হয় এবং তাঁর সাধন যোগান দিতে পারত একমাত্র কৃষিজীবী মানুষ। এই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর রাজশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় ছিল রাজকীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সামন্তপ্রভুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে রাখা। ঠিক এই কারণেই পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসত্বের তীব্রতম পরিস্থিতিতেও ভূমিদাসদের নুন্যতম কিছু অধিকার ছিল যা সামন্তপ্রভুরাও লঙ্ঘন করতে পারত না। এছাড়া জনসংখ্যার চাপে অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার ব্যাপারে এবং নতুন বসতি পত্তনের ক্ষেত্রে এই কৃষিজীবিরা সামন্তপ্রভুদের অধিকার আরও সীমিত রাখতে সফল হয়। ফলে রাজশক্তি এবং প্রজাবর্গের মিলিত চাপে সামন্তপ্রভুরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা দেয় খাজনার নগদীকরণ, ভূমিদাস প্রথার অবসান এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান।

অপরদিকে পূর্ব ইউরোপে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বাদ দিলে রাষ্ট্রীয়শক্তি বলতে কিছু ছিল না। ফলে সামন্তশক্তির হাতেই সামগ্রিক নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত থাকার ফলে বণিকরা এই অঞ্চলে সম্পূর্ণত

সামন্তশক্তির মুখাপেক্ষা হয়ে বাণিজ্য চালাত এবং এ থেকে লাভবান হয়েছিল শুধু সামন্ত শ্রেণী। এই কারণে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলেও রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই পূর্ব ইউরোপের সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে বলে মনে করতেন রবার্ট ব্রেনার।

উক্ত ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও মার্ক ব্লখ, রোদনী হিলটন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সামন্ততন্ত্রের পতনের বিভিন্ন ব্যাখা প্রদান করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, চতুর্দশ শতকেই সামন্ততন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়। কারণ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপের অর্থনীতি এক সংকটের মুখোমুখি হয়—যা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে ধনতন্ত্রের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

তথ্যসূত্র :

১। ইউরোপে যুগান্তর—ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

২। রূপান্তরিত ইউরোপ—রীনা মুখার্জ্জী

৩। পৃথিবীর ইতিহাস—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৩.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

(১) ইউরোপে যুগান্তর—ভাস্কর চক্রবর্তী, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়।

(২) রূপান্তরিত ইউরোপ—রীলা মুখার্জ্জী।

(৩) The Rise of the Modern west–Menakshi Phukan

৩.২.৭ : নমুনা প্রশ্ন

(ক) তুমি কিভাবে বিশ্লেষণ করবে যে, সামন্ততন্ত্র ছিল একপ্রকার ভূমি ব্যবস্থাপনা?

(খ) মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি আলোচনা করো?

(গ) কোন কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সামন্ততন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল?

(ঘ) সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কে মরিস ডব ও পল সুইজি-র মধ্যে বিতর্কগুলি আলোচনা করো?

(ঙ) মাইকেল পষ্টান ও রবার্ট ব্রেনার কিভাবে সামন্ততন্ত্রের পতনকে ব্যাখ্যা করেছেন?

পর্যায়-৩

'ক্রুসেড'

একক-৭

ক্রুসেডের সংজ্ঞা

একক-৮

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ এর প্রভাব

সূচীপত্র :

৩.৩.১ : উদ্দেশ্য

৩.৩.২ : ক্রুসেডের সংজ্ঞা এবং তার গতিপথ

৩.৩.২.১ : ক্রুসেডের কারণসমূহ

৩.৩.৩ : মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ এর প্রভাব

৩.৩.৪ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.৩.৫ : নমুনা প্রশ্ন

৩.৩.১ : উদ্দেশ্য

ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধ মধ্যযুগীয় ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খ্রিষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত এই ধর্মযুদ্ধ ইউরোপীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষার্থী এই অধ্যায়টি পাঠ করে আলোচ্য সময়কালে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের উদ্ভব এবং গতিপথ সম্পর্কে অবহিত হবে। ক্রুসেডের মূল কারণ হিসাবে খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক পবিত্রভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করতে গিয়ে কিভাবে তা মুসলিম জগতের বিদ্বেষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাও শিক্ষার্থীদের কাছে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে দেখা দেবে। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কারণগুলিও কিভাবে ক্রুসেডকে ত্বরান্বিত করেছিল, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত গ্রন্থগুলি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তা জানতে পারবে। ধর্মীয় উন্মাদনা রাজনৈতিক সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করে এবং তাঁর তীব্রতাও বৃদ্ধি করে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। উল্লেখ্য, এই অধ্যায়সমূহ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে যে, শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বিষয় কিভাবে খ্রিষ্টান

ইউরোপ এবং প্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করেছিল। সর্বোপরি ক্রুসেডের ফলাফল এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। এক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, রেনেসাঁ বা নবজাগরণের পথ সুগম হওয়া, ইউরোপের বাণিজ্যিক কার্যকলাপে পরিবর্তন, নতুন ইউরোপীয় সমাজ গঠনের সূত্রপাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

৩.৩.২ : ক্রুসেডের সংজ্ঞা এবং তার গতিপথ

'ক্রুসেড' শব্দটির দ্বারা মূলত ধর্মীয় যুদ্ধকে বোঝান হয়। তবে কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জনগণ সুদৃঢ় মনোভাব পোষণ করলে তাকেও ক্রুসেড নাম দেওয়া হয়। সাধারণত বিশ্ব ইতিহাসে ক্রুসেড বলতে 'পবিত্রভূমি' অর্থাৎ জেরুজালেম এবং কনস্ট্যান্টিনোপল এর উপর অধিকার কায়েম করার জন্য ইউরোপের খ্রিষ্টানদের সম্মিলিতশক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ১০৯৫-১২৯১ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বেশ কয়েকবার যে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেছিল সেগুলিকে বোঝায়। যদিও 'ক্রুসেড' এর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

কোন যুদ্ধ বা অভিযানগুলিকে ক্রুসেড বলা হবে সে ব্যাপারেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রকৃতপক্ষে পুর্বাঞ্চলীয় অর্থোডক্স বাইজান্টাইন সম্রাট এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন আনাতোলিয়াতে মুসলমান সেলজুক সাম্রাজ্যের বিস্তার রোধ করার জন্য। 'ক্রুসেড' এর বিভিন্ন কারণ ছিল : (১) জেরুজালেম দখল করা, (২) খ্রিষ্টানদের এলাকা পুনরুদ্ধার করা, (৩) খ্রিষ্টান এলাকা রক্ষা করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

প্রথম ক্রুসেডের সূত্রপাত হয় পোপ দ্বিতীয় উর্বানের মাধ্যমে। তিনি ১০৯৫ সালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে সহায়তা প্রার্থনা করেন। প্রথমে ক্রুসেড বলতে মুসলিমদের কাছ থেকে জেরুজালেম শহর ফিরিয়ে নেওয়ার ইউরোপীয় প্রচেষ্টাকে বোঝানো হলেও পরবর্তীকালে অ-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের যেকোন সামরিক প্রচেষ্টাকে ক্রুসেড বলা শুরু হয়।

ধর্মযোদ্ধাগণ মধ্যপ্রাচ্যে সামন্তবাদী রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। তাই ক্রুসেডগুলিকে ইউরোপীয় সম্প্রসারণবাদ ও উপনিবেশবাদের একটি আদি রূপ হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে। এই অভিযানগুলির মাধ্যমেই ইউরোপীয় খ্রিষ্টানেরা সর্বপ্রথম দেশ থেকে বহুদূরে সামরিক অভিযানে বের হয় এবং বহু সংখ্যায় তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম বিদেশে প্রচার করার চেষ্টা চালায়।

ক্রুসেডগুলি ছিল যুদ্ধভিত্তিক খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টান ইউরোপের সম্প্রসারনের বহিঃপ্রকাশ। এগুলিতে ধর্মীয় চেতনার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক চিন্তাধারার মিল ঘটেছিল। এর ফলে খ্রিষ্টানেরা অন্য সংস্কৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ইউরোপে মধ্যযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে ক্রুসেড বিবেচিত হয়।

পোপ ২য় উর্বানের ভাষণের দ্বারা ক্রুসেডের বীজ বপন করা হয়েছিল। সেলজুক তুর্কিদের বিরুদ্ধে বাইজান্টীয়ান সম্রাট আলেক্সিস সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। পোপ উর্বান তাঁর ভাষণে সম্রাট শার্লাম্যান কীভাবে স্যাক্সনদের বলপ্রয়োগে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন এবং স্পেনের মুসলিম শাসকদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

৮১৪ সালে ফ্রাংক জাতির রাজা শার্লাম্যানের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং খ্রিস্টান ইউরোপ আক্রমণের সম্মুখীন হয়। এশিয়া থেকে মজর নামের যাযাবর জাতি এসে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং দশম শতক পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখে। ৮০০ সাল থেকে উত্তর ইউরোপ ভাইকিংয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও হানা দেয়। কিন্তু ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের প্রসার। ইসলামের সামরিক শক্তি ৮ম শতকের মধ্যেই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। তারা ইতালিতেও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। গ্রিকদের চিরায়ত সংস্কৃতির ধারক বাইজান্টীয়ান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করে এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করে। ভাইকিং বা মজর জাতির তুলনায় ইসলামের হুমকি ছিল দ্বিমুখী। এটি ছিল সংস্কৃতি ও ধর্ম উভয়ের যুদ্ধ।

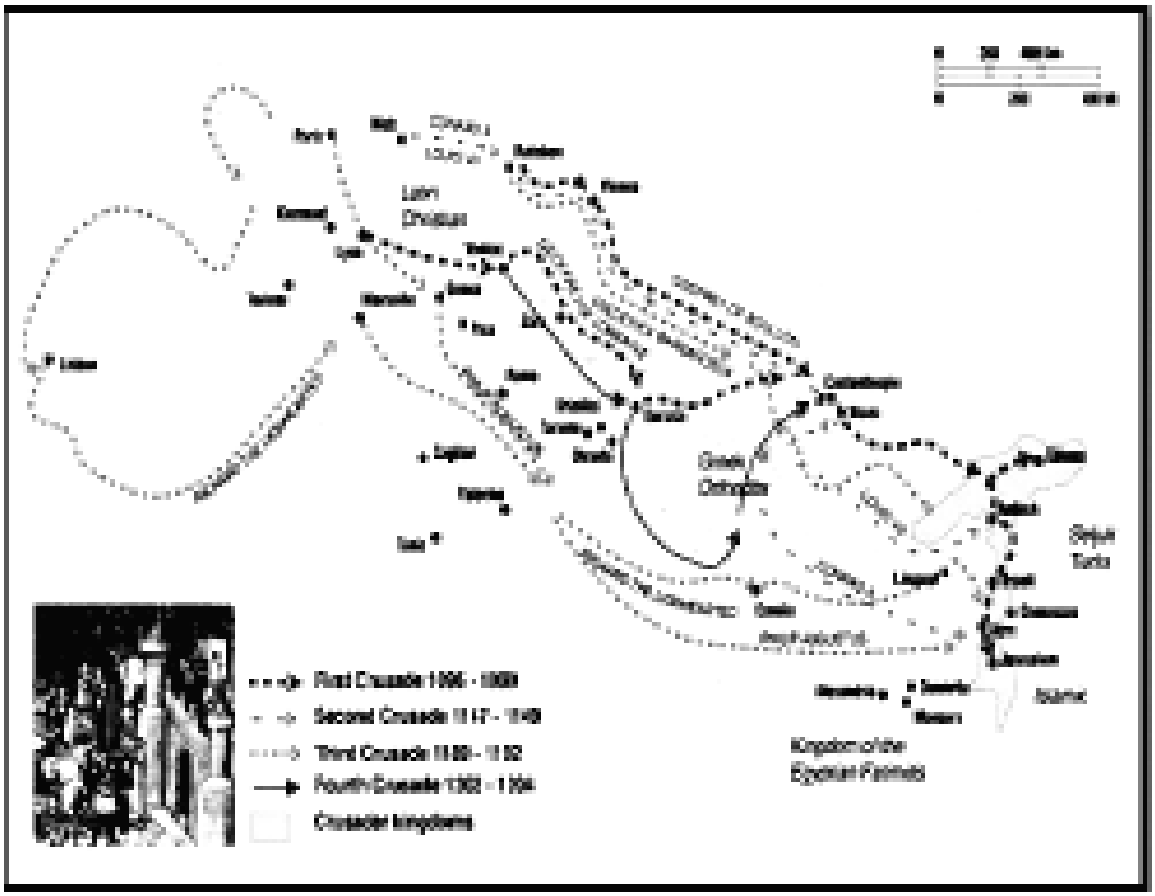
কিন্তু একাদশ শতকে শক্তির ভারসাম্য পশ্চিমের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। খ্রিস্টানদের গীর্জা কেন্দ্রীভূত হয়। রাজারা সরকারী ব্যবস্থায় বিশপদের নিয়োগ শুরু করেন। অন্যদিকে পোপরাও ইউরোপীয় জনমতকে নিজেদের সমর্থনে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন। ফলে ক্রুসেড আরম্ভ করা সহজ হয়ে ওঠে।

সর্বোপরি, এই সময় ইউরোপের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এখানকার নগরজীবনে এসেছিল নতুন জোয়ার। স্থানীয় ও দূরবর্তী বাণিজ্যে সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। ইউরোপের মনুষ্য ও অর্থনৈতিক সম্পদ ক্রুসেডের ব্যয়ভার বহনের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে ইউরোপীয় বণিকেরা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত। কিন্তু এবার তারা দ্রব্য, পরিবহন ও লাভের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের ব্যাপারে উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে। এই পার্থিব অভিলাষ ও পবিত্র ভূমি সম্পর্কে ধর্মীয় অনুভূতির মিশেল, এবং পোপের নেতৃত্বে প্রদানের ক্ষমতা—এ সবই যুগ্মভাবে ক্রুসেডের জন্য পশ্চিম ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের প্রস্তুত করে তোলে।

ক্রুসেড এর অর্থ ধর্মযুদ্ধ। মূলতঃ পবিত্রভূমি জেরুজালেমের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইউরোপের খ্রিস্টান ও প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক (১০৯৬-১২৯২ খ্রিঃ) পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় দুইশত বছর ব্যাপি যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয় তা-ই ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠিত এই যুদ্ধ মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও এশিয়ার ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ তাঁদের ধর্মীয় নেতা পোপের নির্দেশে বুকে ক্রুস চিহ্ন নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ক্রুসকেই যুদ্ধের পতাকা হিসাবে ব্যবহার করেছিল বলেও এই যুদ্ধ ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত।

তবে অধিকাংশ গবেষক ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মুসলিম জাতির সাথে খ্রিস্টানদের প্রতিটি সংঘর্ষকে ক্রুসেড নামে আখ্যায়িত করার সমালোচনা করেছেন। এশিয়ার মুসলমান এবং ইউরোপের খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরাজিত সুদীর্ঘকালের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব কলহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধে। তাই এই ক্রুসেডের কারণ ছিল যেমন বহুবিধ তেমনি এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ভূখন্ড বিশেষ করে বায়তুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টানদের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইতিহাসে এগুলিকে ক্রুসেড যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই সব যুদ্ধ ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার ভূখণ্ডে ক্রুসের নামে চালানো হয়েছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের এই ধারা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এ সময় নয়টি বড় যুদ্ধ হয় এবং তাতে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ফিলিস্তিন ও বায়ুতুল মুকাদ্দাস ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হজরত উম্র ফারুক এই সময়েই জয় লাভ করেন এবং তখন থেকে তা মুসলমানদের অধীনে ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত খ্রিস্টানরা তা ফিরিয়ে নেওয়ার কোন উদ্যোগ নেয়নি।



চিত্র ১ : একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ক্রুসেডের গতিপথ।

কিন্তু খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের শেষদিকে সেলজুক তুর্কীদের পতনের পর হঠাৎ খ্রিস্টানদের মনে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার চেতনা জাগরিত হয়। তা থেকেই এই যুদ্ধের অবতারণা হয়।

ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের পিছনে আসল কারণ ছিল ধর্মীয়। কিন্তু এটাকে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়েছিল। ধর্মীয় কারণের পিছনে রয়েছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও। যিনি এই যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়িয়ে ছিলেন সেই পিটার রাহেবের সম্পর্ক ছিল কিছু ধনী ইহুদীর সাথেও। পিটার রাহেব ছাড়াও ইউরোপের কয়েকজন খ্রিস্টান রাজার ধারণা ছিল ইসলামিক এলাকাগুলো দখল নিতে পারলে তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা কেটে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এইসব যুদ্ধের পিছনে কোন একটি কারণ ছিল না। তবে ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ছিল সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ।

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ : ১০৯৭—১১৪৫ খ্রী:

পোপের যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকে একে একে চারটি বিশাল সেনাবাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হয়। পাদ্রী পিটারের অধীনে এক লক্ষ এর মত খ্রিস্টানদের এক বিশাল বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে তারা নিজেদের ধর্মের লোকদের ওপরেই হত্যা, রাহাজানি ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। বুলগেরিয়া হয়ে তারা যখন কনস্টান্টিনোপল পৌঁছায়, তখন এখানকার রোমান সম্রাট তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে তাদের গতি এশিয়া মাইনরের দিকে ফিরিয়ে দেন। তারা যখন ইসলামী এলাকায় প্রবেশ করে, তখন সেলুজক শাসক কালাজ আরসালান এই বাহিনীটিকে পযুর্দস্ত করেন। তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয়। ক্রুসেডারদের এই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল।

ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় বাহিনী একজন জার্মান পাদ্রী গাউসফেল—এর নেতৃত্বে গঠিত হয়। তারা যখন হাঙ্গেরী অতিক্রম করে, তখন তাদের অনাচারে অতিষ্ঠ হাঙ্গেরীয় জনগণ নিরুপায় হয়ে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। ফলে এটিও ব্যর্থ হয়। ক্রুসেডারদের তৃতীয় বাহিনীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ফিনল্যান্ডের স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল। এই বাহিনী যখন পবিত্র যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়, তখন এই বাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শিকার হয় রাইন নদীর তীরবর্তী মসুল হস ককটি শহরের ইহুদী বাসিন্দারা। এরা যখন হাঙ্গেরী অতিক্রম করতে থাকে, তখন হাঙ্গেরীর অধিবাসীদের দ্বারা তারা বিপুল সংখ্যায় নিহত হয়। এদের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও বিশাল বাহিনী ছিল দশ লক্ষ সৈন্যের। ১০৯৭-এ তারা অভিযান শুরু করে। এই বাহিনীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও সিসিলির রাজপুত্ররা ছিলেন। এই সম্মিলিত বাহিনির নেতৃত্ব ছিল ফ্রান্সের গডফ্রের হাতে। বিশাল এই বাহিনী এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রসিদ্ধ কুনিয়া শহর অবরোধ করে। কালাজ আরসালান পরাজিত হন। বিজয়ী খ্রিস্টানরা আরও অগ্রসর হয়ে ইন্তাকিয়া পৌছায়। নয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইন্তাকিয়াও তাদের দখলে চলে যায়। ইন্তাকিয়ার পর বিজয়ী বাহিনী সিরিয়ার কয়েকটি শহর দখল করে এবং কালক্রমে হিমস পৌছয়।

১০৯৭ সালে গডফ্রের (Godfrey of Bouillon) নেতৃত্বে পরিচালিত সাত লক্ষ খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধা কনস্টান্টিনোপলের পথে অগ্রসর হয়ে এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেন। ইকনিয়ামের সেলজুক সুলতান কিলিজ আর্সালান দাউদ খ্রিস্টান বাহিনীর গতিরোধ করতে গিয়ে পরাজিত হন। এরপর খ্রিস্টানগণ এন্টিয়ক (ইন্তাকিয়া) নগর অবরোধ করে ২১ অক্টোবর। নয় মাস অবরোধের পর খ্রিস্টান ক্রুসেডারগণ ইন্তাকিয়া নগর অধিকার করে ১০৯৮ সালের ৩রা জুন। খ্রিস্টান দলপতি রোহিমন্ড এন্টিয়কের রাজা ঘোষিত হন।

১০৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে ফরাসী কাউন্ট রেমন্ড (Raymond of Toulouse) এর নেতৃত্বে পরিচালিত খ্রিস্টান যোদ্ধাগণ সিরিয়ার মেরাতুন্নোমান নগর ভস্মীভূত করে। বহু সংখ্যক অধিবাসী নিহত হন। ক্রুসেডার দলপতি গডফ্রে মিশরের ফাতেমিয় খলিফা মোস্তা আলী বিল্লার সেনাপতি ইফতেখারউদ্দৌলাকে পরাজিত করে জেরুজালেম নগর দখল করে।

দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ ১১৪৪-১১৮৭ খ্রী:

সিরিয়া আক্রমণ :

জার্মান সম্রাট তৃতীয় কনরাড (Conrad III) ও ফরাসী রাজ সপ্তম লুই (Louis VII)-এর নেতৃত্বে নয় লক্ষ খ্রিস্টান ক্রুসেডার সিরিয়া আক্রমণ করে। ফরাসী রাণী ইলিয়ানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে অসংখ্য নারীও এই যুদ্ধে যোগ দেন। এই বিরাট বাহিনী সিরিয়ায় উপস্থিত হলে দ্বিতীয় ক্রুসেড আরম্ভ হয় (১১৪৭ সাল)। খ্রিস্টান ক্রুসেডারগণ এন্টিয়ক নগর পুনর্দখল করে। দামাস্কাস নগরের নিকট ক্রুসেডারগণ পরাজিত হয়। আলেপ্পা রাজ নুরউদ্দিন জোসেলিনকে বন্দি করেন। জেরুজালেম রাজা তৃতীয় বল্ডউইন মিশরীয় বাহিনীকে পরাজিত করে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী আস্কালন বন্দর দখল করেন (১১৫১-১১৫৩)। ১১৫৯ সালে ভূমিকম্পে সিরিয়া বিধ্বস্ত হলে খ্রিস্টানগণ সাহায্যর্থে এগিয়ে আসে। মরক্কোর সুলতান আব্দুল মোমেন খ্রিস্টানদের পরাজিত করে সমগ্র ত্রিপোলী স্বরাজ্যভুক্ত করেন। আলেপ্পার আমীর নুরউদ্দিন ক্রুসেডের খ্রিস্টান যোদ্ধাগণকে হারিম শহরের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে পরাজিত করেন। ১১৭৬ সালে সিরিয়ার নাবালক সুলতান মন্ত্রীর পরামর্শে দামাশকাস থেকে আলেপ্পোয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সুযোগে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা দামাশকাস নগর অবরোধ করে। যদিও শেষ পর্যন্ত তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে। ১১৭৭ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন প্যালেস্টাইনের মার্জিয়ান নামক স্থানের যুদ্ধে ক্রুসেডার খ্রিষ্টানগণকে পরাজিত করেন। এর পরই সুলতান সালাহউদ্দিনের আহ্বানে সাব্জা নদীর তীরে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাজন্যবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইকনিয়াম, আর্মেনিয়া, মৌসল, জর্জিয়া, আরবাল, কায়ফা, মার্দিন প্রভৃতি স্থানের নরপতিরা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে (২রা অক্টোবর, ১১৮০ সাল), দুই বছর পর্যন্ত পরস্পর বিবাদ থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাজন্যবর্গের সম্মেলনের দুই বছর পর সুলতান সালাহউদ্দিন আরব, সিরিয়া, মিশর ও নিউবিয়ার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষিত হন। অন্যদিকে প্যালাস্টাইনের খ্রিস্টান ক্রুসেডারগণ পূর্ব সন্ধি লঙ্ঘন

করায় সুলতান সালাহউদ্দিন মিশর থেকে সিরিয়া উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে সুলতান ও তাঁর ভ্রাতা তাদের সম্মিলিত যুদ্ধে খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধাদের পরাজিত করেন। এরপর সুলতান সালাহউদ্দিন ইরাকের ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিম নেতাদের দমন করার জন্য অগ্রসর হন। ক্রমে তিনি এডেসা, রাক্কা, কারসিয়া, নসিবিন প্রভৃতি শহর অধিকার করেন এবং সবশেষে তিনি মৌসল অবরোধ করেন ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে।

এই প্রেক্ষাপটে ক্রুসেডার খ্রিস্টান সেনাপতি রেজিনাল্ড (Reginald of Chatillon) সুয়েজের দক্ষিণে অবস্থিত আকাবা উপসাগরের তীরবর্তী আইলা বন্দর অবরোধ করে সেখানে আরব বণিকদের বারোটি জাহাজ লুট করে, অগ্নি সংযোগ করে এবং আরব বণিকদের হত্যা করে। অতঃপর রেজিনাল্ড মদীনা আক্রমণে অগ্রসর হন। কিন্তু মিশরীয় বাহিনী ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের গতিরোধ করেন। রেজিনাল্ড পরাজিত হয়ে প্যালেস্টাইনে পলায়ন করেন। অধিকাংশ সৈন্য নিহত অথবা বন্দিভাবে মিশরে আনীত হয়। সুলতান সালাহউদ্দিন আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিবরিয়া ওদের (Sea of Galilee) তীরবর্তী হিত্তিন প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে খ্রিস্টান সেনানায়কদের পরাজিত করেন। সুলতানের বিজয়ী সেনাদল ক্রমে আক্কা, নাজারেখ, হাইফা, সিজারিয়া, জাফফা, সিডন, বৈরুত প্রভৃতি নগর অধিকার করে। সুলতান স্বয়ং জেরুজালেম অবরোধ করেন (২৩ সেপ্টেম্বর, ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে)।

তৃতীয় ক্রুসেড

মুসলিমদের বিজয়ের সংবাদ সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের আয়োজন শুরু হয়। সমগ্র ইউরোপ এতে যোগ দেয়। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবোসা, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ড রাজ রিচার্ড শেরদিল এই যুদ্ধে অংশ নেন। পাদ্রী ও ধর্মযাজকরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে খ্রিস্টানদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। সম্রাট রিচার্ডের আদেশে ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ প্রত্যেক ইংল্যান্ড বাসীর আয়ের দশমাংশ 'Saladin Tax' নামে সংগৃহীত হয়। খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধাগণ দলে দলে সিরিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর টায়র ও আক্কা নগরে সমবেত হতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম পর্বে খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়। কিন্তু সম্রাট রিচার্ড ও ফিলিপ সসৈন্য আক্কার নিকটবর্তী হলে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা বিপুল উৎসাহে পুনরায় আক্কা অবরোধ করে। সিরিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধে বার-বার পরাজিত হতে থাকলেও ইউরোপ থেকে নতুন নতুন যোদ্ধা সিরিয়ায় আসতে থাকলে ক্রুসেডারদের সাহস ও উৎসাহ বাড়তে থাকে। দুই বছর আক্কা শহরের অবরোধ ধরে রাখার পর সুলতান সালাহউদ্দিন পিছু হাটতে থাকেন। এই যুদ্ধে ইউরোপ ও এশিয়ার শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়। যদিও শেষ পর্যন্ত সুলতান সালাহউদ্দিন ও ইংল্যান্ড সম্রাট রিচার্ডের মধ্যে সন্ধি সাক্ষরিত হয়।

চতুর্থ ক্রুসেড : (১১৯৫ খ্রি:)

আইয়ূবী সুলতান আল মালিকূল আদেলের হাতে খ্রিস্টানরা দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় বরণ করে এবং ইয়াফা শহর মুসলিমদের আয়ত্তে চলে আসে।

পঞ্চম ক্রুসেড : (১২০৩ খ্রি:)

ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপলে হামলা চালিয়া ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে।

ষষ্ঠ ক্রুসেড : (১২২৭ খ্রি:)

পোপ এনভিসেন্টের নেতৃত্বে আড়াই লক্ষ জার্মান সৈন্যের বিশাল বাহিনী সিরিয়ার উপকূলে আক্রমণ করে। আইয়ূবী শাসক আল আদল নীলনদের মোহনায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। খ্রিস্টান বাহিনী নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

সপ্তম ক্রুসেড :

আল মালিকুল কামেল ও তাঁর ভাইদের মধ্যে বিরোধের কারণে বায়তুল মুকাদ্দাস শহর ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। কিন্তু কামেলের উত্তরসূরী সালেহ তা আবার ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন।

অষ্টম ক্রুসেড :

ফরাসী সম্রাট নবম লুই মিশর আক্রমণ করেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কাছে পরাজিত হন।

নবম ক্রুসেড :

ইংল্যান্ড রাজ প্রথম এডওয়ার্ড ও ফ্রান্সের রাজা যৌথভাবে সিরিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু মুসলিমদের কাছে এই যৌথবাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধের ফলেই সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে ক্রুসেডারদের অস্তিত্ব নিশ্চিন্ন হয়ে যায়। ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের অবসান ঘটে।

৩.৩.২.১ : ক্রুসেডের কারণসমূহ

যে সমস্ত কারণে ক্রুসেড সংঘটিত হয়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হল—

(ক) পরস্পরের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগ্রাম :

জেরুজালেম উদ্ধার করাই শুধু ধর্মযোদ্ধাদের লক্ষ্য ছিল না, ইসলামের উপর খ্রিস্টানদের আধিপত্য স্থাপনও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পরস্পরের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের ফল ছিল ক্রুসেড। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ইসলামের দ্রুত অগ্রগতি সমস্ত ইউরোপে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই কারণে একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ইসলাম বিরোধী চেতনা জাগরিত হয়।

(খ) পোপের আধিপত্য স্থাপনের বাসনা :

একাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান জগতে রোমান গীর্জা ও গ্রিক গীর্জার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল। রোমান খ্রিস্টানগণ গ্রিক খ্রিস্টানগণকে নাস্তিক বলে মনে করত। এই সময়ে রোমান ধর্মগুরু পোপ সমস্ত খ্রিস্টান জগতে তাঁর

আধিপত্য স্থাপনের জন্য ধর্মযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একমাত্র উপায় ছিল ক্রুসেড। তিনি উপলব্ধি করেন ক্রুসেড তাঁর আধিপত্য স্থাপনে সাহায্য করবে।

(গ) সামাজিক কারণ :

অধ্যাপক আনেস্টি বার্কার মনে করেন যে, ইউরোপের সামন্তপ্রথা ক্রুসেডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সামন্ত ব্যবস্থা মূলত একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। একাদশ শতাব্দীতে এই প্রথা নানা কারণে দেশবাসীর কাছে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে ওঠে। সামন্তরাজার পুত্রগণ সর্বদা পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত থাকতেন। পোপ ও ধর্মযাজক সম্প্রদায় তাদের এই মানসিকতাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন। কারণ দশম শতাব্দী থেকেই মুসলিমগণ ভূমধ্যসাগরের উপর কর্তৃত্ব আরোপ করেছিল। ইউরোপীয় জাতিগুলি বিশেষত ইতালি, ভেনিস, পিসা এবং জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা ভূমধ্যসাগরীয় ব্যবসা বাণিজ্য করতে না পারায় তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। ফলতঃ তাদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। তারা উপলব্ধি করে যে, ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধ তাদের প্রাচ্যের ব্যবসার পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

(ঘ) তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী

একাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মস্থান জেরুজালেম সেলজুক সুলতানদের অধিকারে আসে। এই সময় ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেমে আসতে থাকে এবং মাঝে মাঝে তারা মুসলিম তীর্থযাত্রীদের ন্যায় দস্যুর কবলে পড়ে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তারা মুসলিম দস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করল সমস্ত খ্রিস্টান জগতের মধ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) সম্রাট এলিকমাস কমনেনাসের আবেদন :

পোপ দ্বিতীয় উর্বানের কাছে গ্রিক সম্রাট এলিকসাস কমনেনাসের আবেদন ক্রুসেডের একটি প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এলিকসাস কমনেনাস পোপ দ্বিতীয় উর্বানের কাছে সাহায্যের জন্য এই মর্মে আবেদন জানান যে, সেলজুক সুলতানগণ এশিয়া মাইনরে তাঁর রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে। পোপ একে প্রাচ্য (গ্রিক গীর্জা) ও প্রতীচ্যের (রোমান গীর্জা) মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি সুযোগ মনে করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার আবেদনে সাড়া দেন।

(চ) পোপ উর্বানের প্রচার

১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় উর্বান ফ্রান্সের ক্লারমেন্ট শহরে এক সভা আহ্বান করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের উত্তেজিত করেন। তিনি প্রচার করেন যে, যারা এই যুদ্ধে যোগদান করবে তাদের সমস্ত পাপ মোচন হবে এবং যারা যুদ্ধে মারা যাবে তারা স্বর্গে যাবে। এতে উৎসাহিত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিমদের হাত থেকে পবিত্র ভূমি উদ্ধারের জন্য খ্রিস্টানগণ দলে দলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

৩.৩.৩ : মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ এর প্রভাব

ক্রুসেডের ফলে বহু সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হলেও বিশ্ব ইতিহাসে ক্রুসেডের তাৎপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্রুসেডের ফলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও ক্রুসেডের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন যে, 'ক্রুসেডের ফলে এক আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়।"

উল্লেখ্য, এই সময় মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। উন্নত ভাবধারার সাথে পরিচিত হওয়ায় মুসলিমরা জ্ঞানজগতে ইউরোপীয়দের উদ্দীপিত করে। এই প্রেরনাই ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করে। তাই ইউরোপের নবজাগরণে ক্রুসেডের দান অনস্বীকার্য।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্রুসেড এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে প্রাচ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের কোনো ধারনাই ছিল না। কিন্তু ক্রুসেডের ফলে ইউরোপীয়গণ মুসলিমদের কাছ থেকে কতকগুলি আবিষ্কার যেমন—মেরিনার কম্পাস ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। তারা মুসলিমদের উন্নত কৃষিপদ্ধতির এবং শিল্প জীবনের সাথেও পরিচিত হয়। প্রাচ্যের এই সমস্ত উন্নত পদ্ধতির ধারণা নিয়ে যখন তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সেখানে প্রাচ্য শিল্পজাত দ্রব্যের একটি বাজার গড়ে ওঠে।

ইউরোপীয়গণ প্রাচ্যের দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং ফলস্বরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভূমধ্যসাগরের সামুদ্রিক তৎপরতা আরো বাড়তে থাকে। ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্যর উদ্দেশ্যে মুক্তভাবে ভূমধ্যসাগর ব্যবহার করতে থাকে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয়।

ক্রুসেড সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। অধ্যাপক হিট্টি এটাকে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের দীর্ঘকালীন বিরোধের একটি মধ্যযুগীয় অধ্যায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাস ও রোমান্টিক গল্প লেখকগণ ক্রুসেডের সাথে জড়িত সালাহউদ্দিন ও রিচার্ডকে কেন্দ্র করে নানা রোমান্টিক কাহিনীর জাল বুনেছেন।

প্রায় তিন শতাব্দী ধরে চলমান ক্রুসেড ছিল ইউরোপের সামন্ত খ্রিস্টান জগতের সাথে পূর্বাঞ্চলের আধা-সামন্ত ও আধা-উপজাতীয় মুসলিম সংস্কৃতির সংঘর্ষ। ইউরোপীয় খ্রিস্টানেরা ছিল এই যুদ্ধে আক্রমণকারী। তাদের আক্রমণের স্পর্ধা তাদের আভ্যন্তরীন শক্তিসত্তার পরিচয় বহন করেছে। মুসলিমগণ যদিও সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানে অনেক অগ্রসর ছিল, কিন্তু সভ্যতা বিশেষত আর্থ-সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক পদ্ধতি ও নেতৃত্বের দিক থেকে তারা ইউরোপীয়দের তুলনায় অনুন্নত ছিল। ইসলামী বিশ্বে জীবন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো অভিন্নতা ছিল না। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাদের বিভিন্নতা বা অনৈক্য বিরাজমান ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিবাদ ও রাজনৈতিক কারণে মুসলিমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে বংশীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তারা অনবরত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। যদিও সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের প্রকৃতি ছিল একেবারেই আলাদা। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো বিরোধ ছিল না। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে অনুপ্রানিত করেছিল। এই কারণে পোপ যখন ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন, তখন অসংখ্য মানুষ হাজার মাইলের ব্যবধান অতিক্রম করে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়।

অন্যদিকে বাগদাদের খলিফা, কায়রোর প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা, অসংখ্য রাজা, শাসক ও প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার বাইরে নির্যাতিত মুসলিমদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ঐক্য লক্ষ্য করা যায় নি। কিন্তু খ্রিস্টান ইউরোপের জনশক্তির ও সম্পদের অপ্রতুলতা মুসলিমদের অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তিন শতাব্দীর আগ্রাসী অভিযানে মধ্যযুগীয় ইউরোপ নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল। সামন্তবাদী শক্তি তখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে কৃষকদের বিদ্রোহের ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপ তার যুদ্ধনীতি পরিহার করে নতুন সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করে। এর ফলশ্রুতি হল আধুনিক ইউরোপ। যদিও দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম এশিয়া ও আফ্রিকায় সে রকম কোনো পরিবর্তন আসে নি।

৩.৩.৪ : সহায়ক গ্রন্থ

(১) ইসলামের ইতিহাস—কে আলী।

(২) পৃথিবীর ইতিহাস—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(৩) রূপান্তরিত ইতিহাস—রীলা মুখার্জী।

৩.৩.৫ : নমুনা প্রশ্ন

(ক) ক্রুসেড বলতে কী বোঝো? ক্রুসেডের গতিপথ নির্দেশ করো?

(খ) ক্রুসেডের প্রধান কারণগুলি সম্পর্কে যা জান লেখো?

(গ) ক্রুসেড মধ্যযুগের ইউরোপকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

পর্যায়-৪

দূর প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাদী সমাজ

একক-৯

মধ্যযুগীয় চীনের রক্ষণশীল সমাজ

একক-১০

মধ্যযুগীয় জাপানের সামাজিক স্তর ব্যবস্থা

সূচীপত্র :

৩.৪.১ : উদ্দেশ্য

৩.৪.২ : আদি মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগের চৈনিক রাজবংশ সমূহ

৩.৪.৩ : মধ্যযুগীয় চীনের রক্ষণশীল সমাজ

৩.৪.৪ : মধ্যযুগীয় জাপানের সামাজিক স্তর ব্যবস্থা

৩.৪.৫ : নমুনা প্রশ্ন

৩.৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.৪.১ : উদ্দেশ্য

মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কিত চর্চায় সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দূর প্রাচ্যের সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। দূর প্রাচ্যের সভ্যতাগুলোর মধ্যে চৈনিক এবং জাপান সভ্যতা বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই রক্ষণশীল নামে অভিহিত এই দুই প্রাচ্যবাদী দেশের সমাজ আবদ্ধ হয়েছিল তাদের নিজস্ব রীতিনীতি ও নিয়ম প্রনালীর মধ্যে। বহির্জগতের রীতি নীতি সম্পর্কে তারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিল। সুপ্রাচীনকাল থেকে কনফুসিয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত চৈনিক সমাজ শৃঙ্খলাকে অন্যতম অগ্রাধিকার দিয়েছিল। চীন ও জাপান দুই প্রাচ্যবাদী সভ্যতাতেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সুতরাং এই অধ্যায়টি পাঠ এর ফলে শিক্ষার্থী মধ্যযুগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্যবাদী সভ্যতার সামাজিক রীতিনীতি এবং তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবে। এছাড়া আদি মধ্যযুগ থেকেই চীনের তাং বংশ,

সুং বংশ এবং ইউয়ান বংশ কিভাবে মধ্যযুগের চৈনিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে সংস্কার সাধন করেছিল তাও বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

অন্যদিকে শিক্ষার্থী এটি জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে যে, মধ্যযুগীয় জাপানের সমাজ ও সভ্যতা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সামাজিক স্তরবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মূলত আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা জাপানের এই সামাজিক স্তরবিন্যাস কে প্রভাবিত করেছিল। সর্বোপরি শিক্ষার্থী এটি জানতে পারবে যে মধ্যযুগীয় জাপানের সমাজ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে অবিকৃত ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে বলা যায়, জাপানের ইতিহাসে সামন্ততান্ত্রিক যুগ টিকে ছিল ১১৮৫ থেকে ৬০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় কালে। শিক্ষার্থী এই বিষয়ে অবগত হবে যে, আলোচ্য সময়কালে জাপানি সমাজ ছিল বহুস্তরীয়-যাকে 'Classic Pyramidal Division'-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই সমাজ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তরে আসীন ছিলেন সম্রাট এবং পরবর্তী স্তরগুলি তে শোগুন, ডাইমিয়, সামুরাই এবং অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থান ছিল।

সর্বোপরি এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের মনে এই উপলব্ধি জাগ্রত করতে সক্ষম হবে যে চৈনিক সমাজ প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্রের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় পাঠ এর ফলে জানা যাবে যে আলোচ্য সময়কালে বা মধ্যযুগে রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্রের কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন শ্রেণীর দ্বারা-যারা জেন্ট্রি নামে অভিহিত। এই অধ্যায় কালক্রমে এই ধারণাকেই প্রতিপন্ন করবে যে, 'the three interlocking sectors of Chinese society (State, Gentry and local social systems) historically gave it different options for maintaining the traditional patterns of power and authority.'

৩.৪.২ : আদি মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগের চৈনিক রাজবংশ সমূহ

চীনের ইতিহাসে তাং বংশের (Tang Dynasty) রাজত্বকাল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ৬১৮ থেকে ৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই বংশ তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। তাদের গৌরবজনক ইতিহাস আবর্তিত হয়েছিল রাজধানী Ch'ang An (Changan, আধুনিক (Sian)-এ উন্নত শিল্পকলা, রুচিশীল কাব্য এবং মধ্য এশিয়ায় চৈনিক আধিপত্যের বিস্তারকে কেন্দ্র করে। তাং বংশের পর চীনের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করে সুং বংশ বা Sung Dynasty (৯৬০ থেকে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ)। যদিও শেষ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি মোঙ্গলদের দ্বারা সুং বংশের শাসকরা পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের ৩০০ বছরের শাসনকালের ইতিহাসে চিত্রকলা, সাহিত্য এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় সার্বিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উল্লেখ্য চৈনিক অভিযান সম্পূর্ণ করতে মোঙ্গলগণ ৪০ বছর সময় নিয়েছিল। কিন্তু তারা শুধুমাত্র ৭০ বছর পর্যন্ত চীনের শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। অতঃপর চৈনিক বিদ্রোহের ফলে তারা চীন থেকে বিতাড়িত হয়। প্রধানত ইউয়ান বা

মোঙ্গল বংশই চীনের মধ্যযুগের ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইউয়ান বংশের রাজত্বকালেই (১২৭৯-১৩৬৮) ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো চীন ভ্রমণ করেন এবং তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে এই বংশের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

২২০ খ্রিস্টাব্দে হান বংশের পতনের পর পরবর্তী চার শতাব্দী পর্যন্ত চীন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় একাধিক পৃথক রাজবংশের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে উত্তর চীনের একাধিক অঞ্চল বর্বরদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিকশিত হয়েছিল। অতঃপর তাং বংশের অধীনে চীন সংস্কৃতিক উৎকর্ষতা, মহানুভবতা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছিল। উল্লেখ্য এই সময়েই 'Imperial Civil Service' পরীক্ষাসমূহ নতুনভাবে পুনর্গঠন করা হয়। চৈনিক কাব্যের ইতিহাসে তাং বংশকে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদান করা হয়। চৈনিক কবি Li Po (৭০১-৭৬২) এবং Tu Fu (৭১২-৭৭)-এর কাজগুলিতে উৎকর্ষ কাব্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। চৈনিক প্রতিভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে কাগজ এবং ছাপার কাজের (Printing)-এর উদাহরণ লক্ষণীয়। তাং বংশের প্রথম পর্ব মন্দির, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত হয়। তাং শাসকদের রাজধানী Chang An সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় সংস্কৃতিক মডেল হিসেবে পরিগণিত হয়। Chang An শহরের স্থায়ী বাসিন্দারা ছিলেন পার্শিয়ান, জরোয়াস্ট্রিয়ান, মুসলিম, ইহুদি, ভারতীয় বৌদ্ধ, হিন্দু, এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে আগত নেস্ট্রুরিয়ান খ্রিস্টানগণ।

৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তাং বংশের পতনের পর ৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চৈনিক ইতিহাসে এক অরাজকতার পর্ব লক্ষ্য করা যায়। এরপর ৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সুং রাজবংশ ক্ষমতায় আরোহন করে। প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত তারা রাজত্ব করে। বিভিন্ন দিক দিয়ে সুং রাজবংশ আকর্ষণীয় পর্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুং শাসকদের নীতি ছিল তাদের এলাকা গুলির অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে অবস্থানকারী বর্বর দলগুলিকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তোষণ করা। সুং বংশের রাজধানী গড়ে উঠেছিল হলুদ নদীর (Yellow River) তীরবর্তী 'Kaifeng' অঞ্চলে। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল 'Kaifeng'। উল্লেখ্য, মধ্য অষ্টাদশ শতকের সমগ্র ইউরোপের তুলনায় একাদশ শতকের চীনে বিপুল পরিমাণে লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদিত হতো। সুং সেনাবাহিনী ছিল আয়তনে বিশাল এবং লৌহ ও অন্যান্য ধাতব অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত। সুং বংশের সময়কালে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিস আধিকারিকেরা সেই অর্থে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রতি তিন বছর অন্তর তাদের বদলি করা হতো। ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে সাক্ষরতা এবং শিক্ষার প্রসারের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চশ্রেণীতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ আসে। কালক্রমে তাঁরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই শ্রেণী থেকেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়োগ করা হতে থাকে। পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আধিকারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাং শাসকরা ছিল অগ্রদূত। যদিও মোট সরকারী পদের তুলনায়

নিয়োগ পাওয়া আধিকারিকদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। কিন্তু সুং শাসকদের অধীনে চীনের এই ব্যবস্থা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। উচ্চস্তরের আধিকারিকরা অধস্তন পদগুলিতে নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে পারতেন। কিন্তু উচ্চপদগুলোতে তারাই নিয়োগ পেতেন যারা তিনটি স্তরের পরীক্ষায় পাশ করতেন। এগুলি হল—(i) সম্পূর্ণতা বা Perfectural level (ii) প্রাদেশিক বা Provincial Level এবং (iii) সম্রাটের সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাত পর্ব।

মধ্যযুগীয় চিনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদানটি এসেছিল মোঙ্গলদের কাছ থেকে। চীন অধিগ্রহণ করার পর তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চৈনিক রাজবংশ ইউয়ান রাজবংশ নামে পরিচিত হয়। উল্লেখ্য মোঙ্গলরা চীনকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োজিত চৈনিক আধিকারিকদের মাধ্যমে। চৈনিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল, কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মোঙ্গলরা নিজেদের হাতে নিয়েছিল। ৭০ বছরের স্বল্প দৈর্ঘ্যের শাসনকালে চৈনিক সংস্কৃতি মূলত সুং সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। সুং শাসনকালে চিত্রকলায় দক্ষতাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন নাটক এবং দেশীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রসার ঘটে। বস্তুতপক্ষে ইউয়ান যুগের নাটকগুলি ছিল অনেকটা অপেরার মত যেখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীত এবং নৃত্যের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পরিবর্তে চিরাচরিত সঙ্কেতমূলক চিত্রাবলী প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল। বেশিরভাগ নারী চরিত্র পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হত।

আলোচ্য সময়কালে চৈনিকরা অস্ত্র রাখার অধিকারী ছিল না। এই সময় রাজস্বের হার ছিল অত্যধিক এবং শ্রমিকরা কোনরকম পারিশ্রমিক ছাড়াই রাষ্ট্রীয় প্রকল্পগুলিতে কাজ করতে বাধ্য হতো। পরবর্তীকালে অন্যতম মোঙ্গল শাসক কুবলাই খাঁ সিংহাসনে আরোহন করেন। ১২৯৪ সালে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোঙ্গলদের রাজধানী ছিল পিকিং। কিন্তু এরপর থেকেই তাদের শাসন কর্তৃত্ব শিথিল হতে শুরু করে। যদিও তাদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা যায় যে তারা বিখ্যাত 'Grand canal' পুনঃনির্মাণ করেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক নিয়োগ করে তা পিকিং পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। তারা একটি নতুন কার্যকরী ডাক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এছাড়াও কাগজি মুদ্রার প্রচলন করেন। এই দুটিই সমকালীন সময়ে চীনে আগত ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলোকে বিস্মিত করেছিল। উল্লেখ্য, আলোচ্য সময়কালে চীনে মানুষের বসবাসযোগ্য আবাসস্থল উত্তপ্ত করতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত 'কালোপাথর' ('Black rocks' or coal)-ও মার্কোপোলোর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক সৃষ্টি করেছিল।

কুবলাই খাঁ ইউয়ান তথা মোঙ্গল বংশের একজন দক্ষ সম্রাট ছিলেন কিন্তু সংস্কৃতিগতভাবে সময়ের সাথে সাথে তিনি একজন যথার্থ চৈনিক-এ পরিণত হয়েছিলেন। ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো তার সময় কালের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। বস্তুতপক্ষে কুবলাই খাঁ প্রসঙ্গে মার্কোপোলোর বিবরন উল্লেখ করতে গিয়ে

বলা হয় যে, 'Marcopolo gives a flattering portrait of his sagacity, majesty and benevolence, which was probably as accurate as his more general accounts of Yuan China.'

কিন্তু কুবলাই খাঁ-এর পরবর্তীকালে ইউয়ান বংশের অধীনে চীনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ১৩১০ সালের পর থেকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। মোঙ্গলদের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় এবং বিজিত জাতিগুলির প্রতি চৈনিকদের ঘৃণা দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ ১৩৩০ এর দশক নাগাদ চীনে সর্বব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীনের ইয়াংসি উপত্যকার (Yangtze Valley) উপর মোঙ্গলদের নিয়ন্ত্রণ খর্ব হয়। এই সময়ে সংঘটিত একটি কৃষক বিদ্রোহ অবশিষ্ট মোঙ্গলদের চীনের প্রাচীর অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে ফিরে যেতে বাধ্য করে। অতপর ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে চীনে একটি নতুন রাজবংশ ক্ষমতায় আরোহন করে—যা মিং রাজবংশ (Ming Dynasty) নামে পরিচিত।

৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঝু ইউয়াংঝাং (Zhu-Yuanzhang) নামক কৃষক পরিবার থেকে আগত একজন যোদ্ধা মিং বংশের সূচনা করেন। তিনি দক্ষিণ চীনের বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করেন এবং 'Hongwu' উপাধি ধারণ করে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন। বিদেশি শাসকদের দ্বারা শোষন এবং নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মিং রাজবংশ চৈনিক ইতিহাসে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ধারা প্রবর্তন করে। এই সময়ে চীনের জনসংখ্যা ১০০ মিলিয়নের বেশি অতিক্রম করে। উল্লেখ্য মিং রাজবংশই ছিল চীনের সর্বশেষ দেশীয় রাজবংশ। মিং শাসকদের কৃতিত্ব ছিল এটাই যে তাঁরা কনফুসিয় আদর্শে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। একই সাথে তারা সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরো কঠোর করেন। এই সময় কৃষক দের কর ছাড়ের সুবিধা প্রদান করে কৃষিকাজকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে চৈনিক শিল্পকলা এবং সাহিত্যেও চৈনিক মূল্যবোধের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল।

একথা উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন সময়ের চৈনিক সমাজব্যবস্থাতেও কনফুসিয় মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল। বিশেষ কিছু কনফুসিয় অনুশাসন চৈনিক সমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন—শিশুরা তাদের পিতা মাতার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকবে। এমনকি প্রয়োজনে পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে দাস হিসেবে বিক্রিও করতে পারে। একইভাবে এটিও বলা হয়েছে যে, ছাত্ররা কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই তাদের শিক্ষকের প্রতি অনুগত থাকবে। নির্দেশ অমান্য করলে শিক্ষকরা ছাত্রদের শাস্তিও দিতে পারেন। কনফুসিয় চৈনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের প্রতিও কিছু নির্দেশ ছিল। যেমন নারীরা সর্বপ্রথম তাদের পিতা এবং পরে তাদের স্বামী ও সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করবে। আলোচ্য সময়কালে উচ্চবর্ণের মহিলারা শিক্ষালাভের সুযোগ পেলেও তারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেতেন না। উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান ও মর্যাদার সাথে মধ্যযুগীয় চৈনিক সমাজেও নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় যখন লক্ষ্য করা যায় যে, চৈনিক সমাজেও সেই নারীরাই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যারা পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন।

মিং শাসকেরা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। যেমন—আলোচ্য সময়কালে চৈনিক কারিগরেরা নীল এবং সাদা রঙের চিনা মাটির পাত্র নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সম্ভবত একাদশ শতকেই চৈনিক নাবিকেরা প্রথম চৌম্বক কম্পাস আবিষ্কার করেন। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই মিং শাসকেরা প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগর এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি আবিষ্কারে সফল হয়েছিলেন। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিং শাসকেরা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ঝেং হি (Jheng He) নামক চৈনিক অনুসন্ধানকারী পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারতবর্ষ, পার্সিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকা অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার দ্বারা পরিচালিত সমুদ্রযাত্রাগুলি এই সমস্ত অঞ্চলের সাথে চৈনিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করেছিল। একইসাথে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও চৈনিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। যদিও একথা উল্লেখযোগ্য যে, ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঝেং হি-র মৃত্যুর পর তৎকালীন মিং শাসক সমস্ত রকমের বহির্দেশীয় বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ফলত চীনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই বহির্দেশীয় বাণিজ্য তথা অভিযান বন্ধ হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ ছিল রক্ষণশীল মানসিকতা-যা তাদের সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল। কারণ চৈনিকরা চেয়েছিল তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে তারা তাদের স্থায়িত্বের প্রধান উৎস বলে মনে করত। এছাড়া কনফুসিয় পণ্ডিতরা মনে করতেন যে চৈনিক সমাজ ও সভ্যতাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এই কারণে বহির্বানিজ্যের প্রতি তাদের উৎসাহ ছিল খুবই কম। সর্বোপরি, সমুদ্র বাণিজ্য ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য এবং তা থেকে আশানুরূপ লাভ হতো না।

৩.৪.৩ : মধ্যযুগীয় চীনের রক্ষণশীল সমাজ

বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল চীনকে 'eternal' বা চিরন্তন বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রায় প্রত্যেক মানব সমাজেই যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি অনুভূত হচ্ছিল, তখন চিরন্তন সম্পর্কিত ধারণা খুব একটা প্রচলিত ছিল না। বস্তুতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দার্শনিক, উনবিংশ শতকের চিন্তাবিদ এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বের কিছু সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে চীন চিরন্তন রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগীয় চীনের সমাজ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।

মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের কথা উল্লেখ করা যায়— (১) সুং বংশের সময়কালের (৯৬০-১২৭৯) চিরাচরিত চৈনিক সমাজ ব্যবস্থা এবং (২) মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে রূপান্তরিত সমাজ ব্যবস্থা—যা প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের দ্বৈত প্রভাবের ফল।

মধ্যযুগের চৈনিক সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পার্থক্যকে নির্দেশ করে। সাধারণত রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি বৈধ এবং সংগঠিত

রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃহত্তর প্রকরণ। অন্যদিকে সামাজিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় কর্তৃত্ব এবং মানব সম্পর্কের ক্ষুদ্র সমাজ প্রকরণ। এখান থেকে নিঃসৃত সীমানাগুলি প্রায়ই ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতিকগতভাবে নির্ধারণ করা হয়। একটি আচরণগত সত্তা হিসেবে রাষ্ট্র কোন বিশেষ অথবা স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থার সমষ্টিকে চালিত করে। এই প্রেক্ষাপটে চৈনিক সমাজ প্রধানত রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সংঘটিত ঐক্যকে প্রতিনিধিত্ব করে—যা প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্রের দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু ইতিপূর্বে এই যোগসূত্র কোন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা চিহ্নিত যাঁরা জেন্ট্রি নামে পরিচিত ছিল। রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকগতভাবে চৈনিক সমাজের তিনটি আন্তঃবিভাগ (Three interlocking sectors) যথা: রাষ্ট্র, জেন্ট্রি এবং স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থা—ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের চিরাচরিত গঠনকে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন বিকল্পের যোগান দিয়েছিল। রাষ্ট্র তার ক্ষমতার অবস্থানকে ধরে রাখার জন্য জেন্ট্রিদের মধ্য থেকেই নিয়োগ সম্পন্ন করত। এর ফলেই স্থানীয় অভিজাতরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করত। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এই যোগসূত্রের ফলেই জেন্ট্রির মত বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

চৈনিক সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে কনফুসিয়বাদ সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। এই মতবাদের পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারের (রাজতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্র) উপর অর্পিত হয়েছিল। উল্লেখ্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ-সামরিক ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যবস্থার জটিলতা থেকে মুক্ত। সামরিক ব্যবস্থা ছিল রাজতন্ত্রের সাথে যুক্ত এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এটি চরিত্রগত দিক দিয়ে অ-চৈনিক ছিল। সুতরাং চৈনিক রাষ্ট্রের এই দ্বৈত প্রকৃতি ছিল চিরাচরিত এবং আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিরোধী। সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য স্বতন্ত্র সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং মর্যাদা ও কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানব সম্পর্কের প্রকৃতিও গুরুত্ব পেয়েছিল।

রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসেবে জেন্ট্রি শ্রেণী চৈনিক সমাজব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল। জেন্ট্রি শ্রেণীর কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছিল। জেন্ট্রি শ্রেণীতে উন্নীত হবার জন্য বিভিন্ন বিকল্প ছিল এবং নিয়োগ ব্যবস্থাও ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু একটি পৃথক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে জেন্ট্রি কখনই বিকশিত হয়নি। এ কথা বলা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে জেন্ট্রি শ্রেণীর কিছু সাদৃশ্য ছিল।

হান থেকে চিং বংশ পর্যন্ত আমলাতন্ত্র এবং কনফুসিয় আদর্শে পরিচালিত সরকারী ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চীন ক্রমশ একটি সংগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। হান বংশের প্রথম দশকগুলিতে চীন

ভৌগলিক ধারণা অনুযায়ী আধুনিক চীনের আকার ধারণ করে। সমাজের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর মধ্য এবং দক্ষিণ চীনে হান বংশের রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক ব্যবস্থাও প্রসারিত হয়। উল্লেখ্য মধ্য এবং দক্ষিণ চীনে সাধারনত অ-চৈনিক জনগনের বসবাস ছিল—যারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই কারণেই সংস্কৃতিক আত্তীকরণ ত্বরান্বিত হয়, উক্ত অঞ্চলগুলির নিজস্ব ভাষা লোপ পেয়ে চৈনিক ভাষা প্রাধান্য পায় এবং একইসাথে চৈনিক সংস্কৃতিও বিস্তার লাভ করে।

রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক ঐক্য সত্ত্বেও স্থানীয় বৈচিত্র্য টিকে ছিল, এমনকি কয়েক শতাব্দীর পর তা ক্রমশ বৃদ্ধিও পেয়েছিল। চৈনিক ভাষা অসংখ্য উপভাষায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমগ্র দেশেই সামাজিক এবং সংস্কৃতিক বৈচিত্র প্রথা ও রীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছিল। সামাজিক এবং সংস্কৃতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণায় গবেষক Talcot Parsons এবং আলফ্রেড ক্রোয়েবার (Alfred Kroeber) সামাজিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, 'Social system is the specifically relational system of interaction among individuals and collectivities.' গতানুগতিক চৈনিক সমাজে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট আন্তঃসম্পর্কিত ব্যবস্থা জাতীয় প্রেক্ষাপট অপেক্ষা অনেকাংশেই ছিল স্থানীয়। আলোচ্য সময়কালে বিবাহ এবং কটুম্বিতা (kinship) ছিল সম্পর্কের প্রধান নির্ণায়ক।

চৈনিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম কার্যাবলী ছিল কর্তৃত্বের প্রসার। বিশেষ করে বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠী ও অভিজাতদের মাধ্যমে এই কর্তৃত্বের প্রদর্শন চলত। এক্ষেত্রে জেন্ট্রি নামক অভিজাত শ্রেণী পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষকদের কাছে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যদিও অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের জেন্ট্রির সাথে চৈনিক জেন্ট্রিদের সেভাবে সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইংল্যান্ডের জেন্ট্রিদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মূল ভিত্তি ছিল জমির উপর মালিকানা। অন্যদিকে চৈনিক জেন্ট্রিরা ছিল মূলত সরকারি আমলা ও আধিকারিক শ্রেণী। ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে জেন্ট্রি বিতর্ক আবর্তিত হয়েছিল একটি বিশেষ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। সেটি হল শাসন পরিচালনায় নিযুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠী হিসেবে জেন্ট্রিরা তাদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়েছিল নাকি স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থা এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছিল? উল্লেখ্য শাসন পরিচালনায় নিযুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীকে কোন সম্মান বাচক শব্দে অভিহিত করার মত প্রচলিত শব্দ চৈনিকদের ছিল না। তবে চীনের বিভিন্ন বিদ্রোহ সংক্রান্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'আধিকারিক, ভূস্বামী এবং অভিজাত'-দের সম্পর্কে 'shen' নামক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলতঃ এ কথা বলা যায় যে অভিজাতদের সম্পর্কে ব্যবহৃত 'shen' শব্দটি জেন্ট্রিদের সম্পর্কে প্রয়োগ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। প্রকৃতপক্ষে 'shen'-রা ছিল বুদ্ধিজীবী-আধিকারিক শ্রেণী—যারা রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে কোনও দপ্তর অধিগ্রহণ করত না। এই দলের নিচুতলার সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র স্কুল শিক্ষকদের অপেক্ষা

সামান্যই উন্নত ছিল। এই বক্তব্য নির্দেশ করে যে, জেন্ট্রিদের মর্যাদার উৎস রাষ্ট্র এবং স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যেই নিয়োজিত ছিল। এই বিতর্কের সম্ভাব্য সমাধানের কথা বলতে গিয়ে G. William Skinner একটি মাধ্যমের কথা বলেছেন। এটি হল, 'a recognitioin in future research that social structure in the middle range of traditional Chinese society is at once derivative of and enmeshed in two quite distinctive hierarchical systems-that of administration to be sure, but that of marketing as well.' স্কিনার যাকে 'marketing' বলে অভিহিত করেছেন, তাকেই আমরা স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করি।

প্রায় সমস্ত পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছেন যে, শাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন শ্রেণী চৈনিক রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করত। কিন্তু চিরাচরিত চৈনিক পদমর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠী যেমন—'আধিকারিক, ভূস্বামী এবং অভিজাতগণ' নির্দেশ করে যে, বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য তিনটি শর্তের প্রয়োজন ছিল—'ক্ষমতা, সম্পদ এবং মর্যাদা'। চৈনিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিষয়গুলি মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই কারণে খ্রিষ্ট্রীয় প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে ভুসম্পদ এবং বংশানুক্রমিক পদমর্যাদা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, সেরূপ আর্থ সামাজিক বিকাশের ফলে এক নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে যারা শিক্ষার মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছিল। অতঃপর মিং এবং চিং রাজবংশের রাজত্বকালে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরনের ফলে কার্যকরী এবং প্রকৃত আমলাতন্ত্র শিক্ষিত শ্রেণীকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে—যা কালক্রমে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সুতরাং চৈনিক সমাজব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে জেন্ট্রীরা রাষ্ট্র এবং স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতা, সম্পদ এবং মর্যাদা ভোগ করত। উল্লেখ্য এরা কোন পৃথক 'এস্টেট' বা জাতি ছিল না। এর সদস্যরা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের আধিকারিক হতে পারতো সেইরূপ আবার ভূস্বামীও হতে পারত-যারা প্রধানত সম্পদশালী এবং মর্যাদাসম্পন্ন পরিবার গুলিতে বিচরণ করত।

এইভাবে চীনে গতানুগতিকতা বা রক্ষণশীলতা টিকে ছিল। একটি উচ্চ মানের সংস্কৃতি এবং স্থানীয় বহুবিধ বৈচিত্র্য সম্পন্ন সামাজিক ব্যবস্থার মিশেলে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছিল। জেন্ট্রী শ্রেণী রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থানীয় সংস্কৃতি-উভয়ের মধ্যেই যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত। ভূ-সম্পদের সহজলভ্যতা জেন্ট্রী শ্রেণীকে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিয়েছিল। অন্যদিকে উচ্চমানের সংস্কৃতির বিস্তার রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে জেন্ট্রীদের প্রবেশকেও সুনিশ্চিত করেছিল। ফলস্বরূপ স্থানীয় ক্ষমতা, মর্যাদা এবং সম্পদের সুদৃঢ়করন সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে এটি বলা যায় যে, চৈনিক সমাজকে একটি একক সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য না করে এটিকে রাষ্ট্র এবং স্থানীয় সামাজিক ব্যবস্থার সংমিশ্রণের একটি ফল হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই বক্তব্যকে সমর্থন করে চৈনিক গবেষক C.K. Yang বলেন যে,

রক্ষণশীল বা গতানুগতিক চীনকে ভাবা যেতে পারে দুটি প্রধান গঠনগত উপাদানের দ্বারাঃ একটি জাতীয় আমলাতান্ত্রিক ভিত্তি-যেখানে কেন্দ্রীকরন, মূল্যমান, নৈতিকতা এবং কর্তৃত্বের সংগঠিত শ্রেণীবিভাগের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। অন্যটি হলো বহু বিভক্ত স্থানীয় সম্প্রদায়ের অন্তঃস্তরের উপর জোর দেওয়া-যা নীতিগতভাবে কনফুসিয়ান আদর্শ, একটি জাতীয় আমলাতন্ত্র এবং একটি জাতীয় অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল।

রক্ষণশীল বা গতানুগতিক চৈনিক সমাজ তার সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌঁছেছিল সুং বংশের শাসন কালে (৯৬০-১২৭৯)। অতঃপর আধুনিক যুগের আগমন কাল পর্যন্ত চৈনিক সমাজ কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে চীনকে মুক্ত করে সুং বংশ চিনকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিকাশে সুং বংশের ভূমিকা ছিল। এই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র পরবর্তীকালে ইউয়ান, মিং এবং চিং বংশের সময়কালে আরও শক্তিশালী হয়েছিল। উল্লেখ্য রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি হলো বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং বিভিন্ন স্থানীয় আধা সামরিক বাহিনী। এই সময় রাজনীতির কেন্দ্রীকরণের ফলে সামরিক ও পুলিশ বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। এই ভাবেই 'Pao-Chia' নামক গ্রামকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান চিং বংশের রাজত্বকালে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করেছিল। বস্তুতপক্ষে চীনের ওপর বিদেশী রাজবংশগুলির (Liao, Chin, Yuan এবং Ching) সাফল্যের মূলে ছিল সামরিক বাহিনীর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা।

তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, চীনের উচ্চ মানের সংস্কৃতি সু বংশের রাজত্বকালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল-যার ফলে ধীরে ধীরে তার সৃজনশীলতাও হারিয়েছিল। সুং বংশের রাজত্বের শেষ দিকেও বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক চিন্তা ভাবনার আগমন অব্যাহত ছিল। কিন্তু পরবর্তী রাজবংশগুলি অনেক বেশি রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। মিং রাজবংশের Wang Yangming-কে বাদ দিলে চিনের শেষ বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন Chu-His (১১৩০-১২০০)।

চৈনিক অর্থনীতিতেও এই সময় আবদ্ধ রূপ বা স্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। তাং এবং সুং বংশের রাজত্বকালে গুণগত ও পরিমাণগত দুই দিক দিয়েই চৈনিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। নতুন উৎপাদন শিল্পের সাথে সাথে নতুন নতুন শহরও আত্মপ্রকাশ করে। যদিও মিং বংশের রাজত্বকাল থেকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রধানত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বৃদ্ধির আকারে চলতে থাকে।

চিরাচরিত চৈনিক সমাজ ব্যবস্থায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থা যার অন্যতম ভিত্তি গ্রাম। স্থানীয় জেন্ট্রীদের মাধ্যমেই রাষ্ট্র গ্রামীণ এলাকায় দুটি প্রধান লক্ষ্য অর্জন করেছিল—(১) খাজানা আদায় এবং (২) আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেন্ট্রীরা গ্রামে বসবাস করত না, বসবাস করতো শহরে—যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল।

৩.৪.৪ : মধ্যযুগীয় জাপানের সামাজিক স্তর ব্যবস্থা

মধ্যযুগীয় দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল জাপান। জাপানের সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে সমর নায়কদের প্রভাব ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সামুরাই, নিনজা প্রমুখ যোদ্ধৃশ্রেণী মধ্যযুগীয় জাপানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিল। তবে সামুরাইদের পাশাপাশি জাপানি সমাজব্যবস্থায় আরো কতকগুলি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল যারা সমকালীন জাপানের আর্থ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে পুনর্গঠিত করেছিল। এই ব্যবস্থা জাপানে দীর্ঘদিন ধরে বজায় ছিল। সাধারণত এ কথা বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগীয় জাপানের সামন্তপর্ব টিকেছিল ১১৮৫ থেকে ১৬০৩ সালের মধ্যে। এই সময়কালে জাপানের সমাজ কতগুলি স্তরে বিভক্ত ছিল। একে ত্রি-স্তরীয় পিরামিডের সাথে তুলনা করা চলে। উল্লেখ্য, আলোচ্য সময়কালে ইউরোপের এবং বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের সমাজেই সমগ্র জনগণের ১২% ছিল অভিজাতগন

মধ্যযুগীয় জাপানের প্রকৃত শাসক ছিলেন শোগুন। শোগুনরা ছিলেন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন সামরিক নেতৃবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের পক্ষে বা অনুকূলে শোগুনরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করত। তবে বৈধতা অর্জনের জন্য তখনো পর্যন্ত সম্রাটের দ্বারা নিয়োগকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। তাদের উপাধিগুলি বংশপরম্পরায় বজায় থাকত। তাদের দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র 'Bakufu' নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল মূলত কর আদায়ের সরকারি অফিস। বস্তুতপক্ষে এই সময়কালে দুই ধরনের শোগুনতন্ত্র ছিল—(১) কামাকুরা শোগুনতন্ত্র (১১৯২-১৩৩৩) এবং (২) আশিকাগা শোগুনতন্ত্র (১৩৩৬-১৫৭৩)।

সম্রাট এবং শোগুনের পর জাপানি সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় স্থানে ছিল ডাইমিয়োগন। মূলত তারা ছিলেন দরবারের অভিজাত। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সময় নায়ক হিসেবেও অভিহিত করা হতো। শোগুনের পরই তাদের অবস্থান ছিল এবং তারা অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ভোগ করত। সর্বোপরি নিজেদের অধীনে থাকা জমি থেকে বেতন বাবদ 'ichimangoku' আদায়ের অধিকারীও ছিল ডাইমিয়গন। জমির উপর বংশানুক্রমিক অধিকার বজায় থাকার জন্য তারা নিজেদের পরিবারের মধ্যেও এটি হস্তান্তরিত করতে পারতেন।

জাপানি সমাজের সর্বাধিক পরিচিত শ্রেণী ছিল সামুরাই। সামন্ততান্ত্রিক জাপানের সমগ্র জনগণের মোট ১০ শতাংশ ছিল সামুরাই। তারা ডাইমিয়দের সেবায় নিয়োজিত থাকত এবং তাদের প্রতি তারা আনুগত্য প্রদর্শন করত। তারা পারিবারিক উপাধি ধারণ করতে পারত। তারা অস্ত্র রাখার অধিকারীও ছিল। উল্লেখযোগ্য যে অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারাও সামুরাই হতে পারতো। তবে সেক্ষেত্রে তাদের কোন একজন পুরুষের নেতৃত্বাধীনে থাকতে হত।

জাপানি সামন্ত সমাজের নিম্নতম স্তরে ছিল সাধারণ জনগণ—যাদের মধ্যে কারিগর, কৃষক এবং গ্রামবাসীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনো কোনো গবেষকের মতে, কৃষকদের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর ছিল। এইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় জনগণের মধ্যে সবথেকে প্রথমে অবস্থান ছিল কৃষকদের। তবে সেই সমস্ত কৃষকদেরই সামাজিক মর্যাদা ছিল যাদের নিজস্ব জমি ছিল। উৎপাদন মুল্যের নিরিখে কৃষকদের পরেই অবস্থান ছিল কারিগর এবং কারুশিল্পীদের। শহরে তাদের নিজস্ব কাজের জায়গাও ছিল যা পরবর্তী স্তরে অবস্থিত সাধারণ বণিক এবং অন্যান্য শ্রেণীদের ছিল না। তারা ছিল কনফুসিয়ান আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। জাপানি সামন্ত সমাজেও বণিকদের নিম্নতম স্তরে রাখা হত।

জাপানি সমাজব্যবস্থার নিম্নতম স্তরে আরো একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যাদের 'Ronin' বলে অভিহিত করা হতো। 'Ronin'-দের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, 'A Ronin was a wandering, mater-less Samurai, who was considered an outcast and lived in the fringes of society'। উল্লেখ্য, রোনিনদের কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল। ইতিপূর্বে, যে সমস্ত সামুরাইদের মর্যাদা দেওয়া হতো না এবং সামাজিক স্তর থেকে বহিষ্কার করা হত, তারাই 'রোনিন' নামে পরিচিত ছিল। তাদের সুযোগ সুবিধা এবং হারিয়ে ফেলা মর্যাদার কারণে অনেক সময়ই তাদের অসিযোদ্ধা এবং ভাড়াটে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা হত। বহিরাগত শ্রেণী হিসেবে তাদের অবস্থান নির্ণীত হত ডাইমিয়দের দ্বারা।

পরিশেষে জাপানি সমাজের প্রান্তিক স্তরেও একশ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। সমাজের তাদের উৎপত্তি অথবা ভূমিকার দ্বারাই তাদের অবস্থান নির্ধারিত হত। এর 'Ainu' নামে অভিহিত হত। জাপানে জাতিগত সংখ্যালঘু ছিল 'Ainu'। এদের অনেকেই জাতিগত বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিল এবং অনেকক্ষেত্রেই এদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হত। বস্তুতপক্ষে যে সমস্ত লোকজন কলকারখানায় কাজ করত, সামাজিক রীতি অনুসারে তাদের সমাজের নিম্নতম স্থানে নিক্ষেপ করা হত। সবশেষে বলা যায় যে, গণিকা এবং নর্তকীরা ছিল স্বাধীন এবং সমাজব্যবস্থার পিরামিড ব্যবস্থায় তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

উপরিউক্ত সামাজিক স্তরবিন্যাস মেইজি যুগের পুনরুত্থানের আগে পর্যন্ত জাপানে টিকে ছিল। পরবর্তীকালে সামরিক পদমর্যাদার বিলুপ্তির পর এই সামাজিক স্তরবিন্যাসে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৩.৪.৫ : নমুনা প্রশ্ন

ক. হান বংশের পরবর্তীকালে চৈনিক রাজবংশগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে যা জান লেখো?

খ. তুমি কি মনে কর যে প্রাক-আধুনিক চীন ছিল একটি জেন্ট্রী রাষ্ট্র?

গ. মধ্যযুগের চৈনিক সমাজ কতটা রক্ষণশীল ছিল?

ঘ. মধ্যযুগীয় জাপানের সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনা করো?

৩.৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

ক. 'A History of Asia'—Rhoads Murphey

খ. 'Rise of Modern China'—Imanuel Hsu.

গ. 'বিশ্বসভ্যতা'—এ কে এম শাহনাওয়াজ

ঘ. **'Half the World : The History and Culture of China and Japan'**–Arnold Joseph Toynbee

পর্যায়-৫

ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজের গঠন

একক-১১

সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা

একক-১২

ইউরোপীয়ান সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য

একক-১৩

ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক

একক-১৪

উৎপাদন সম্পর্ক—পুঁজির বিকাশের সম্ভাবনা

সূচীপত্র :

৩.৫.১ : উদ্দেশ্য

৩.৫.২ : সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা

৩.৫.২.১ : হেনরী পিরনের মত

৩.৫.২.২ : মার্ক ব্লকের মত

৩.৫.২.৩ : পেরি অ্যান্ডারসনের মত

৩.৫.২.৪ : ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি

৩.৫.৩ : ইউরোপীয়ান সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য

৩.৫.৪ : ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক

৩.৫.৫ : উৎপাদন সম্পর্ক—পুঁজির বিকাশের সম্ভাবনা

৩.৫.৬ : নমুনা প্রশ্ন

৩.৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.৫.১ : উদ্দেশ্য

ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় সমাজের গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বিষয়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন কে বাদ দিলে আর যে বিষয়টি ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গভীর প্রভাব ফেলেছে তা হল অর্থনীতি। যা সবিশেষ আলোচনার দাবি রাখে, তা হল ভারতীয় মধ্যযুগের অর্থনৈতিক আলোচনায় সামন্ততন্ত্র নামক এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব—যা সমসাময়িক রাজনীতির সাথেও সংশ্লিষ্ট। প্রধানত গুপ্তযুগের পতনের পরই কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ভূমিদাসের মাধ্যমে ভারতে সামন্তপ্রথার উদ্ভব হয়। যদিও প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে ইউরোপের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কিছু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রের ন্যায় ভারতীয় মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে আর যে বিষয়টি সমৃদ্ধ করেছে তা হল, ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের গঠন ও প্রকৃতি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায় কার্লমার্কস এর 'Asiatic Mode of production' সম্পর্কিত ধ্যানধারণা কে কেন্দ্র করে ইরফান হাবিবদের ন্যায় ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বিতর্কটিও খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাসে উৎপাদন সম্পর্ক এবং পুঁজির বিকাশের সম্ভাবনাও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। কৃষিজমি, কৃষক ও জমির মালিকের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজের গঠন নামক এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত বিষয় গুলি জানতে পারবে সেগুলি হল—

১. সামন্তপ্রথা নামক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব এবং সে প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মতামত।

২. ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি।

৩. ইউরোপের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য।

৪. ভারতীয় মধ্যযুগের গ্রামীণ সম্প্রদায় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক।

৫. মধ্যযুগীয় অর্থনীতিতে উৎপাদন সম্পর্কে এবং পুঁজির বিকাশের সম্ভাবনা।

৩.৫.২ : সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা

সামন্ততন্ত্র ছিল প্রধানত এক প্রকার ভূমি ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থা সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী অর্থাৎ নবম শতক থেকে পনের শতক পর্যন্ত ইউরোপবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং তাদের আচার-আচরণ ও ভাবধারার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উৎপত্তিগত ভাবে দেখতে গেলে দেখা যায়, 'সামন্ততন্ত্র' একটি ল্যাটিন শব্দ Feud am থেকে এসেছে। এখানে 'Feud am' এর অর্থ 'Fief' বা 'ক্ষুদ্র জমি।'

অন্যদিকে হস্তান্তরিত ক্ষুদ্র জমিতে অথবা শর্তাধীনে জমি দানকে বলা হতো 'Fief' বা 'Feud।' আর এই 'Feud' থেকে 'Feudal' (সামন্ত) এবং 'Feudal' শব্দ থেকেই সামন্ততন্ত্র বা Feudalism শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে।

সামন্ততন্ত্র বিকশিত হয়েছিল এমন একটি সময়ে যখন সম্পদ ও ক্ষমতার উৎস ছিল একমাত্র জমি। জার্মান অভিবাসনের সময় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ সময় মূলত জমি কেন্দ্রিক উৎপাদন গুরুত্ব লাভ করায় জমির মালিকের নিকট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। সামন্ত প্রথার উৎপাদনের কাজে সামন্ত প্রভূদের কোনো ভূমিকা থাকতো না। উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকতো কৃষক ও ভূমিদাসগণ অথচ উৎপাদিত ফসলের এক বিরাট অংশ লাভ করত সামন্ত প্রভূরা।

'সামন্ততন্ত্র' একটি ভূমিকেন্দ্রিক সরকারী ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিবর্তে স্থানীয় ভূস্বামীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়েছিল। যদিও যথাযথভাবে সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ একক কোন সংজ্ঞায় সামন্ততন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এছাড়া ঐতিহাসিকদের মধ্যেই এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, দশম ও এগারো শতকে ইউরোপে যে বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাই সামন্তব্যবস্থা। এছাড়া জার্মান ঐতিহাসিক গ্যানশফ বলেন, মধ্যযুগে ইউরোপে এমন কতগুলো অদ্ভুত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল যা একখণ্ড জমিকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। এর অর্থ হল একজন আর একজনকে জমি দান করবে এবং জমি দাতা হচ্ছেন 'লর্ড' আর যিনি গ্রহীতা তিনি হলেন 'ভ্যাসাল।' এই 'লর্ড' ও 'ভ্যাসালে'র মধ্যে যে সম্পর্ক এবং তার ফলে যে ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল তাই হলো সামন্ততন্ত্রের বা সামন্ত ব্যবস্থা। সুতরাং সামন্ততন্ত্র বলতে এমন কতকগুলো প্রথা, বিধি ও ব্যবস্থার সমষ্টিকে বোঝায় যেখানে শক্তিশালি মানুষ দুর্বল মানুষকে সাহায্য করবে এবং এর বিনিময়ে দুর্বল মানুষ শক্তিশালী মানুষকে সেবা করতে বাধ্য থাকবে।

৩.৫.২.১ : হেনরী পিরনের মত

বিংশ শতাব্দীর কুড়ি ও ত্রিশের দশকে বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক হেনরি পিরেন অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করেন। তার মতে প্রাচীন যুগে ইউরোপের নগরভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ হয়েছিল এবং এর ভিত্তি ছিল দূরপাল্লার বাণিজ্য। এই বাণিজ্য আবার নির্ভরশীল ছিল ভূমধ্যসাগরের সস্তা নৌ পরিবহনের উপর। কিন্তু সপ্তম শতকের শেষে এবং অষ্টম শতকের গোড়ায় আরবরা ইউরোপ আক্রমণ করে এবং ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে পশ্চিমের প্রবেশ পথ জিব্রাল্টার, সাগরের মধ্যস্থলে সারদিনিয়া এবং পূর্বের প্রবেশপথ

আলেকজান্দ্রিয়া (যা তারা ইতিপূর্বে দখল করে নিয়েছিল)। নৌ চলাচলের প্রধান কেন্দ্রগুলি বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার ফলে দুরপাল্লার বাণিজ্য ব্যাহত হয়। অর্থনীতি এর ফলে স্থানীয় বাণিজ্য-ভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং অন্তর্মুখী হয়ে গ্রাম নির্ভর হয়ে পড়ে। পিরেন একেই 'বদ্ধ অর্থনীতি' বলেছেন। একাদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ধর্মযোদ্ধারা আরবদের জিব্রাল্টার থেকে বিতাড়িত করে। এর ফলে আবার দূরপাল্লার বাণিজ্যের নতুন করে বিকাশ ঘটে এবং তার সঙ্গে নগর ভিত্তিক অর্থনীতিরও। এবং এর ফলে সামন্তপ্রথার ধীরে ধীরে অবসান ঘটে। এইভাবে পিরেন সামন্তপ্রথা ও বাণিজ্যের মধ্যে পারস্পরিক ও বিরোধী সম্পর্ক দেখেছিলেন। এই ধারণা সবাই মেনে নেননি এবং তার মত ইউরোপের ইতিহাসচর্চায় এখন আর গ্রাহ্য নয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল যেমন, ভারতের ঐতিহাসিকদের উপর এর প্রভাব এখনো প্রবল।

৩.৫.২.২ : মার্ক ব্লকের মত

বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন। তার আলোচনায় এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি দিকই স্পর্শ করা হয়েছে—অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক-প্রশাসনিক। তিনি দেখান যে, পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণকারীরা এসেছিল। পঞ্চম শতকে এই জার্মান উপজাতিরা অনেক দূর প্রান্ত থেকে এই অঞ্চলে আসে এবং তাদের আক্রমণের চাপে রোম সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয়। তাদের পরে আসে আরবরা। এরপরে ম্যাগিয়ার এবং দশম শতকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার আক্রমণকারীরা। এই সমস্ত আক্রমণের ফলে সমাজ নিরাপত্তার অভাব ভীষণভাবে অনুভূত হয় এবং অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়। ফলে মধ্যযুগের ইউরোপে সমাজের প্রায় সব ব্যক্তিই নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের সুরক্ষা সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা ও জীবন ধারনের উপায়ের অন্বেষণ থেকেই তৈরি হয় 'পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক'। সমাজের সমস্ত অংশই এই ধরনের সম্পর্ক তৈরি করে। কৃষকরা তাদের জমি স্থানীয় ভূস্বামীকে দিয়ে দেয় নিরাপত্তা ও জীবন ধারণের উপায় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে। ভূস্বামী কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেয় এই শর্তে যে, তারা প্রভুর জমি বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করবে। স্থানীয় ভুস্বামী আবার অনুরূপভাবে ক্ষমতাবান তাঁর থেকে ক্ষমতাবান প্রভুর কাছে নিরাপত্তার সন্ধানে নিজের জমি সমর্পণ করে। ইনিও স্থানীয় প্রভূর জমি ইত্যাদি তাকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পরিবর্তে স্থানীয় ভূস্বামীকে সামরিক বাহিনীর জন্য লোক জোগাড় করার দায়িত্ব নিতে হয়। এভাবে ছোট ভূস্বামী বা প্রভু বড় প্রভুর সামন্ত (Vassal) হলেন। এভাবেই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে যতক্ষণ না সমাজের সবাই একজন না একজনের প্রভু বা একজনের সামন্তে পরিণত হয়। কেবল সবার উপরে ছিলেন রাজা। তিনি কারও সামন্ত নন। আর কৃষক কখনোই কারো প্রভু ছিল না। এইভাবে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও তৈরি হয়।

৩.৫.২.৩ : পেরি অ্যান্ডারসনের মত

পেরি অ্যান্ডারসনই সামন্ত প্রথা কে সমাজের ভেতর ঘটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল বলে মনে করেন। তাঁর মতে সামন্ত প্রথা দুটি বিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার সংঘাতের ফল। দাসশ্রম-এর উপরে নির্ভরশীল ইউরোপের প্রাচীন সমাজে ক্রমশই উৎপাদন ব্যবস্থার সংকট দেখা দেয়। কারণ ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হচ্ছিল। এর মূল কারণ ছিল দাস-শ্রমের সীমাবদ্ধতা। উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম এমন উদ্ভাবন যা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সম্ভব তাতে দাস-শ্রমিকদের অনীহা ছিল। সুতরাং প্রাচীন গ্রিক ও রোমের সভ্যতা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে জার্মান উপজাতিগুলির সামাজিক সংগঠন অন্য ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সমান অধিকার-ভিত্তিক উপজাতীয় সামাজিক কাঠামো এখানে দুটি কারণে চাপের মধ্যে ছিল—সমাজের স্তরবিভেদ সৃষ্ট হওয়া এবং উন্নত রোমক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ। এই দুইয়ের সংঘাতের ফলে পঞ্চম শতকে দুই ব্যবস্থারই বিপর্যয় ঘটে এবং সৃষ্টি হয় নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—সামন্তপ্রথা। ঐতিহাসিকরা মনে করেন সামন্তপ্রথা সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। এই প্রক্রিয়া সমাজের সকল স্তরেই দেখা গিয়েছিল। সুতরাং সামন্ত প্রথার উদ্ভব দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল, কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

৩.৫.২.৪ : ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র একটি অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত বিষয়। সাধারণত **'সামন্ততন্ত্র'** শব্দটি মধ্যযুগে ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বর্বর আক্রমণের এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে নবম শতকে এই প্রতিষ্ঠানটি বিকশিত হয়েছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপে। ভূমিকেন্দ্রিক ও ভূমিনির্ভর এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপের বর্বর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ, সামন্ততন্ত্র একটি ভূমিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তাই মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজকে ঐতিহাসিকগণ **সামন্ততান্ত্রিক** সমাজ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা অবশ্য সামন্ততন্ত্রকে একটি উৎপাদন ব্যবস্থা বলে মনে করেন।

'সামন্ত' সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণির উপাধি, যারা রাজার অধীন স্থানীয় শাসক। রাজসামন্তও এক ধরনের শাসকের উপাধি যিনি রাজার প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় শাসক ও সামন্ত। সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের অন্যান্য উপাধি ছিল সামন্তাধিপতি; মহাসামন্তাধিপতি; সামন্ত-প্রতিরাজা ইত্যাদি।

আদি মধ্যযুগীয় (চার থেকে বারো শতক) ভারত, তথা বাংলায়, সামন্তপ্রথা ছিল শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় বহনকারী চিহ্ন। অবশ্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'সামন্ত' শব্দটি প্রতিবেশী রাজাকে নির্দেশ করে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজার পক্ষে বা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যুদ্ধ করার শর্তে ভূস্বামী বা জমিভোগকারী প্রজা অর্থে

'সামন্ত' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থে (প্রথম শতক)। 'বৃহস্পতিস্মৃতি' গ্রন্থে 'সামন্তদের সামরিক ও অন্যান্য পরিষেবার বিনিময়ে রাজা কর্তৃক ভূমি প্রদানের ব্যবস্থার কথা সুপারিশ করা হয়েছে। 'হর্ষচরিতম্' গ্রন্থে সামন্তদের সাতটি স্তরের উল্লেখ রয়েছে। এসব উল্লেখের পাশাপাশি ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রশাসনে সামন্ত, মহাসামন্ত, রণক, রাজপুত্র, রৌতদের যে অসংখ্য উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শাসনব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুদের বিশেষ অবস্থান।

সর্বভারতীয় ক্ষমতার অধিকারীর অনুপস্থিতিতেই অসংখ্য আঞ্চলিক শক্তিধরদের উত্থান ঘটেছিল বলেই মার্কসীয় পন্ডিতবর্গ মত প্রকাশ করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার উন্মেষের কারণেই শাসন ব্যবস্থায় এ পরিবর্তন ঘটেছিল। ডি.ডি কোশাম্বির মতে এই নতুন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল দু'টি পর্যায়ে : (ক) উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের (feudalism from above) প্রভাবে, যা ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়। সে সময় অধিরাজার সাথে তার অধীনস্থ স্বশাসনিক সামন্তপ্রভুদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল; মাঝখানে ভূম্যধিকারীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। (খ) সামন্ততন্ত্রের আরো জটিল ব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে নীচ থেকে উদ্ভাবিত সামন্ততন্ত্র (feudalism from below), যে ব্যবস্থায় গ্রামীণ ভূস্বামীরা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজা ও কৃষকশ্রেণি মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে ক্ষমতাশালীর ভূমিকা পালন করতে থাকে। এদের কারণেই রাজনৈতিক অবকাঠামো ধীরে ধীরে খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়ে। চার থেকে সাত শতকের মধ্যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে ও দ্বিপর্যায়িক বিকাশকে অবশ্য অনেক মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকই সমালোচনা করেছেন। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে ধ্রুপদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন আর. এস শর্মা। তিনি তিন থেকে বারো শতকের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের বিকাশে তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। এগুলি হল : (১) ৩০০-৬০০ শতকের মধ্যে উন্মেষ; (২) ৬০০-১০০০ শতকের মধ্যে বিকাশ এবং (৩) ১০০০-১২০০ শতকের মধ্যে উৎকর্ষ অর্জন এবং একই সাথে উক্ত ব্যবস্থার মধ্যে ফাটলও দেখা দিয়েছে। শর্মা পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিক অবস্থার সাথে সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক অবকাঠামোর যোগসূত্র দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

খ্রিস্টীয় চার শতকের দিকে, যখন প্রধান পুরাণসমূহ তাদের পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তখন পৌরাণিক বর্ণনায় রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের দুর্বলতার চিত্র পাওয়া যায়। ওই সময়ে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, শূদ্র সম্প্রদায় কর্তৃক ক্ষমতাধরদের প্রতি অমান্যপ্রবণতা ও কলিযুগে ধর্মকে হীন মনে করা—এসবই চার শতকের দিকে এক সামাজিক সংকটেরই ইঙ্গিত দেয়। শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা লোপ পাওয়ার মধ্যে এ সংকটের রাজনৈতিক প্রকাশ দেখা যায়। তারা তাদের আইনসম্মত অধিকার আদায় করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা ধর্মীয় শ্রেণিকে, প্রধানত: ব্রাহ্মণদেরকে ভূমিদান করতে এবং সাথে সাথে তাদেরকে প্রশাসনিক ও আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান করতে বাধ্য হয়। ফলে এই দান গ্রহীতারাই রূপান্তরিত হয় স্থানীয় ক্ষমতাবান শাসকে। আর্থিক অবস্থার অবনতি ও মুদ্রার স্বল্পতার কারণে রাজার পক্ষে রাজকর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে; বিনিময়ে রাজা

তাদের ভূমিদান করতে বাধ্য হয়। এভাবে সৃষ্টি হয় পার্থিব দান গ্রহীতা শ্রেণির। লিপি প্রমাণের (আট শতকের) ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে বিহারের হাজারিবাগ এলাকার গ্রামবাসীদের পক্ষে কিভাবে তিন ব্যবসায়ী ভ্রাতা রাজার প্রতি অবলগন/অবলগক প্রদর্শন করেছিল এবং রাজা ব্যবসায়ী ভ্রাতৃত্রয়কে স্থানীয় সামন্ত বলে স্বীকৃতি দান করেছিলেন।

ইতিহাসে সর্বযুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা একই রকম ছিল না। এক সময় রাজার ক্ষমতার কোন সীমা ছিল না। আইনপ্রণয়ন, শাস্তিদান এবং বিচার করার সর্বময় ক্ষমতাই ছিল রাজার। যুদ্ধ ঘোষণা করারও তার ছিল একক ক্ষমতা। আবার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং ন্যায়ের উৎসেও ছিলেন রাজা। তবে রাজার সর্বময় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধকরণেরও কিছু ব্যবস্থা ছিল, যাতে সে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে। প্রথম নিয়ন্ত্রক ছিল মহামন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ। যখন বাংলার পাল সম্রাট দ্বিতীয় মহীপাল এর সামন্তবর্গ বিদ্রোহ করেছিল তখন তিনি তাঁর সদ্গুণ সম্পন্ন মন্ত্রিবর্গের উপদেশ অমান্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কেবল জীবনই হারান নি, একই সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলও হারিয়েছিলেন। বরেন্দ্র এলাকার সামন্তবর্গ রাজার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিলো (মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র)। আবার রামপাল যখন বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি করছিলেন তখন তাঁকে বিপুল সংখ্যক সামন্তকে ভূমিদানসহ বিভিন্ন উপঢৌকনের প্রলোভন দেখিয়ে পক্ষে টানতে হয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিত’ কাব্যে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় যে সামন্তপ্রভুরা রাজক্ষমতার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতো। গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের শেষ পর্যন্ত বাংলার কিংবা সারা ভারতবর্ষেরই রাজনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো সামন্ততান্ত্রিক ছিল এবং এক অর্থে সামন্ততন্ত্র সমাজের শক্তিতো ছিলই আবার কখনো কখনো সমাজের দুর্বলতাও ছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুদের তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান কেবল বাংলাতেই না, সারা ভারতেই ছিল। বৈন্যগুপ্তের (৫০৭ খ্রি:) সময় সামন্ত বিজয়সেন ক্ষমতাশালী হয়ে মহাসামন্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং সাম্রাজ্যের সর্ব দক্ষিণ-পূর্বাংশে অসীম ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি শশাঙ্কও মহাসামন্তের অবস্থান থেকে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠে এসেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজবংশের প্রথম রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল রাজাদের ক্ষমতার ‘আধার’ হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারীদের তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখান থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তাঁর উত্থান ঘটে। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেনও পাল সাম্রাজ্যে সামন্ত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং পালদের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করেন। অসংখ্য তাম্রশাসনে বিধৃত বহু দৃষ্টান্ত থেকে সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে আদি মধ্যযুগীয় (চার থেকে বারো শতক) শাসন ব্যবস্থায় সামন্তদের প্রভাব কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণ ও ফলাফল উভয়ই বলে বিবেচনা করা যায়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য : সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ইউরোপে যখন একের পর এক বর্বর আক্রমণ হচ্ছিল, তখন এই আক্রমণকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা ইউরোপীয় রাজাদের ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে রাজারা সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব স্থানীয় লর্ড বা ভূস্বামীদের হাতে ছেড়ে দেন। এভাবে রাজারা তাঁদের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা লর্ডের সঙ্গে ভাগ করে নিলে এক বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

(খ) পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ঠ। এক্ষেত্রে রাজা ও লর্ড ছিল একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। বস্তুত রাজা ছিলেন ওভার লর্ড বা বড়ো লর্ড। এই নির্ভরশীলতা অবশ্যই সামরিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্র। লর্ড আবার নির্ভরশীল তাঁর অধঃস্তন ভ্যাসালদের উপর। ভ্যাসাল আবার লর্ডের উপর নির্ভরশীল। এভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা তৈরি হয় চুক্তির মাধ্যমে। স্তরে স্তরে বিভক্ত এই সমাজে একেবারে উপরে থাকতেন রাজা, আর একেবারে নীচে থাকতেন ভূমিদাস বা জমিতে আবদ্ধ পরাধীন কৃষকেরা। এই ভূমিদাসদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল ভূস্বামী বা লর্ডদের। এদের সম্পর্ক ঠিক সহযোগিতার ছিল না, চুক্তির মাধ্যমে এই সম্পর্ক তৈরি হত না। এই সম্পর্ক ছিল শোষণ বা অত্যাচারের। ভূমিদাসেরাই ছিল অত্যাচারিত ও শোষিত।

(গ) জমির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বা কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি ছিল এই সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাণিজ্য বিশেষত বহির্বাণিজ্যের স্থান ছিল একেবারে নীচের দিকে। কৃষিনির্ভর হলেও উৎপাদন বাড়াবার সুযোগ এই ব্যবস্থায় ছিল না। এক গ্রামকেন্দ্রিক (বা ম্যানরকেন্দ্রিক; ম্যানর বলতে বোঝায় এক বড় ভূমিখন্ড) আবদ্ধ অর্থনীতি এই সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

ভারতের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব—রামশরণ শর্মার অভিমত : সামন্ততন্ত্রের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে কোনো কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিক খ্রিস্টিয় ৬০০ থেকে ১২০০ এই সময়কালকে **ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের** যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়কালে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায় বলে এঁরা দাবি করেন। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কথা প্রথমে বলেন **ডি. ডি. কোশাম্বি। পরে রামশরণ শর্মা** বিস্তৃত ভাবে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উন্মেষ ৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তারপর ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ—এই সময়কালে এই ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ঘটে। ৯০০থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি ও ভাঙন ধরেছিল। ইউরোপের অনুকরণে ড. শর্মা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। সেগুলি হল—

(ক) ইউরোপের মতো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর এই বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়। রাজারা প্রায়শই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রহার (বা নিষ্কর জমি,

যে জমির খাজনা ভোগ করবে ওই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তি) দান করতেন। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিকেও অগ্রহার দান করা হত। এর ফলে আঞ্চলিক প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও এক বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

(খ) অগ্রহার দানের ফলে কেবল রাজনীতি বা প্রশাসনে নয়, অর্থনীতি বা সমাজ জীবনেও এক নতুন প্রবণতার জন্ম হয়। ড. শর্মা মনে করেন, খ্রিস্টীয় ৬০০-১২০০ শতকের সময়কালে অর্থনীতি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। বহির্বাণিজ্যের উপস্থিতি এই সময়কালে চোখে পড়ে না। মুদ্রার অনুপস্থিতি ও নগরের পতন বাণিজ্যের অবক্ষয়ের চিত্র বহন করে। শিল্পের বিকাশ ও বাণিজ্যের সঙ্গে নগরের বা শহরের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ড. শর্মা হিউয়েন সাঙের বিবরণের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরের পতন ঘটে ছিল। এই নগর গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কৌশাম্বী, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, বৈশালী, প্রভৃতি। এইভাবে ইউরোপের মতো ভারতবর্ষেও এক কৃষিনির্ভর আবদ্ধ অর্থনীতি গড়ে ওঠে, যেখানে ভূস্বামীরা প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। কৃষকদের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয় এবং এরা ক্রমশ জমিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। পুরাণে কৃষকদের বলা হত **'আশ্রিতহালিক', 'বদ্ধহল'**, ইত্যাদি। এর থেকে প্রমাণিত হয় কৃষকরা জমিতে আবদ্ধ ছিল এবং তাদের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। এই অবস্থা ইউরোপের ভূমিদাস ব্যবস্থার অনুরূপ। ড. শর্মা একথা স্বীকার করেন যে, এই সময়কালে কৃষির প্রসার ঘটেছিল এবং উৎপাদনও বেড়েছিল।

৩.৫.৩ : ইউরোপীয়ান সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য

ড. শর্মার উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক সহমত পোষণ করেন না। **হরবন্স মুখিয়া, দীনেশচন্দ্র সরকার, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চম্পকলক্ষ্মী** প্রমুখেরা মনে করেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'সামন্ততন্ত্র' শব্দটি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ এই সময়কালের ভারতীয় ইতিহাসের অদ্ভুত মিল থাকলেও অমিলও ছিল অনেক বেশি। শর্মার অনেক বক্তব্য এঁরা তথ্যনিষ্ঠ ভাবে অনেকাংশে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন।

প্রথমত, বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা মানেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, এখানে ভূস্বামীদের সামরিক সাহায্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, যা ইউরোপে ছিল। কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সময়কালে বর্বর আক্রমণের ভয়াবহতা দেখা যায়নি।

তৃতীয়ত, মুদ্রার অনুপস্থিতি, নগরের অবক্ষয়, বাণিজ্যের পতন বা বাণিজ্যশূন্যতা—এগুলির কোনোটিই সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয়। এই সময়কালে বেশ কিছু নগরের পতন ঘটলেও নতুন কিছু শহরও গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া কাশী, বারাণসী বা পাটলিপুত্রের মতো প্রাচীন শহরের অস্তিত্ব এই সময়তেও ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যও এই

সময় চলেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চিন এবং আরবের সঙ্গে এ সময় বহির্বাণিজ্য চলত। তাছাড়া শর্মা কথিত কৃষির প্রসার তো বাণিজ্যের প্রসারেও সাহায্য করবে। অর্থনীতি পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল—এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

চতুর্থত, কৃষিতে স্বাধীন শ্রমের ব্যবহারও অব্যহত ছিল। তা ছাড়া আশ্রিতহালিক বা বদ্ধহল শব্দগুলির ব্যাখ্যা পুরাণে নেই। কাজেই এই শব্দগুলি ভূমিদাসের সমার্থক কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ভারতীয় কৃষকেরা ইউরোপীয় ভূমিদাসের পর্যায়ে পৌঁছেছিল কিনা, এ বিষয়ে ড. শর্মা নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বস্তুত, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। ড. শর্মার অনেক ব্যাখ্যাই ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ভারতবর্ষকে ফেললে জটিলতা তৈরি হতে বাধ্য এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে শর্মার ব্যাখ্যার মধ্যে যে অভিনবত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে কর্নেল জেমস টড ১৮৮০র দশকে রাজস্থানে ইউরোপীয় সামন্ত প্রথার অনুরূপ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সামন্তপ্রথার ধারণাটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল ইউরোপীয়রা এইসব অঞ্চল জয় করার ফলে বা এই অঞ্চলের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে। এর ফলেই ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমাজ বা তাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা সহজ হয়েছিল। আবার 'সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা'র ধারণা প্রয়োগ করে নানান সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা সহজেই করা সম্ভব হত। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা পরে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এঁরা অবশ্য এর অর্থকে আরো প্রসারিত করেন।

ভারতবর্ষে 'ভারতীয় সামন্তপ্রথা' এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ছবি তুলে ধরে যেখান বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটে। ফলে মুদ্রার প্রচলনে সংকট দেখা দেয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্র বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণদের এবং কিছুটা কর্মচারীদের জমি দান করতে। এরা আবার কৃষকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে ও সামন্তপ্রথা প্রতিষ্ঠা করে। একাদশ শতকে আবার বাণিজ্য শুরু হয়; কৃষকেরা নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে এবং সামন্তপ্রথার অবসান এর সূচনা হয়।

সাম্প্রতিককালের ইতিহাস চর্চায় 'ভারতীয় সামন্তপ্রথা' সম্পর্কিত ধারণাটি সমালোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই ধারণায় বাণিজ্য ও সামন্তপ্রথার মধ্যে একটি বিরোধকে ধরে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই ধারণায় ইউরোপ থেকে ধার করা বিশ্লেষণ ও তার পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—ম্যানর, ভূমিদাস, কমিউটেশন ইত্যাদি। সমালোচকরা বলেন যে, ভারতীয় পরিবেশ, প্রযুক্তি ও সামাজিক ব্যবস্থা ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং ভারতবর্ষে বা অন্যত্র প্রাক-আধুনিক যুগের ইতিহাস ও সমাজ বুঝতে হলে ঐ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই তা বুঝতে হবে, ইউরোপ থেকে ধার করা ধারণার মাধ্যমে নয়। তবে সমালোচনা সত্ত্বেও

সামন্তপ্রথা সম্পর্কে ধারণা জনপ্রিয় হয়েছে। এর একটা কারণ এই যে এই ধারনার অস্পষ্টতার ফলে সাধারণভাবে নানান অবস্থা বুঝতে এটি প্রয়োগ করা যায়। আবার কেউ কেউ একটু অন্যভাব্যে শব্দটি ব্যবহার করেন, যেমন আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা প্রোটো সামন্ততন্ত্র বা 'সামন্তপ্রথা'।

৩.৫.৪ : ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক

জাতি ও যৌথ পরিবার ভারতের গ্রামীণ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্যের আলোকে বিভিন্ন দিক নিয়ে ভারতের গ্রাম ও গ্রামের সম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। গ্রামের সেবা ব্যবস্থার কার্যকরী গোষ্ঠী যেমন বিভিন্ন কারিগর, কর্মকর্তা এবং গ্রামের চাষের জনগোষ্ঠীর সহায়তায় গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সহায়ক উপাদান গঠিত হয়। ভারতে মানব বসতির মৌলিক একক হিসেবে গ্রামে থাকে বাসস্থান, চাষের জন্য আবাসস্থল এবং কৃষি জমি। উল্লেখ্য, 'সমাজতান্ত্রিক গ্রাম' একটি সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাস্তবে এলাকার আশেপাশের কৃষি এলাকা বিবেচনা করাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। এবং এটি কেবল প্রশাসনিক উদ্দেশ্য নয়, বরং গ্রামের সমস্ত জনসংখ্যাতে তথ্যও এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। একটি 'সমাজতান্ত্রিক গ্রাম' প্রায়শই 'প্রশাসনিক গ্রাম' হিসাবে একই রকম থাকে। যাইহোক, গ্রামের এই প্রক্রিয়া দেশের সমগ্র অংশে দেখা যায় না, কারণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভৌগলিক, পরিবেশগত ও ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রয়েছে।

প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে গ্রাম সমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করেন। স্বনির্ভরতা বোঝাতে অনেক সময় এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো সমাজই পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক্ষেত্রেও শব্দটি তুলনামূলকভাবে সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ বলতে এমন গ্রাম সম্প্রদায়কে বোঝানো হয় যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা বিদ্যমান এবং জীবন ধারণের মৌলিকপ্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য তাদের গ্রামের বাইরের কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। এই সীমিত অর্থেও প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' ছিল কিনা সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা একমত নন।

সমাজতান্ত্রিক এ. আর. দেশাই-এর মতে, প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর মতে, সামান্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে শতাব্দীকাল ধরে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজই ছিল প্রাক-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক চাষাবাদ এবং হস্তচালিত শিল্পের উপর ভিত্তি করে গ্রাম সমাজগুলি যুগ যুগ ধরে টিকে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর ভারতে কর্মরত ইংরেজ প্রশাসক চার্লস মেটকাফের বক্তব্য তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

> গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররূপে বিরাজ করত। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই তারা নিজেরাই জোগাড় করতে পারত। বাইরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন হতো না। যেখানে কোন কিছুই টিকে থাকে না। সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিজের জোরে টিকে গেছে। একের পর এক রাজংবশ এসেছে এবং লোপ পেয়েছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক বিপ্লব। হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ সবাই ক্রমান্বয়ে শাসন করেছে, কিন্তু গ্রাম সমাজ মূলতঃ একই রকম থেকে গেছে।

এইচ. এস. মেইনের মতে, গ্রাম সমাজ হল একটি সংগঠিত ও স্বয়ংক্রিয় পরিবার গোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের উপর যৌথ মালিকানার অধিকারী। এলফিনস্টোন, ডেনজিল, ইবেটসনের মত ব্রিটিশ প্রশাসকরাও প্রাক-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের অস্তিত্বের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এই গ্রাম সমাজগুলিতে ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যেত। বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই এই গ্রাম সমাজগুলি তার সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্য, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন গৃহস্থালী সামগ্রী নিজেরাই তৈরি করত।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাই-এর মতে, গ্রামের সমগ্র ভূমি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চায়েতের অধিকারে ছিল। পঞ্চায়েত ছিল গ্রামসমাজের প্রতিনিধি। পঞ্চায়েতই কর্ষণোপযোগী ভূমি বিলি-বন্দোবস্ত করত। গ্রামের রিবারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক এ. আর. দেশাই শেলভাঙ্কারের এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন—এরা একদিকে বিভিন্ন প্রকার যৌথ বাধা-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো আবার অন্যদিকে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল'। গ্রাম সমাজে কৃষক ছাড়া মুচি, কামার, কুমোর, ছুতার, ধোপা, তেলি, নাপিত ও অন্যান্য কারিগররা বাস করত। তারা সবাই গ্রামের জনগণের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই উৎপাদন করত। গ্রামগুলি উৎপাদনের ব্যাপারে মোটামুটি স্ব-নির্ভর ছিল বলা চলে। গ্রামের প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি উৎপাদনের চেষ্টা দেখা যেত না, কারণ এতে কোনো লাভ হচ্ছিল না। বিশেষ করে কৃষকদের ক্ষেত্রে বাড়তি ফসল থেকে রাজস্ব আদায়কারীরা বেশি অংশ দাবী করবে—এই আশঙ্কায় শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজনমাফিক উৎপাদনকেই তারা স্বাভাবিক লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করত। গবেষক রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিমের সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেশ কিছু আধিকারিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থার কার্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তারই ভিত্তিতে ১৮১২ সালে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবরণী প্রকাশিত হয়। তবে, অধ্যাপক মুখার্জির মতে, এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতের গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে কার্ল মার্কসের রচনা থেকে আমরা সব চেয়ে ভাল ধারণা লাভ করতে পারি।

সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত:** ব্যক্তি মালিকানার অনুপস্থিতি। মার্কসের মতে, ভারতের গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছিল ভূমিতে যৌথ মালিকানার উপর ভিত্তি করে। **দ্বিতীয়ত:** কৃষিজাত ও হস্তচালিত শিল্পের ঐক্যবন্ধনকে প্রাক-বৃটিশ গ্রাম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা যায়। মার্কস মন্তব্য করেন যে, কৃষি ও শিল্পের মিলনের ফলে ক্ষুদ্র সমাজ সম্পূর্ণ রূপে স্বয়ংভর হয় এবং নিজের মধ্যেই উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের শর্ত পূরণ করে। অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান তৈরি হয়নি। পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে গ্রাম সমাজেই কৃষি ও শিল্পের জন্য যৌথভাবে নিয়োজিত হত। **তৃতীয়ত**-গ্রাম সমাজের বিচ্ছিন্নতা। বাইরের সমাজের সঙ্গে অর্থনীতিক সংযোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে প্রাক ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজ গুলি বহুকাল ধরে নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ. আর. দেশাই-এর মতে স্বনির্ভর গ্রাম সমাজগুলি বহির্জগৎ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ইরফান হাবিবও মনে করেন যে, প্রতিটি গ্রাম আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বতন্ত্র এককে পরিণত হয়েছিল। **চতুর্থত**-প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজে সামাজিক সচলতার একান্ত অভাব ছিল। মার্কসের মতে, গ্রাম সমাজগুলির গতিহীনতার কারণে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং নিজ কক্ষপথে আপন গতিতে আবর্তিত হয়েছে। এ. আর. দেশাই-এর মতে, মার্কস এই অপরিবর্তনশীল গ্রাম সমাজের চিত্র খুবই সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ প্রশাসকদের বর্ণনা করা 'গ্রাম সমাজ' এবং মার্কস বর্ণিত 'এশিয়াটিক' সমাজের ধারণাগত সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক গৌতম ভদ্র বলেন যে, এই দুটি ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই বেশি। মূল পার্থক্য হল দৃষ্টিভঙ্গিগত। কারণ মার্কস যৌথ মালিকানার ধারনাকে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখেছেন। এই দ্বান্দ্বিক দিক এবং ভূমিতে বিভিন্ন রকম অধিকারের স্বীকৃতি ইংরেজ প্রশাসকদের রচনায় ছিল না।

ভারতের গ্রামসমাজে ভূ-সম্পত্তির যৌথ মালিকানা ছাড়া আরও দুটি প্রক্রিয়া মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী। একদিকে ছিল শ্রমবিভাজনের বিকাশের অভাব। এর কারণেই কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের সংযোগ ঘটেছিল। অপরদিকে ছিল অপরিবর্তনযোগ্য শ্রম বিভাজনের প্রতিষ্ঠা। এটি জাত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। জাত প্রথা অনুসারে গ্রাম সমাজের সদস্যদের বৃত্তি জন্মসূত্রেই আরোপিত হত। অধ্যাপক ইরফান হাবিব-এর মতে, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের মিলন এবং অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাজন—ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির এই দুই যুগ্ম অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে কার্লমার্কস-এর বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। কার্লমার্কস-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ বিজ্ঞানী কে. এম. আশরাফ প্রাক-ব্রিটিশ যুগের গ্রাম সমাজ সম্পর্কে বলেন যে, এখানে স্থানীয় চাহিদার কথা মনে রেখেই উৎপাদন করা হত। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা নিজে নিজে পেশায় নিযুক্ত থেকে তাদের কাজ করতো। ঐতিহাসিক ডি ডি কোশাম্বিও ভারতীয় গ্রাম সমাজ সম্পর্কে মার্কসের মতকে সমর্থন করেছেন। তার মতে, সামান্য প্রয়োজনে সীমিত অর্থে পণ্য উৎপাদন ছিল। তবে উৎপাদন রাষ্ট্রের হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা কখনোই বাজার পণ্যের রূপ নেয় নি।

৩.৫.৫ : উৎপাদন সম্পর্ক—পুঁজির বিকাশের সম্ভাবনা

প্রায়ই বলা যায় যে, ব্রিটিশদের অভিযানের আগে তথা মধ্যযুগে ভারত পুঁজিবাদী অর্থনীতির শিল্পায়ন ও বিকাশে কেন ব্যর্থ হল? অন্য কথায়, ইউরোপে যা ঘটেছিল তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যযুগে ভারতে পুঁজিবাদের উত্থানের কোন সম্ভাবনা ছিল কি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন ডঃ মোরল্যান্ড এবং ব্রিজ নারায়ন। যাইহোক, 1960 এর দশক থেকে মরিস ডি মরিস (1963) এবং Toru Matsui-এর দ্বারা শুরু হওয়া এই প্রশ্নটির উপর নিয়মিত বিতর্ক হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বিপানচন্দ্র ও তপন রায়চৌধুরী (1968) এই বিতর্কে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ঊনিশ শতকের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ। মধ্যযুগীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়ে কার্যকরী অনুসন্ধান করেছেন ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত প্রবন্ধ 'Potentialities of Capitalistic Development in the Economy of Mughal India' (presented at the Internationa Economic History Congress, Bloomington, 1968 and published in 'Enquiry', New Series, Vol. 111, No. 3, 1971, pp. 1–56) এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া A.I. Chicherov এর 'India : Economic Development in the 16th-18th centuries' গ্রন্থটিও এক্ষেত্রে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এছাড়া Jan Qaisar-এর 'The Role of Brokers in Medieval India' (published in The Indian Historical Review, Vol. I, No. 2 Sept. 1974, pp. 240–46) নামক গ্রন্থটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

প্রাথমিক পুঁজিবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (i) উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ; (ii) অর্থ বা বাজার সম্পর্ক; (iii) পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক জোগান এবং (iv) উৎপাদন-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিরতি। উল্লেখ্য, মধ্যযুগীয় ভারতের ব্যবসায়ীদের যে যথেষ্ট মূলধন ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বলা হয় যে, ১৬৬৩ সালে সুরাতের কিছু ব্যবসায়ী ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন রুপির মালিকানাধীন ছিল। সুরাতের বিখ্যাত বণিক আবদুল গফুরের ৮ লক্ষ টাকার সম্পদ ছিল। ২০টি জাহাজ ছিল তাঁর মালিকানাধীন (৩০০ টন এবং ৮০০ টন)। ইংরেজী বিবরনগুলি থেকে জানা যায় যে, তার ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ তার কোম্পানির চেয়ে কম ছিল না। আরেকজন সুরাতের ব্যবসায়ী ভি জি ভন-এর ৮ লক্ষ্য টাকা মূল্যের 'এস্টেট' ছিল।

ব্যবসায়ীরা তাদের অর্থ বা মূলধন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও কাজে লাগাত এবং তা অনেকাংশেই ছিল স্বাভাবিক। এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সদস্যরাও বাণিজ্যে বিনিয়োগ করত। এই গোষ্ঠীতে এমনকি মুঘল সম্রাট, রাজপরিবারের মহিলা, রাজকুমার, অভিজাত প্রমুখরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমান ব্যবসায়ীদের চেয়ে অনেক কম ছিল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে তাদের দ্বারা বিনিয়োগ 'অর্থ-বাজার' গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মুঘল ভারতে ঋণ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নত ছিল। 'স্রফ' নামক পদাধিকারী ব্যক্তি অর্থ প্রদান এবং 'হুন্ডী' নামক বিনিময় বিল প্রদান করে ব্যাংকার-এর ভূমিকা পালন করত। এমনকি ব্যবসায়ীদের 'হুন্ডী' আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্যের উপর ছাড় দিয়ে 'স্রফ' বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছিল। আভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য বিনিময়ের উপর বিমার সুবিধাও প্রচলিত ছিল।

সর্বোপরি, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আর্থিক ঋণ প্রদান এবং তার উপর সুদ আদায়ের জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বও আলোচ্য সময়কালে লক্ষ্য করা যায়। একথা সুস্পষ্ট ভাবেই বলা যায় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ ভাবেই পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলিই মধ্যযুগীয় ভারতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত করেছিল। পণ্যসামগ্রী বিশেষ করে বস্ত্র, saltpetre, নীল ইত্যাদি বিপুল পরিমানে উৎপাদিত হয়েছিল। 'Broker' বা বেনিয়ানদের কার্যকরী ভূমিকার জন্যই ভারতীয় ও বিদেশী উভয় ব্যবসায়ীর পক্ষেই এই পণ্যগুলি সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগীয় ভারতে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পরিবহনের মাধ্যমগুলিও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। উল্লেখ্য, পুঁজিবাদ তখনই বিকশিত হতে পারে যখন 'মূলধন' উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৃহত্তর এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করবে। এটিই হল শিল্পগত এবং বাণিজ্যিক মূলধনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। পরেরটি সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকে না। অন্যকথায়, উৎপাদন ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এটি স্বাধীন কারিগরদেরর দ্বারা সম্পাদিত হত, যারা সরঞ্জামের মালিক ছিল, কাঁচামাল কেনার জন্য তারা অর্থ বিনিয়োগ করেছিল, তাদের নিজ নিজ বাসস্থানে (Domestic craft system) কাজ করেছিল, উৎপাদিত পণ্যগুলির মালিক ছিল এবং পরে তারা উৎপাদিত পণ্যগুলি বিক্রি করত বাজারে। কিন্তু পুঁজিবাদ এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করে দেয় এবং স্বাধীন কারিগরদের মজুরি-কর্মীতে রূপান্তরিত করে। শিল্পগত মূলধন ধীরে ধীরে উৎপাদন পদ্ধতি এবং সমগ্র ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষেত্র থেকে শিল্পগত ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের আগমন হঠাৎ করে ঘটেনি। ইতিপূর্বে সেখানে একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায় বা 'transitory stage' ছিল যা বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ-এর মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়। এটি 'Putting-out system' নামে পরিচিত। বিদ্যমান এই কারিগরি প্রক্রিয়াতেই বাণিজ্যিক মূলধনের অনুপ্রবেশটি 'Putting-out system'র (দাদনি) মাধ্যমে ঘটে ছিল—যা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে স্বল্প আকারে হলেও এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত অনুশীলন ছিল।

৩.৫.৬ : নমুনা প্রশ্ন

ক. মধ্যযুগীয় ভারতে সামন্ততন্ত্রের উত্থান এবং তার প্রকৃতি আলোচনা কর? এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণ কর?

খ. ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় কর?

গ. মধ্যযুগীয় ভারতের গ্রামীণ সমাজ এবং সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলির মূল্যায়ন কর?

ঘ. তুমি কি মনে কর যে মধ্যযুগীয় ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশের কোনও সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল?

৩.৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

ক. 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'—রোমিলা থাপার।

খ. 'ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে'—ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী।

গ. 'প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে'—রনবীর চক্রবর্তী।

ঘ. 'Indian feudalism'–Ram sharan Sharma.

ঙ. 'Rethinking Early Medieval India : A Reader'–Upinder Singh.

চ. 'মুঘল যুগের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ'—গৌতম ভদ্র

পর্যায়-৬

ধর্ম ও জাতি গঠন

একক-১৫

ইসলামের প্রভাবে সামাজিক মননে পরিবর্তন

একক-১৬

ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজে সংস্কার আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক

সূচীপত্র :

৩.৬.১ : উদ্দেশ্য

৩.৬.২ : ইসলামের প্রভাবে সামাজিক মননে পরিবর্তন

৩.৬.৩ : ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজে সংস্কার আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক

৩.৬.৪ : নমুনা প্রশ্ন

৩.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.৬.১. : উদ্দেশ্য

মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিশ্চিতভাবেই ইসলামের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। সাধারণত অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এর পরেই শুরু হয় আধুনিক যুগের উত্তোরণ। উল্লেখ্য, অগ্রসরতা ও যুক্তিবাদ (Progress and rationality) আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত হয়। এরই সাথে উদারতা ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতারও সঞ্চার ঘটে। শেষোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যকে ইসলামের অনিবার্য প্রভাব বলা চলে—যা মধ্যযুগের সুফী ও ভক্তি নামক দুটি ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। সমাজ ও ধর্ম গঠনের প্রক্রিয়ায় ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরধর্মসহিষ্ণুতার বাতাবরণও এই সময় গড়ে উঠেছিল। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এই সহিষ্ণুতার আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক আনুগত্য অর্জন। অন্যদিকে বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির মেলবন্ধনও এই সময়ে শুরু হয়েছিল। বর্ণপ্রথা, খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ, বিনোদন, সমাজে মহিলাদের অবস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

সুতরাং, মধ্যযুগীয় সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই অধ্যায়টি পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত বিষয় গুলি জানতে পারবে সেগুলি হল—

১. মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ও তার পুনর্গঠনে ইসলামের অবদান।

২. ইসলামের আদর্শের পেক্ষাপটে সুফি ও ভক্তিবাদ নামক ধর্মীয় আন্দোলনের তাৎপর্য।

৩. ইসলামের প্রভাব এবং সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক।

৩.৬.২ : ইসলামের প্রভাবে সামাজিক মননে পরিবর্তন

ইতিপূর্বে, গ্রীক, সিথিয়ান ও হুনরা তাদের সঙ্গে নিজেদের কোন ধর্মতত্ত্ববিদকে নিয়ে না আসায় হিন্দু ও বিদেশি ধর্মের মধ্যে কোন সংঘাত উপস্থিত হয়নি। কিন্তু ইসলামের আগমনের পর এই সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের সঙ্গে এক নতুন জীবনধারার আগমন ঘটে। বিদেশিদের প্রভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের যেটুকু পরিবর্তন হয়েছিল তা দুই ধর্মের বিধানদাতারা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তা হয় নি। তবে তা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সংমিশ্রণের কিছু প্রবনতা দেখা যায়। লক্ষ্যনীয় যে তুর্কীরা ভারতীয়দের খাদ্য পোশাক গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল ইসলামের কোন কোন সামাজিক চিন্তা ভারতীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পরোক্ষভাবে দেখতে গেলে এদিক দিয়ে মোঙ্গলদের অবদান আছে। তারা আফগানিস্তান ও পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চলগুলি থেকে ব্যাপকহারে জনগণের ভারতবর্ষে আসার সম্ভাবনা বন্ধ করে দেয়। সমুদ্রপথে প্রতিবছর মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী আসত এবং তারা পশ্চিম উপকূলের বন্দর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করত। এই সমস্ত কারণে ধর্মান্তরিত হিন্দুরাই ইসলামের প্রধান ভরসা হয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া চলছিল খুবই ধীরগতিতে। উল্লেখ্য, মুসলিমরা ভারতবর্ষের সব সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এ থেকে প্রমানিত হয় না যে, অধিকাংশ হিন্দু শুধুমাত্র দুরবস্থার কারণেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এমনকি সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষের দ্বারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে তেমন কিছু সুযোগ সুবিধে হয় নি। অধিকাংশ মুসলিম প্রাক্তন হিন্দু হওয়ার ফলে দেশের মূল জনসমাজের জীবনধারার সঙ্গে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। তবে একথা বলতেই হবে যে দুই ধর্মের শাসকশ্রেণী দুই ধর্মের মিলন সম্পর্কে এত সহজ কিছু করতে চান নি। দুই ধর্মের নীতি প্রণয়নকারীরা এবং কখনো কখনো রাজনীতিকরাও হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে প্রভেদ টিকিয়ে রাখতেই আগ্রহী ছিলেন। কারণ ধর্মীয় আনুগত্যকে প্রয়োজনমতো ধর্ম ছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে। হিন্দু পণ্ডিতরা বোঝেন নি যে, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে একীকরনের সচেতন চেষ্টা থাকা উচিত।

সুলতানি আমলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বের থেকে এমন কিছু পৃথক ছিল না। ইসলামিক অনুশাসন অনুযায়ী এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একেবারে খাঁটি ইসলামী আখ্যা দেওয়া অসম্ভব ছিল। যেমন—

দৈব শক্তির সঙ্গে রাজার কোন সম্পর্কের কথা কোরানে বলা হয়নি। কিন্তু পারস্যের সাসানীয় রাজাদের কাছ থেকে মুসলিম শাসকরা এই ধারনা গ্রহণ করেছিল। ভারতে আসার পরও তারা এই ধারনা প্রত্যক্ষ করেছিল। পরবর্তী স্তরে শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতি-নির্ধারকদের অনুমতি নিয়ে তারা রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার ধারনাকে নিজেদের রাজনৈতিক ধারণায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

আলোচ্য সময়কালে ভারতীয় মুসলিম সমাজ তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল—ধর্মীয় ও তার বাইরের অভিজাত শ্রেণী, কারিগর ও কৃষক। অভিজাতদের মধ্যে তুর্কী, আফগান, পারসী ও আরবী সম্প্রদায়ের লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাথমিক পর্বে অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠী অনুযায়ী পার্থক্য থাকলেও পরবর্তীকালে তারা ভারতবর্ষকেই স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলেই পরস্পরের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এই মেল বন্ধন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইতিপূর্বে হিন্দু ধর্মের গুরু ও সন্ন্যাসীদের ঐতিহ্যের ফলে পরবর্তীকালে মুসলিম শেখ ও পীরদের সমাদৃত হবার রাস্তা তৈরী হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত নির্জনে বসবাসকারী এবং প্রভূত আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী এই ধর্মীয় গুরু এবং শেখরা প্রয়োজনে সাধারন মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারেন—এই ধারনা প্রসারিত হয়েছিল। মধ্যযুগে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই সুলতান সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। সুলতান-এর দ্বারা এইসব সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর পিছনে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সন্ন্যাসী যেন তার ভক্তদের সুলতানের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য উৎসাহ দেন। কোন কোন সন্ন্যাসী নিয়মিত বৃত্তি পেতেন।

এই সময় ভারতীয় ও ইসলামিক সংস্কৃতির মিলনের সব চেয়ে সুস্থ প্রকাশ দেখা যায় শহরের কারিগর ও গ্রামের কৃষকদের মধ্যে। এই যুগের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তায় এই মিলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ের স্থাপত্য-এর মধ্যেও পারস্পরিক প্রভাব এর পরিচয় আছে। অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান যেমন জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুর আচার অনুষ্ঠানে দুই ধর্মের সামাজিক রীতি-নীতির মিশ্রন লক্ষ্য করা যায়। কোন হিন্দু মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও তার হিন্দু পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারী হিসেবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারত। ইসলামের কোন কোন রীতি-নীতি হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানকেও প্রভাবিত করেছিল।

ইসলামে বর্ণপ্রথার কোন স্থান না থাকলেও মুসলিম সমাজ জীবনে বর্ণ প্রথাকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি। মুসলিমদের বর্ণপ্রথার ভিত্তি ছিল জাতিগত পার্থক্য। তুর্কী, আফগান বা পারস্যদেশীয় পরিবারগুলি সমাজে উচ্চবর্ণ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এরা 'আশরফ' (আরবী ভাষায় এই শব্দের অর্থ 'সম্মানীয়') নামে পরিচিত লাভ করে। এর পরের বর্ণ হল ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণের হিন্দু। যেমন মুসলিম রাজপুত। বৃত্তিজাত বর্ণগুলি আরও দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে একটি হলো 'পরিচ্ছন্ন বর্ণ' এবং অন্যটি হলো 'অপরিচ্ছন্ন বর্ণ'। প্রথমটির মধ্যে আছে কারিগর ও অন্যান্য পেশার লোক আর অন্য বর্ণভুক্ত মানুষ হল ঝাড়ুদার ও মেথর শ্রেণীর লোক।

হিন্দু উপবর্ণগুলির মত মুসলাম সমাজেও বর্ণ প্রথার উপরের দিকে ওঠার ব্যবস্থা ছিল। যদিও বিবাহের ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথার বাইরে যাওয়া যেত না। এটি ছিল সামাজিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

বিদেশী হওয়ার কারনে তুর্কী ও আফগানরা নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করত। যদিও খাদ্য ও পোশাকের ক্ষেত্রে ভারতীয় রীতি গ্রহণ করার ফলে তাদের স্বতন্ত্রতা কিছুতা হারিয়ে গিয়েছিল। এছাড়া মুসলিমরা আচার-ব্যবহারে বেশ কিছু পরিবর্তন স্বীকার করার ফলে ইসলাম ধর্ম তার গোঁড়া রক্ষণশীল থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। উত্তর ভারতের একাধিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুসলিম অভিজাতদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পোলো, ঘোড়দৌড়, জুয়া, শিকার ইত্যাদি অনেক কিছুই ইসলাম বিরোধী ছিল।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর কাছেই পুত্র সন্তানের জন্ম অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সমাজে নারীদের মর্যাদার অবনমন ঘটেছিল। উচ্চবর্ণের নারী মীরাবাঈ বা রাজিয়া তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু প্রথমজন হয়েছিলেন সন্ন্যাসিনী আর দ্বিতীয়জন পুরুষ শাসকদের অনুকরণ করেছিলেন। হিন্দু রাজকুমারী এবং মুসলিম শাসকদের প্রণয় নিয়ে অসংখ্য রোমান্টিক কাহিনী রচিত হয়েছিল। যদিও বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে নারীদের পর্দার আড়ালেই ছিল। বাড়ির একটা পৃথক অংশ তাদের জন্য নির্ধারিত থাকতো। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কারণে কৃষক ও কারিগরদের পরিবারের নারীদের অনেক বেশি স্বাধীনতা ছিল।

মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে উলেমারা এ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে যে কোনো রকম মিশ্রণ পরিহার করে চলত। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা বর্ণ বা ধর্মের লোক সম্পর্কে একই মনোভাব পোষণ করতো। হিন্দু ধর্মের উপর মুসলিম শাসনের যাই প্রভাব পড়ে থাকুক না কেন আলোচ্য সময়কালে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের অবসান হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান কমে গিয়েছিল। কারন মুসলিম শাসকরা নিজেদের ধর্ম প্রবক্তাদের প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কোনো কর দিতে হতো না কিন্তু মুসলিম শাসনে ওই বিশেষ সুবিধার অবসান হয়। রাজসভাতেও ব্রাহ্মণদের আর পূর্বের মত প্রতিপত্তি থাকল না। এই সময় উলেমারা উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে হলে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মন্দির ও মসজিদ এর আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নি।

বিচ্ছিন্নতার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থা। মন্দির ও মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতেও ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোন বিষয় শেখানো হতো না। অধিকাংশ মুসলিম স্কুল বা মাদ্রাসা রাষ্ট্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেলেও তা ধর্মশিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তা সত্ত্বেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরে অন্যান্য মানুষের মধ্যে ভারতীয় ও আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে পারস্পরিক আগ্রহের উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে এই বিনিময় ইতিবাচক হয়েছিল। ভারতীয়

চিকিৎসা পদ্ধতি পশ্চিম এশিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আরবদের ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিও ভারতে প্রসার লাভ করেছিল। যদিও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কারিগরি শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। কারিগরি শিক্ষার দায়িত্ব ছিল সরকারি কারখানার কারিগরদের।

ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ এ দেশের জীবনযাত্রার মধ্যে বিদেশী প্রভাব অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। যদিও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে পূর্বের মতোই স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা তখনও লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা দৈনন্দিন জীবন যাপনে কোন অসুবিধা ভোগ না করলেও প্রকৃতপক্ষে নাগরিক মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে তারা মুসলিমদের সমতুল্য ছিল না। ধর্মান্তরিত মুসলিমরা পূর্বে নিম্নবর্ণের হিন্দু হলেও ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদি মুসলিমরা সম্পূর্ণভাবে বিদেশি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে স্বতন্ত্র থাকত, তাহলে হয়ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ইসলামী আদর্শ স্বীকার করতে আপত্তি থাকত না।

স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টায় ব্রাহ্মণরা প্রাচীন সাহিত্যের উপর নির্ভর করেছিল। এর ফলে প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নতুন করে ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। যখন নতুন শাসকরা হিন্দু ধর্মের আইনগত ভিত্তি জানতে চাইতেন তখন ব্রাহ্মণরা প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিত। উল্লেখ্য বর্ণাশ্রমের কাঠামোর বাইরেও যে কোন শক্তিশালী ধর্মীয় গোষ্ঠী থাকতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে কি করা উচিত সে বিষয়ে কোনো বিধান শাস্ত্রে ছিল না।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ইসলামের উদার চিন্তাধারার প্রভাব আলোচ্য সময়কালে সমসাময়িক সমাজ এবং ধর্মের উপর পরিলক্ষিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবথেকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় সুফী ও ভক্তিবাদ নামক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। উল্লেখ্য প্রথম দিকে সুফীরা রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার জন্ম দিলেও তারা ক্রমশ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল। সম্ভবত সমাজের মধ্যে থেকে গেলে সুফিদের প্রভাব হত অনেক বেশি এবং ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও তারা মানুষকে সংগঠিত করতে পারতো। সেক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলনের নতুন সামাজিক এবং ধর্মীয় চিন্তা জোরদার হয়ে উঠত। যদিও সুফি মতবাদ পূর্বের ভক্তিবাদেরই আরেক রূপ ছিল, তা সত্ত্বেও সুফীরা পরবর্তীকালের ভক্তিবাদকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিছু কিছু প্রকৃত ইসলামিক ধারনা এর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। বিশেষ করে সামাজিক সুবিচার সম্পর্কিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে।

সুফী ও ভক্তি উভয় মতবাদের মধ্যেই অনেকাংশে মিল ছিল। উভয় মতবাদেই বিশ্বাস করা হত যে, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন প্রয়োজন। এছাড়া উভয় পক্ষই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের প্রেমময় সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিত। দুই মতবাদেই গুরু বা পীর-এর উপর জোর দেওয়া হত। কিন্তু সুফিদের অতীন্দ্রিয়বাদ এর সঙ্গে ভক্তি মতবাদের বিরোধ ছিল। কারন ভক্তিবাদীরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পক্ষপাতী ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় নতুন চিন্তার কথা প্রচার করাই ভক্তি প্রচারকদের উদ্দেশ্য ছিল।

ভক্তিবাদীরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন কারিগর এবং অনেকে ছিলেন দরিদ্র কৃষক। অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা ভক্তি আন্দোলনে যোগ দিলেও অধিকাংশ ভক্তিমতবাদের অনুগামী ছিলেন নিম্ন বর্ণের মানুষ। এই মতবাদে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনার বস্তু ও বর্ণপ্রথাকে আক্রমণ করা হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হত। এবং ধর্ম শিক্ষা সম্পূর্ণ স্থানীয় ভাষায় দেওয়া হত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুগের ভক্তি আন্দোলনে সবথেকে বেশি অবদান এসেছিল নামক ও কবীরের কাছ থেকে। এরা শহরের মানুষ ও গ্রামের যে সব কারিগরের শহরের সঙ্গে সংযোগ ছিল তাদের কাছে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কবীর ও নানকের এর চিন্তাধারা, ইসলামিক ও প্রচলিত চিন্তা-ধারা উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। ইসলামী চিন্তার প্রভাবের জন্য তাদের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তি প্রচারকদের চিন্তার কিছু পার্থক্য আছে। তবে তাদের শিক্ষা প্রধানত শহরভিত্তিক ছিল।

ইউরোপের প্রখ্যাত পন্ডিত ওয়েবার মনে করেন, মোক্ষলাভের পথ হিসেবে ভক্তিমার্গের ধারণা খ্রিস্ট ধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে ঐতিহাসিক গ্রিয়ারসন-এর মতে খ্রিস্টধর্মেই প্রথম একেশ্বরবাদ তত্ত্ব প্রচারিত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য ইউরোপীয়দের এই দাবিকে অযৌক্তিক এবং প্রমাণের অযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু ভক্তিবাদের উত্থানে ইসলামের প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক ইউসুফ হোসেন তার 'Glimpses of Medieval Indian Culture' গ্রন্থে বলেছেন যে, ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রেরণা এসেছিল ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শ থেকে। তিনি মনে করেন যে, মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদ এর প্রধান ও প্রথম প্রবক্তা রামানন্দ ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সম্ভবত তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন। অধ্যাপক হোসেন বিশ্বাস করেন যে, ভক্তিমার্গ ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে সুপ্রাচীন কার থেকেই জড়িত। কিন্তু মধ্যযুগের ভক্তিবাদ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ধারণা-যাকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ভাবনার সাথে সম্পর্কিত করা যাবে না। মধ্যযুগের ভক্তিবাদে যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সাম্যের কথা বলা হয়েছে তা ইসলামধর্মের প্রভাবের ফল। অধ্যাপক হোসেন ভক্তি আন্দোলন কে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়ের পরিধি শ্রীমৎভগবতগীতার সময় থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। এই পর্যায়ের ভারতের ধর্মভাবনায় মুষ্টিমেয়র একেশ্বরবাদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের বহু ঈশ্বরবাদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিধি ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত। এই সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। তাই ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সূত্রে হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছিল এবং ভক্তিবাদী আন্দোলনের নতুন জোয়ার আসে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববাদ, মানবতাবাদ এবং সামাজিক তত্ত্বের দ্বারা ভক্তিবাদীরা প্রভাবিত হন এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ দ্বারা মুক্তির সন্ধানে ব্রতী হন। যদিও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এ. এল. শ্রীবাস্তব প্রমুখ ঐতিহাসিক এর বিরোধিতা করেছেন। এদের মতে ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী বা কাফেরদের বিশ্বাসী বা ইসলামীদের সম-মর্যাদা বা সম-অধিকার দেওয়া হয়নি।

কোন কোন ঐতিহাসিক মধ্যযুগে ভক্তিবাদের প্রসারে ইসলামের পরোক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং বহু হিন্দুর ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা হিন্দুধর্মের সন্ধানে এক সংকট সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় হিন্দু সংস্কারকদের একাংশ হিন্দু ধর্মের ভাবাদর্শের মধ্যেই সর্বজন গ্রাহ্য ও সহজে বোধগম্য ধর্মভাবনা খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হন এবং এরাই ভক্তিবাদের কথা প্রচার করেন। যদিও ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার এর মতে কবির বা নানক কেউই সচেতনভাবে ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করেননি। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ভাবধারা গ্রহণ করে দুই ধর্মের পার্থক্য দূর করার বা কোন নতুন সমন্বয়বাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এদের ছিল না। তবে উভয়ের বক্তব্যই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কারিগর ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এই দুই প্রচারক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তার প্রধান কারণ এদের মতবাদ ছিল সহজবোধ্য এবং বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত। এর উভয়েই সামাজিক সমস্যার কথা অনুভব করেছিলেন এবং তা দূরীকরণের সচেষ্ট ছিলেন। জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে এরা সমাজকে পুনর্গঠিত করার আহ্বান জানান। কবির ও নানক কোন নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের অনুগামীরা যথাক্রমে 'কবীর-পন্থী' ও 'শিখ সম্প্রদায়' নামে পরিচিত হন।

ভক্তিবাদের বিকাশে ইসলামের পরোক্ষ অবদানের কথা স্বীকার করে নিলেও মনে রাখা দরকার যে, ভক্তিবাদের তত্ত্ব হিন্দু ধর্মাদর্শের মৌলিক কাঠামোর মধ্য থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল, অন্য কোন ধর্মের আদর্শকে ভিত্তি করে নয়। বেদে ব্রহ্মাকেই সৃষ্টির সূত্র এবং আনন্দের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে শ্রীমদভগবত গীতায়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে মুক্তির পথ হিসেবে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাচীনকালে ভক্তিযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সূত্রে ভগবানের উপর ভক্তির তত্ত্ব বিকশিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্মে জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করা হয়েছে এবং স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা হয়েছে ধর্মের বাণী। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদ প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। শৈব 'নায়নার' এবং বৈষ্ণব 'আলভার' সম্প্রদায়ের স্তব গানের মধ্যে ভক্তিবাদ বিকশিত হয়। তামিল ভক্তিবাদে সর্বপ্রথম ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভালোবাসার সম্পর্কের কথা উচ্চারিত হয়। তামিল সাধকদের ভক্তিবাদের ঢেউ উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এজন্য অপেক্ষা করতে হয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। কারণ নায়নার ও আলভার সম্প্রদায় তামিল ভাষায় তাদের মতবাদ প্রচার করার ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

৩.৬.৩ : ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজে সংস্কার আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজ্যের উত্থান, বিশেষত বহুমুখী পটভূমি সহ, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মিশ্রণ তথা 'সমন্বয়বাদ' (Syncretism)-এর ধারণাটি মধ্যযুগের ইতিহাসে গুরুত্ব অর্জন করেছে। ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, মধ্যযুগীয় ভারত বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব না করে সমবেদনা ও সহিষ্ণুতা

প্রদর্শন করেছিল। মধ্যযুগীয় ভারতে 'সমন্বয়বাদ' শুরু করার ক্ষেত্রে দিল্লী সুলতানির প্রতিষ্ঠা এবং তাদের গৃহীত নীতিগুলি তারা অণুসরন করেছিল। উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত দিল্লী সুলতানি সর্বদা ভারতীয় পরিস্থিতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল। তারা তাদের প্রজাদের উপর বলপূর্বক ইসলামকে চাপিয়ে দেয়নি। অমুসলিম জনগনকে ধর্মান্তরিত করার চেয়েও তাদের উদ্বেগ ও গুরুত্ব ছিল রাজস্বের উপর। তারা কখনও সংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে চায়নি কারন এটি তাদের স্থায়ী রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে। তারা এমনকি ধর্মীয় গুরুদের কাছ থেকেও দূরত্ব বজায় রেখেছিল এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও বিশ্বাসের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকেও উৎসাহিত করেছিল। ঐতিহাসিক মুজাফফর আলমের মতে, সহনশীলতা এবং আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের প্রচারকে দিল্লী সুলতানির দ্বারা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছিল। সমন্বয়বাদী ধারনা গ্রহণ করার প্রবণতাকে কখনোই বিরোধিতা করা হয় নি। যদিও কিছু শাসক ও আধিপত্যবাদী এই প্রবণতাগুলির বিরোধিতা করেছে। তবে তার থেকেও বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি এটি গ্রহণ করেছে।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ও তাঁর পুত্র হুমায়ূন-এর দ্বারা ইসলাম ও হিন্দুধর্মকে সমর্থন করার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা ছিল, কিন্তু তাদের সংক্ষিপ্ত শাসনের কারণে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সম্রাট আকবর সমন্বয়বাদের উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি 'দীন-ই-ইলাহী' নামে একটি উদার ধর্ম বিশ্বাস প্রবর্তন করেছিলেন, 'জিজিয়া' বা হিন্দুদের জন্য তীর্থযাত্রী কর বাতিল করেছিলেন, অমুসলিমদের জনসাধারণের উপাসনার উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বিলুপ্ত করেছিলেন, মহাভারত, রামায়ণ ও বৈদিক সাহিত্যের মতো মহাকাব্য অনুবাদকে প্রশংসা করেছিলেন। তিনি এমনকি হিন্দু রাজকন্যাদের বিবাহ করেন এবং তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রথা অনুশীলন করতে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ফতেপুর সিক্রিতে নির্মিত ধর্মীয় চর্চা কেন্দ্রে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসীদের আগমনকে সমর্থন করেছিলেন, যেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হত। আকবার মনে করতেন কোনো ধর্মই এমনকি ইসলামও একমাত্র সত্য ধর্ম বলে দাবী করতে পারে না। 'ইবাদতখানা'তে (ফতেপুর সিক্রির উপাসনা স্থল) আয়োজিত দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনার ফলেই আকবরের মনে এই ধরনের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল। ঘটেছিল। উল্লেখ্য শুধুমাত্র মুসলিম শাসক নয়, অসংখ্য অ-মুসলিম শাসকও (দক্ষিণ ভারতে) সমন্বয়বাদকে গুরুত্ব দিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি প্রদান করেছিল এবং মুসলিম সন্তদের তাদের অঞ্চলে ধর্মচর্চা করার অনুমতি দেয়।

সুলহ-ই-কুল (সহনশীলতা)-এর মতবাদ অনুধাবন করার জন্য আকবর বিভিন্ন সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের সূচনা করতে সফল হন। এ ছাড়াও, 'আখলক' নামক রাজনৈতিক মতাদর্শ সকল ভিন্ন ধর্মের প্রজাদের কল্যাণ চেয়েছিল। এই সকল উদ্যোগের প্রভাবেই মধ্যযুগীয় ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয়সাধনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। 'আখলক' মতাদর্শের রূপরেখা উল্লেখযোগ্যতার মুঘল শাসক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই সমান পরিমাপে ঐশ্বরিক সমবেদনা (রহমত-ই-হক) উপভোগ করেন। এটিই আদর্শ রাষ্ট্রের সামাজিক ঐক্য হিসেবে

স্বীকৃত হয়। এবং এর ফলেই বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বীর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির সংঘাতমূলক দাবিগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

সুফিবাদ, ভক্তি আন্দোলন এবং ইসমাইলির মত সম্প্রদায়গুলির কর্মকান্ড এবং প্রভাবের ফলেই সমন্বয়বাদী প্রবণতাগুলি আরও সহজ হয়েছিল। রশিদউদ্দীন খানের মতে, দুটি মৌলিক ঐতিহ্য ভারতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। একটি হল ইন্দো-আর্য সংস্কৃতিক প্রবাহ যা বৈদিক দর্শনের ধারাকে ফিরিয়ে এনেছিল। অপরটি হল ইন্দো-মুসলিম সংস্কৃতি যা ভক্তিমার্গ এবং ইসলামীয় সুফীবাদের মিশ্রণ। এর ফলেই ভারতীয় মাটিতে পুনর্বাসন, সহযোগিতা এবং সহাবস্থান-এর বীজ বপিত হয়। কিন্তু একথা বলা যাবে না যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও উত্তেজনা ছিল না।

ভারতের সুফিবাদের প্রভাব আরও ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোকদের দ্বারা দরগাহ ও মাজারের আরাধনায়। আজমীরে মঈন-উদ্-দীন চিশতি এবং দিল্লির নিজাম-উদ-দীন আউলিয়ায় মত জনপ্রিয় দরগাহগুলি একই রকম। সুফীরা কখনো শরিয়তের রক্ষণশীলতাকে অনুসরণ করেন নি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন পথ তাদের কাছে উন্মুক্ত ছিল। তারা সুন্নি ও শিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি নমনীয় ছিল। অনেক সুফিরা 'ওয়াহদাত-আল-ওহাজুদ' এর মতবাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল, যা ধর্মীয় অনুশীলন ও বিশ্বাসের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের অন্তর্গত ঐশ্বরিক ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিল এবং বিশ্বাস করেছিল। এই মতবাদ বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং ধর্মীয় সংশ্লেষণ গঠনের প্রক্রিয়াতে অবদান রেখেছিল।

সুফিরা অন্যদের কাছে পৌঁছাতে এবং তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্য সুপরিচিত। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি এবং প্রথা ছিল, যার চর্চা শরিয়তের অনুমোদন ছিল না। তা সত্ত্বেও অনেক সুফি এই রীতিনীতির চর্চা করেছিলেন। সুফিরা মনে করতেন যে, 'ঈশ্বর সব কিছুর মধ্যেই এমনকি অ-মুসলিমদের মধ্যেও বিদ্যমান। তাই হিন্দুদের ধর্মদ্রোহী বলে অভিহিত করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, 'the spread of Islam in South Asia was better facilitated by Sufi's. Therefore, it is very much essential to recognize the role of Sufi's in creating a context for cultural synthesis between different religions in medieval India.

ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তারাও সমন্বয়বাদ প্রসারে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিলেন। একাধিক গবেষকের মতে, ভারতে ভক্তি আন্দোলন ঐশ্বরিক ধ্যান-ধারণার প্রসার এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জনৈক গবেষকের মতে, 'সূফী ও ভক্তি আন্দোলন দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্যকে এতটাই অস্পষ্ট করেছে যে, হিন্দুদের দ্বারা সদ্গুরুর ও মুসলিমদের দ্বারা পীর-এর অনুগামী হওয়া একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক ভক্তিবাদী সন্ত হিন্দু ও ইসলাম উভয়ের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। তাদের জীবন দর্শন সাধারণ মানুষকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছিল, দরিদ্র ও কারিগররা তাদের সামাজিক নীতি ও প্রথার সঙ্গে সেগুলির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল। এমনকি বৈষ্ণবরাও মধ্যযুগীয় ভারতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য অনুগামীর সমর্থন পেয়েছিল।

এটা মনে রাখা উচিত যে মধ্যযুগীয় ভারতে সমন্বয়বাদের বিরোধিতা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল না। উলেমা এবং ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণী নিজস্ব স্বতন্ত্র স্থান, মতামত ও রীতিনীতির চর্চা সযত্নে পালন করেছিলেন।

মধ্যযুগে সৃজনশীলতা ও সাহিত্যের কোন কোন অংশে সমন্বয়িক প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করা যায়। 'মারসিয়া' (একটি ইরানী শিয়া সংগীত ঐতিহ্য)-এর সুরকারগণ তাদের আঞ্চলিক ভাষায় এবং ঐতিহ্য সেগুলি রচনা করেছিলেন—যেখানে সুফিসাধকগণ এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই অসাধারণ দ্বিভাষিক কবিতা রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য বাস্তবের বিদ্যমান সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল। কবীরের মত সন্তরাও রহস্যময় বস্তু হিসাবে ঈশ্বরের ধারণাকে সহজতর করার চেষ্টা করেছেন এবং ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে এক হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

এ ব্যাপারে তর্ক করার কোন অবকাশ নেই যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাটি মধ্যযুগীয় ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এমনকি 'ধর্মান্তরিতকরনের' কাজটিও বলপ্রয়োগের দ্বারা সম্পাদিত হত না। প্রকৃতপক্ষে এটি বলা যুক্তিযুক্ত যে, শ্রেণী নিপীড়ন ও ব্রাহ্মণ্য নির্যাতনের ফলেই ধর্মীয় রূপান্তরের ঘটনা ঘটছিল। যদি ইসলাম হিন্দুধর্মের সমানুপাতিক প্রবণতাগুলিকে শক্তিশালী করে থাকে তাহলে হিন্দু দর্শনও মুসলিম ধর্মীয় নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতাবাদকে শক্তিশালী করেছে বলে মনে হয়। যদিও এ প্রসঙ্গে J.J Burman বলেন যে 'It could not be an accident that during the long period of Muslim rule the Bhakti movement gathered considerable following in Islam'.

৩.৬.৪ নমুনা প্রশ্ন

ক) মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ইসলামের প্রভাবকে তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

খ) তুমি কি মনে কর যে, মধ্যযুগীয় ভারতের সংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল?

গ) রাষ্ট্রীয় সংহতি সাধনে মধ্যযুগীয় ভারতের শাসক সম্প্রদায় কিভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন?

৩.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

ক. 'India's Islamic Traditions 711-1750 : Themes in Indian History'–Richard M. Eaton

খ. 'Conversion to Islam in the Medieval Period'—Richard W. Bulliet

গ. 'মধ্যযুগের ভারত' (সুলতানি আমল ও মুঘল আমল)—তেসলিম চৌধুরী

ঘ. 'মধ্যযুগের ভারত'—সতীশ চন্দ্র

ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্র পাঠযুক্ত (CBCS) স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ৪

Modern World-19th and 20th Centuries

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

পরামর্শদাতা

শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

ডিসেম্বর ২০১৮
মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয়

মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংর(িত। মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(েবিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত(কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সং(িষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

SYLLABUS

Paper - IV

Modern World : Nineteenth and Twentieth Century

[100 Marks]

BLOCK-1 : Legacy of the Nineteenth Century

Unit-1 : Growth of capitalism and Imperialism ; U.K., France, Germany and Japan

Unit-2 : a) Liberalism and Socialism

b) National ism

BLOCK-2 : World Order up to 1919

Unit-3 : Origins of the First World War; its nature; peace settlement and its long term consequences.

Unit-4 : Making of the Russian Revolution-establishment of a Socialist State, its economic and political aspects and responses and reactions in the West.

BLOCK-3 : World Between the two Wars

Unit-5 : Working of the League of Nations and Collective Security; crisis in capitalism. Great Depression.

Unit-6 : Liberal ideas social movements; and ideologies of Nazism and Fascism; Germany, Italy and Japan.

BLOCK-4 : Second World War and The New Political Order

Unit-7 : Origins, nature and results of the Second World War.

Unit-8 : Nationalist Movements and Decolonization.

Unit- 9 : Communist Revolution in China and its Impact on world politics.

BLOCK -5 : Cold War and its effects

Unit-10 : Ideological and Political basis of the cold war; Pacts and Treaties, tensions and rivalries.

Unit-11 : Non-Aligned Movement and the Third World.

Unit-12 : UNO and the concept of World Peace and regional tensions - Palestine, Kashmir, Cuba, Korea, Vietnam.

BLOCK-6 : Age of Progress : Economic and Social

Unit-13 : Industry; Agriculture; Science and Technology and Communication and Information. Cultural Revolution; Civil Rights Movement; Apartheid and Feminism.

BLOCK -7 : Disintegration of Socialist block and end of Cold War

Unit-15 : Genesis and process of disintegration - its impact on society and politics. Changes in the political order; from bipolar to unipolar world system.

Unit-16 : Socialism in decline globalization and political impact.

CONTENTS

Paper-II	Units	Authors	Titles	Pages
Block-1	1	Prof. Amal Das	Growth of capitalism and Imperialism UX., France, Germany and Japan	1-17
	2	Prof. Amal Das	a) Liberalism and Socialism b) Nationalism	18-36
Block-2	3	Dr. Ashok Kumar Chakraborty	Origins of the First World War: its nature; peace settlement and its long term consequences	37-51
	4	Dr. ashok Kumar Chakraborty	Making of the Russian Revolution- establishment of a Socialist State, its economic and political aspects and responses and reactions in the West	52-62
Block-3	5	Dr. Ashok Kumar Chakraborty	Working of the League of Nations and Collective Security; crisis in capitalism, Great Depression,	63-74
	6	Prof. Amal Das	Liberal ideas social movements and ideologies of Nazism and Fascism : Germany, Italy and Japan	75-91
Block-4	7	Sri Soumitra Sinha	Origins, nature and results of the Second World War.	92-100
	8	Sri Soumitra Sinha	Nationalist Movements and Decolonization	101-108
	9	Sri Soumitra Sinha	Communist Revolution in China and its Impact on world politics.	109-116
Block-5	10	Sri Soumitra Sinha	Ideological and Political basis of cold war; Pacts and Treaties, tensions and rivalries	117-130
	11	Prof. Balai Chandra Barui	Non-Alignment Movement and the Third World	131-138
	12	Prof. Balai Chandra Barui	UNO and the concept of World Peace and regional tensions - Palestine, Kashmir, Cuba, Korea, Vietnam	139-149
Block-6	13	Sri Alok Kumar Ghosh	Age of progress: Industry; Agriculture; Science and Technology and Communication and Information	150-155
	14	Sri Alok Kumar Ghosh	Cultural Revolution; Civil Rights Movement; Apartheid and Feminism	156-169
Block-7	15	Sri Alok Kumar Ghosh	Genesis and process of disintegration- its impact on society and politics. Changes in the political order: from biopolar to unipolar world system	170-182
	16	Sri Alok Kumar Ghosh	Socialism in decline globalization and its economics and political impact	183-188

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পর্যায় গ্রন্থ - ১

উনিশ শতকের দান

Legacy of the Nineteenth Century

একক - ১

ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ

Growth of Capitalism and Imperialism

বিন্যাসক্রম ঃ

উপ-একক - ১

৪.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৪.১.১.১.১ ঃ ধনতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝায় এবং এর উদ্ভব

৪.১.১.১.২ ঃ ইউরোপের দেশগুলিতে ধনতন্ত্রবাদের প্রসার

৪.১.১.১.৩ ঃ পুঁজিবাদ বিকাশের ধারা

৪.১.১.১.৪ ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া

৪.১.১.১.৫ ঃ ধনতন্ত্রবাদ ও মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা

৪.১.১.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

৪.১.১.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

উপ-একক - ২

৪.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৪.১.১.২.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

৪.১.১.২.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ শব্দের নানা ব্যাখ্যা

৪.১.১.২.৩ ঃ নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও নানা তত্ত্ব

৪.১.১.২.৪ ঃ সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণ

৪.১.১.২.৫ ঃ উপসংহার

৪.১.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থবলী (Reference Books)

৪.১.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

উপ-একক - ১

ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ

Growth of Capitalism

৪.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ধনতন্ত্রবাদের অর্থ, এর উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য।

(২) ইউরোপে কিভাবে ধনতন্ত্রবাদের প্রসার হয়েছিল।

(৩) ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ধারা।

(৪) ধনতন্ত্রবাদের সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া -মার্কসের চিন্তাভাবনা।

৪.১.১.১.১ ঃ ধনতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝায় এবং এর উদ্ভব

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূত্র ধরেই ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগে ইউরোপ মানুষের জীবনযাত্রার জন প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যাদির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবে যেটুকু শিল্পদ্রব্যাদি উৎপন্ন হত তা সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া ছিল না। কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ও আরও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদক শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক ও কর্মের উৎকর্ষানুযায়ী স্বীকৃতি পেত। শিল্পপণ্যের প্রকৃত উৎপাদক ও লভ্যাংশভোগীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান আধুনিক যুগের মত এত অধিক ও ছিল না। অর্থবন্টন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমাজের অধিকাংশের মধ্যে সঞ্চারিত হত।

কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার বিপ্লব এল। এই 'শিল্পবিপ্লবের' সূচনা প্রথমে হল ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতকের এবং এই বিপ্লবের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের অন্যত্র ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনায়, ফ্রান্স, জার্মানীতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল। রাশিয়াতেও ঊনিশ শতকের শেষে বিংশ শতকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ঐ সব দেশে শিল্পায়ন ইংল্যাণ্ডের তুলনায় দেরিতে শুরু হলেও দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে এবং দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ইউরোপের ঐ সব দেশগুলিতে গড়ে উঠেছিল প্রচুর পরিমাণে কলকারাখনা এবং এর ফলে নতুন ফ্যাক্টরী ব্যবস্থা (Factory System) গড়ে উঠল। শিল্পবিপ্লব শুধু ইউরোপে নয়, অন্যান্য মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। কলকারখানায় নতুন যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটল এবং প্রচলিত হল পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার। এই ব্যবস্থার সকল প্রকার উৎপাদন কাজে যন্ত্র প্রধান হয়ে উঠল। কেবলমাত্র প্রয়োজন হল যন্ত্রকে সচল রাখার জন্য মজুরি ভিত্তিক শ্রমিকদের। যান্ত্রিক কলকারখানার প্রসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ধনতন্ত্রবাদের প্রসার এবং মুষ্টিমেয় Capitalism বা মূলধনী শ্রেণীর

সৃষ্টি। মূলধনীশ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিপত্তিশালী হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারল। এই অর্থ বিনিয়োগ করে তারা শিল্পের উৎপাদনের জন্য কলকারখানা গড়ে তোলার কাজ করল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ যোগান দিতে লাগল। এই সব কলকারখানাতেঅসংখ্য মানুষ কাজ পেল। মুলধনী শ্রেণী বা পুঁজিপতিশ্রেণী এদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত। বিনিময়ে তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে মুজরি দিত অত্যন্ত অল্প। শ্রমিকগণ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেদ্ধেক বঞ্চিত হলেও পুঁজিপতিরা কিন্তু বিনা পরিশ্রমে আর্থিক মুনাফা লাভ করে ধনী থেকে আরও বেশী ধনী হয়ে উঠল এর ফলে সমাজে দুটি অসম শ্রেণীর সৃষ্টি হল—একদিকে সুবিধাভোগী পুঁজিপতি শ্রেণী এবং অন্যদিকে সব প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং সামান্য মজুরিতে জীবিকা নির্বাহের অসমর্থ, অসহায় 'সর্বহারা' শ্রমিকশ্রেণী। নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টি হতে থাকল। এ ব্যবধান সমাজের মধ্যে এক সর্বগ্রাসী ও সুদূরপ্রসারী সমস্যার সৃষ্টি করল।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্তার অবসান ঘটে প্রচলিত হয় পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার। যান্ত্রিক কল-কারখানার প্রসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ধনতন্ত্রবাদের প্রসার। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হলেও পুঁজিপতিরা ধনী থেকে আরও ধনী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

১। কোন বিপ্লবের সূত্র ধরে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়?

২। ধনতন্ত্রের ফলে সমাজে সৃষ্ট দুটি শ্রেণীর নাম কর।

৪.১.১.১.২ ঃ ইউরোপের দেশগুলিতে ধনতন্ত্রবাদের প্রসার

ইংল্যান্ডে 'শিল্পবিপ্লবের' সূত্র ধরে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটলেও তা পরবর্তীকালে ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। শিল্পায়ন শুধু ইউরোপেই নয়, অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঊনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রবাদ দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল। এই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়ায় জাপান, এমন কি চীন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল।

ইংলাণ্ডে 'শিল্পবিপ্লবের' সূত্র ধরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—যেমন ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়া।

ইংল্যাণ্ড ঃ

ইংল্যাণ্ডে প্রথমে ধনতন্ত্রাদের বিকাশের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। শিল্পায়নের বিকাশের সঙ্গে যে ধনতন্ত্রবাদের সম্পর্ক সেই শিল্পায়নের কিছু আবশ্যিক শর্তের উপস্থিতি ইংল্যাণ্ডে প্রথম দেখা দিয়েছিল, যা অন্যত্র দেখা যায়নি। প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই ইংল্যাণ্ড আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হতে শুরু করে। রপ্তানী, দাস ব্যবসা, ঔপনিবেশিক জমির আবাদ, ব্যক্তিগত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি, মালবহনের মাশুল প্রভৃতির ফলে ইংল্যাণ্ড অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আর্থিক দিক দিয়ে এক অভাবনীয় উন্নতি ঘটায়। ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ

শতকে প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে 'শিল্পবিপ্লব' ও পুঁজিবাদের উদ্ভবের সম্পর্কটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভূত উন্নতি, নতুন চালিকাশক্তির উৎসের আবিষ্কার ও ব্যবহার, বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণ, লোহা-ইস্পাতের বহুল ব্যবহার, কারখানাব্যবস্থা ও নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং আরও নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে শিল্পায়ন অভাবনীয়ভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। ইংল্যাণ্ড ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তারএকচেটিয়া প্রাধান্য শিল্পের ক্ষেত্রে বজায় রেখেছিল এবং সমগ্র 'বিশ্বের কারখানা'য় পরিণত হয়েছিল। এ সময়ে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল কলকারখানা নির্মাণে এবং প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যাদির উৎপাদনে। উদ্দেশ্য ছিল, অত্যধিক মুনাফা অর্জন। ইংল্যান্ডের পুঁজিপতিশ্রেণী যন্ত্রে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যাদি সস্তা দামে বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত। কাঁচামালের অনায়াসলভ্যতা ইংল্যান্ডের শিল্পমালিকদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

ইংল্যান্ডে এই ধনতন্ত্রবাদের প্রসারে পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কারণ শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের নানাভাবে শিকার হয়েছিল, এর ফলে পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং তা দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছিল।

জার্মানী ঃ

জার্মানীতে উনিশ শতকের শেষার্ধে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ ঘটে। এর পশ্চাতে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য, ফ্রান্সের কাছ থেকে ফ্রান্স-প্রাশীয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট অঙ্কের অর্থ আদায় এবং আলসাস লোরেন ফ্রান্সের কাছ থেকে প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি বড় কারণ ছিল। আলসাস-লোরেন লাভ করার ফলে জার্মানীর বস্ত্রশিল্পসহ অন্যান্য নানা শিল্পের উন্নতি ঘটে। লৌহ ও কয়লা শিল্প, রসায়ন ও বিদ্যুৎ শিল্পে জামানীতে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বৈদেশিকি বাণিজ্য দ্রুত প্রসারলাভ করে। শিল্পোন্নয়নের জন্য বিসমার্ক শিল্প সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করেন। জার্মানী একটি ধনতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয় এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম পুঁজিবাদের স্বার্থে সমুদ্রপারে উপনিবেশ বিস্তার এবং নৌবহর গড়ে তোলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন।

ফ্রান্স ঃ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নানা কারণে ফ্রান্সের শিল্পায়ন অত্যন্ত মন্থর ছিল বলা চলে। বিপ্লবী ও নেপোলিয়নের সময়ে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, কয়লার অভাব, কৃষির উপর অধিক নির্ভরশীলতা এর জন্য দায়ি ছিল। ফ্রান্সে উনিশ শতকের শেষ লগ্নে ধনতন্ত্রবাদ এবং পুঁজিপতিশ্রেণী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রান্সে—প্রাশীয় যুদ্ধে (১৮৭০-৭১) ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে তার অর্থনীতি সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একদিকে খনিজ সম্পদ ও শিল্পেসমৃদ্ধ আলসাস-লোরেন জার্মানীর কাছে পরিত্যাগ এবং অন্যদিকে যুদ্ধে পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট অঙ্কের অর্থ জার্মানীকে প্রদানের ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে সাময়িক মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদশকে এবং বিংশ শতকের সূচনায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের আবির্ভাব এবং আধুনিকতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্রান্স শিল্পের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি ঘটায়। বৃহদায়তন নতুন কলকারখানা ও শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। বিশ শতকে ফ্রান্সে কয়লা ও লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্র শিল্প প্রসারলাভ করে। ফ্রান্সের শিল্পায়নের প্রধান ক্ষেত্র ছিল বস্ত্রশিল্প। এইভাবে ফ্রান্সে ধনতন্ত্রবাদ বিকাশলাভ করে।

রাশিয়া ঃ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদাসদের মুক্তি থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত সময়কালকে সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা রুশ ইতিহাসের পুঁজিবাদী যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই পর্ববিভাগ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মহাসংস্কারসমূহকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট বিভাজনরেখা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মহাসংস্কারের ফলে একদিকে যেমন ভূস্বামী শ্রেণীর ক্রমিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে শিল্পপতি, বণিক, প্রযুক্তিবিদদের উত্থান ঘটেছিল। ১৮৯০ এর দশকে রুশ শিল্পের অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। গেরসেনক্রনের হিসাব মতো বেড়ে যাওয়ার গড় ৮ শতাংশ। রেলপথের দ্রুত সম্প্রসারণ, দেশী ও বিদেশী পুঁজির ব্যাপক হারে বিনিয়োগ, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ইত্যাদির ফলে শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ তীব্র হয়ে উঠেছিল। লৌহ ও কয়লার উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত রুশ শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, রুশ সরকার তার শিল্পের প্রসারে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন এবং রাশিয়ার সমগ্র শিল্পের বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশই ছিল বিদেশী পুঁজি। এর ফলে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া 'আধা-ঔপনিবেশিক' অবস্থায় পৌঁছেছিল বলে রুশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধনতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের এই বিকাশের ফলে দুর্দশা নেমে এসেছিল সীমাহীন দারিদ্র্যে নিপীড়িত ও বিক্ষুব্ধ সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষক সমাজের উপর।

প্রশ্ন

১। ইউরোপের দেশগুলির ছাড়া অন্য কোন কোন দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রসার ঘটে?

২। কোন সময়কে সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা রুশ ইতিহাসের পুঁজিবাদী যুগ বলে অভিহিত করেছেন?

৪.১.১.১.৩ ঃ পুঁজিবাদ বিকাশের ধারা

ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্বে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত ভূমিকাই ছিল মুখ্য, রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌণ। পুঁজিপতিরা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করে শিল্প গড়ে তোলে এবং নিজেদের মধ্যে মুনাফা অর্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমদিকে (১৮৭১-১৯১৪) পুঁজিপতিশ্রেণী রাষ্ট্রের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সরকারী উদ্যোগ ও সাহায্য মিলিত হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সরকার নিজের নিজের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, রেলপথ, খাল ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য কাজ করেন। রাষ্ট্রের উদ্যোগে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়। ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে ঋণদানেরও ব্যবস্তা গৃহীত হয়। এই সব নানা ব্যবস্থার ফলে

ইউরোপের পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্বে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত ভূমিকাই ছিল মুখ্য, রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌণ। কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমদিকে (১৮৭১-১৯১৪) পুঁজিপতি শ্রেণী রাষ্ট্রের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াতে পেরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরা ধ্বংস হয়েপড়ে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ঘটে। তাছাড়াও ইউরোপের দেশগুলির সরকার নিজ নিজ দেশের শিল্পগুলিকে অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত দেশগুলির অশুভ প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার জন শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন। এই সংরক্ষণ নীতি ইউরোপের অনেক দেশে কৃষির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েচিল। শুধু তাই নয়, সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির সরকার শিল্পজাত ও কৃষিজ দ্রব্যের আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করে। এভাবে সরকার দেশীয় শিল্পমালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেন।

১৮৭১ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ-এই পর্বে পুঁজিবাদী বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্য হল শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক। প্রতিটি দেশে বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াতে পেরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরা উদ্যোগ নানা স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে জোটবদ্ধ হতে থাকে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এই জোটবদ্ধতা 'একীকরণ' (amalganation) অথবা 'সমশিল্প জোট' (combine) ও 'বব্যসায়-সংহতি'র (Trust) রূপ নিয়েছিল। জার্মানীতে এই জোটবদ্ধতা শিল্পসংঘ গড়ে তুলে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ও মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই জোটবদ্ধতার ফলে পুঁজি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। শিল্প উদ্যোগগুলির মতই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিও জোটবদ্ধ হতে থাকে। এগুলির মাধ্যমে ক্ষমতাশালী বড় বড় পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলেছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, জার্মানীর ব্যাঙ্কগুলি ও লগ্নীকারক সংস্থাগুলি শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলিকে অর্থ লগ্নী করেনি, এইসঙ্গে বিদেশেও পুঁজি বিনিয়োগ করেশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে এগিয়ে এসেছিল। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ গড়ে তোলার পেছনে জার্মানীর ডয়েজ ব্যাঙ্ক প্রভূত সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন

১। মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ধ্বংস হয়েছিল কেন?

২। দেশীয় শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত কম শিল্পোন্নত দেশগুলি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

৪.১.১.১.৪ ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া

পুঁজিবাদ প্রসারের ফলে একটি কেন্দ্রীভূত অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী শিল্পপতিগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। এই শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের আর্থিক শক্তিতে বলশালী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে প্রচেষ্টা চালায় এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, আন্তজার্তিক রাজনীতিতেও পুঁজিবারে প্রসার নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের শিল্পসংরক্ষণ নীতি গ্রহণের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল আমদানির উপর চড়া শুল্ক ধার্যের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি করা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তজার্তিক বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছিল এবং তিক্ততা দেখা দিয়েছিল। অনেক দেশের সরকার শুল্ক প্রাচীর নির্মাণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বহু কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া সাময়িক অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার মালিকগণ তাদের কারখানায় তৈরি সামরিক সরঞ্জাম বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে প্রভূত মুনাফা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে ইউরোপের দেশগুলির

মধ্যে সামরিকও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার পরিণতি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত এবং উপনিবেশ বিস্তারের প্রবল আগ্রহ থেকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে এবং এই সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বে প্রথম মহাযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। উপনিবেশগুলি থেকে পুঁজিপতিরা শুধু শিল্পপণ্যের কাঁচামালই সংগ্রহ করত না, সেই সঙ্গে সেখানে পণ্যের বিস্তৃত বাজার গড়ে তুলল এবং পুঁজি বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবেও তা কাজে লাগাল। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে ঔপনিবেশিক বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে বিশাল পুঁজি সঞ্চিত হল— এসব পুঁজি নির্গমনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিজেদের পুঁজির নিরাপত্তা ও মুনাফা অর্জন সুনিশ্চিত করতে পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলি জয় করে নিতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে পুঁজিবাদী দেশগুলি বিস্তারনীতি গ্রহণ করল। এইভাবে শিল্পে উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্ব জুড়ে নিজেদের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক বাজার গড়ে তুলল এবং সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগ করল। এর ফলে একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটল, তেমনি অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতির উদ্ভব ঘটল।

চড়া শুল্ক ধার্য করার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছিল। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। নিজেদের নিরাপত্তা ও মুনাফা সুনিশ্চিত করতে পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশ জয় করে নিতে থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার লালসা শ্রমিক শ্রেণীর সংঘর্ষ অনিবার্য করে তুলল।

ধনতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার লালসা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য করে তুলল। শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলল পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে।

Laissez-faire বা না হস্তক্ষেপ নীতি পুঁজিপতিশ্রেণীকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ বাণিজ্য অধিকারের সুযোগ দিল। এই তত্ত্বের ফলে শ্রমিকদের উপর মালিকশ্রেণীর শোষণ তীব্র হল। উৎপাদনব্যবস্থার উপর মালিকশ্রেণীর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল।

প্রশ্ন

১। পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল কেন?

২। Laissez-faire কি?

৪.১.১.১.৫ ঃ ধনতন্ত্রবাদ ও মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা

কার্ল মার্কস তার 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ফলে বিত্তবান পুঁজিপতিশ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। এই শ্রেণীসংগ্রামই তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূলকথা। শোষণে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করবে। লক্ষ্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন। বস্তুত মার্কস বলেছেন, 'রাষ্ট্রশ্রেণীশোষণের যন্ত্র'। সুতরাং সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের

কার্ল মার্কসের মতে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অধিকার করবে।

মাধ্যমে পুঁজিপতিশ্রেণীকে হঠিয়ে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অধিকার করবে। এর ফলেই প্রতিষ্ঠিত হবে 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র'। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে, তখন পুঁজিপতিশ্রেণী ও ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে এবং এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। রাষ্ট্র তখন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং তার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।

প্রশ্ন

১। ''কমিউনিস্ট ম্যানিফোস্টো'' কার লেখা?

২। 'রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের যন্ত্র'—উক্তিটি কার?

৪.১.১.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

১। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী— ইউরোপের ইতিহাস।

২। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

৩। নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা।

৪। ডেভিড টমসন — Europe Since Napoleon

৫। Hayes — Contemporary Europe Since 1870

৬। Hazen — Europe Since 1815.

৭। লেনিন — রাষ্ট্র ও বিপ্লব।

৪.১.১.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

১। ধনতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝায়? এর উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর।

২। শিল্পবিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ কিভাবে হয়েছিল।

৩। ঊনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের সূচনায় ইউরোপে ধনতন্ত্র বিকাশের ধারা আলোচনা কর।

৪। ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ফলে সামাজিক পরিবর্তন কি হল?

৫। বিশ্বরাজনীতিতে ধনতন্ত্রবাদের প্রসারের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

৬। ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

উপ-একক - ২

সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ

Growth of Imperialism

৪.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) সাম্রাজ্যবাদ শব্দের অর্থ এভং এর নানা ব্যাখ্যা।

(২) নয়া সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায় এবং এই নয়া সাম্রাজ্যাবাদের উদ্ভবের কারণ।

(৩) বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের পরিণতি।

৪.১.১.২.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

'Imperialism' বা 'সাম্রাজ্যবাদ' রাজনীতির পরিভাষায় একটি নেতিবাচক ও নিন্দাসূচক শব্দ। এই শব্দটির সঙ্গে পৃথিবীর সব মানুষই আজ পরিচিত। সংবাদপত্র, নানাধরণের গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক সাহিত্যে আজ এই শব্দটি বহুনিন্দিত। শব্দটির সাধারণ অর্থ হল, এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য এক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, দুর্বল রাজ্য গ্রাস করার চেষ্টা উদ্দেশ্য হল, নিজ রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করা এভং পর রাজ্যের অধিবাসীদের উপর সর্ব দিক দিয়ে আধিপত্য স্থাপন এবং শাসনের নামে শোষণ করা।

'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য এক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, দুর্বল রাজ্য গ্রাস করার চেষ্টা।

সাম্রাজ্যবাদ হল একটি রাজনৈতিক ধারণা ও নীতি যা সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপকে সদাসর্বদা উৎসাহ প্রদান করে। সাম্রাজ্যবিস্তার, নতুন নতুন স্থান দখলের নীতি, নিজ রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সীমানা বৃদ্ধি করা এবং অন্য রাজ্য বা জাতির উপ শাসন কায়েম করার লক্ষ্য থেকেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদ।

প্রশ্ন

১। 'সাম্রাজ্যবাদ' কি?

২। 'সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কি?

৪.১.১.২.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ শব্দের নানা ব্যাখ্যা

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে 'Imperialist' শব্দটি প্রচলিত থাকলেও এই শব্দটি কিন্তু ঊনিশ শতকের পূর্বে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি। ফ্রান্সে ১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ এই সময়ে যখন জুলাই রাজতন্ত্র (July Monarchy) প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন ফরাসী শব্দ 'অ্যাঁপিরিয়ালিজম' সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই শব্দটি "Bonapartism" এর প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছিল। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ানের 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য' (Second Empire) (১৮৫১) সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তৃতীয় নেপোলিয়নের সরকার ছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং ফ্রান্সের এই সরকারকে অনেকেই স্বেচ্ছচারী, জঙ্গী, জনমত-বিরোধী এবং অসাংবিধানিক বলে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে 'সাম্রাজ্যবাদ' বা 'imperialism' সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালিপনা ও স্বৈরাচারিতার রূপ লাভ করেছিল। ইংরেজ সমালোচকদের বিশেষ করে উদারপন্থীদের দৃষ্টিতে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন ছিল ফ্রান্সে নৈরাজ্য ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটির ব্যাখ্যায় নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন এবং জার্মানীর রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্থান এবং রুশ ও অটোমান সাম্রাজ্যের শোষণ ও অত্যাচার প্রভৃতি নানা ঐতিহাসিক ঘটনা 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটিতে একটি নেতিবাচক, নিন্দাসূচক মাত্রা যোগ করে। ঊনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে এই শব্দটির ব্যাখ্যায় পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের অভিধানে একটি নতুন শব্দ 'Anti-Imperialism' এর আলোকেও 'Imperialism' শব্দটির পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন ভাবধারা গড়ে উঠতে থাকে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় ঐ সময়ে 'Anti-imperialism'র মনোভাব কারোর কারোর মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

*১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের সময় ফরাসী শব্দ 'অ্যাঁপিরিয়ালিজম' সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি **'Bonapartism'**-এর প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের অভিধানে একটি নতুন শব্দ **'Anti-Imperialism'**-এর আলোকেও **Imperialism** শব্দটির পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।*

তবে এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদগণ সকলেই অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন না। বরং ১৮৯০ সাল নাগাদ লর্ড রোজবেরির মত উদারপন্থীরা 'সাম্রাজ্যবাদে'র এক নতুন ব্যাখ্যা করেন — এটি হল উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদ (Libefral Imperialism)। ব্রিটিশ লেখক ও চিন্তাবিদ শিলী (Seely), 'The Expansion of England' গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটিকে নিন্দাত্মক অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং তিনি সাম্রাজ্যবাদকে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করতে লাগলেন। লর্ড কার্জন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের উদারতাকেই বড় করে দেখান। প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ কি তা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য হল, মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি দূর করার চেষ্টা। এই সব সমস্যা, তাঁর মতে 'Radical Nationalism' বা উগ্র জাতীয়তাবাদ বা 'Socialism' বা সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়ই তা কেবল দূর করতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এইসব সমস্যার সমাধন করা সম্ভব। এই অর্থে কার্জনের কাছে সাম্রাজ্যবাদ লোভ ছিল না, শোষণও নয়। বরং এই সাম্রাজ্যবাদের ইতিবাচক দিক ছিল, কার্জনের এই সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন ইংরেজ কবি কিপলিং। তিনি তাঁর কবিতায় সাম্রাজ্যবাদের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে, শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের উপর ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব হল অশ্বেতকায় জনগণের কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়া। (White man's burden)

প্রশ্ন

১। 'Imperialism' এর সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত ফরাসি শব্দটি কি?

২। লর্ড কার্জনের মতে সাম্রাজ্যবাদ কি?

৪.১.১.২.৩ ঃ নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও নানা তত্ত্ব

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ এই সময়কালে এক নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ইউরোপে দেখা যায়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশ বিস্তারের খেলায় মত্ত হয়ে উঠে। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদে পেছনে অবশ্য কারণ ছিল। এই কারণগুলি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই পর্বকে (১৮৭০-১৯১৪) 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ' হিসাবে নিন্দাও করা হল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর (Boer) যুদ্ধের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ্ জে. এ. হবেসন (J. A. Bobson) (Imperialism-A study) গ্রন্থটি লেখেন। এতে তিনি সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদ হল এটি সচেতন রাষ্ট্রনীতি ও একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মূলধনী শ্রেণী শ্রমিকদের ঠকিয়ে অত্যধিক মুনাফা অর্জন করে। হাতে মাত্রাতিরিক্ত সঞ্চয়ের ফলে প্রভূত পরিমাণে মূলধন স্তূপীকৃত হয়। সুতরাং এই 'মাত্রাতিরিক্ত মূলধনের লগ্নির ক্ষেত্র অনুসন্ধানের' জন্য সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে। উপনিবেশ বিস্তার করে সেখানে মূলধন বিনিয়োগ করে আরও মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা মূলধনী শ্রেণী করে চলে। এজন্য তারা নিজ নিজ দেশের সরকারকে উপনিবেশ দখলের জন্য চাপ দিতে থাকে। উপনিবেশের কাঁচামাল ও বাজারকে একচেটিয়া দখল করে তারা অধিকতর বিত্তশালী হয়ে উঠে। সুতরাং নব সাম্রাজ্যবাদের মূল অর্থনৈতিক শিকড় ছিল উপনিবেশে লগ্নির জন্য অতিরিক্ত মূলধনের চাপ। এর প্রতিকারের উপায় হিসেবে হবসন বলেন যে, অভ্যন্তরীণ সামাজিক সংস্কার ও ধনের সুষম বন্টন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ধন বন্টনের বৈষম্য দূর করতে পারলে দরিদ্র জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা উদ্বৃত্ত ভোগ্যপণ্য ক্রয় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ভোগ্যপণ্য বা মূলধন পাহাড় সমান হবে না। তখন নতুন নতুন বাজারের অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবার ফলে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতাও কমে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উপনিবেশের বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি অধিকার করার বাসনাও ছিল। অতিরিক্ত মনুষ্যশক্তি সংগ্রহের কামনাও ছিল।

সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের জন্য হবসন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাও হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর শিল্পমালিকদের মূলধন স্ফীতির ফলেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে বলে হবসন অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পূর্বেও তো সাম্রাজ্যবাদ ছিল। এর পেছনে কি কারণ তার ব্যাখ্যা কিন্তু হবসন দেননি। তাঁর মতবাদের এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, স্তূপীকৃত মূলধন এবং কাঁচামাল ও বাজার দখলের অভিপ্রায়ই নয়া ড্যা সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করেছিল। শিল্পবিপ্লব এবং ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল।

হবসনের এই অর্থনৈতিক ধারণা ও ব্যাখ্যার আরও বিশ্লেষণধর্মী ও বিস্তারিত আলোচনা পাই বিখ্যাত রুশ কমিউনিস্ট নেতা ভি. আই. লেনিন রচিত 'Imperialism : the Highest Stage of Capitalism' (১৯১৬) নামক গ্রন্থটি থেকে। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ভিতরেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির বৈদেশিক নীতি পুঁজিবাদী শক্তির হেলনেই পরিচালিত হত। অধিক মুনাফার আশায় শিল্প মালিকরা

দেশের প্রয়োজনের মাত্রারিক্ত শিল্পপণ্য উৎপাদন করত। এই উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয় এবং বাজার দখলের জন্য পুঁজিবাদী উপনিবেশ দখল করত। যেহেতু বিশ্বে উপনিবেশের সংখ্যা সীমিত, সেহেতু প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশ উপনিবেশ দখল করার চেষ্টায় মত্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশেষে যুদ্ধের আকার নিয়েছিল। এ ব্যাপারে লেনিনের অভিমত হল, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের অন্তিমপর্ব এবং সমাজতন্ত্রের আগমনের পূর্ববর্তী পর্ব। বৈরিভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সংঘাত বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনবে। লেনিনের মতে, বিত্তশালী বুর্জোয়া শ্রেণীরা উপনিবেশ দখলের পর সেই অনগ্রসর, দরিদ্র দেশের শ্রমিকদের শোষণ করে, উৎপাদনের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে। উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণী বেশি আয়ের আশায় এই শোষণের সামিল হয়। বিত্তশালী বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর একটি মুখ্য অংশকে উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার কিছু অংশ উপঢৌকন দেয়। এর ফলে সেই শ্রমিকরা তাদের বৈপ্লবিক প্রবণতাকে বিসর্জন দিয়ে ধনী বুর্জোয়াদের সহযোগী হয়। কিন্তু শ্রমিকরা ভুলে যায় যে তাদের এই সুবিধা হল নিতান্তই সাময়িক। একটা সময়ে এর অবসান ঘটবে। সীমিত উপনিবেশেও দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনিবার্য্য পরিণতি হবে যুদ্ধ। আর তখন শ্রমিকদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। রোজা লুক্সেমবার্গ তাঁর 'Accumulation of Capital' গ্রন্থে (১৯১৩) লেনিনের মতই একই অভিমত ব্যক্ত করেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক যেমন — ডেভিড টমসনের মতে, লেনিনের এই যুক্তি কয়েকটি অসুবিধাজনক সত্যকে উপেক্ষা করেছে। লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিদেশে মূলধন বিনিয়োগের অধিকাংশ ঔপনিবেশিক রাজ্যে হয়নি, মূলতঃ হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা ও রাশিয়ায়। সুতরাং উদ্বৃত্ত মূলধনের বিনিয়োগের জন্যই উপনিবেশ গড়ে ওঠে, এই চুক্তি সবসময় গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডেনমার্ক ও সুইডেনের মত জীবনযাত্রার মানোন্নত দুটি দেশের কোন উপনিবেশ ছিল না। আবার ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের বিস্তৃত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু এই দুই দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনুন্নত ছিল।

তথাপি, লেনিনের মতবাদের খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে একথা স্বীকার্য যে, সাম্রাজ্যবাদ বিস্ফোরণের পিছনে শিল্পবিপ্লব, মূলধনী শ্রেণীর মূলধন বিনিয়োগ ও বাজার দখলের আগ্রহই বিশেষভাবে করেছিল।

তবে ডেভিড টমসন মনে করেন যে, সামগ্রিক বা মৌলিক কোনো অর্থেই সাম্রাজ্যবাদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করা চলে না। অর্থনৈতিক শক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে, উপনিবেশ বিস্তারের জন্য অর্থনীতি ছাড়াও অন্য কারণও থাকতে পারে। ঐতিহাসিক গর্ডন এ, ক্রেগ অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে রাজনৈতিক উপাদানের গুরত্ব বেশি বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্র উপনিবেশগুলিতে প্রকৃত রাজনৈতিক ও সামরিক সুযোগ সুবিধার কথা জনগণের মধ্যে প্রচার না করে সেখানকার অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার কথা প্রচার করত নিজেদের কাজের সমর্থনে। কেননা এতে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া সহজ ছিল। তিনি আরও বলেন, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির কর্ণধাররা সাম্রাজ্যবাদী নীতিগ্রহণে অর্থনীতির প্রয়োজনের চেয়ে রাজীনীতির প্রয়োজনকেই প্রধান বলে বিবেচিত করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ফ্রান্স-প্রাশীয় যুদ্ধের (১৮৭০-৭১) পরের রাজনৈতিক পরিচিত বিচার করা যেতে পারে। এই যুদ্ধের পর ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের একটি মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠে এবং তা হল ঃ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি শুধুমাত্র নিজেদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারলেই

রাষ্ট্রগুলি তাদের ভয় করে চলবে এবং শক্তির মর্যাদা দেবে। অতএব এক্ষেত্রে উপনিবেশ বিস্তার হল বিজিত রাষ্ট্রের সমীহ আদায় করা এবং নিজ রাষ্ট্রের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করা।

গর্ডন ক্রেগের মতানুসারে সাধারণভাবে ও কথা বলা যায় যে, অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থের সহাবস্থান দেশকে সাম্রাজ্যবাদী করে তোলে, কোনো কোনো দেশ, যেমন ইটালী ও রাশিয়াতে উপাদানের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রভাব বেশি ছিল। তবে এ সাধারণীকরণ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ঔপনিবেশিকতা বিস্তারে খ্রীষ্টান মিশনারীদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত স্কট, ডেভিড লিভিংস্টোন প্রমুখ। মিশনারীরা অনগ্রসর সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের পথ অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই মিশনারীদের অনুসরণ করেছিল বিভিন্ন দেশের বণিকের দল।

সাম্রজ্যবাদের বিকাশে আরো একটি উপাদান হল প্রশাসক ও সৈনিক। জটপাকানো প্রশাসনিক অবস্থা থেকে শৃঙ্খলা ও দক্ষ প্রশাসন ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক প্রশাসকগোষ্ঠী তৎপর ছিল। এদের মধ্যে মিশরের লর্ড ক্রোমার উত্তমাশা অন্তরীপে লর্ড মিলানারের এবং জার্মান পূর্ব আফ্রিকায় কার্ল পিটার্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা নিজ উদ্যোগে সাম্রাজ্যবিস্তার করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্যস্থাপন বড় বড় শক্তিগুলির কাছে শক্তি জাহির করার ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও এই সাম্রাজ্যবিস্তার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ডেভিড টমসনের মতে কোনো দেশ সাম্রাজ্যবাদী হবে কিনা তা নির্ভর করে বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক, সাংবাদিক বা রাজনীতিবিদদের উন্নতি চায়। তাছাড়া ঔপনিবেশিকতার ঐতিহ্য আছে এমন দেশই সাধারণতঃ তাড়াতাড়ি উপনিবেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এর দৃষ্টান্ত ব্রিটিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতিসমূহ। জার্মানী ও ইটালীর ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য ছিল না। তাই ঔপনিবেশিক রঙ্গমঞ্চে তাদের আবির্ভাব দেরিতে হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উপনিবেশের বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি অধিকার করার বাসনাও দেখা যায়। অতিরিক্ত মনুষ্যশক্তি সংগ্রহের কামনাও ছিল। ফরাসীরা আফ্রিকায় এই মনুষ্যশক্তিই চেয়েছিল, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা যা ইটালীয়রা লিবিয়ায় চেয়েছিল এবং এইসব ছাড়াও অনেক মিশ্রিত কামনা ঔপনিবেশিক আকাঙ্খার সঙ্গে মিশেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার প্রধান তিনটি বলয় ছিল— আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্য। ইউরোপীয় দেশগুলি যেমন ইংল্যন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, প্রভৃতি আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে আফ্রিকাকে নিজেদের মেধ্যে বন্টন করে নেয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের একটি ক্ষেত্র ছিল।

অতএব সবশেষে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণার উৎস ও প্রকৃতি এক নয়, একাধিক। বিভিন্ন দেশে উৎস ও প্রকৃতির বিভিন্নতা আছে। পতাকাকে বাণিজ্য অনুসরণ করেছে ঠিক তা বলা চলে না। বরং উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও জলদস্যু, বাইবেল ও আমলা, ব্যাঙ্কমালিক ও ব্যবসায়ীর সঙ্গে পতাকা গেছে। পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত ও অশোষিত অংশ নানা সুযোগ-সুবিধা এনে দিত যা ঊনিশ শতকের অন্তিমপর্বের প্রতিযোগিতার জগতে সবাই দু'হাত বাড়িয়ে নিত।

প্রশ্ন

১। 'Imperialism: The Highest Stage of Capitalism'গ্রন্থটি কার লেখা?

২। উপনিবেশিকতা স্থাপনে যে খ্রীষ্টান মিশনারী সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্থাপন করেছিল তার নাম কি?

৪.১.১.২.৪ ঃ সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণ

সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার প্রধান তিনটি বলয় ছিল আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্য, আফ্রিকায় ব্রিটিশ, ফরাসী এবং জার্মানী ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক বিস্তারকে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের দিক দিয়ে অত্যন্ত অপরিহার্য মনে করল।

অধ্যাপক ফ্রিজ ফিশার (Fritz Fischer) প্রমুখ জার্মান সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে জার্মানীর বিশ্বজনীন বিস্তারনীতির কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এর পশ্চাতে জার্মানীর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এরা সকলে সুপরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণশীল নীতি গ্রহণে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে এবং ঔপনিবেশিক ও রাজনীতির স্বার্থে ইউরোপের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ও ইউরোপের বাইরে মধ্য-প্রাচ্য ও মধ্য আফ্রিকার এক ব্যাপক অঞ্চলে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে দৃঢ়সংকল্প হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের সময় থেকেই এই বিস্তারধর্মী নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৭ খ্রী. কাইজার উইলিয়াম ঘোষণা করেন যে, জার্মানী আর মহাদেশীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে প্রস্তুত নয়, এবার সে বিশ্বনীতির বা 'Welt Politik' (World Politics)-র পথে অগ্রসর হবে। জার্মান রাজনীতিতে বিত্তবান শ্রেণী তাদের প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখার জন্যই বিশ্বজনীন বিস্তারধর্মী নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী লালসা এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হয়। ইউরোপীয় রাজনীতিতে ইতালী ও জার্মানীর দ্রুততর শক্তিবৃদ্ধির ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি যথা—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স , জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড বুয়োর রাজ্যদুটি অধিকার করে নেয়। এরপর সাময়িকভাবে বুয়োররা তাদের হৃত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করলেও ইংরেজরা বুয়োরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৯০২খ্রীঃ তা পুনরায় নিজেদের দখলে আনে। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। আফ্রিকার একটি বৃহৎ অংশেরউপর ফরাসী আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল, আলজেরিয়া, টিউনিস, সমগ্র সাহারা অঞ্চল, সেনেগাল প্রভৃতি এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফরাসীরা তাদের দখল বিস্তার করে। আফ্রিকার উত্তর উপকূল থেকে কঙ্গো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর ফরাসী আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী তোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরুন ও আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। ইতালী ও পর্তুগালও আফ্রিকাতে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। এভাবে প্রায় সমগ্র আফ্রিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দিতা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের একটি ক্ষেত্র ছিল। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য ইঙ্গ ফরাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল। ফরাসীদের প্রাধান্য খর্ব করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা সারা ভারতবর্ষে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, পরবর্তীকালে ভারত সীমান্তে রুশ প্রভা বিস্তারের সম্ভাবনাকেও ইংরেজরা প্রতিহত করেছিল। এ ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

ফরাসীরা ইন্দো-চীনের এক বিস্তৃত অঞ্চলে অর্থাৎ কোচিনচীন, কাম্বোডিয়া, আন্নাম, লাওস প্রভৃতির উপর ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

মধ্য এশিয়ায় ইঙ্গ -রুশ ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠেছিল। আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে উভয়ের সংকট অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এই আফগান সমস্যাকে কেন্দ্র করে খাইবার গিরিপথ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ইংরেজদের অধিকারে আসে। রাশিয়াও এই অঞ্চলে তার বিস্তারনীতি অব্যাহত রেখেছিল।

একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পারস্য উভয়ের দ্বন্দ্বের ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ-চুক্তির মাধ্যমে পারস্য দুটি প্রভাব-বলয়ে বিভক্ত হয়। উত্তরাংশে রাশিয়া এবং দক্ষিণাংশ ইংল্যাণ্ডের প্রভাব বলয় হিসেবে স্থিরীকৃত হয়।

একইভাবে নিকট প্রাচ্য বা তুরস্ক ছিল ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সংঘর্ষের একটি উল্লেকযোগ্য কেন্দ্র, মৃতপ্রয় তুরস্ককে গ্রাস করাই ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির উদ্দেশ্য। এই সংঘর্ষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরা ছিল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যাণ্ড। তুরস্কের অখণ্ডতা বজায় রাখা ছিল ইংল্যাণ্ডের দীর্ঘ অনুসৃত নীতি। আর তুরস্ককে গ্রাস করা ছিল রাশিয়ার নীতি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইংল্যাণ্ডকে তার দীর্ঘদিনের তুরস্ক নীতি পরিহার করে রাশিয়ার মতই তুরস্ককে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়।

দূর প্রাচ্যে চীন ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান লক্ষ্য। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সেখানে অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথম চীনযুদ্ধ (১৮৩৯-৪২ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের (১৮৫৬-৬১ খ্রীঃ) সুযোগ নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স বাণিজ্যিক অতিরাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে। চীনের দুর্বলতার সুযোগে জাপানও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য চলে যাওয়ার পর সেখানে জাপান তার আধিপত্য বিস্তার করে। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ চীনে বিস্তারনীতি অনুসরণ করে চলে। জার্মানী সান্টুং অঞ্চলে, ইংল্যাণ্ড ইয়াং সিকিয়াং অঞ্চলে, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়ায়, ফ্রান্স কোয়াং চোয়াং, টনকিন ও ইউনান অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতিতে জাপান ও ইংল্যাণ্ড আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ১৯০৪ খ্রীঃ জাপান শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে

অগ্রসর হল। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়ে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী জাপান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনের কাছে একুশ দফা দাবী পেশ করেছিল।

প্রশ্ন

১। আফ্রিকার কোন কোন দেশে ফরাসীরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে?

২। কত খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে?

৪.১.১.২.৫ ঃ উপসংহার

১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপীয় রাজনীতি বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে সমপৃক্ত হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক জি. বারাক্লু (G. Barraclough) মনে করেন ১৮৯৮ খ্রীঃ থেকে ইউরোপের দেশগুলি এবং জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ বিশ্বরাজনীতিতে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে। তাই একদিকে যেমন মহাদেশীয় রাজনীতিতে জার্মানীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ছিল ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে উদ্ভুত, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই দুটি দেশের কাছে জার্মানীর প্রাধান্যের প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্য ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক, জাপানের কাছে এশিয়ার বিশেষত সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার ক্রমিক বিস্তারনীতি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মহাদেশীয় রাজনীতির চিরায়ত ধারার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ ও ইউরোপ-বহির্ভূত দেশগুলোর যোগদানের ফলে একটি সার্বিক বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল।

৪.১.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থবলী (Reference Books)

(১) প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী — ইউরোপের ইতিহাস।

(২) ডেভিড টমসলন (David Thomson) — Europe since Napoleon

(৩) Lenin — Imperialism, the Highest Stage of Capitalism

(৪) E.J. Hobsbawm — The Age of Empire

(৫) P.T. Moon — Imperialism and world politics

(৬) W.L. Langer — The Diplomacy of Imperialism

৪.১.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

(১) সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়? এই শব্দটির প্রচলন ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে কিভাবে হয়েছে?

(২) নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব কোন্ সময় থেকে হয়? এই সাম্রাজ্যবাদকে নয়া সাম্রাজ্যবাদ কোন্ অর্থে আখ্যা দেওয়া হয়?

(৩) নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ ও বিভিন্ন তত্ত্বগুলি আলোচনা কর।

(৪) ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপীয় শক্তিগুলির সম্পর্কের পরিবর্তন কিভাবে ঘটাল?

(৫) সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবে অর্থনৈতিক উপাদান কতখানি দায়ী ছিল?

(৬) ইউরোপীয় দেশগুলির ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতি আলোচনা কর।

(৭) ১৮৭০ থেকে পরথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের ধারাটি আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

উনিশ শতকের দান

Legacy of the Nineteenth Century

একক - ২

উদারতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ

Liberalism, Socialism and Nationalism

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য
৪.১.২.১ ঃ সূচনা
৪.১.২.২ ঃ উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও প্রসার
৪.১.২.৩ ঃ উদারতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য
৪.১.২.৪ ঃ উদারতন্ত্রবাদের সীমাবদ্ধতা
৪.১.২.৫ ঃ উপসংহার
৪.১.২.৬ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব
৪.১.২.৭ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৪.১.২.৮ ঃ কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীগণ
৪.১.২.৯ ঃ কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং এর প্রভাব
৪.১.২.১০ ঃ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার
৪.১.২.১১ ঃ জাতীয়তাবাদ শব্দের সংজ্ঞা
৪.১.২.১২ ঃ জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান
৪.১.২.১৩ ঃ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব
৪.১.২.১৪ ঃ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ
৪.১.২.১৫ ঃ জাতীয়তাবাদী আদর্শের বৈশিষ্ট্য
৪.১.২.১৬ ঃ জাতীয়তাবাদের দোষ-ত্রুটি
৪.১.২.১৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থ
৪.১.২.১৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্ন

৪.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব, প্রসার ও বৈশিষ্ট্য।

(২) উদারতন্ত্রবাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা।

(৩) সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও লক্ষ্য।

(৪) আদি সমাজতন্ত্রীগণ ও তাঁদের লক্ষ্য, আদর্শ।

(৫) কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং বিশ্বে এর প্রভাব।

(৬) ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার এবং সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ।

(৭) জাতীয়তাবাদ শব্দের অর্থ, উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য।

(৮) জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতাদর্শ।

(৯) জাতীয়তাবাদের অবদান।

(১০) জাতীয়তাবাদের দোষ-ত্রুটি।

৪.১.২.১ ঃ সূচনা

ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্স তথা বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিপ্লব নতুন ভাবধারার উন্মেষ ঘটিয়েছিল সমগ্র ইউরোপে। ঊনবিংশ শতকে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল। এই প্রবণতা দুটি হল ঃ (১) পরিবর্তনমুখী প্রবণতা এবং (২) পরিবর্তন-বিরোধী প্রবণতা। পরিবর্তনমুখী প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের মুক্ত পন্থার আদর্শ এবং পরিবর্তন বিরোধী প্রবণতা এই আদর্শের বিরুদ্ধতা করে চলেছিল। এই পরিবর্তনমুখী প্রবণতা ইউরোপে তিনটি ভাবধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। এগুলি হল (১) উদারতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রবাদ, (২) সমাজতন্ত্রবাদ, (৩) জাতীয়তাবাদ।

৪.১.২.২ ঃ উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও প্রসার

১৮১৫ থেকে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী সময়কে David Thomson তাঁর 'Europe since Napoleon' গ্রন্থে 'আঞ্চলিক অন্তর্বিপ্লবের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ('The generation between1815 and 1849.... was a time of endemic civil war') ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রক্ষণশীল পুরোনো ব্যবস্থা ইউরোপে পুনরায় ফিরে এলে ফরাসী বিপ্লব প্রসূত নতুন ভাবধারার সঙ্গে এর সংঘাত দেখা দেয়। ইউরোপে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাত ইউরোপের ইতিহাসকে নতুন দিকে মোড় দেয় এং শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে রক্ষণশীলবাদী শক্তিগুলি প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে এবং ইউরোপের প্রায় সর্বত্র নূতন সমাজের প্রয়োজন অনুসারে নূতন ধরনের সরকার গড়ে উঠতে চলেছে। ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রগতিপন্থী ও প্রগতি বিরোধী শক্তির মধ্যে লড়াই। ফরাসী বিপ্লব উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও

জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করে ইউরোপের দেশগুলির জনগণের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছিল স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্রের জন্য জোরালো দাবী উঠেছিল; আবার জার্মানী, ইতালির ন্যায় দেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্য আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল; আবার বেলজিয়াম, গ্রীস, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ডে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। গ্রীস ও বেলজিয়ামে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। এই উভয় দেশ গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

১৮১৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রগতিপন্থী ও প্রগতিবিরোধী শক্তির মধ্যে লড়াই। ফরাসী বিপ্লব উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করে ইউরোপের দেশগুলির জনগণের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল।

৪.১.২.৩ ঃ উদারতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য

উদারতন্ত্রবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ উদারতন্ত্র শাসকশ্রেণীর স্বৈরাচারী নিরঙ্কুশ ও অবাধ ক্ষমতার ঘোরতর বিরোধী ছিল। সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসকের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল উদারনীতিবাদের লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ উদারতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জনগণের বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। তৃতীয়তঃ উদারতন্ত্র আইনের চোখে সকল মানুষই সমান এই আদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিল। চতুর্থতঃ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত গণ-উদ্যোগ হল এই মতবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মানুষের যেমন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে তেমনি তাদের যে কোন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রেও কোনরকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা বাধা থাকবে না। সবশেষে বলা যায়, উদারনীতিবাদ আইনসভার সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই আইনসভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে। উদারতন্ত্রবাদ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। কারণ এই ধরনের সরকার বা শাসনব্যবস্থা আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে স্বৈরাচারী বা সীমাহীন ক্ষমতার আধিকারী হতে পারবে না। এই উদারতন্ত্রী ভাবধারা ও আদর্শ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে সংবিধান সভা কর্তৃক প্রণীত লিখিত সংবিধানটি উদারতন্ত্রবাদের সাফল্যের পরিচয় প্রদান করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলে যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উদারনীতি তাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

উদারতন্ত্রবাদ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। কারণ এই ধরনের সরকার বা শাসনব্যবস্থা আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে স্বৈরাচারী বা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না।

কিন্তু উদারতন্ত্রবাদের উগ্র রূপটি প্রকাশ লাভ করেছিল গণতন্ত্রাবদের মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্রবাদীর গণ-সার্বভৌমত্বের তত্ত্বে আস্থাশীল ছিল। এই তত্ত্বের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছিল রুশোর 'General Will' বা জনসাধারণের ইচ্ছা তত্ত্বের মধ্যে। উদারতন্ত্রবাদীরা কিন্তু এই তত্ত্ব প্রচার করেনি। উদারতন্ত্রবাদীরা গণতন্ত্রবাদের সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি প্রয়োগও মেনে নিতে পারেনি। আইনসভার নির্বাচনে সমস্ত জনগণই ভোটে অংশগ্রহণ করবে তা উদারনীতিবাদের সমর্থকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। তাই ফ্রান্সে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের উদারনৈতিক সংবিধানে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যেই ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ থাকবে তা মেনে নেওয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন ১। উদারতন্ত্রবাদের প্রধান বৈশিষ্টগুলি কি কি?

৪.১.২.৪ ঃ উদারতন্ত্রবাদের সীমাবদ্ধতা

ইউরোপে ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উদারতন্ত্রবাদের সাফল্য ছিল সীমিত। একমাত্র গ্রীস ও বেলজিয়ামে স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া অন্যান্য স্থানে উদারতন্ত্রবাদ পরাক্রমশালী রাজতান্ত্রিক শক্তি ও তার সেনাবাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত উদারনীতিবাদের সমর্থকগণ কোন বাস্তব আদর্শবাদ জনগণের কাছে স্থাপন করতে পারেনি। রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল এবং জনসাধারণের কাছে তারা কোনরকম কার্যকরী পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করতে পারেনি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জার্মানী ও ইটালীর উদারনৈতিক আন্দোলনে। ইটালীর ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র গঠন সম্পর্কে ম্যাৎসিনি ও তাঁর সমর্থকগণ বাস্তবতাবর্জিত রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় রেখেছিল। জার্মান উদারনীতিবিদরা ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টে কোন কার্যকরী গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

৪.১.২.৫ ঃ উপসংহার

তবে উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ইউরোপের প্রতিকিরয়াশীল শক্তি — যেমন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, ভূস্বামী অভিজাতশ্রেণী ও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যে পরিবর্তনমুখী চিন্তাধারার বার্তা নিয়ে এসেছিল তা অবশ্যই ইউরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের পথ প্রস্তুত করেছিল। ১৮১৫-১৮৭১ ইউরোপের ইতিহাসের এই পর্বে পরিবর্তনমুখী প্রণতাগুলি পুরোনো প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে আপোস করতে বাধ্য হলেও ইউরোপের পুনর্গঠন ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে যে জয়লাভ করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

৪.১.২.৬ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব

ঊনবিংশ শতকের উদারতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ন্যায় সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলনও প্রসারলাভ করে। এই মতবাদ হোল দার্শনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত উৎপাদন ও আয় বন্টনের দ্বারা সমাজে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সমাজব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করেই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই মতবাদের উদ্ভবের কারণ টানা যায় শিল্পবিপ্লবের সূচনা থেকে। শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবেই ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। ইংলণ্ডে প্রথম এই শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী বিপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। এই শিল্পবিপ্লব ইউরোপের দেশে যেমন ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য বড় বড় কল-কারখানা গড়ে উঠল। প্রচুর পরিমাণে শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হতে শুরু করল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিতে। এই নতুন যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অসান হল এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেল। মানুষের মস্তিষ্ক, বিশেষ গুণ ও প্রতিভা মূল্যহীন হয়ে পড়ল। কেবলমাত্র যন্ত্রশক্তির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য

কায়িক শ্রমের প্রয়োজন অনুভূত হল। সৃষ্টি হল এক নতুন শ্রেণীর। এই শ্রেণী হল কায়িকশ্রমে নিযুক্ত মজুরিপ্রাপ্ত দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণী। অতএব দুটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল যন্ত্রচালিত নব উৎপাদনব্যবস্থায়। এরা (১) পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী এবং (২) শ্রমিক শ্রেণী। এই নতুন ব্যবস্থা সমাজদেহে এক সর্বগ্রাসী ও সুদূরপ্রসারী সমস্যার সৃষ্টি করল। শিল্পবিপ্লব থেকে উদ্ভুত এই সমস্যা জন্ম দিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজদর্শনের যা ইতিহাসে সমাজতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। মার্কসবাদ সমাজতন্ত্রবাদেরই পরিশোধিত রূপান্তর।

পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নানাকারণে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। এই সব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — শ্রমিক শোষণ, অত্যাচার, স্বল্প মজুরী, শ্রমিকদের উপর অমানুষিক পরিশ্রমের বোঝা, শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, কর্মের স্থায়িত্বের অভাব, শিশু ও নারী শ্রমিকদের অধিকার সময় খাটানো, শ্রমিকদের দৈহিক অবনতি ও মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি। শ্রমিকরা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করা সত্ত্বেও অতি সামান্য মজুরী পেত। অন্যদিকে মূলধনী পুঁজিপতি সম্প্রদায় দিন দিন তাদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করে চলেছিল। ধনী থেকে অধিকতর ধনী হচ্ছিল। এর ফলে মূলধনী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হল। শুরু হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপর্যয় নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা। এই চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি হল সমাজতন্ত্রবাদ। অষ্টাদশ শতকে এই সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কিত চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর বহু দার্শনিক তাঁদের চিন্তাধারার মাধ্যমে এই মতবাদকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ছায়া অষ্টাদশ শতকের বেশ কিছু আগেই পাওয়া যায়। দার্শনিক প্লেটোর (Plato) 'Republic' গ্রন্থে সমাজতন্ত্রবাদের ছায়া পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের ইংরেজ চিন্তাবিদ স্যার টমাস মুর তাঁর 'Utopia' ('ইউটোপিয়া') গ্রন্থে সমাজে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। তবে এসবই ছিল কল্পনাভিত্তিক। আধুনিক সমাজতন্ত্রের সূচনা ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করা যেতে পারে। রুশোর 'General Will' বা 'সাধারণের ইচ্ছা' এবং ফরাসী বিপ্লবের সুমহান আদর্শ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের গতিশীলতা এনেছিল।

শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবেই ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত উৎপাদন ও আয় বণ্টনের দ্বারা সমাজে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

ম্যাবলি ও মোরেলি এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই আদর্শ হিবার্টপন্থী আন্দোলনে ও জ্যাকোবিনদের কার্যকলাপে দৃষ্ট হয়েছিল। বিপ্লবের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র 'আখ্যা' দিলেও জনসাধারণের বিপর্যয় এবং বুদ্ধিজীবীদের আবেগ ও চিন্তাধারা মিশ্রিত হয়ে 'ব্যাবেয়ুফ' আদর্শ ও পন্থার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর আদর্শের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদী লক্ষণ বজায় ছিল। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় এই কল্পনামিশ্রিত রূপটির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে। কারণ এই সময়ে শিল্পবিপ্লবের প্রসারের ফলে মালিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। নতুন উৎপাদন সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেই ঊনবিংশ শতকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ক্রমশঃ প্রাথমিক কল্পনাশ্রয়ী রূপটি মুছে ফেলে বিজ্ঞানসম্মত দর্শনের পথে অগ্রসর হল।

৪.১.২.৭ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রবাদ পুঁজিবাদের ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ঘোর বিরোধী। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের মালিকানার পরিবর্তে সমতার ভিত্তিতে অর্থ বন্টন করা এই মতবাদের প্রধানতম লক্ষ্য। এই মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, পুঁজিপতি মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকদের শোষণের ফলেই সমাজদেহে নানা সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ধনী মালিকশ্রেণী ও দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফএলই সামাজিক সঙ্কটের উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রীদের দাবী হল জমি, মূলধন, সম্পত্তি ইত্যাদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সবকিছুই ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীনে আনয়ন।

তবে সমাজতন্ত্রবাদীদের নীতি ও আদর্শগত মতভেদ লক্ষণীয়। নরমপন্থী সমাজতন্ত্রীগণ যেমন ইংলণ্ডের শ্রমিকদল (Labour Party) এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর সমাজতন্ত্রীগণ সম্পত্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্ত্বের উপর জোর দিয়েছেন এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে বইে তাদের ধারণা। অন্যদিকে Syndicalist-রা মনে করে যে, প্রত্যেক শিল্পের মালিকানার অধিকার শ্রমিক-সংঘের হাতে অর্পণ করা উচিত। 'সমষ্টিবাদের' (Collectivism) নীতির প্রবক্তারা রাষ্ট্র কর্তৃক শুধুমাত্র উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। বিপ্লবী সাম্যবাদী দেশের সব সম্পত্তি এবং উৎপাদনের ব্যবস্থা একমাত্র জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করার উপর জোর দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় মজুরি প্রথার প্রচলন থাকবে না এবং রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে কাউকেও মজুরি গ্রহণে বাধ্য করবে না।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নীতি ও আদর্শের পার্থক্যই ছিল না, কার্যপদ্ধতির দিক থেকেও তাদের মধ্যে নানা মত পার্থক্য বজায় ছিল।

প্রশ্ন

১। সমাজতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝ?

২। সমাজতন্ত্রবাদের প্রধানতম লক্ষ্য কি ছিল?

৪.১.২.৮ ঃ কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীগণ

কার্ল মার্কস পূর্ববর্তী আদি সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তারা হলেন ইংলণ্ডের বরার্ট ওয়েন (Robert Owen), ফ্রন্সের সেন্ট সাইমন (সাঁ সিমোঁর) (St. Simon), চার্লস ফুরিয়ার (Charles Fourier), লুই ব্লাঙ্ক (Louis Blanc) প্রভৃতি। এই সব আদি সমাজতন্ত্রীগণ মানবতার আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য, দৈন্য, অত্যাচার,অবিচার তাঁদের মনকে নাড়া দিয়েছিল বলে তারা এক সুন্দর সমাজ জীবনের কল্পনা করেছিলেন। এঁরা শিল্পপতি ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তিতে আদর্শ শিল্পনগরী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আদি সমাজতন্ত্রীদের চিন্তা ও আদর্শ নিঃসন্দেহে মহৎ হলেও তা ছিল কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব। তাই এঁদের বলা হয়ে থাকে অবাস্তব সমাজতন্ত্রী (Utopian Sosialists)। মার্কসবাদীরা এদের 'কল্পনাশ্রয়ী আদর্শবাদী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে আদি

কার্ল মার্কস- পূর্ববর্তী আদি সমাজতন্ত্রীদের চিন্তা ও আদর্শ হমৎ হলেও তা ছিল কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব। কারণ তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার চেয়ে শাসক, অভিজাত ও শিল্পতিদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি।

সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন লুই ব্ল্যাঙ্ক। তিনি কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র ও আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক কার্ল মার্কসের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছিলেন। তিনি কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রকে অনেকটাই বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Organization of Labour' এ প্রতিটি মানুষের কাজের অধিকরাকে স্বীকৃতি দেওয়া রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিত্তবানও শিল্পপতিদের পরিবর্তে তিনি সাধারণ শ্রমিকদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন মুনাফাভোগীদের তীব্রভাবে আঘাত করার জন্য। তাঁর মতবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে তিনি ছিলেন একজন বড় নেতা। ফ্রান্সে তাঁর মতবাদের প্রভাবে জাতীয় কারখানার পত্তনও হয়েছিল, যদিও এই সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি নানা বাধা বিপত্তির ফলে।

তবে লুই ব্ল্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য আদি সমাজতান্ত্রিকরা অবাস্তব আদর্শবাদী হওয়ায় তাদের মতবাদ শেষ পর্যন্ত অসার প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার চেয়ে শাসক, অভিজাত ও শিল্পপতিদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অবাস্তব কাজ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে তাদের অদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের সমালোচনা ও সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নানা দোষত্রুটি প্রকট করে দিয়েছিল। তবে আদি সমাজনতন্ত্রীদের সমাজতান্ত্রিক না বলে মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক হিসেবে অভিহিত করাই অধিকতর সঙ্গত হবে বলে মনে হয়।

তবে সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী মতাদর্শ গড়ে তোলার পেছনে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা ছিল। শিল্পবিপ্লব যুগের পরবর্তীকালে ইউরোপে এক নতুন সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। সনাতন কুটির ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীরা নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ফ্যাক্টরী (Factory) ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে এই শ্রমিকশ্রেণী শহরগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রভা বিস্তার করতে শুরু করল।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম প্রকাশ ও প্রভাব অনুভূত হয় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে। ১৮৪৮০৫২ সময়পর্বে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে এবং শ্রমিক শ্রেণীরপ অধিকারের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৮৪৮-৫২ খ্রীষ্টাব্দের সময়পর্বে শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের নেতারা রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত ফরাসী বিপ্লবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র দেবার চেষ্টা করেছিল। এই বিপ্লব খুব একটা সফল না হলেও পশ্চিম ইউরোপে যে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর পর থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ইউরোপে এক নতুন দিকে মোড় নেয়।

প্রশ্ন

১। কার্ল মার্কস পূর্ববর্তী দু-জন সমাজতন্ত্রবাদীর নাম লেখ? কেন তাদের 'কল্পনাশ্রয়ী আদর্শবাদী' বলে আখ্যা দেওয়া হয়?

৪.১.২.৯ ঃ কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং এর প্রভাব

ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের যুগ্ম রচনা 'The Communist Manifesto' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে। মার্কস ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের জনক। নিজ মতবাদকে 'বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ' বা 'সাম্যবাদ' (Communism) নামে অভিহিত করে মার্কস আদি সমাজতন্ত্রবাদের

অসারতা এবং সেই মতবাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অনবদ্য পুস্তক 'Das Capital' ('দাস্ ক্যাপিটাল্') প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ধনতন্ত্র সমাজকে শোষণের পথে নিয়ে যায়। এই প্রথার নানা শোষণ, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দিকগুলো উন্মোচিত করে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর। এমন কি তিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বৈপ্লবিক কর্মপন্থার কথা তুলে ধরেছিলেন। তত্ত্বগত দিক দিয়ে এখানে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদ থেকে আলাদা হয়ে সাম্যবাদের (Communism) তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। ১৮৪৮-৫২ খ্রীষ্টাব্দের সময়পর্বে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং এর ফলে তাদের উপর নানাধরণের অত্যাচার, নিষ্পেষণের তিক্ত অভিজ্ঞতা কার্ল মার্কসকে পীড়া দিয়েছিল। ফলে মার্কস্ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামশীল আন্দালন ও সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে তিনি বলেছেন যে ''এতাবৎকাল মানবসমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।'' তাঁর মতে, সব যুগেই মানসমাজ নানা অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে নিরন্তর শ্রেণীসংঘর্ষ চলেছে। আধুনিককালে এই দ্বন্দ্ব চলেছে বিত্তবান পুঁজিপতিশ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী তাদের মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এই কারণেই তিনি দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান করেছেন—''দুনিয়ার মজদুর এক হও''। এই সংগ্রামের আশু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন । কারণ মার্কসের মতে, ''রাষ্ট্র শ্রেণী শোষণের যন্ত্র''। তাই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রী পুঁজিপতিদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবশেষে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অধিকার করবে এবং এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র'। এই 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র' এবং শ্রমিক বিপ্লব যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারবে তখন সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে এবং শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে। এই সঙ্গে শ্রেণীশোষণের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে এবং তারও সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটবে। এ ভাবেই সমাজতন্ত্রবাদ তার সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে পারবে।

আধুনিককালে বিত্তবান পুঁজিপতিশ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণী মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। শোষিত শ্রমিক শ্রেণী তাদের মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এই কারণেই কার্ল মার্কস দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান করেছেন—''দুনিয়ার মজদুর এক হও।'' এই সংগ্রামের আশু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন।

মার্কসবাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল একটি যুক্তি নির্ভর তত্ত্বের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থার সমন্বয় সাধন। এ কথা সুবিদিত যে মার্কসীয় চিন্তাধারা এবং কর্মপন্থা দ্বন্দমূলক বস্তুবাদের তত্ত্বটিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই দার্শনিক তত্ত্বটি গ্রহণে তিনি হেগেলের (Hegel) কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী হলেও তাঁর কৃতিত্ব হোল তিনিই কিন্তু হেগেলের আদর্শবাদী দার্শনিক তত্ত্বকে বস্তুতান্ত্রিক রূপ দিয়েছিলেন। এর ফলে ইতিহাসে বস্তুবাদ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। মার্কসের মতে, প্রতিটি ঘটনার বিবর্তনের মধ্যে আছে থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্ ও সিন্থেসিসের শক্তি। আধুনিক যুগের শোষক পুঁজিপতি বুর্জোয়ারা হল থিসিস্ অর্থাৎ রক্ষণশীল, পরিবর্তন বিমুখ শক্তি, শোষিত শ্রমিকশ্রেণী হল অ্যান্টি থিসিস অর্থাৎ সংগ্রামশীল পরিবর্তনকামী শক্তি। এই পরস্পরবিরোধী উভয়শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকারী শক্তিটি হল সিন্থেসিস্। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যে শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে তাই হল সিন্থেসিস। এইভাবে মার্কস জগতের অগ্রসরতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শর্তগুলি

হল একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় থেকে আরেকটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ে রূপান্তর যার সবশেষে পরিণতি হল ধনতন্ত্রের অবসান এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মার্কস্ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য যুক্তি থেকেই পরিবর্তন আসবে। এর ফলে মার্কসবাদীর তাদের কর্মপন্থার সাফল্যের ওপর গভীর বিশ্বাস আয়ত্ত করেছিলেন। সাম্যবাদীদের মধ্যে অসাধারণ বিশ্বাস জাগরণের ফলে Communist বা সাম্যবাদী কর্মপন্থা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। এই অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বে কোন কোন সময়ে অনেক বেশি উদারনৈতিক মতের প্রভাব দেখা যায়।

মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণে সবচেয়ে গুরুত্ব লাভ করেছে অর্থনীতি। তাঁর মতবাদের অন্যতম প্রধান সূত্র হল উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র। এই সূত্রানুসারে কোন বস্তুর প্রকৃত মূল্য হল এর পশ্চাতে নিয়োজিত শ্রমের ফল। কিন্তু শ্রমের অধিক গুরুত্ব সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতি মালিক শ্রেণীর কাছে গুরুত্বহীন এবং অত্যন্ত অসহায়। শ্রমিকশ্রেণী মূলধনী শ্রেণীর কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করা সত্ত্বেও তাদের কপালে অতি সামান্য মজুরি জোটে। কিন্তু দিন-রাত্রি খেটে তারা যে সামান্য মজুরি পায় তার তুলনায় তারা তাদের পুঁজিপতি মালিককে অনেক বেশি দেয় অধিকতর উৎপাদনে মধ্য দিয়ে। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকরা সৃষ্টি করেছে তা কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়া পুঁজিপতিশ্রেণী লাগামছাড়া মুনাফা অর্জন করছে। সুতরাং মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে একমাত্র শ্রমের মাপকাঠিতেই আয়ের বন্টন হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী থেকে যে অর্থ আসে তার উপায় একমাত্র তাদেরই অধিকার থাকা উচিত।

মার্কস তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণে পশ্চিম ইউরোপের তিনটি প্রধান দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। এই দেশগুলি হল—ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানী। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক সূত্র গ্রহণ করেছিলেন ইংলন্ডের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুধাবন করে। ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ইতিহাস ও রাজনীতির আমূল পরিবর্তন তাঁকে শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বের গ্রহণে ও বিশ্লেষণে সাহায্য করেছিল। আর জার্মানীর দার্শনিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর সার্বিক দার্শনিক তত্ত্বটি গ্রহণ করেছিলেন। অতএব মার্কসীয় চিন্তাধারায় ত্রিবিধ উপাদাগুলির সংমিশ্রণতার লক্ষণ বজায় আছে। এগুলি হল —ইংরেজ অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং প্রয়োগ; ফ্রান্সের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জার্মানীর দার্শনিক তত্ত্ব । মার্কসের দার্শনিক তত্ত্ব যেমনই ছিল সমৃদ্ধশালী, ঠিক তেমনই ছিল বিশ্বে প্রভাস শালী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উনিশ শতকে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা এবং আন্দোলন মার্কসীয় তত্ত্ব ও ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এবং এঙ্গেলসের সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের সংগঠন 'Communist League' ('কমিউনিস্ট লীগ') প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে)। এর স্লোগান ছিল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ('Workers of the World unite) এই সংস্থার লক্ষ্য ও কর্মসূচী মার্কস ও এঙ্গেলস্ রচনা করেছিলেন। 'বিজ্ঞানসম্মত' 'সমাজতন্ত্রবাদ' বা সাম্যবাদের মূলনীতি, শ্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচী, লক্ষ্য ওলক্ষ্যে পৌঁছাবার পন্থা ইত্যাদি কৌশল মার্কস এই সময় নির্দেশিত করেন। তাঁর চেষ্টায়ই সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলন একটি অভিন্ন দারায় এই সময় থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। মার্কসবাদীর সমাজতন্ত্রের মূল সোপান ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism)। আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল বক্তব্য হল, 'সর্বহারাদের কোন পিতৃভূমি নেই'। তাই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সর্বহারা সংগ্রাম হল, 'সর্বহারাদের কোন পিতৃভূমি নেই।' তাই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী

ঐক্যবদ্ধ সর্বহারা সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন। মার্কসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল লন্ডনে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে সেপ্টেম্বর 'প্রথম আন্তর্জাতিক' (First International) । এর ফলে বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আন্দোলন সহায়তা করার ক্ষেত্রেও 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর 'আন্তর্জাতিক' কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এঙ্গেলস্। তিনিই ছিলেন 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' প্রাণপুরুষ। কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস ইউরোপের সমাজতন্ত্রকে একটি প্রাণবন্ত গতিময় আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন।

প্রশ্ন

১। কার্ল মার্কসের লেখা একটি বইয়ের নাম লেখ?

২। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বাস্তুবাদ তত্ত্বটি কি?

৪.১.২.১০ ঃ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার

ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল। প্রাক্ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীতে ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলন করেছিল। ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন (১৮৩৬-৪৮), ফ্রান্সে 'সোস্যাল ডেমোক্রেসি'র আন্দোলন শুধু প্রবল হয়েই উঠেনি, সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পথও প্রস্তুত করেছিল। ফ্রান্সে এর সূত্র ধরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। তবে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব খুব একটা সাফল্য না পাওয়ায় কিছুকালের জন্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছিল। তবে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপে আবার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে।

১৮৭১খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্যারী কমিউনের অভ্যুত্থান সমাজতন্ত্রবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই অভ্যুত্থানের পেছনে সমাজতন্ত্রীদের এক সক্রিয় ভূমিকা আছে বলে ফরাসী সরকার মনে করে। এ কারণে ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার রোধ করার জন্য সরকার সমাজতন্ত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার নিপীড়ন শুরু করে। এর ফলে বহু সমাজতন্ত্রী দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এই কারণে বেশ কিছুকাল শ্রমিক আন্দোলন বা সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের প্রচেষ্টা নির্বাসিত বা দেশত্যাগী ফরাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের পর ফ্রান্স দ্রুত শিল্পায়নের অগ্রসরতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পোন্নয়নের হাতে ধরে সমাজতন্ত্রবাদও আবার ফ্রান্সে নতুনভাবে প্রসারলাভ কবে ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে দুই সমাজতন্ত্রী জুলেস গুয়েসেডে (Jules Guesede) এবং পল লাফার্গ (Paul Lafargue) মার্কসীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ওয়াকার্স পার্টি গঠন করে। কিন্তু এ সময়ে আরও নানা অ-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক সংগঠনও ফ্রান্সে গড়ে উঠতে থাকে। এদের মধ্যে নানা প্রশ্নে ভিজন, দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্রান্সে দুর্বল করে তুলেছিল।

ইংলন্ডে ঊনিশ শতকের শেষদিকে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বিরোধী এবং ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অনুসারী ফেবীয় সমাজতন্ত্র প্রচলিত হয়। এঁরা ইংলন্ডে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এঁরা বিপ্লব বিরোধী ছিল এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রবাদ আনতে চেয়েছিলেন। সে কারণে এই মতবাদ 'সামাজিক ডারউইনবাদ' নামে অভিহিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেবীয়দের একটি রাজনৈতিক দল গতি এবং Independent Labour Party' গঠিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইংল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এই সময় শ্রমিকরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত 'লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয় ফেবীয় দল ও 'Independent Labour' দলের সমাজতন্ত্রীরা। পরে 'লেবার পার্টি' লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করলেও মার্কসীয় তত্ত্বকে স্বীকৃতি জানায়নি।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসারলাভ করেছিল ঊনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের সূচনায়। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের স্বৈরাচারে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসারের নানাভাবে বাধা আসে। তবু শিল্পোন্নয়নের ফলে ঊনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে সেখানে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। রুশ মার্কসবাদের জনক প্লেখাকনভ 'Emancipation of Labour' নামে একটি মার্কসীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। এই দলের বহু তরুণ সদস্য ছিলেন। এই তরুণদের নেতা ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' স্থাপিত হয়। এই দল পরে 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক' — এই দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে। এইভাবে বলশেভিক দলের ক্ষমতায় আসার ফলে রাশিয়ার মংত বিশ্বের একটি বিশাল দেশে লেনিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

ঊনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের সূচনায় জার্মানীতে একটি শক্তিশালী গণভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এর পাশ্চাতে কারণ ছিল একদিকে ১৮৭০ এর দশক থেকে জার্মানীতে শিল্পোন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ১৮৯০ সাল নাগাদ সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দল — 'German Social Democratic Party'র গঠন। এর ফলে ঊনিশ শতকের শেষের দশকে জার্মানীতে পৃথিবীর বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ঘটে। এই দলের ছিল একটি সুসংহত তত্ত্ব; বাস্তব আন্দোলনের ঐতিহ্য, সুদক্ষ নেতৃত্ব এব ব্যাপক গণ-সমর্থন। এই দলের তত্ত্ব মার্কস্ এবং এঙ্গেলসেনর মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ফার্ডিনান্ড লাসালের নেতৃত্বে এই দল অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং তাঁরই চেষ্টায় শুধু এই দল শক্তিশালী হয়ে উঠেনি; আইনসভার বাহ্যির এবং ভিতরে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। এদিক দিয়ে দেখলে লাসালকেই প্রকৃত বিচারে জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবর্তক এবং 'Social Democratic party'-র আন্দোলনের ঐতিহ্যের সৃষ্টিকর্তা বলা যেতে পারে।

তবে লাসাল ও তার সমর্থক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জাতীয়তাবাদী। তাঁর জাতয় সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে কার্ল কট্স্কি, লাইবনেক্ট্ ও বেবেল প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিকদের ও তাদের অনুগামীদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক ছিল। এঁরা আন্তর্জাতিকতায় আস্থাশীল ছিলেন। এর ফলে জার্মানীর সমাজতন্ত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দল দুটি বহু দ্বন্দ্বের পর গোথাতে মিলিত হয়ে একটি আপসমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে 'Socialist Workingment's Party of Germany' ('সোসালিস্ট ওয়ার্কিংমেনস্ পার্টি অফ্ জার্মানী') নামে একটি অভিন্ন সমাজবাদী দল গঠন করে। এই গোথা সম্মেলন মার্কস নির্দেশিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের

নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁদের কর্মসূচী মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্বকে গ্রহণ করেনি। এই নতুন দল পার্লামেন্টীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলে শক্তি নিয়োজিত করে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী পরিহার করে।

১৮৭০ এর দশকে জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বেশ শক্তিশালী ও গতিময় হয়ে উঠে। গণসমর্থনও এই সময় বেশ মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পেছনে কারণ হল — সমগ্র জার্মানীতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, শহরে শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ। এই দলের ক্ষমতাবৃদ্ধির আশঙ্কিত হয়ে বিসমার্ক এদের প্রভাব হ্রাসের জন্য দমননীতি অনুসরণ করেন এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী কতকগুলি আইন প্রবর্তন করেন। তাছাড়া বিসমার্ক শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করার জন্য শ্রমিক কল্যাণমূলক কিছু কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। এগুলি হল-অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও অক্ষমতয়ার জন্য বীমা আইন প্রণয়ন। এভাবে রাষ্ট্রের উদ্যোগে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। কিন্তু তাতেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করা গেল না। সোস্যাল ডেমোক্রেটদের অনুগামীদের সংখ্যা স্ফীত হয়ে উঠে।

১৮৯০ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সিংহাসনে আরোহণের পর উইলিয়াম ও বিসমার্কের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিরোধী আইন-কানুনের পুনর্নবীকরণের প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিলে সমাজতান্ত্রিকগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নতুনভাবে রাজনৈচিতক কার্যকলাপ প্রকাশ্যে শুরু করেন। সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন-কানুন নবীকরণ না হওয়ায় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিকগণ কার্ল কট্স্কির (Karl Kautsky) নেতৃত্বে আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। এই তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন এঙ্গেলস এর অনুগামী ও মার্কসীয় তত্ত্বের গোঁড়া প্রবক্তা। তাঁর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই ১৮৯০ সালের পর 'Social Democratic Party-র কর্মসূচী গড়ে উঠে। এই কর্মসূচী মার্কসীয় তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি গ্রহণ করেছিল। এই কর্মসূচী গোথা (Gotha) কর্মসূচী থেকে এ কারণে পৃথক যে, এটি ছিল বহুলাংশে মার্কসীয় দৃষ্টিভাবাপন্ন। এর ফলে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে 'Social Democratic Party' একটি সুসংহত দল হিসেবে তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীকে রূপ দেওয়ার কাজে অগ্রসর হয়। শীঘ্রই এই দল অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির আদর্শ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্বের শেষদিকে জার্মান সংসদে এই দলের সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৪ সালে জার্মানীর স্থানীয় প্রতিনিধিসভাগুলিতে এই দলের ১২০ জন সদস্য ছিল। ১৯১২ সালে ১১০ জন সদস্য নিয়ে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল জার্মান সংসদে বৃহত্তম দলের মর্যাদা লাভ করে। এই দলের সদস্য সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে ষাট লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। সমাজতান্ত্রিক পত্র-পত্রিকা এবং স্বাধীন ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন সারা জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ এই সময় Social Democratic দলের পরিষদ (Council) জার্মানীর 'ছায়া সরকার' (Shadow Government) এ পরিণত হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্রী নেতা ব্যাবেল এই সময়ে প্রভূত ক্ষমতার অধিকরী হন।

তবে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে গোঁড়া মার্কসীয় তত্ত্বের প্রাধান্য দেখা গেলেও ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের সূচনায় জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিরোধী মতবাদ গড়ে উঠতে থাকে যা সংশোধনবাদ (Revision) নামে পরিচিত। এই সংশোধনবাদের কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ জার্মানী। সংশোধনবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন। শুধু জার্মানীতেই নয়, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও মার্কসবাদের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীগত বিরোধ এবং মতানৈক্য সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে প্রবল হয়। বার্নস্টাইন ধনতন্ত্রবাদের আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীকে সমালোচনা করেন। তিনি মার্সসের তত্ত্বকে সেকেলে এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে অভিহিত করেছেন। নতুন যুগের প্রেক্ষাপটে তিনি মার্কসবাদের শোধন ও পুনর্বিবেচনা-র প্রয়োজন আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রের স্থলে কতকগুলি গণতান্ত্রিক

পদ্ধতির প্রস্তাব দেন। সংখ্যার দিক থেকে সর্বহারারা যত বেশি হবে বলে মার্কস মনে করেছিলেন, তা কিন্তু বাস্তবে হয়নি। এর ফলে সর্বহারাদের প্রাধান্য তেমন করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া সর্বহারারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতেও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বার্নস্টাইন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে, এই শ্রেণী সমাজে স্থিতিশীলতা আনতে পারবে। বার্নস্টাইন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমাজের সমন্বয়কারী হিসাবে দেখেছিলেন এবং Social Democrat এর সাফল্যের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন লাভর উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, বার্নস্টাইন মনে করতেন যে, গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ আসতে পারে। সশস্ত্র সংগ্রাম সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত পথ হওয়া উচিত নয়। তিনি মনে করতেন পুঁজিবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির অবসান ঘটিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী অবশেষে নরম মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এর কারণ তাদের রিদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন-কানুন প্রবর্তনের প্রসঙ্গে টেনে এনেছেন। এই আইনগুলি শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল ছিল। বর্নস্টাইন এইভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস্ নির্দেশিত বৈপ্লবিক পথ থেকে সরে এসেছিলেন। তিনি শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেননি; বরং ধীরে ধীরে সমাজ উন্নয়নের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সশস্ত্র বিপ্লব আশু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেও স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারে না। গণতান্ত্রিক উপায়ে, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের উত্তরণে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর সংশোধনবাদী মতবাদ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। সব দেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অনেক তরুণ ও সমাজতন্ত্রী লেখকের দ্বারা তাঁর মতবাদ সমর্থিত হয়েছিল। তবে মার্কসীয় সমালোচকদের দৃষ্টিতে এই সংশোধনবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের বিকাশর একটি নতুন স্তরের ফলমাত্র। বস্তুতঃ দেখা গেছিল যে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতেই সংশোধনবাদ শক্তিশালী হয়েছিল।

তবে জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এ কথা সত্যি যে জার্মানীতে 'Social Democratic Party' শ্রমিক শ্রেণীর সর্ববৃহৎ সংগঠনরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রমিক এবং সমবায় আন্দোলনের উপর পভাব লাভের মধ্যে দিয়ে এই দল শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ঘটাতেও যথেষ্ট সফল হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারেও এই দল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিল। 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি এই দলের অসামান্য প্রচেষ্টায় সমগ্র জার্মানীতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল

৪.১.২.১১ ঃ জাতীয়তাবাদ শব্দের সংজ্ঞা

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণের পূর্বে 'জাতি' (Nation) কথাটির সঙ্গে পরিচিত প্রয়োজন। কারণ জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং জাতিরাষ্ট্র-এই সব শব্দগুলি একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। সারা বিশ্বে রাজনৈতিক সচেতনার যুগে 'Nation' বা 'জাতি' শব্দের গুরুত্ব বৃদ্ধি লাভ করেছে। সাধারণভাবে জাতি বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বসবাসকারী ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। তবে জাতি শব্দটি এই অর্থে শুধুমাত্র ব্যবহার করলে জাতিত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাবে। জাতি গঠনে বেশ কিছু উপাদান থাকে যা জাতিত্বের শর্তের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচ্য। ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রভৃতি বহু উপাদানই জাতি গঠনে সহায়তা করে। বাংলায় বহু অর্থে 'জাতি' কথাটি ব্যবহৃত হলেও 'জাতি' শব্দটিই 'Nation' এর পারিভাষিক অর্থরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন — জাতিসংঘ, (United Nation), ভারতীয় জাতি, জার্মান জাতি ইত্যাদি। রেনানের মতে, জাতি হল এক আত্মিক ও

সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ জনসম্প্রদায়। রেনান জাতিত্বের দুটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় জনগোষঠীর সনাতন ঐতিহ্য ও তার পরম্পরা এবং প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়ে টিঁকে থাকবার জন্য ঐক্যের অদম্য ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কতকগুলি মানসিক গুণ একটি জনগোষ্ঠীকে একক জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সক্ষম করে। এইসব গুণগুলি হল — সমমানসিকতা, সহমর্মিতা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন।

রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত একটি জাতি হল জাতীয়তাবাদের ধারক। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী কোন জনসমষ্টি যদি তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয় এবং ভাষা, ধর্মের দিক থেকে অভিন্ন থকে এবং নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূলগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তবেই তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হয়। উক্ত জনসমষ্টির মনে যে জাতিগত চেতনা বর্তমান থাকে তার থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদ। তবে সর্বক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সর্ববিধ শর্ত নাও থাকতে পারে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে ঐক্যবোধ থাকা একান্ত আবশ্যক; তা না হলে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে না। আধুনিক বিশ্বে জাতিত্বের নিরিখেই রাষ্ট্রের বৈধতা, শক্তি ঠিক করা হয়ে থাকে।

৪.১.২.১২ ঃ জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান

এই জাতিত্বের (Nationhood) কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ অখণ্ড ভূখণ্ড; ভাষাগত ঐক্য, সাহিত্যগত; প্রথাগত বৈশিষ্ট্য; সাধরণ সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান; রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা, প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিয়হ্যের প্রতি আস্থা; একই রাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য; সাধারণ মূল্যবোধ; জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষে কাজ, জাতীয় নীতির সাফল্য কামনা, বিদেশি শত্রুর প্রতি বৈরী মনোভাব ইত্যাদি।

এই উপাদনগুলির সবকটিরই যে থাকার প্রয়োজন আছে তা নয়। আংশিকভাবে থাকলেই জাতিত্বের শর্তগুলি পূরণ করা সম্ভব। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ধর্মের ও রাজ্যসীমানার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশের জনগণের মধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতয় চেতনা বা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্রিটিশ শাসনাধীন পরাধীন ভারতের কথা তুলে ধরা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ধর্মীয়, ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও ভারতের জনগণের মনে অখণ্ড ভারত চেতনা বা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠে। ভাষাগত, ধর্মগত, কৃষ্টিগত, প্রথাগত বিভিন্নতা ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। ইউরোপেও বিভিন্ন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল।

৪.১.২.১৩ ঃ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তার পূর্বে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় 'জাতি' 'Nation) শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। মধ্যযুগের জাতীয়তাবাদ ছিল 'সর্বজনীন' (Universal)। ঐতিহ্যবাদীরা (Traditionals) যেমন অ্যান্থনি স্মিথ এবং গটফ্রিড হারডার প্রমুখেরা জাতিত্বকে আবহকালীন ও সার্বজনীন বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। প্রকৃত রাজনৈতিক গুরুত্বসহ জাতীয়তাবাদী ধারার উদ্ভব ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ধরা যেতে পারে। ম্যাকিয়াভেলি বা জাঁ বোঁদা-র রচনায় 'জাতি' কথাটির

উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিরিশ বছরের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ডাচ পণ্ডিত হুগো গ্রোটিয়াসও জাতিরাষ্ট্রের কথা বলেননি। এমন কি এই যুদ্ধ শেষে যে 'ওয়েস্টফ্যালীয় চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছিল তাতেও জাতিরাষ্ট্রের কোন আভাস পাওয়া যায় না। রেনেসাঁসের পর জাতীয়তাবাদের কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ধারণা এই জাতীয়তাবোধকে খর্ব করতে থকে। ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement) এর মুক্ত জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলি 'Counter Reformation' এর সামাজিক দ্বন্দ্বের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

আধুনিকতাবাদীরা (Modernist) যেমন এন্টনি গিডেন্স (Anthony Giddens), এরিক হবস্‌বম্‌ (Eric Hobsbawm). বেনেদিক্ট অ্যান্ডারসন (Benedict Anderson) প্রমুখরা সকলেই সহমত পোষণ করেন যে, পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্রবাদ, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী জতীয় চেতনার উন্মেষে ও জাতিরাষ্ট্রের গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। কোথাও ধর্ম, কোথাও ভাষা, আবার কোথাও এক অখণ্ড ভূখণ্ডের অধিকার থেকে ঐক্যবোধ সাহিত্যগত, সংস্কৃতিগত ও ঐতিহাসিক স্মৃতির ঐতিহ্য এই জাতিরাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ধর্মসংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী ইউরোপে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে ধর্মের ভূমিকাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। ঐ সময়কার বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনগুলি এ ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখে। এগুলি হল বোহেমিয়ার হাসীয় (Hussite) আন্দোলন, জার্মানীর লুথারীয় সংস্কার আন্দোলন, ইংল্যাণ্ডের হেনরীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং ফ্রান্সের ক্যালভিনবাদের ধর্মীয় আন্দোলন। এইসব ধর্মীয় আন্দোলন আঠারো ঊনিশ শতকের জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল। আবা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভাষা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সতেরো শতকের পূর্বেই ফরাসী রাজা চতুর্থ হেনরি লিয়ঁ-র তাঁর অভিজাতদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আপনারা ফরাসী বলেন, সুতরাং আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। স্প্যানিশভাষীরা স্পেনে থাকবে, জার্মানরা জার্মানীতে।'' অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লবের সময় প্যারিসের স্বীকৃত সাহিত্য ভাষাকেই ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, ফ্রান্সের বিভিন্ন উপভাষা তাদের কাছে 'সামন্ত সমাজের উচ্ছিষ্ট' বলে বর্জিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের জাতীয়তাবাদ ছিল 'সর্বজনীন' ঐতিহ্যবাদীরা যেমন অ্যান্থনি স্মিথ এবং গটফ্রিড হারডার প্রমুখেরা জাতিত্বকে আবহকালীন ও সর্বজনীন বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক গুরুত্বসহ জাতীয়তাবাদী ধারার উদ্ভব ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ধরা যেতে পারে।

প্রশ্ন ১। জাতীয়তাবাদের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল?

৪.১.২.১৪ ঃ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ

জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ভাষার গুরুত্বের কথা বলতে ভোলেননি ইতালীর যুব নেতা ম্যাৎসিনি। তাঁর কাছে, ''নেশন হলো সমভাষাভাষী নাগরিকদের জগৎ''।

কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস্ প্রাথমিক পর্যায়ে সাধার অর্থে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের উপরই জোর দিয়েছিলেন। জাতিত্ব বা জাতিতত্ত্ব তাঁদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। তবে একথাও সত্যি যে, তাঁরা এটা অবস্যই উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতীয় পরিবেশ ও ঐতিহ্য শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠবার এবং শ্রেণী সংঘর্ষের এক অনস্বীকার্য অঙগ। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ অনেক সময় 'জাতি' (Nation) ও 'সমাজ' (Society)। এই শব্দ দু'টি 'শিভিল সোসাইটি' (Civil Society) অর্থে ব্যবহার করেছেন। মার্কসের মতে, ধনতন্ত্রবাদের স্বার্থসাধন নিয়ে শ্রেণীসংঘর্ষের সূচনা হয় সিভিল সোসাইটিতে। রাষ্ট্র সে ক্ষেত্রে প্রভাবশালী শ্রেণীটিরই রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে থাকে এবং তার পররাষ্ট্রনীতিও ঐ প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হয়। জাতীয় চরিত্র প্রসঙ্গ মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় অনেক সময়েই এসে গেলেও তাঁরা 'জাতীয়তাবাদ' অপেক্ষা সামাজিক শ্রেণীসম্পর্ক বিষয়েই অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের মতে, অনেক জাতিই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। দ্রুত শিল্পায়নের পরিণতি হিসেবেই তা ঘটে থাকে। কিন্তু সব সভ্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও একীভূত করা হল মার্কসীয় সর্বহারা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য।

*'শ্রমজীবি মানুষের কোন দেশ নেই, শ্রমজীবি মানুষের কোন জাতি নেই, তারা শমগ্র শ্রমজীবি শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত — এই তাদের মূল পরিচয়।' **'Workers of the world unite'** এই ছিল তাঁদের শ্লোগান। গোড়ার দিকে মার্কসীয় চিন্তাবিদ্‌রা জাতীয়তাবাদের ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সর্বহারা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।*

তাঁরা উভয়েই একথাও মনে করতেন যে, বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণীর সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবোধ পরিহার করে চলা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে 'The Communist Manifesto' এর বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'শ্রমজীবী মানুষের কোন দেশ নেই, শ্রমজীবী মানুষের কোন জাতি নেই, তারা সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত—এই তাদের মূল পরিচয়।' 'Workers of the world unite' এই ছিল তাঁদের শ্লোগান। গোড়ার দিকের মার্কসীয় চিন্তাবিদরা জাতীয়তাবাদের ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সর্বহারা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মার্কসীয় চিন্তাবিদদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটান, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ অষ্ট্রো মার্কসীয় চিন্তাবিদগণ ও লেখকগণ মনে করতেন যে সর্বহারাশ্রেণীর বিকাশের স্বার্থেই জাতি, জাতিত্বের ও জাতীয়তাবাদের একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লেনিন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হলেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব বজায় ছিল। তিনি রাশিয়ার জাতীয় সমস্যা এবং অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে এক দৃঢ় সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। পোল্যাণ্ডের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে লেনিনের অভিমত ছিল যে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে না নেওয়া হলে সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। লেনিনের মতে, সমাজতন্ত্রের লক্ষণ হল সব জাতি ও ব্যক্তিকে একই পরিবারের ঐক্যে আবদ্ধ করা। কিন্তু এটি বাস্তবায়িত করতে হলে প্রত্যেককে তার নিজস্ব মত ও পথ অনুযায়ী চলতে দিতে হবে। তাই লেনিন এশিয়ার মুক্তিকামী আন্দোলনকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ১। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতাবাদ কি ছিল?

৪.১.২.১৫ ঃ জাতীয়তাবাদী আদর্শের বৈশিষ্ট্য

ফরহাসী বিপ্লবের বড় অবদান হল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। এই বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী জাতীয়তাবাদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। বিপ্লবের সময় থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদের উভ্যুদয় ইউরোপের ইতিহাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রও প্রসারলাভ করেছিল। নেপোলিয়নের কার্যকলাপেও ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিসমূহ জাতীয়তাবাদ ওইউরোপের দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপন্থী ছিল স্পেন ও জার্মানীতে তাঁর প্রবর্তিত প্রশাসন অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। তবে নেপোলিয়ন জার্মানীকে ৩৯টি রাষ্ট্রে ভাগ করার ফলে জার্মানীর জাতীয়তাবাদের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। একইভাবে ইতালীতেও নানা সংস্কার কার্যের মাধ্যমে তিনি সেখানকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ইতালি, জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রসারিত করে। জার্মানী ও ইতালীতে জাতীয়তাবাদ অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জার্মানী ও ইতালিতে শুল্কব্যবস্থার নতুন রূপায়ন এবং বোহেমিয়ায় বোহেমিয় শ্রমিকশ্রেণী ও জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পুষ্ট করেছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঐক্যবদ্ধ জার্মান ও ইতালি রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছিল।

৪.১.২.১৬ ঃ জাতীয়তাবাদের দোষ-ত্রুটি

জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনগণ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধনে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সক্ষম। তবে জাতীয়তাবাদ যকন সংকীর্ণ জাতিপ্রেমে পরিণত হয় তখন তার রূপ ভীষণ হয়ে উঠে। উগ্র জাতীয়তাবাদ বহুক্ষেত্রেই আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করে। তা পররাজ্য গ্রাস বা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এটি জাতীয়তাবাদের বড় দোষ। এখানে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক লালসা বড় হয়ে দেখা দেয়। এই দুই উদ্দেশ্য সফল করার দম্য বাসনা থেকেই পররাজ্য গ্রাসনীতি বা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রসারলাভ করে। উনিশ শতকের শেষে এবং কুড়ি শতকে হিটলারের সময়ে জার্মান জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের এবং পররাজ্য গ্রাসনীতির মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এর পরিণতিও হয়েছিল ভয়ঙ্কর। ফ্রান্স বরাবরই জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে 'স্বাভাবিক সীমান্তের' প্রসারণের চেষ্টা করে গেছে।

'জাতীয়তাবাদ যখন সংকীর্ণ জাতিপ্রেমে পরিণত হয় তখন তা উগ্র জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়। আবার একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে যদি আঞ্চলিক জাতিসত্তাগুলো বার বার আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে তবে সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংকট দেখা দেয়।'

জাতীয়তাবাদের আরো একটি বড় সমস্যা হল, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতিসত্তাকে ব্যবহার করে গড়ে উঠলেও, আবার জাতিসত্তার লড়াই আন্তর্জাতিক সংকট ডেকে আনে। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে যদি আঞ্চলিক জাতিসত্তাগুলো বার বার আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে তবে সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংকট দেখা দেয়। এই সংকট বড় হয়ে দেকা দেওয়ার কারণ হল সেই রাষ্ট্রে এক রূপত্বের উপর অধিক জোর দেওয়া। এর ফলে সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গ সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এবং আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হোল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ও ইতালি। জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলেও উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর

জাতিসত্তা বিরোধের কিন্তু নিষ্পত্তি হয়নি। এর বড় কারণ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া জার্মান একরূপত্বের ধারণা। ঠিক একইভবে পাইডমন্টের নেতা কাভুরের নেতৃত্বে যেভবে ইতালি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল তা উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির মধ্যে যে অর্থনৈতিক ব্যবধান ছিল তাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

প্রশ্ন ১। জাতীয়তাবাদের ত্রুটিগুলি কি কি?

কারণ উত্তর ইতালিতে ছিল শিল্পে উন্নত ধনী অধিবাসীদের বসবাস, আর দক্ষিণ ইতালিতে ছিল কৃষিজীবী, স্বল্প উন্নত দরিদ্র অধিবাসীদের বসবাস। ইতালির রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল আসলে শিল্পোন্নত উত্তর ইতালির হাতে অনুন্নত দক্ষিণ ইতালির রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ। এর ফলে জাতীয় ঐক্য বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় তার অভাব ছিল।

তবে জাতীয়তাবাদ যদি সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর হিতসাধনের জন্য আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিণত হয় তবেই তার সার্থকতা। আতর্জাতিকতাবাদের গুরুত্ব জাতীয়তাবাদের চেয়েও অধিকতর। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হ্যারল্ড ল্যাস্কি (Harold Laski) মন্তব্য করেছেন, ''হয় আমরা আন্তর্জাতিকভাবে চিন্তা করতে শিখব, না হলে ধ্বংস হয়ে যাব, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

৪.১.২.১৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

(১) E. J. Hobsbawm — Nations and Nationalism Since 1970.

(২) E. J. Hobsbawm — The Age of Empire

(৩) Hugh Seton — Watson-Nationalism and Communism

(৪) William L. Langer — The Diplomacy of Imperialism

(৫) Anthony Giddens — Nation State and Violence

(৬) অলক কুমার ঘোষ — আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৪)

(৭) নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা

(৮) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

(৯) David Thomson — Europe Since Napolean
(বঙ্গানুবাদ — দীপক মুখোপাধ্যায়)

৪.১.২.১৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্ন

(১) ইউরোপে উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য ও প্রেসার আলোচনা কর।

(২) উদারতন্ত্রবাদের সঙ্গ গণতন্ত্রের সংযোগের ভাল-মন্দ বিচার কর। উদারতন্ত্রবাদের সীমাবদ্ধতা কি?

(৩) 'সমাজতন্ত্রবাদ' বলতে কি বোঝ? এর উদ্ভব আলোচনা কর।

(৪) সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি কি?

(৫) আদি সমাজতন্ত্রী কারা? তাদের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মতাদর্শ ব্যাখ্যা কর।

(৬) কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং এর প্রভাব আলোচনা কর।

(৭) ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা ও প্রসার আলোচনা কর।

(৮) জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা কর।

(৯) জাতীয়তাবাদ কথাটির অর্থ কি? জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(১০) জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

(১১) জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতাদর্শ আলোচনা কর।

(১২) জাতীয়তাবাদের অবদান ও সীমাবদ্ধতা কি কি?

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক -৩

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী শান্তি সম্মেলন

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.২.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.২.৩.১ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব

৪.২.৩.২ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি

৪.২.৩.৩ ঃ শান্তি চুক্তি এবং এর সুদূর প্রসারী ফলাফল

৪.২.৩.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.২.৩.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.২.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি

(৩) প্যারিসের শান্তি সম্মেলন

(৪) ভার্সাই শান্তিচুক্তির শর্তাবলী ও জার্মানীর প্রতিক্রিয়া

(৫) ভার্সাই শান্তিচুক্তির সুদূর প্রসারী ফলাফল

(৬) ঐতিহাসিক তর্ক-বিতর্ক

৪.২.৩.১ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব

১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এবং ১৯১৮ খ্রী ১১ই নভেম্বর জার্মানী যুদ্ধ বিরতি করা পর্যন্ত যুদ্ধের ধারা অব্যাহত ছিল। ভৌগোলিক ব্যাপ্তির দিক থেকে এই যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিধা লাভ করেছে। এত ব্যাপক, ভয়াবহ ও সর্বাত্মক যুদ্ধ আগে হয় নি। পরিণতির দিক থেকেও এই যুদ্ধের সর্বব্যাপী চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল।

১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে যে যুদ্ধের সূচনা হয়, ভৌগোলিক ব্যাপ্তির দিক থেকে তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি কত সালে হয়েছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে প্রয়োজন বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সারা ইউরোপ জুড়ে যে প্রবল সংঘাত ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তার উৎস অনুসন্ধান ও স্বরূপ বিশ্লেষণ। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি। বলা যেতে পারে, ইউরোপের সংকটজনক ঘটনাগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

১৮৭১ খ্রীঃ এর পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইউরোপে যে সংঘাত ও উত্তেজনা ছিল, তাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রসার ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ। ইউরোপে জাতীয়বাদের উদ্ভব ও পরিণতি বা পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ১৮১৫ খ্রীঃ ১৮৭১ খ্রী-এর মধ্যে। ১৮৭১ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ইটালী ওজার্মানী। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ সফল হয়িন। জাতীয়তাবাদ তখনও ছিল একটি আদর্শ ও অনুপ্রেরণা, যা ইউরোপের বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদের চরম বিকাশ ইউরোপের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করেছিল। দেশভেদে ও অঞ্চলভেদে জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন এবং সংঘাত ও উত্তেজনার বীজ এখানেই নিহিত ছিল। ভিন্ন এবং সংঘাত ও উত্তেজনার বীজ এখানেই নিহিত ছিল। ইউরোপে এই সময় কিছু দেশ ছিল যারা তাদের জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতায় পরিতৃপ্ত ছিল এবং তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে উদ্‌গ্রীব ছিল। ইংল্যান্ড ও বিসমার্কের জার্মানী ছিল এই দলভুক্ত। জাতীয় রাষ্ট্ররূপে ইংল্যাণ্ডের আবির্ভাব ঘটেছিল অনেক আগে এবং ইউরোপীয় ভূখন্ডে কোন অংশের প্রতি তার দাবী ছিল না। ঐক্যবদ্ধ করার পর বিসমার্ক জার্মানীকে একটি 'তৃপ্ত দেশ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ছিল, যারা ছিল ক্ষুব্ধ ওঅসন্তুষ্ট। তাদের জাতীয়তাবাদ ছিল অপূর্ণ। তবে দেশভেদে এই অতৃপ্তির প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। ইউরোপের কোন অংশের প্রতি ফ্রান্সের লোভ ছিল না কিন্তু প্রাশিয়ার কাছে আলসেস্-লোরেন হারানোর ব্যথা সে ভুলতে পারে নি। এই দুই অঞ্চল পুন রাধিকার করতে সে বদ্ধ পরিকর ছিল। তার এই মনোভাব ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে তীব্র বিরোধ ও তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। আবার ১৮৭১ খ্রীঃ ইটালী একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও সম্পূর্ণভাবে সে খুশী বা তৃপ্ত হয়নি। তার মনে হয়েছিল আড্রিয়াটিক সাগর তীরবর্তী অঞ্চল ন্যায্যত তার প্রাপ্য। অপর একটি অতৃপ্ত রাজ্য ছিল সার্বিয়া। তার লক্ষ্য ছিল বোসনিয়া ও হার্জিগোবিনা। ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন চুক্তিতে ঐ দুই অঞ্চলের উপর অষ্ট্রিয়া শাসনের অধিকার পেলেও কার্যতঃ অঞ্চল দুটি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত হয়। অন্যদিকে আড্রিয়াটিক সাগর দিয়ে সার্বিয়ার বর্হিগমনের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার বিরোধ ও সংঘাত ছিল অনিবার্য। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস ছিল অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত। ১৮৭৮ খ্রীঃ বুলগেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বুলগার জাতীয়তাবাদীরা পূর্ব রুমেলিয়ার বিচ্ছিন্নতা অন্তর থেকে মেনে নেয় নি। সিলিষ্ট্রিয়া (Silistria) না পাওয়ার রুমানিয়া ক্ষুব্ধ ছিল। রুমানিয়ার ক্ষোভের অপর কারণ হল রাশিয়া কর্তৃক বেসারাবিয়া অধিকার। ম্যাসিডোনিয়াকে কেন্দ্র করে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীসের মধ্যে বিরোধ ছিল। বুলগেরিয়া ম্যসিডোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিল। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্তশাসনের সূত্র ধরে ম্যাসিডোনিয়া গ্রাস। অন্যদিকে গ্রীস ও সার্বিয়া উভয়েই ম্যাসিডোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিল। তারা ম্যাসিডোনিয়ার ব্যবচ্ছেদ চেয়েছিল। গ্রীসের ক্ষুব্ধ হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্ক গ্রীসকে থেসালী ও এরিয়াসের একটি অংশ দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীঃ

ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও পরিণতি বা পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ১৮১৫খ্রীঃ থেকে ১৮১৭ খ্রীঃ এর মধ্যে। ১৮৭১ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ইটালী ও জার্মানী। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ সফল হয়নি।

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে গ্রীস পরাজিত হয় এবং গ্রীসের অর্ন্তভূক্ত থেসালী অংশটি সে তুরস্ককে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। থেসালী পুনরধিকার এ ক্রীট পাওয়ার জন্য গ্রীস ব্যাকুল ছিল। বলকান অঞ্চলে অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও স্বার্থের সংঘাত এবং সেই সঙ্গে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দিতা এই অঞ্চলে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন তিনটি জাতি —পোল, চেক ও সার্বোক্রোট—সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব ছিল। ইটালীর জনগণ যেমন পিডমন্টকে কেন্দ্র করে তাদের জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করেছিল, সার্বরাও তেমনই সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে সার্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল। একইভাবে বহুরাষ্ট্রিক রাজ্য রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন জাতি, যেমন লিথুয়ানিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, রুথেনিয়ান প্রভৃতি জাতীয় সংগ্রাম ও ঐক্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

প্রশ্ন

১। বার্লিন চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

২। ১৯ শতকের শেষার্ধে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রকৃতি বর্ণনা কর।

অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলি ছিল সম্প্রসারণশীল। এক অর্থে তারাও ছিল অতৃপ্ত কিন্তু তাদের অতৃপ্ততার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। তাদের জাতীয়তাবাদ ছিল অসহিষ্ণু। তারা নিজেদের প্রাপ্যটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা অন্যদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে উৎসুক ছিল। অন্যদের তারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো। জার্মানী ছিল এই ধরনের উগ্র ও অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদের বড় উদাহরণ। জার্মান লেখক ও দার্শনিকগণ তাদের রচনার মাধ্যমে জার্মান জাতীয়তাবাদের জয়গান ঘোষণা করেন এবং টিউটনিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। নিকট প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যে জার্মানী তার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে ইংরেজরা যখন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল, তখন জার্মানী তার রক্ষক হিসেবে অবতীর্ণ হলো। দ্বিতীয় উইলিয়াম ইসলামের সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে প্রাচ্যে জার্মান কর্তৃত্ব স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্য বা নিকট প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় নয়, জার্মানী এই সময় পৃথিবীর সর্বত্র নিজের শক্তি বিস্তারে উদগ্রীব ছিল। জার্মানী ছাড়া অপর একটি সম্প্রসারণশীল দেশ ছিল রাশিয়া। রাশিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন সমাবেশে গৃহীত শর্তগুলি অস্বীকার করা। তাছাড়া দূর প্রাচ্যে মাঞ্চুরিয়ার দিকেও রাশিয়ার নজর ছিল। তবে দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার এই উচ্চাকাঙ্খা বাধা পেয়েছিল জাপানের উত্থানের ফলে।

সামরিকবাদ বলতে এমন এক ভয়ংকর ও মারাত্মক নীতি বা ব্যবস্থা যা রাষ্ট্র নায়ক ও প্রশাসকদের উপরও আধিপত্য বিস্তার করতে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম।

উগ্র ও অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল সামরিকবাদ-এর। সামরিকবাদ বলতে বোঝায় এমন এক ভয়ংকর ও মারাত্মক নীতি বা ব্যবস্থা, যার প্রধান লক্ষ্য হলো এক বিশাল ও শক্তিশালী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী গোষ্ঠী, যারা বিশেষভাবে কোন এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের সময়, রাষ্ট্রনায়ক ও প্রশাসকের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম। বাহুবলের মাধ্যমে পৃথিবীকে দমন করার স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য প্রতিফলিত হয়েছে এই মতাদর্শের মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে একটা আত্মরক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। অস্ত্রসজ্জার মূল উদ্দেশ্য যেন শান্তি রক্ষা, সামরিক খাতে অর্থবরাদ্ধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার

যুক্তি দেখানো হত। ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের পরই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষভাবে জার্মানী, এইভাবে সামরিকবাদ নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী এক অশুভ অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রবণতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বিশেষভাবে ১৯১২-১৩ খ্রীঃ এর পর, যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে ওঠে। সামরিকবাদ নীতি অনুসরণ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করে। এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা ছিল জার্মানী, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার। সামরিক শক্তি বিস্তারে এই রেষারেষি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে এমন কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছিল না, যা এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রতিহত করতে বা নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করতে সক্ষম।

প্রশ্ন ১। কিভাবে সামরিকবাদের উদ্ভব ঘটেছিল?

উগ্র ও অসহিষ্ণু জাতীয়বাদের প্রসার এবং সামরিকবাদের উদ্ভবের ফলে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র নিরাপত্তার অভাব বোধ করেএবং এই অবস্থায় জোট বাঁধার কূটনীতির সূত্রপাত হয়। এই বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্ক। যুদ্ধের জন্য নয়, বরং ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যই অষ্ট্রিয়া ও ইটালীকে নিয়ে ত্রিশক্তি মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু তাঁর অনুসৃত কূটনীতির জটিলতা এবং গোপন শর্তের অস্তিত্ব ইউরোপ জুড়ে এক সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রিশক্তি আঁতাত, এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোটে বিভক্ত হয়ে যায়। বলা যেতে পারে, উভয় জোটের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক সন্দেহ ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পরিপন্থী ছিল। মনে হতে পারে, এই পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রজোট শান্তিরক্ষার সহায়ক ছিল, কারণ অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িত হওয়ার ভয়ে জোটভুক্ত একটি দেশ তার মিত্র বা চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ অপর দেশকে প্রতিপক্ষ জোটের কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। কিন্তু বিপরীত আশঙ্কাও ছিল। অর্থাৎ কোনভাবে একবার যুদ্ধ শুরু হলে, ইউরোপের প্রতিটি প্রধান রাষ্ট্রই অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হত। কোন রাজ্যের স্বার্থ সেই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে অনিচ্ছুক হলেও তাকে সেই যুদ্ধে অংশ নিতে হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন শুরু হয়, তখন এইভাবেই সেই যুদ্ধ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই অষ্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে। ১লা আগষ্ট জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, ৩রা আগষ্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৪ঠা আগষ্ট। অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তখন তা শুধুমাত্র অষ্ট্রিয়া, সার্বিয়া ও বলকান অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের সংকীর্ণ লক্ষ্যে আবদ্ধ ছিল না, এর সঙ্গে উভয় রাষ্ট্রজোটের সম্মান, সংহতি ও অস্তিত্বের প্রশ্নও জড়িত ছিল।

সামরিকবাদের উদ্ভবের ফলে সমগ্র ইউরোপ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি শিবিরে আত্মপ্রকাশ করে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পরস্পর বিরোধী দুই রাষ্ট্রজোটের অস্তিত্ব কতখানী দায়ী ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। Fay-র মতে, পরস্পরবিরোধী দুই জোটের অস্তিত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এ.জে.পি. টেলার (A.J.P. Taylor) বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন কোন পক্ষই চুক্তির শর্তগুলি পালন করে নি। জেমস্ জোল (James Joll) ফে-র বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো ১৯১৪ খ্রীঃ আগে পর্যন্ত মৈত্রী ব্যবস্থার তখনই একটি কার্যকরী ভূমিকা ছিল, যখন মৈত্রীবদ্ধ দুটি দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ এক ছিল; কিন্তু যখন তা ছিল না, তখন তা দুটি দেশের নীতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে যতক্ষণ জার্মানীর বৈরী সম্পর্ক ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্কের একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল, কিন্তু ইউরোপের বাইরে আফ্রিকায় যখন ফ্রান্স ফ্যাসোডা সংকটে জড়িয়ে পড়েছিল তখন রাশিয়া সে ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় নি। একইভাবে দূর প্রাচ্যে সংকটের সময় ফ্রান্সও রাশিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায় নি। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সম্পর্ক কখনই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। অন্যদিকে একই জোটের শরিক হলেও চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ যদি একই কেন্দ্রভূমিতে মিলিত না হত, তাহলে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হত না। ইটালীর সঙ্গে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া ত্রিশক্তি মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলেও সে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করতে সচেষ্ট হয়েছিল। রাশিয়ার জারের সঙ্গেও সে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কে ত্বরান্বিত করতে পরস্পরবিরোধী চুক্তিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন ডেভিড টমসন (David Thomson) । তাঁর মতে, একদিকে পূর্ব ইউরোপে বলকান সমস্যা ও অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ এক অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং জোটের কূটনীতি তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, ১৯১২ খ্রীঃ থেকে ১৯১৪ খ্রীঃ মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুই রাষ্ট্রজোট পরস্পরবিরোধী দুটি সশস্ত্র শিবিরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তারা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

মার্কসবাদীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী সংঘাত ও প্রতিযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেনিনের সাম্রাজ্যবারে উদ্ভব তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে, শিল্প বিপ্লবেরে চরম বিকাশের ফলে ঊনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিংশ শতকের গোড়ায় ইউরোপের পুঁজিবাদী রাজ্যগুলি একদিকে যেমন শিল্প উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের অভাব বোধ করেছিল, অন্যদিকে তেমনই উদ্বৃত্ত পণ্যের বিপননের জন্য বাজার অনুসন্ধান করছিল। এই উভয়বিধ সমস্যা সমাধানের জন্য তারা উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এশিয়া ও বিশেষভাবে আফ্রিকা মহাদেশের উপর নজর দেয়। উনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিংশ শতকের গোড়ায় উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা শুরু হয়। মিশর ও সুদানকে কেন্দ্র করে ইঙ্গ ফরাসী বিরোধ এবং কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ পরিকল্পনা সূত্র ধরে ইঙ্গ ফরাসী মন কষাকষি ছিল, তেমনই দক্ষিণ আফ্রিকায় ইঙ্গ-জার্মান দ্বন্দ, টিউনিসিয়ায় ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালীর দ্বন্দ বা মরোক্কোয় ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে দ্বন্দ ছিল। মার্কসবাদীরা উপনিবেশ নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দিতার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎস অনুসন্ধান করেছেন।

প্রশ্ন

১। বিসমার্ক কে ছিলেন?

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে সাম্রজ্যবাদের ভূমিকা সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। ঔপনিবেশিক দ্বন্দ ও প্রতিদ্বন্দিতা ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষের সৃষ্টি করলেও ঔপনিবেশিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল সেরাজিভো হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে, যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সমস্যা জড়িত ছিল না। অর্থাৎ আফ্রিকা বা এশিয়ার কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়, ইউরোপের সমস্যাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এছাড়া ঔপনিবেশিক প্রশ্ন ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যেসব বিরোধ দেখা দিয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই সেগুলির নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। কঙ্গোকে কেন্দ্র করে যে বিরোধে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ইংল্যান্ড, জার্মানী ও পর্তুগাল জড়িয়ে পড়েছিল, ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত বার্লিন সমাবেশে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীঃ কঙ্গোর উপর বেলজিয়ামের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রীঃ ভেনেজুয়েলাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটে গিয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে বুয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিরোধ, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ফ্যাসোডার ঘটনা, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মরোক্কোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ইত্যাদি ঔপনিবেশিক দ্বন্দ তীব্র তিক্ততা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই তা মিটে গিয়েছিল। ডেভিড টমসনের সুচিন্তিত মন্তব্য হল—'Diplomatically, colonial collisions were always disturbing, but they were certainly not decisive in making the situation that precipitated war between the rival alliances in 1914. There is strong evidence that all the most important colonial disputes had been settled before 1914'.

তবে ইউরোপে রাষ্ট্রজোট গঠনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯০৪ খ্রীঃ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আঁতাত ও ১৯০৭ খ্রীঃ ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপন তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছিল। আবার এও ঠিক যে, ঔপনিবেশিক দ্বন্দ মৈত্রী স্থাপনের পূর্ব শর্ত হলে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ওফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীর পরিবর্তে ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠত। আবার সাম্রাজ্যবাদকে মূলধন করে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। ফ্রান্স যাতে আলসেস-লোরেন হারানোর ব্যথা কিছুটা ভুলতে পারে, তার জন্য বিসমার্ক ফ্রান্সকে উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। তাই ইউরোপের কূটনৈতিক পুনর্বিন্যাসে সাম্রাজ্যবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ঔপনিবেশিক দ্বন্দ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে প্রায়শই সংঘাত সৃষ্টি করলেও ঔপনিবেশিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়নি।

১৯১৪ খ্রীঃ সেরাজিভো হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হলেও বিগত প্রায় দশ বছর ধরেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল ও উত্তেজক ছিল এবং একের পর এক সংকট শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হলেও তৃতীয় পক্ষ বা গোষ্ঠী এই সব সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল এবং ইউরোপ ক্রমশঃ পরস্পরবিরোধী দুই শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এইসব সংকটের উৎসভূমি ছিল বলকান অঞ্চল ও আফ্রিকা। বলকান সমস্যার সঙ্গে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকলেও আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপের তিনটি প্রধান রাষ্ট্র-ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী বিভিন্ন সংকটের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেরাজিভো হত্যাকাণ্ডের আগে যে সব সংকট দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটি শেষ পর্যন্ত মিটে গিয়েছিল কিন্তু সেইসব সংকট কাটাতে গিয়ে ইউরোপের কোন না কোন বৃহৎ দেশের মর্যাদায় আঘাত পড়েছিল।

১০৫-০ খ্রীঃ ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মরক্কোকে কেন্দ্র করে বিরোধের মধ্যে দিয়ে সংকটের সূচনা হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ আলজেসিকার্সে আয়োজিত এক সমাবেশে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সমর্থন করায় কাইজার দ্বিতীয় ইউলিয়াম মরক্কোর উপর ফ্রান্সের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯১১ খ্রীঃ মরক্কো সংকট আবার জটিলাকার ধারণ করে। ঐ বছর জার্মানী মরক্কোর আগাদির বন্দরে প্যান্থার নামে এক রণতরী প্রেরণ করে, যার আপাত উদ্দেশ্য ছিল মরক্কোর অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের হাত থেকে জার্মানবাসীকে রক্ষা করা; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মরক্কোয় ফ্রান্সের অধিকার স্বীকৃতির বিনিময়ে তার কাছ থেকে আফ্রিকার অন্য কোন অঞ্চল অধিকার করা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সহযোগিতার ফলে জার্মানী পিছু ভটতে বাধ্য হয়। মরক্কোকে কেন্দ্র করে পরপর দু'বার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলেও, তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। তবে উভয় ক্ষেত্রেই জার্মানীর পরাজয় হয়েছিল এবং ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল?

২। বিসমার্ক ফ্রান্সকে উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন কেন?

১৯০৮ খ্রীঃ তরুণ তুর্কীরা তুরস্কে ক্ষমতা দখল করার পর বলকান অঞ্চলে সংকট সূচিত হয়। তারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের গৌরব ও ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হলে অস্ট্রিয়া, বোসনিয়া ও হার্জিগোবিনা অধিকার করে নেয়। অস্ট্রিয়ার এই আগ্রাসী নীতি বার্লিন সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হলেও রাশিয়া প্রথম তার বিরোধিতা করেনি, কারণ সে আশা করেছিল যে, এর বিনিময়ে অস্ট্রিয়া দার্দানেলিস্ ও বসফেরাস প্রণালী দিয়ে রুশ রণতরী চলাচলের অধিকার সমর্থন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা না ঘটায় রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ আহ্বান করার জন্য তৎপর হয়। কিন্তু জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করায় রাশিয়া পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এর ফলে রাশিয়ার মর্যাদা হ্রাস পায়, উল্লেখ্য যে, ১৯০৮-০৯ সালে রোসনিয়া সংকটে একথা স্পষ্ট হয় যে, বলকান অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যে কোন সময় বিরোধ এক আন্তর্জাতিক সংকটের সূত্রপাত করতে পারে। এছাড়া অস্ট্রিয়ার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে যে কোনো সংকটে সে জার্মানীর সাহায্য লাভ করবে। কিন্তু এই ঘটনার একটি বিপজ্জনক দিক ছিল। স্লাভ সম্প্রদায়ের মানুষ অস্ট্রিয়ার মত একটি বহুরাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল। ফলে বোসনিয়ার অভ্যন্তরে বসবাসকারী তরুণ ও উগ্র বৈপ্লবিক মতাদর্শে বিশ্বাসী স্লাভরা 'ইয়ং বোসনিয়া' আন্দোলন গড়ে তুললে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়। তাদের এই কার্যকলাপে সার্বিয়ার মদত ছিল। বলা যেতে পারে, যেভাবে অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোবিনা দখল করে নেয়, তা সার্বিয়ার মনঃপূত ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানীর উগ্রজাতীয়তাবাদের ফলে মরোক্কোকে কেন্দ্র করে পর পর দুবার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলেও তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

সেরাজিভো হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড ও তাঁর স্ত্রী যখন বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো ভ্রমণ করেছিলেন, তখন প্রিন্সিপ নামক জনৈক বোসনিয়ান সার্ব তাদের হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে এব সার্বিয়াকে এক চরমপত্র পাঠায়, যার উত্তরের মেয়াদ ছিল মাত্র ৪৮ ঘন্টা, সার্বিয়া এই চরমপত্রের অধিকাংশ শর্ত স্বীকরা করে।

কিন্তু তাতেও অস্ট্রিয়া সন্তুষ্ট না হওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রশ্ন

১। প্যান্থার কি?

২। বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্ভুদ্ধ স্লাভরা কোন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল?

উল্লেখ্য যে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার দ্বন্দ্ব ছিল অনিবার্য এবং অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে যে চরমপত্র দিয়েছিল, তাতে সার্বিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল। অস্ট্রিয়ার মত একটি বহুজাতিক ও বহুভাষী রাষ্ট্রের পক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছিল, জাতীয়তাবাদের দ্রুত প্রসার অস্ট্রিয়ার অস্তত্বের পক্ষে কাম্য ছিল না। বিগত শতকে ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যের ফলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। এই অবস্থায় সার্বিয়ার নেতৃত্বে সর্বসার্ববাদ অস্ট্রিয়ার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তার আশঙ্কা হয়েছিল সার্ডিনিয়া-পিডমন্টের নেতৃত্বে যেমন ইটালীর এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন সফল হয়েছিল, তেমনই একইভাবে সার্বিয়ার নেতৃত্বে সার্বদের ঐক্য সম্ভব হতে পারে। বলা যেতে পারে, অস্ট্রিয়ার জেদেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কেন বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। কারণ বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে একরে পর এক সংকট যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়নি বা উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট না হলেও বিরোধ মিটে গিয়েছিল।

অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তার স্ত্রী সেরিজোভা ভ্রমণকালে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে এক চরম পত্র দেয়। মূলতঃ অস্ট্রিয়ার জেদের ফলেই যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

সেরাজিভো সংকটের সময়ও আশা করা গিয়েছিল যে, কোন আন্তর্জাতিক সমাবেসের মাধ্যমে সার্বিয়া-অস্ট্রিয়ার বিরোধের নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে ইউরোপের সমস্ত বড় রাষ্ট্রই এই সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে অস্ট্রিয়া জার্মানীর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। ৫ই জুলাই জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। জার্মানীর নিকট থেকে সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না কারণ বলকান অঞ্চল, প্রণালী এলাকা ও কন্সট্যান্টিনোপোলের উপর অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর আধিপত্য তার পক্ষে মেনে নেয়ো সম্ভব ছিল না। রাশিয়া ৩০শে জুলাই সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। জার্মানী রাশিয়াকে সৈন্য সমাবেশ করতে নিষেধ করলেও রাশিয়া তাতে রাজী হয়নি। ফলে ১লা আগস্ট জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একইভাবে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থকাতে না চাইলে ৩রা জানুয়ারী জার্মানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সকে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে জার্মানী বেলেজিয়াম আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ডও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বেলজিয়ামের উপর জার্মানীর আক্রমণ ছিল ১৮৩৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত লণ্ডন চুক্তির পরিপন্থী। ইউরোপের পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্র বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পশিচম ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা ছিল ব্রিটিশ বিদেশনীতির প্রধান লক্ষ্য। তাই তার পক্ষে বেলজিয়ামের ওপর জার্মান আক্রমণ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় ৪ঠা আগস্ট ইংল্যাণ্ড জার্মানীর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৬ই আগস্ট অস্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং ১২ই আগস্ট ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়।

প্রশ্ন

১। অস্ট্রিয়ার যুবরাজের নাম কি?
২। লণ্ডন চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া কেন যোগ দিয়েছিল?

৪.২.৩.২ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি

বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, জোট বাঁধার নীতি ও গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা ও ঊনিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি শিবিরে বিভক্ত হওয়ার ঘটনা আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিতে জার্মানীর দায়িত্বের প্রশ্নটি অবশ্যই স্পর্শকাতর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হলেও কয়েকজন ঐতিহাসিক যেমন — বানের্স (E.H. Barnes), ফে (F. B. Fay) ও গুচ (G. P. Gooch) এর বিরোধিতা করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডেভিড টমসন বলেছেন, "The most important thing about the First World War is that it was the unsought, unintended and product of a long sequences of events which began in 1871". তিনি এর জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জাতিকে দায়ী করেননি। অস্ট্রিয়া ও জার্মানী যুদ্ধের জন্য প্রাথমিকভাবে তাদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপানো সমীচীন নয়। ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড, আংশিকভাবে হলেও এর জন্য দায়ী ছিলড়। ইউরোপের প্রদান দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের তীব্র সংঘাত ছিল। তাদের মধ্যে যেমন পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল, তেমনি ছিল ভীতি ও আতঙ্ক। নিজের উপর পুরো ভরসা বা আস্থা না থাকায় তারা জোটের রাজনীতিকে আশ্রয় করেছিল। সবক্ষেত্রে আগ্রাসী মনোভাব নয়, বরং আত্মরক্ষা ও অস্তিত্ব বজায় রাখা তাদের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল অনেকাংশে আত্মরক্ষামূলক। এই যুদ্ধের সঙ্গে কোন নীতির প্রশ্ন বা মতাদর্শ জড়িয়ে ছিল না। সর্বজাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেছিল রাশিয়ার মত একটি স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র। গণতন্ত্র রক্ষার জন্যও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। গণতন্ত্র রক্ষা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার পক্ষে এক শিবিরে অবস্থান করা সম্ভব হত না। বলা যেতে পারে, রাজনীতিবিদ্‌রা দায়িত্বহীনের মত আচরণ করেছিলেন। সমকালীন রাজনীতিবিদ্‌রা অভিজ্ঞ ও দক্ষ হলেও জটিল ও সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না। এদের সম্পর্কে লয়েড জর্জের মন্তব্য হল — 'they were all handy man in a well behaved sea, but helpless in a typhoon'. নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধ ছিল একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের কাছে এই যুদ্ধ ছিল অভিশাপ।

গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। গণতন্ত্র রক্ষা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া পক্ষে এক শিবিরে অবস্থান করা সম্ভব হত না।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি উল্লেখ কর।

৪.২.৩.৩ ঃ শান্তি চুক্তি এবং এর সুদূর প্রসারী ফলাফল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে শান্তি সম্পাদনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ার আগেই এর ক্ষেত্রে প্রস্তুত হচ্ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রর কর্ণধাররা মাঝে মাঝে যুদ্ধের লক্ষ্য ও নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট ঘোষণা উপস্থাপিত করেন। যুদ্ধের শেষ পর্বে যখন মিত্র পক্ষের জয় সুনিশ্চিত তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ব্রিটেনের যুদ্ধ নীতি ঘোষণা করে জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেন এবং জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেন এবং জার্মানীকে এর জন্য শাস্তিদানের কথা ব্যক্ত করেন। এই প্রতিশোধমূলক ধারণার বিপরীত মেরুতে ছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের মানবতাবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী। ১৯১৮ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসের নিকট প্রদত্ত এক ঘোষণায় তিনি বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্ত ব্যাখ্যা করে বলেন যে, যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির ভাগ্য বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের ইচ্ছানুসারে নির্দ্ধারিত হবে না। ন্যায় নীতি ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরই নূতন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে, রাষ্ট্রপতি উইলসনের আদর্শবাদী ঘোষণায় জার্মান প্রতিনিধিরা ১৯১৮ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি সম্পাদন করেন এবং যুদ্ধের সময় রাশিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক থেকে সৈন্যপসারণ ও ব্রেস্ট লিটোভস্ক ও বুখারেস্ট সন্ধি দুটি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানায়। জার্মানীর যুদ্ধ বিরতি অনুমোদিত হওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। রেপর ১৯১৯ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারী ২৭টি দেশের প্রতিনিধিরা প্যারিস নগরে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সমবেত হন। ১৯১৯ খ্রীঃ ২৮শে জুন জার্মান প্রতিনিধি ভার্সাই-এ ইচ্ছের বিরুদ্ধে একতরফা সন্ধিপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

ন্যায়নীতি ও জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার উপরই নতুন বিশ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, রাষ্ট্রপতি উইলসনের আদর্শবাদী ঘোষণায় জার্মান প্রতিনিধিরা ১৯১৮ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি সম্পাদন করেন।

প্রশ্ন

১। প্রাথমিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাকে দায়ী করা হয়?

২। ভার্সাই শান্তিচুক্তি কেথায় হয়েছিল?

ভার্সাই সন্ধি ঃ

জার্মানীর সঙ্গে সম্পাদিত ভার্সাই সন্ধি বিশ্বের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভার্সাই সম্মেলন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমাবেশ। তবে এই সম্মেলন ছিল মূলতঃ বিজয়ী দেশগুলির সম্মেলন। জার্মানী প্রমুখ বিজিত দেশগুলির প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। এদিক দিয়ে ভার্সাই সম্মেলন ছিল একপেশে, একতরফা সম্মেলন, আবারএই সম্মেলনে ছোট বড় বিভিন্ন মাপের দেশগুলির প্রতিনিধিরা যোগদান করলেও সম্মেলনের নীতি নির্দ্ধারণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রধানত চারটি বৃহৎ শক্তি ও তাদের নেতারা মুখ্য ভূমিক গ্রহণ করেন। চার নেতা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশো ও ইটালীর প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও অর্লান্ডো। ক্লিমেনশো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। বলা

ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে দু'ধরনের লক্ষ্য ছিল যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা; এবং ভবিষ্যত যুদ্ধের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করা।

যেতে পারে, ভার্সাই সম্মেলনের কার্যকলাপে দুটি ভিন্ন ধ্যান ধারণার প্রতিফলন ঘটেছিল। একদিকে ছিল উইলসনের ঘোষিত আদর্শবাদী, উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী; এর বিপরীতে ছিল ফরাসী ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের বাস্তববাদী স্বার্থান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গী। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল করা, এবং জার্মানীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করা। স্বাভাবিকভাবে সম্মেলনের কার্যকলাপ খোলা মনে পরিচালিত হয়নি, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রকট হয়ে ওঠে এবং চরম গোপনীয়তার মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

শান্তি সম্মেলনের সামনে বিচার্য বিষয়গুলি ছিল দুই ধরনের — যেমন, নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকটি হল জার্মানীকে শাস্তিদান করা এবং ভবিষ্যতে জার্মানী যাতে আর যুদ্ধের পথে অগ্রসর না হয় সে জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা। ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে দু'ধরনের লক্ষ্য ছিল— যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ঘটেছে, সেই ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, এছাড়া ভবিষ্যতে যুদ্ধের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করা। জার্মানীকে চুক্তি অনুমোদনের জন্য তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। চুক্তিটিতে সম্মতিদান ছাড়া জার্মানীর আর কেত্রান বিকল্প ছিল না। জার্মানী পরিস্থিতির চাপে অনিচ্ছুকভাবে চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করে। তাই প্রথম থেকেই চুক্তি সম্পর্কে জার্মানীর গভীর মানসিক ক্ষোভ ছিল।

প্রশ্ন

১। শান্তি সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন?

২। ভার্সাই চুক্তির ওপর জার্মানীর ক্ষোভ ছিল কেন?

ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক শর্ত অনুসারে আলসাস ও লোরেরন ফ্রান্সকে দেওয়া হল, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের নিরপেক্ষতার অবসান ঘোষিত হল এবং তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লীগ অব নেশনস্ কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হওয়ার কথাও ঘোষিত হল। জার্মানী কর্তৃক আক্রমণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেলজিয়ামকে মরসনেট, ইউপেন ও মেমেডি দেওয়া হল। ফ্রান্সের খনিজ অঞ্চলের ধ্বংসসাধনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্মানীর সার অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়া হল। বলা হল যে, সার উপত্যাকা পনের বছরের জন্য এক আন্তর্জাতিক পরিষদের অধীনে থাকবে এবং এই পনের বছর ফ্রান্স সার-এর কয়লাখনির উপর কর্তৃত্ব করবে এবং সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সার উপত্যকার অধিবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ স্থির করবে।

গণভোটের মাধ্যমে উত্তর-শ্লেজউইগ ডেনমার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা কার্যকর করা হয়। এই গণভোট সম্পর্কে জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন—৪০,০০০ জার্মান মনোভাবাপন্ন অবিাসীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জার্মানীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া পোলান্ডকে দেওয়া হয়। এর ফলে জার্মানীর ভেতরে একটি প্রবেশপথ সৃষ্টি করে জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করা হল, জার্মান অধ্যুষিত ডানজিগকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হল এবং এর শাসনভার লীগ অব নেশনস্-এর ওপর ন্যস্ত করা হল। মেমেল শহরটি প্রথমে মিত্রপক্ষকে ও পরে লিথুয়ানিয়াকে দেওয়া হল। লীগ অব নেশনস্-এর সর্বসম্মতি ছাড়া অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সংযুক্তি সাধন করা হবে না বলে স্থির হয়। জার্মানীকে

শান্তি চুক্তিতে জার্মানীর ভৌগোলিক ব্যবচ্ছেদও করা হয়। জার্মানীর খনিজ সমৃদ্ধসার অঞ্চল ফ্রান্সে দেওয়া হয়। তাছাড়া জার্মানীর ওপর প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ চাপানো হয়েছিল।

তার সকল উপনিবেশ ত্যাগ করতে হল। এইভাবে প্রায় ২৫০০০ বর্গমাইল অঞ্চল জার্মানীকেপরিত্যাগ করতে হল এবং প্রায় ২০০০,০০০ জার্মান নাগরিককে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশ মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের রক্ষাধীনে রাখা হল।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জার্মানীকে দুর্বল করে রাখা। সন্ধিপত্রে ২৩১ নং ধারায় বলা হয় 'জার্মানী ও মিত্র রাষ্ট্রবর্গের আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষভুক্ত সরকারগুলির ও তাদের নাগরিকদের যে ক্ষতি হয়েছিল জার্মানী তা পূরণ করতে বাধ্য থাকবে।' জার্মানীর বৃহদাকার বাণিজ্য পোতগুলি ফ্রান্স এবং যুদ্ধ জাহাজগুলি ইংল্যান্ডকে দেওয়া হল। জার্মানী নিজ ব্যয়ে জাহাজ নির্মাণ করে ঘাটতি পূরণের জন্য বাধ্য রইল এবং শ্যাম, মরক্কো, সাইবেরিয়া, মিশর, তুরস্ক, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্থানে সকল সম্পত্তি ও 'বিশেষ অধিকার' পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। জার্মানীর বাইরে জার্মান নাগরিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার মিত্রপক্ষের রইল। দশ বছরের জন্য ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করতে জার্মানী বাধ্য থাকল। পাঁচ বছরের জন্য জার্মানীর এলব ও ওনিডার নদীগুলি আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রেখে তা সকল দেশের বাণিজ্যপোতগুলির নিকট উন্মুক্ত রাখা হল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানী কি পরিমাণ অর্থ মিত্রপক্ষকে প্রদান করবে তা স্থির করা সম্ভব না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন নিয়োগ করা হল।

প্রশ্ন

১। জার্মানী একটি খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চলের নাম লেখ?

২। কোন শহরকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়?

জার্মানীকে সামরিক শক্তির দিক দিয়েও পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা হল। বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের রীতি বন্ধ করে বারো বছরের জন্য জার্মানীকে এক লক্ষ স্বেচ্ছাবাহিনী রাখবার অধিকার দেওয়া হল ও তা কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে ব্যবহার করতে হবে বলা হল। রাইন নদীর পূর্বতীর থেকে জার্মান সৈন্য অপসারিত হল। তার কামান ও যুদ্ধ জাহাজের আকার ক্ষুদ্রতর করা হল, হ্যালিগোল্যান্ডের দুর্গগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল। জার্মানীর নৌবহরের সংখ্যা হ্রাস করা হল, সামরিক বিমানবহর রাখা নিষিদ্ধ হল। জার্মানীকে এ সকল শর্তাদি পালন করতে বাধ্য করার জন্য রাইন নদীর বাম তীরবর্ত্তী অঞ্চল পনের বছরের জন্য মিত্র শক্তির অধীনে রাখা হল।

সন্ধির ২৩১ নং ধারায় জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধির শর্তাদি ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করার অপরাধে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে প্রধান যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধের আইন-কানুন ভাঙ্গার জন্য সামরিক বিচারালয়ে একশত জার্মানকে অভিযুক্ত করা হল। জার্মানীকে নিজ পূর্ব সীমান্তে সৈন্য সরিয়ে আনতে হল এবং বেলজিয়াম, পোলান্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান লীগ অফ নেশনস্-এর ভার্সাই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহের রীতিবন্ধ করে— জার্মানীকে বারো বছরের জন্য একলক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখার অধিকার দেওয়া হল। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করায় কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে প্রধান যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা হয়।

প্রশ্ন

১। যুদ্ধের জন্য কাকে সর্বাধিকভাবে দায়ী করা হয়?
২। সেভরের সন্ধি কত সালে সংগঠিত হয়?

ভার্সাই সন্ধির মূলনীতির অনুকরণে অপরাপর সন্ধি দ্বারা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় পুর্নবিন্যাস করা হয়। এগুলি হল (ক) সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি (১৯১৯খ্রীঃ), (খ) ট্রিয়াননের সন্ধি (১৯২০ খ্রীঃ), (গ) নিউলির সন্ধি (১৯১৯খ্রীঃ) এবং (ঘ) সেভরের সন্ধি (১৯২০খ্রীঃ)।

ভার্সাই সন্ধির নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অভিমত লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত অভিমত অনুযায়ী এই সম্মেলনে ন্যায়, নীতি ও সততা বিসর্জন দিয়ে জার্মানীর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। বিজয়ীরা পরাজিত জার্মানীর প্রতি এত কঠোর না হলে হয়ত জার্মানী তার পরিবর্ত্তিত অবস্থা মেনে নিত। অধ্যাপক ই.এইচ. কার বলেছেন— The element of dictation was more apparent than in any previous peace treaty of modern times. বিজিত ও বিজয়ীর মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারা এই চুক্তির শর্ত নির্দ্ধারিত হয়নি। বিজয়ী পক্ষ প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় উন্মুত্ত হয়ে এই চুক্তি জার্মানীর ওপর আরোপ করেছিল। জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি, তাদেরকে একাসনে বসতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। প্যারিসে তাদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদের ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল। মিত্রপক্ষীয়দের এই দুর্ব্যবহার ও অসম্মান জার্মানবাসীদের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি করেছিল যে তারা এই আরোপিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এছাড়া ভার্সাই চুক্তি সম্পর্কে অভিযোগ হল এই সন্ধির শর্তাবলী ছিল জার্মানীর পক্ষে কঠোর ও নির্মম, জার্মানীকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্বল করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীকে একতরফাভাবে দায়ী করে তার কাছে সাধ্যাতীত ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করা হয় ও জার্মানীকে আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে হীনবল করার হীনচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই সন্ধির পেছনে ন্যায় নীতি ও পারস্পরিক সুবিধা নীতি আদপেরই ছিল না। অন্যান্য শক্তিগুলি এই যুদ্ধের জন্য কম দায়ী ছিল ন। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর অস্ত্র হ্রাস করা হলেও বিজয়ী শক্তিগুলি তাদের নিজস্ব সম্ভার অক্ষুণ্ণ রাখে। জার্মানীর ন্যায় একটি বৃহৎ দেশকে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা যেরূপভাবে অসামরিকীকরণ, উপনিবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

ভার্সাই চুক্তি সম্পর্কে অভিযোগ হল এই সন্ধির শর্তাবলী ছিল, জার্মানীর পক্ষে কঠোর ও নির্মম। জার্মানীকে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্বল করা হয়। অর্থাৎ উইলসনের চৌদ্দদফা শর্ত লঙ্ঘন করা হয়।

উইলসনের চতুর্দশ দফা ছিল মিত্রশক্তিরই প্রস্তাব। চতুর্দশ দফা শর্ত মেনে অস্ত্র সমর্পণ করলে, এর ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হবে বলা হলেও ভার্সাই চুক্তিতে তা অগ্রাহ্য করা হয়। চোদ্দ দফা শর্তের ধারাগুলি হল (১) গোপন কূটনীতি পরিত্যাগ করে খোলাখুলিভাবে ও সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা। (২) শান্তি বা যুদ্ধের সময়, উপকূলবর্তী অঞ্চল ছাড়া সমুদ্র মুক্ত রাখা, (৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক বাধাবিঘ্ন হ্রাস করা, (৪) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজন ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্রের হ্রাস করা। (৫) উপনিবেশবাসীর স্বার্থের কথা স্মরণ রেখে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপনিবেশ পুনর্বিবেচনা করা, (৬) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিয়ে তাকে স্বাধীন দেশ রূপে গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া, (৭) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বেলজিয়ামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, (৮) ফ্রান্সের সমস্ত অঞ্চল মুক্ত করা, (৯) ইটালীর সীমান্ত পুনর্বিন্যাস, (১০)

অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা, (১১) বল্কান রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা (১২) তুরস্কের অঞ্চলগুলির সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নটি সুনিশ্চিত করা (১৩) পোলান্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং (১৪) ছোট বড় সকল রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে জাতিগুলির একটি সাধারণ সমিতি স্থাপন।

উল্লেখ্য, চর্তুদশ দফায় ১-৪ ধারায় শর্তগুলি ভার্সাই সন্ধিতে প্রয়োগ করা হয়নি। চর্তুদশ দফায় সচল শক্তির নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হলেও ভার্সাই সন্ধির দ্বারা কেবলমাত্র জার্মানীকে নিবস্ত্রীকৃত করা হয়। এছাড়া 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতি ঘোষিত হলেও জার্মানীর কোন কোন অংশকে জার্মান অধিবাসীসহ জার্মানী থেকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

প্রশ্ন

১। উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতিটি কি ছিল?

২। কোন কোন ক্ষেত্রে চৌদ্দদফা শর্তের লঙ্ঘন করা হয়?

ভার্সাই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে কঠোর অবিচারমূলক ছিল কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পৃথিবীর কূটনৈতিক ইতিহাসে যুদ্ধাবসানে সমস্ত শান্তিচুক্তিই বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে সম্পাদিত হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী শক্তিবর্গ বিজিতদের উপর একতরফাভাবে শর্তাবলী আরোপ করেন। এদিক থেকে ভার্সাই চুক্তি নজিরবিহীন ও আশ্চর্যজনক ছিল না। এছাড়া, জার্মানীর আচার-আচরণও সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কফুটের সন্ধিতে ফ্রান্সের প্রতি সে যে নির্মম আচরণ করেছিল তার কোন তুলনা নেই। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বলেশভিক রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যে ব্রেস্ট লিটোভস্ক-এর চুক্তি সম্পাদিত হয়, রুমানিয়ার সঙ্গে যে বুখারেষ্টের সন্ধি সম্পাদন হয়েছিল তাতেও জার্মানী কঠোর ও স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। ডেভিড টমসন উল্লেখ করেছেন, প্যারিসের শান্তিচুক্তি রচয়িতাদের সামনে ইউরোপে নূতন শক্তির ভারসাম্য স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। তাদের এমনভাবে নূতন শক্তির ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে যার ফলে জার্মানীর সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভব না হয় ও তার বিরুদ্ধে শক্তি সমতা দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়। তা ছাড়া জাতীয় স্বাধিকার নীতির ভিত্তিতে মধ্য পূর্ব ইউরোপকে নবরূপে সাজানো প্যারিস শান্তি স্থাপকদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁরা জার্মানীর বিজিত অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে জার্মানীকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়নি ও তার বিজিত রাজ্যগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকারীদের পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। ভার্সাই শান্তিচুক্তিতে জার্মানী প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তার মূল শিল্পাঞ্চলগুলি বহাল ছিল। এ. জে. পি টেলর মনে করেন, জার্মানীর অন্তর্নিহিত শক্তি অব্যাহত ছিল ও ভার্সাই চুক্তির স্থপতিরা জার্মান সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। ভার্সাই চুক্তি সঠিকভাবে রূপায়িত হয়নি। এই চুক্তি ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। এক দশকের মধ্যে এই চুক্তি অকেজো ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অধ্যাপক টেলর মন্তব্য করেন— 'The Treaty proved to be failure less because of the inherent defects it contained than it was never put into effect.'

বস্তুতপক্ষে জার্মানাকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়নি ও তার বিজিত রাজ্যগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকারীদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া জার্মানীর মূল শিল্পাঞ্চল গুলি বহাল ছিল।

এ সত্ত্বেও ভার্সাই চুক্তির তথাকথিত কঠোরতা ঐতিহাসিক মহলেও জার্মানীর জনমানসে বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল। অধ্যাপক ই. এইচ. কার, জি. হার্ডি প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ভার্সাই চুক্তির কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপেই জার্মানীতে প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয় ও হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী বলপূর্বক ভার্সাই সন্ধি সংশোধনের চেষ্টা করে ও এর থেকেই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অপরদিকে এ. জে. পি টেলর প্রমুখ মনে করেন, ভার্সাই চুক্তির কঠোরতাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি বলা যায় না, কারণ ভার্সাই চুক্তির তথাকথিত কঠোরতা যখন ধূসর স্মৃতিমান তখন জার্মানী ভার্সাই -এর অবিচারকে অপপ্রচারের বিষয়বস্তুতে পরিণতি করে। তবে ভার্সাই চুক্তি পরোক্ষভাবে জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। ভার্সাই চুক্তিতে সাক্ষ্যদানকারী ওয়েমার গণতান্ত্রিক সরকার জার্মানীর জনগণের কাছে পরাজয় ও আত্মসমর্পনের নামান্তর বলে পরিগণিত হয়। স্বভাবই ভার্সাই বিরোধী মনোভাবে সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর জনমানসে শান্তি ও গণতন্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী সুদৃঢ় হয়। এই অবস্থায় জার্মানীতে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তি দুর্বল হয় ও জার্মান রাজনীতিতে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তির আগমনের পথ প্রশস্ত হয়।

প্রশ্ন

১। ভার্সাই সন্ধি কি কঠোর ছিল?

২। জার্মানীতে কিভাবে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির পথ প্রশস্ত হয়?

৪.২.৩.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) Thomson David -- Europe Since Napoleon.

(২) Seaman L.C.B. -- From Vienna to Versailles.

(৩) Roberts J.M. -- Europe 1870-1945.

(৪) Lipson -- Europe in the 19th and 20th Centuries.

(৫) Joll James -- Europe Since 1870.

(৬) Hobsbawn Eric -- Age of Capital 1848-1875.

(৭) Grant and Temperly -- Europe in the 19th and 20th Centuries.

(৮) Taylor A.J.P. -- Europe: Grandeur and Decline.

(৯) Taylor A.J.P. Struggle for Mastery in Europe.

(১০) Taylor A.J.P. -- First World War.

(১১) Fay-- Origins of the First World War.

৪.২.৩.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা কর। এই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভবপর ছিল কিনা?

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব বিশ্লেষণ করো।

(৩) ভার্সাই চুক্তি সম্পর্কে জার্মানীর অভিযোগসমূহের কি কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল?

(৪) ভার্সাই চুক্তি কি কঠোর ছিল?

(৫) ভার্সাই সন্ধির মধ্যে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৪

রুশবিপ্লব (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ)

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.২.৪.১ ঃ রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট (১৯১৭ খ্রীঃ)

৪.২.৪.২ ঃ রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

৪.২.৪.৩ ঃ রুশ বিপ্লবের লেনিনের ভূমিকা

৪.২.৪.৪ ঃ পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

৪.২.৪.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.২.৪.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) রুশ বিপ্লব প্রেক্ষাপট

(২) রাশিয়ায় কিভাবে জারতন্ত্রের অবসানে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল।

(৩) রুশ বিপ্লবে লেনিনের অবদান

(৪) লেনিনের নয়া অর্থনৈতিক নীতি ও কার্যক্রম

(৫) পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

৪.২.৪.১ ঃ রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট (১৯১৭ খ্রীঃ)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য ও বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যেমন রাশিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে, তেমনি বিশ্ব-বিপ্লবের ইতিহাসে তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও নূতন মাত্রা সংযোজন করেছিল। রুশ বিপ্লব ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লব নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল মুক্তির আশ্বাস, এবং ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ ও সফল প্রতিবাদ।

মুক্তির আশ্বাস, ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ ও সফল প্রতিবাদ। রুশ বিপ্লবের সাফল্য পশ্চিমী পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আতঙ্কিত করেছিল। এই বিপ্লবের প্রভাব রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের সাফল্য সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

প্রশ্ন ১। বলশেভিক বিপ্লবের সময়কাল নির্ধারণ কর।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই বিপ্লবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না রাশিয়ার জারের স্বৈরতন্ত্রের অবলুপ্তি না ঘটলেও একটি সাংবিধানিক শাসন চালু হয়েছিল। তাছাড়া, এই বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা ও উদ্যমের একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। তারা এ থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেছিল যে, জারতন্ত্রের কাছ থেকে কিছু পাবার নেই, তারা বুঝেছিল যে, পরবর্তী বিপ্লবে তাদেরই নেতৃত্ব দিতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী অপরিহার্য। স্বয়ং লেনিন এই বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব হচেছ পরবর্তী এক বৃহত্তর বিপ্লবের মহড়া মাত্র। এই বিপ্লব না হলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব সফল হত না।

জারের স্বৈরতন্ত্রের ও পরিবর্তন বিমুখ মানসিকতা, সামাজিক অস্থিরতা, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। তা সত্ত্বেও বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছিল কারণ রাশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যত কোন অস্তিত্ব ছিল না।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রাশিয়ায় পরপর দুটি বিপ্লব একই সঙ্গে সংগঠিত হয়েছিল। মার্চ মাসের বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটলো। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো। এই প্রজাতন্ত্রের আয়ু ছিল স্বল্প। ঐ বছরের নভেম্বরে প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে লেনিন বলশেভিক দলের নেতৃত্বে পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করলেন। মার্কসের তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ও উত্তরণ ঘটলো লেনিনের হাতে।

বিপ্লবের উৎস নিহিত রয়েছে রাশিয়ার ঊনিশ শতকের ইতিহাসের মধ্যে। জারের স্বৈরতন্ত্র ও পরিবর্তনবিমুখ মানসিকতা, সামাজিক অস্থিরতা, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ, বিপ্লবমনস্কতা অর্থাৎ একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য যা যা আবশ্যকীয় শর্ত, সব কিছুই রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ছিল, তা সত্বেও রাশিয়ার বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছিল কারণ রাশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যত কোন অস্তিত্ব ছিল না। ঊনিশ শতকের শেষ পর্বে রাশিয়ায় যে শিল্প প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, বা রাশিয়ায় যে পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল, তার পিছনে ছিল সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা। পুঁজি এসেছিল বিদেশ থেকে। পশ্চিমী ভাবধারার অনুপ্রবেশের ফলে বা পশ্চিমী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে রাশিয়ায় যে বিত্তশালী সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল, তার সঙ্গে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ, বিশেষত কৃষকদের কোন আত্মিক যোগ ছিল না, কৃষকরা তাদের আপনজন বলে মনে করতে পারে নি। আন্তরিকতা সত্বেও তাদেরএই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

ঊনিশ শতকের শেষ তিন দশকে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল এবং এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদদের উপর নির্ভরশীল এই পুঁজিপতি শ্রেণী জারতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। জারতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কোন মানসিকতা তাদের ছিল না। বিংশ শতকের গোড়ায় অবশ্য জারতন্ত্রের অপদার্থতা ও দুর্নীতি এবং শান্তিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে ব্যর্থতা

তাদের বিরোধী করেছিল। শিল্প বিপ্লবের কুফলস্বরূপ তারা যে নারকীয় জীবন যাপন করতো, তা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছিল। দুটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্যারী কমিউনের ঘটনার সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল। এছাড়া কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ এর তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল। অন্যদিকে তারা লক্ষ্য করেছিল যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর যে উদারনৈতিক ঐতিহ্য ও সরকারের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর দাবী পূরণের সুযোগ ছিল, রাশিয়ায় তা ছিল না। অর্থাৎ সংসদীয় আইনের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রতিবিধান করা সম্ভব ছিল না। তারা উপলব্ধি করেছিল একমাত্র বৈপ্লবিক পথেই বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা করতে হবে।

প্রশ্ন

১। রুশ বিপ্লব সংগঠনের বিলম্ব হয়েছিল কেন?

২। ১৯ শতকের শেষার্ধে পুঁজিপতিশ্রেণী জারতন্ত্রের বিরোধিতা করেনি কেন?

রুশ বিপ্লবের প্রধান কর্তব্য ছিল জারের স্বৈরতন্ত্রের অচলায়তন ভাঙা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব তাকে পযুর্দস্ত করতে পারেনি। কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতি মানুষের জীবনযাত্রার ধারা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করছিল, তখন স্বৈরতন্ত্র ক্রমশঃ তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছিল। বলা যেতে পারে, আধুনিক যুগের দাবী মেটাতে না পারার জন্যই রুশ বিপ্লব একপ্রকার অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। রাশিয়ার জনগণ দুর্নীতিপরায়ন জারতন্ত্রের উপর বিরক্ত হয়ে এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে বিপ্লবকে বেছে নিল।

জার নিকোলাস ছিলেন অযোগ্য। তিনি স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন এবং তার কথাতেই চলতেন। অন্য দিকে রাণী চলতেন রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথায়।

তবে সামগ্রিকভাবে জারতন্ত্রে দুর্বলতা, অপদার্থতা, দুর্নীতি ও সর্বোপরি স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেও ব্যক্তিগতভাবে শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস রুশ বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিলেন বলে Christopher Hill মন্তব্য করেছেন। জার নিকোলাস ছিলেন অযোগ্য। তিনি স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন এবং তাঁর কথাতেই চলতেন। অন্যদিকে রাণী চলতেন রাসপুটিন নামে এক ভক্ত সন্ন্যাসীর কথায়। রাসপুটিন ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। রাসপুটিনের কথায় মন্ত্রীরা নিযুক্ত অথবা পদচ্যুত হতেন। মন্ত্রীদের এত ঘন ঘন পরিবর্তন করা হতো যে তাতে প্রশাসনের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হত। যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংকটের সময় ঘন ঘন এই পরিবর্তন কাম্য ছিল না। এই অবস্থায় জারতন্ত্রের পতন অস্বাভাবিক ছিল না। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবীদের মধ্যে অনৈক্য ও বিদেশী সাহায্য তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে তাঁর পতন হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণ ও জার্মানীর হাতে পরাজয় রুশ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। যোগ্য সেনানায়কের অভাব, সীমান্তে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদপ্তরের কোন বোঝাপড়া না থাকা, রাণী আলেকজান্দ্রা ও রাসপুটিন কর্তৃক ঘনঘন মন্ত্রী পরিবর্তন করা, ডুমাকে অগ্রাহ্য করা এবং যুদ্ধের চাপে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যখন ইংল্যান্ড ও জার্মানী অর্থনীতিতে ব্যাপকহারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করে, তখন রুশ সরকার আধা সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আধা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নীতি অনুসরণ করে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ও সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। বিশেষত খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে। এই অর্থনৈতিক

সংকট গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে, যা বিপ্লবের পথে ইন্ধন যোগায়। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দেশে ব্যাপকহারে দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, সমাবেশ, ধর্মঘট ইত্যাদি দেখা দেয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। সব মিলিয়ে জারতন্ত্র জনগণের কাছে এত হেয় প্রতিপন্ন হয় যে, ডুমার পক্ষে বিপ্লবের নেতৃত্ব দান করা বা জারকে ক্ষমতাচ্যুত করা কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

প্রশ্ন

১। রাশিয়ার শেষ জার কে ছিলেন?

২। রাশিয়ার জনগণ জারতন্ত্রের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কেন?

১৯১৬ খ্রীঃ এর শেষে ও ১৯১৭ খ্রীঃ এর গোড়ায় পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। প্রতিটি মানুষ এমনকি রুশ সেনাবাহিনীর সৈনিকরাও মনে করেছিল যে,বিপ্লব আসন্ন। যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা চলে গিয়েছিল। ভয়াবহ খাদ্য সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, শ্রমিক অসন্তোষ ছিল তীব্র।১৯৫০ খ্রীঃ রক্তাক্ত রবিবারের দ্বাদশ বার্ষিকীর স্মরণে দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ১১ই মার্চ শহরের পথে পথে খণ্ডযুদ্ধ হয়। সেনাবাহিনীও ১২ই মার্চ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জেলখানা ভেঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা হয়। মন্ত্রীদের আটক করা হয়। জার ডুমাকে বরখাস্ত করেন। ১২ই মার্চ বিপ্লবী জনতা পেট্রোগ্রাড শহর দখল করে। এইভাবে ১৯১৭খ্রীঃ মার্চ মাসে রুশ বিপ্লব শুরু হয়। জার ডুমাকে বরখাস্ত করলেও এর সদস্যরা তা মানতে অস্বীকার করে এবং এদের দশজন সদস্য ১৫ই মার্চ অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করে। জার তাঁর ভাই গ্রান্ড ডিউক মিখাইলের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর ভাই জারপদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

১৯০৫ খ্রীঃ রক্তাক্ত রবিবারের দ্বাদশ বার্ষিকীর স্মরণে দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ১১ই মার্চ শহরের পথে পথে খণ্ডযুদ্ধ হয়। ১২ই মার্চ সেনা বাহিনীর বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

প্রশ্ন

১। ডুমা কে ছিলেন?

২। রুশ বিপ্লব কালে জার কার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন?

৪.২.৪.২ ঃ রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

জারতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা ও কৃষকদের উৎসাহ ছিল দুর্দমনীয়। অন্তবর্তী সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয়নি। এই ফাঁক পূর্ণ করেছিল সোভিয়েট। সোভিয়েট বলতে বোঝায় কাউন্সিল বা পরিষদ, যার সদস্যদের নির্বাচিত করত শ্রমিক শ্রেণী বা সেনা বা কৃষকরা। প্রথমদিকে অন্তবর্তী সরকার ও সোভিয়েটের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল। নূতন সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষমা, বৈষম্যমূলক আইনের বিলোপ, আট ঘণ্টা কাজের সময়, সংবিধান সভার নির্বাচন প্রভৃতি কয়েকটি প্রগতিশীল সংস্কার কার্যকরী করেছিল। সোভিয়েট এই সব সংস্কার করলেও উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। বুর্জোয়ী শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লব। তারা চেয়েছিল জারের ক্ষমতা-হস্তান্তরিত হয়ে

তাদের হাতে আসুক এবং ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাশিয়া একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রে উন্নীত হোক বা ইংল্যাণ্ডের মত রাশিয়াতেও একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, কিন্তু সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তারা জারের স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্র চায়নি।

১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লেনিন দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। তাঁর নেতৃত্বে নভেম্বর মাসে বিপ্লবী ফৌজ ও লাল রক্ষী বাহিনী প্রায় বিনা রক্তপাতে অন্তর্বর্ত্তী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লেনিন দেশে ফিরে আসেন এং সেই সঙ্গে শুরু হয় রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব। লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস' পেশ করেন। এতে বলা হয় যে, বিপ্লবের প্রথম পর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে বুর্জোয়াদের কাছে। দ্বিতীয় পর্বে সেই ক্ষমতা দখল করবে দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়। অন্তর্বর্ত্তী সরকার ও সোভিয়েট পরস্পর পরস্পরের মিত্র নয় কারণ উভয়ের শ্রেণীগত চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি মন্তব্য করেন, অন্তর্বর্ত্তী সরকারকে সমর্থন করার প্রয়োজন নেই। সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের অবলুপ্তি কাম্য। সোভিয়েটের হাত শক্ত করা এবং সোভিয়েট বলশেভিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জমি ও ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনের দায়িত্ব থাকবে সোভিয়েটের হাতে।

বলশেভিকরা এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রথমে নিস্পৃহ থাকলেও পরে নেতৃত্ব দেয়। ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বরে বিপ্লবী ফৌজ ও লাল রক্ষী বাহিনী প্রায় বিনা রক্তপাতে অন্তর্বর্ত্তী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কেরেনেস্কি পালিয়ে যান। উল্লেখ্য, 'এপ্রিল তত্ত্বে' লেনিন তাঁর দীর্ঘকালীন লক্ষ্য হিসেবে চেয়েছিলেন বুর্জোয়া বিপ্লবকে সর্বহারা বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের পতন ঘটিয়ে এই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে হবে বলে তিনি মনে করতেন।

প্রশ্ন

১। 'এপ্রিল তত্ত্ব' কি?

২। সোভিয়েত বলতে কি বোঝায়?

ক্ষমতা দখল ছিল বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ, বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করে রাশিয়াকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে উত্তীর্ণ করতে হলে একদিকে প্রয়োজন ছিল জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ মিটিয়ে নেওয়া, অন্যদিকে তেমনি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মার্কসবাদকে কার্যে রূপায়িত করে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই গুরুদায়িত্ব পালন করার মত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব লেনিনের ছিল, ক্ষমতা দখল করার পর তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল করতে। এরজন্য প্রয়োজন ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। এই নীতি অনুসরণ করে তিনি ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানীর সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর শর্তে অপমানজনক ব্রেস্ট লিটোভস্কের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সঙ্গে তিনি নজর দেন ভূমি সংস্কারের কাজে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার ও চার্চের সমস্ত জমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণ করা হয়। এরপর স্থানীয় সোভিয়েটের মাধ্যমে এইসব জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। জমিতে বেগার খাটানো ও জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হয়। বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানা ও রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। বলাবাহুল্য, বিনা বাধায় বিপ্লবের কাজ সফল হয়নি। জমিদার, যাজক শ্রেণী ও অন্যান্য বিত্তশালী মানুষের পৃষ্ঠপোষক প্রতিবিপ্লবী

লেনিন কেবল রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না; মূলত মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ছিল।

শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল। লেনিন এইসব সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রুশ জনগণ পেয়েছিল মুক্তির আস্বাদ। কিন্তু এরপরও বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ দেশ তখন ছিল এক চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। যুদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি। কৃষি, শিল্প এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ভয়াবহ, মজুরি বাড়ানো হলেও জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছিল, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় স্বল্পকালীন মেয়াদে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অর্থনীতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হয়। ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়। লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিপ্লবকে সফল করতে হলে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং শ্রমিক কৃষকের আনুগত্য ও সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে। এই অবস্থায় লেনিন তাঁর নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল নূতন অর্থনৈতিক নীতি or New Economic Policy এই নীতি অনুসারে ছোট ছোট জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কৃষকরা তাদের ক্ষেতের ফসল বাজার দরে বিক্রয় করার সুযোগ পায়, গ্রামে সমবায় প্রথা উৎসাহিত হয়। ছোট শিল্প মালিকদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিদেশ থেকে মূলধন এনে শিল্প প্রসারের নীতি গ্রহণ করা হয়। শিল্পে কঠোর সরকারী গতি পরিত্যক্ত হয়। এই নীতির ফলে রাশিয়ার কৃষি ও শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়। উল্লেখ্য যে, এই নীতি মার্কসবাদের পরিপন্থী বা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি হলেও পরিস্থিতিতে বাস্তবতা বিবেচনা করে লেনিন এই বিচ্যুতি মেনে নিয়েছিলেন। লেনিন কেবল রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না; মূলত মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ছিল। ১৯০২ খ্রীঃ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'What is to be Done?' গ্রন্থে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের পক্ষে সামগ্রিক সমাজচেতনা ও সংকীর্ণতামুক্ত গণভিত্তির প্রয়োজন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এছাড়া তাঁর State and Revolutions,April Thesis, Imperialism-the Highest stage of capitalism প্রভৃতি অসংখ্য লেখার মধ্যে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। বিপ্লবের ফলে কি পরিবর্তন হয়েছে, তা বোঝাতে গিয়ে লেনিন উল্লেখ করেছেন, 'রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য, জারের আমলে তা ব্যবহার করা হত তাদের বিরুদ্ধে।' লেনিনের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল (৩০শে জানুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ) — ''আজ রাশিয়ার বন্ধনমুক্ত প্রজাগণ আর নিজভূমে পরবাসী' হইয়া নাই, তাহাদের সংসারে শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে, আজ তাহারা 'মানুষ' হইবার সমস্ত সুযোগ পাইয়াছে।"

প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য লেনিন কোন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন?

২। লেনিনের একটি বইয়ের নাম লেখ।

৩। ব্রেষ্ট লিটোভস্কের সন্ধি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

১৯১৮ খ্রীঃ যে অস্থায়ী সংবিধান দ্বারা রুশদের শাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তা ১৯২৪ খ্রীঃ বাতিল হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ রাশিয়ায় একটি অস্থায়ী সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানে রাশিয়াকে সংযুক্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র (United Soviet Socialist Republic or U.S.S.R)বলে ঘোষণা করা হয়। এই সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র অঙ্গরাজ্যগুলি হল ইউক্রেইন, শ্বেত রাশিয়া, ট্রান্স ককেশিয়া, তুর্কমেন, উজবেগ, তাজিক। ১৯৩৬ খ্রীঃ এই অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হয় এগারটি। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ৪টি সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এগুলি হল (ক) সোভিয়েতগুলি, (খ) C.P.S.U. অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, (গ) গুপ্ত পুলিশ এবং (ঘ) সেনাদল। দেশের

শাসন ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে রাখা হয়। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে সোভিয়েতগুলি কাজ করে।

সোভিয়েত গঠনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রাম সভা বা গ্রামবাসীদের দ্বারা সোভিয়েত নির্বাচিত হবে। গ্রাম সোভিয়েতগুলির সদস্যরা আঞ্চলিক সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে। আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলি প্রাদেশিক সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে। প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলি প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত সদস্যাদের নির্বাচন করবে। প্রজাতন্ত্রের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত বা ইউনিয়ন সোভিয়েতের প্রজাতন্ত্রের নির্বাচন করবে। ইউনিয়ন সোভিয়েত বা কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের সদস্য সংখ্যা হবে দুই হাজার এবং দুই বছর অন্তর কে অধিবেশন বসবে। ইউনিয়ন সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকর্তাদের বা সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে। সুপ্রিম সোভিয়েতের তরফে একটি মন্ত্রীসভা দেশের শাসনকার্য চালাবে, স্বয়ং লেনিন হলেন এই মন্ত্রীসভার প্রধান।

রুশ সংবিধানে সোভিয়েতগুলিই শাসনব্যবস্থার বৈধ সংস্থা হলেও কার্যতঃ C.P.S.U.বা রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলই ক্ষমতার আসল অধিকারী ছিল। C.P.S.U.বা রুশ কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। সোভিয়েত গঠনের অনুসরণে রুশ কমিউনিস্ট দলকে গঠন করা হয়, গ্রাম থেকে জেলা, প্রদেশ স্তর থে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় পার্টি কংগ্রেসের তিন হাজার সদস্য দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করত। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভূক্ত ছিল পলিটব্যুরো। এই পলিটব্যুরোর সদস্যরাই ছিলেন আসল ক্ষমতার মালিক, এরা যে নীতি নির্দ্ধারণ করতেন তা সরকার কার্যকরী করত। পলিটব্যুরোর সম্পাদক ছিলেন খুবই ক্ষমতাশালী।

প্রশ্ন ১। সোভিয়েত গঠনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৪.২.৪.৩ ঃ রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকার মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে খ্রিস্টোফার হিল মন্তব্য করেন 'The Russian Revolution was Lenin's revolution'. একথা ঠিক, লেনিন এক সংকটজনক মুহূর্তে স্টালিন ও ট্রটস্কির মত অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ শিষ্যকে নিয়ে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে বিপ্লবকে সফল করেছিলেন। বাস্তবিকই রুশ বিপ্লবের প্রাণপুরুষ ছিলেন লেনিন। অবশ্য লেনিনের উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল রাশিয়ার বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস। বলশেভিক বিপ্লব ছিল আগেকার বিভিন্ন আন্দোলন ও রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিণতি। তিনি নিজেই বলেছেন, ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের মহড়া। তবে ইতিহাস কর্তৃক গঠিত হলেও ইতিহাসের স্রোতে তিনি ভাসেন নি বা শুধু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই তার উত্থান সম্ভব করে নি। E.H.Carr বলেছেন যে, লেনিন মহতের মধ্যে মহীয়ান এই কারণে যে, শুধু পূর্ব নিয়ন্ত্রিত শক্তির তরঙ্গে ভাসমান থেকে তিনি মহত্বে উত্তীর্ণ হন নি।

> *'এপ্রিল তত্ত্বে' লেনিন ঘোষণা করেন বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছে, তাই এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। তা জন্য তিনি আওয়াজ তোলেন—**'All Power to the Soviets'** ।*

ইতিহাসের সৃষ্টি হলেও তিনি ইতিহাসের সৃষ্টি হলেও তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই পৃথিবীতে স্থাপিত হয়েছিলেন প্রথম সাম্যবাদী সরকার।

বিপ্লবের এক চরম মুহূর্তে ১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লেনিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর আগে জারতন্ত্রের অবসান হয়েছিল এবং প্রজাতন্ত্রী শাসন কাঠামোয় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে এক অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী ছিল দুর্বল ও অনগ্রসর। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণী ছিল সুসংগঠিত ও সচেতন। জারতন্ত্রের পতনের পর কেরেনেস্কির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের ভিত্তি ছিল দুর্বল। এই অস্থায়ী সরকার দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শ ও চিন্তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল, উদারনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণী ও নরমপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী দল ও গোষ্ঠী চেয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার গঠন করে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের ছত্রছায়ায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে। কিন্তু পেট্রোগার্ডের শ্রমিক সোভিয়েট ও বিদ্রোহী সামরিক নেতারা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। এরা চেয়েছিল যুদ্ধ মিটিয়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক প্রগতি সুনিশ্চিত করতে। যুদ্ধে জার্মানীর হাতে বিপর্যয় রাশিয়ার সমস্যাকে জটিলতা করেছিল। এই অবস্থায় লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল তত্ত্ব' পেশ করে বলেন, বিপ্লব সফল করার জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে সোভিয়েটগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা, এবং তার জন্য সোভিয়েটগুলির উপর বলশেভিক কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করা। তিনি বলেন, সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে জমি ও ব্যাংকের জাতীয়করণ করতে হবে, উৎপাদন ও বন্টনের দায়িত্ব নিতে হবে সোভিয়েটগুলিকে। লেনিনের 'এপ্রিল তত্ত্বে'র বক্তব্যের মূল কথা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছে, তাই এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে বেং তার জন্য তিনি আওয়াজ তোলেন —'All power to the Soviets'। তাঁর অপর স্লোগান হ'ল 'শান্তি, রুটি ও জমি'। লেনিনের পরিকল্পনা ছিল তিনটি (ক) জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন, (খ) কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ এবং (গ) সোভিয়েটগুলির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান। শেষ পর্যন্ত লেনিন বলপ্রয়োগ করে অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করে রুশ বিপ্লব সম্পূর্ণ করেন।

বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করে রাশিয়াকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একদিকে যেমন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ মিটিয়ে নেওয়া, অন্যদিকে তেমনি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মার্কসবাদকে কার্যে রূপায়িত করে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরা ক্ষমতা দখলের পর লেনিনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল করা। এরজন্য প্রয়োজন ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। এই কারণে তিনি ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানীর সঙ্গে কঠোর শর্তে ব্রেষ্ট লিটোভস্কের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সঙ্গে ভূমি সংস্কারের কাজে নজর দেন। বিনা ক্ষতিপূরণের জমিদার ও চার্চের সমস্ত জমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণ করা হয়। এরপর স্থানীয় সোভিয়েট মারফৎ এইসব জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানাও রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। এই সঙ্গে জমিদার, যাজক শ্রেণী ও অন্যান্য বিত্তশালী মানুষের পৃষ্ঠপোষক প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে দমন করেন. ক্ষমতা দখল করার পর বলশেভিক দল লক্ষ্য করেছিল যে দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কৃষি, শিল্প এ থেকে রেহাই পায়নি। মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ভয়াবহ। মজুরি বাড়ানো হলেও জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে শ্রমিক ও বিশেষভাবে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল,লেনিন বুঝেছিলেন বিপ্লব সফল করার জন্য অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং শ্রমিক-কৃষকদের আনুগত্য ও সমর্থন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় লেনিন তাঁর নূতন

অর্থনৈতিক নীতি বা New Economic Policy ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুসারে ছোট ছোট জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কৃষকরা তাদের ক্ষেত্রে ফসল বিক্রি করার সুযোগ পায়। গ্রামে সমবায় প্রথা উৎসাহিত হয়। ছোট শিল্প মালিকদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিদেশ থেকে মূলধন এনে শিল্প প্রসারের নীতি গ্রহণ করা হয়। শিল্পে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি পরিত্যক্ত হয়। এরফলে রাশিয়ায় কৃষি ও শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়। লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি সরকারী নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ ছিল। নূতন এই নীতির ফলে কৃষকরা শ্রমিকদের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তাঁর নীতি ছিল মার্কসবাদের পরিপন্থী।

মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন বলে লেনিন মনে করেন না। বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতির তাগিদে তিনি বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মানবদরদী, জারতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন তার অত্যাচার ও শোষণের জন্য। মানবিক মন নিয়েই তিনি এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ঐতিহাসিক C.H.Hill মন্তব্য করেছেন— 'Lenin symbolizes the Russian Revolution as a movement of the poor and oppressed of the earth who have successfully risen against the great and the powerful'.

প্রশ্ন ১। লেনিন কি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন?

৪.২.৪.৪ ঃ পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

রুশ বিপ্লব শুধু রাশিয়ার ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রথম সফল হ'ল সমাজতন্ত্রী আন্দোলন— জন্ম নিল পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

এই বিপ্লব ঘটার কথা ছিল পূর্ণ বিকশিত কোন এক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, কিন্তু সেখানে তা না ঘটে রাশিয়ার মত একটি অনগ্রসর দেশে ঘটল, যেখানে পুঁজিবাদ ও শিল্পবিপ্লবের বিকাশ হয়েছিল সব শেষে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী ছিল অনেক পিছিয়ে। ক্ষমতা ধরে রাখার মত অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক পরিপক্কতা বা সংহতিবোধ কিছুই তার ছিল না, অপরদিকে সর্বহারা শ্রেণীর সাহায্য নিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ করাও ছিল অবাস্তব একটি পরিকল্পনা। এই অবস্থায় লেনিন একই সঙ্গে বুর্জোয়া বিপ্লবের অবসান ঘটিয়ে ও বলশেভিক বিপ্লবের নেতৃত্বে দিয়ে রাশিয়ার ইতিহাসের গতি অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে বুনিয়াদ গড়ার কথা মার্কস বলেছিলেন, এক্ষেত্রে তার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছিল। লেনিন সমাজবাদ গড়েছিলেন অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকা

মিত্রশক্তি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ও সাম্যবাদী বলশেভিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। বৈদেশিক শক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে বলশেভিক শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য অগ্রসর হয় এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে অভিযান চালায়।

একটি দেশে। এই প্রচেষ্টা সফল হত যদি একই সঙ্গে অন্যান্য রুশ বিপ্লবের এই সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতার কথা E.H.Carr উল্লেখ করেছেন।

রুশ বিপ্লবের ঢেউ পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে নি। তবে পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া এবং এমনকি পরবর্তীকালে আফ্রিকা ও দক্ষি আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মানুষ রাশিয়ার সাফল্যে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যুদয় পুঁজিবাদী জগতের কাছে বিপজ্জনক মনে হল। জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়া মৈত্রী স্থাপন করায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মিত্রশক্তি সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী বলশেভিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক শক্তিবর্গ বলশেভিক শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য অগ্রসর হয় এবং রাশিয়ার ভেতরে অভিযান চালায়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ককেসাস ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ রাশিয়ার ভূখণ্ড দখল করে নেয়। সেই সঙ্গে ১৯২০ খ্রীঃ ফ্রান্স, পোলান্ডকে রাশিয়া আক্রমণে ও ইউক্রেনে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করতে উৎসাহিত করে। ১৯২১ খ্রীঃ নাগাদ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ উপলব্ধি করে যে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বলশেভিক রাশিয়াকে উৎখাত করা অসম্ভব। অন্যদিকে ইউরোপের অন্যত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপ্ন ব্যর্থ হল। বলা যেতে পারে, রাশিয়ায় যে পরিস্থিতি ও আর্য-সামাজিক অবস্থায় বিপ্লব সাফল্যলাভ করেছিল, অন্যত্র সেরকম পরিস্থিতি ছিল না। এছাড়া যুদ্ধের আনে বিজয়ী পাশ্চাত্য শক্তি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে নূতন রাষ্ট্রিক বিন্যাস সাধন করে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে লেনিনের নূতন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ই ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হয় ১৯২১ খ্রীঃ ইঙ্গ রুশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন। ১৯২১ খ্রীঃ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। যদিও লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫ খ্রীঃ) -র ফলে রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়েছিল, রাশিয়া নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিবিন্ন সম্মেলনে-ও অংশ গ্রহণ করতে থাকে। ১৯২৬ খ্রীঃ রাশিয়া লীগ কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯২৭-২৮ খ্রীঃ জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া যোগদান করে, এই সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া স্থল, নেট ও বিমানবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র অবিলম্বে ক্রমান্বয়িক হারে সংকোচন করা প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি, ১৯৩২ খ্রীঃ লীগ কাউন্সিলের উদ্যোগে জেনেভায় প্রথম বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনেও রাশিয়া বিশেষ ভূমিকা নেয়, সোভিয়েত প্রতিনিধি সমস্ত রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সমানুপাতিক হারে হ্রাস করার প্রস্তাব রাখেন। নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩২ খ্রী ঃ পোলান্ড, এস্টোনিয়া, লাটভিয়া, ফিনল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেয়। এই পর্যায়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিবিপ্লবী শক্তির দাপট শেষ হয় এবং পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন

১। লোকার্নচুক্তি কত সালে স্থাপিত হয়?

২। ১৯২৭ খ্রীঃ আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রাশিয়া কি প্রস্তাব দিয়েছিল?

৩। কিভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তিগুলির সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল?

৪.২.৪.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) E.H.Carr — *The Russian Revolution from Lenin to Stalin.*

(২) Kochan Lionel — *The Making of Modern Russia.*

(৩) Joll James — *Europe Since 1870.*

(৪) Eric Hobsbawm — *The Age of Empire.*

(৫) সমর কুমারমল্লিক — *নবরূপে ইউরোপ, ১৮৪৮-১৯১৯।*

(৬) প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় — *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।*

৪.২.৪.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

(২) রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের ভূমিকার মূল্যায়ণ কর।

(৩) পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
WORLD BETWEEN THE TWO WARS

একক ৫
জাতিসংঘ ও যৌথ নিরাপত্তা
বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.৩.৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৩.৫.১ ঃ জাতিসংঘ ও যৌথ নিরাপত্তা

৪.৩.৫.২ ঃ পুঁজিবাদ/ধনতন্ত্রের সংকট ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়

৪.৩.৫.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৩.৫.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৩.৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) যৌথ ইনরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা।

(২) জাতিসংঘের সামনে নানা সমস্যা ও সংকট।

(৩) জাতিসংঘের সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পতনের কারণ।

(৪) ইউরোপে পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের সংকট।

(৫) বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের উৎপত্তির কারণ।

(৬) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৪.৩.৫.১ ঃ জাতিসংঘ ও যৌথ নিরাপত্তা

বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মহান উদ্দেশ্য নিয়েই জাতিসংঘ তার যাত্রা শুরু করে। একটি সাধারণ সভা, একটি কাউন্সিল ও একটি স্থায়ী দপ্তর নিয়ে লীগ অব নেশনস্ গঠন করা হল।

জাতিসংঘ বা লীগ অব নেশনস্ ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রধানতম রক্ষাকরচ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দদফা (Fourteen Points)-র শেষ শর্তটিতে

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার উল্লেখ ছিল। বলা যেতে পারে, এই শর্তটির উপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘ গড়ে উঠে।

আন্তর্জাতিক এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠায় উইলসন একা ছিলেন না। অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রকে আঘাত করবে বেশী এবং সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হবে। ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লব ছিল এর প্রমাণ। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্কলহ ভুলে পুঁজিপন্থী শান্তি অর্জনের লড়াইয়ে পরিণত হোক, উইলসনের এই মনোভাবের শরিক অনেকেই হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, আন্তঃরাষ্ট্রিক ধারণা এই প্রথম এতটা স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রনেতাদের মনে আন্তর্জাতিক ধারণার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো আমেরিকার লানসিঙ্গ (Lansing), ইংল্যাণ্ডের বরার্ট সিসিল (Cecil), ফ্রান্সের লিওঁ বোর্জে (Leon Burgeois)-এরা কেউই আন্তরাষ্ট্রিক সংগঠনের কথা বলেননি, এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলেছিলেন। এক একটা জাতি যে পারস্পরিক রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সত্তার নিরিখে একটি আন্ত-রাষ্ট্রিক তথা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় সামিল হবে, তা উইলসনই ব্যক্ত করেছিলেন। জাতিসংঘের সনদে 'Promotion of International Co-operation' এবং Achieving of International peace and Security' কে জতিসংঘের প্রধান আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ স্বীকার করে যে যুদ্ধের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দ্বারা তারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করবে, ন্যায় ও সততার ভিতিতে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে ও আন্তর্জাতিক আনি-কানুন মেনে চলবে, নিজেদের ভিতর বিবাদ-বিসম্বাদ জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি করবে, কোনো রাষ্ট্র, জতিসংঘের নির্দেশ অমান্য করলে, অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গ তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করবে ও প্রয়োজন হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হবে। বিশ্বে যুদ্ধের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মহান উদ্দেশ্য নিয়েই জাতিসংঘ তার যাত্রা শুরু করে। একটি সাধারণ সভা, একটি কাউন্সিল ও একটি স্থায়ী দপ্তর নিয়ে লীগ অব নেশনস্ গঠন করা হল। এই প্রতিষ্ঠানের একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ সৃষ্টি করা হল।

প্রশ্ন ১। লীগ অব নেশনস্ এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

ত্রিশের দশক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংকটের যুগ নামে পরিচিত। কারণ এই সময়ে শান্তি ও গণতন্ত্র এক প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বিধি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক রাজনীতি সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বযুদ্ধ ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির উদ্ভব ও শক্তিবৃদ্ধি একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে লঙ্ঘন করেছিল, অন্যদিকে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। যদিও বিশের দশকে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব প্রতিপালনে সম্পূর্ণ সফল না হলেও তার ভূমিকা নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু ত্রিশের দশকে শুরু থেকেই একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তোলে এবং যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্র কাউন্সিলের নির্দেশ অথবা সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে মনে করবে এবং সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করবে।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষায় জাতি সংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার জন্য দুটি বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন — (ক) সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ দূরীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করার সময় জাতিসংঘে এ বিষয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ ছিল বা জাতিসংঘ নানাভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তা ব্যাখ্যা করা এবং (খ) বাস্তবক্ষেত্রে জাতিসংঘ সমষ্টিগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে কতদূর সক্ষম হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রধান পধান সমস্যার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দেয় যে জতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা তারা নেমে চলবে এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ব্যাহত হতে পারে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে জাতিসংঘের যে কোন সদস্যরাষ্ট্র সেই অবস্থার দিকে সাধারণসভা বা কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। জাতিসংঘ বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে।

জাতিসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র কাউন্সিলের নির্দেশ অথবা সালিশী বোর্ড বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে জাতিসংঘের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ তা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে মনে করবে এবং সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করবে। আক্রমণকারী দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে সদস্যরাষ্ট্রদের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে তা হ্রাস করার জন্য সদস্যরাষ্ট্রের পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে। তাছাড়া জাতিসংঙ্ঘের সদস্যরাষ্ট্ররা আক্রান্ত দেশকে সামরিকভাবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং সেই সাহায্যের পরিমাণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের কাউন্সিল বিভিন্ন সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য যে সদস্যরাষ্ট্রদের কাছে সাময়িক সাহায্য দাবী করার কোন অধিকার কাউন্সিলের ছিল না। কাউন্সিলের অধিকারছিল কেবলমাত্র সুপারিশ করার। এছাড়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে এমন ব্যবস্থা ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র, বিশেষ করে কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় এই অর্থনৈতিক অবরোধের মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইতালী যখন ইথিওপিয়া আক্রমণ করে তখন ইতালীর বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও জাপান জাতিসংঘের সদস্য নমা থাকায় এই অবরোধ বিশেষ কার্যকরী হয়নি।

প্রশ্ন

১। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধের বিষয়টি কি ছিল?

২। ইতালীর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবরোধ কার্যকর হয়নি কেন?

জাতিসংঘ নানাভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। নিরস্ত্রীকরণ জাতিসংঘের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং মনে করা হয়েছিল যে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করা সম্ভব হলে সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘের সাধারণ সভার অনুরোধে অস্থায়ী মিশ্র কমিশন (Temporary Mixed Commission) খসড়া চুক্তি রচনা করে যেটি Draft Treaty of Mutual Assistance নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে একটি দেশ আক্রান্ত হলে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সমস্ত রাষ্ট্র সেই

দেশকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তবে নিরাপত্তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের সংযোগ সাধনের জন্য এই চুক্তিতে স্থির হয় যে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যদি কোন রাষ্ট্র সম্মত না হয় তবে সেই রাষ্ট্রের জন্য এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে না।

পারস্পরিক সাহায্য সংক্রান্ত খসড়া চুক্তির বিরুদ্ধে অনেক রাষ্ট্রের অভিযোগ ছিল যে আক্রমণকারী রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংজ্ঞা না থাকায় সেই চুক্তি তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই ১৯২৪ খ্রীঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামশে ম্যাকডোনাল্ড এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী হ্যারিয়ট সাধারণ সবার পঞ্চম অধিবেশনে নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সংজ্ঞা যুক্ত করে এক নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। এটি হল Protocol for the pacific settlement of International Disputes সংক্ষেপে এই পরিকল্পনার নাম General Protocol এই প্রোটোকোলের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয় যে, দলিলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে, আইন সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধ স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপন করতে হবে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত সমস্ত রাষ্ট্র মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আইন সংক্রান্ত বিরোধ ছাড়া অন্যান্য বিরোধের জাতিসংঘের কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলে কাউন্সিলের দ্বারা নিযুক্ত সালিশী কমিটি বিচার করবে। এই বিচার উভয় পক্ষকেই মেনে নিতে হবে। কোন বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বা কাউন্সিলের বা সালিশী কমিটির বিচারাধীন থাকার সময় কোন রাষ্ট্র যদি সৈন্য সমাবেশ বা প্রস্তুতি আরম্ভ করে তবে সেই দেশকে আক্রমণকারী রূপে গম্য করতে হবে বলে প্রোটোকলে বলা হয়। জাতিসংঘের কাউন্সিলকে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার এবং প্রয়োজন হলে ক্ষতিপূরণ ধার্য করার অধিকার দেওয়া হবে। নিরাপত্তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য এই প্রোটোকলে প্রস্তাব করা হয় যে ১৯২৫ খ্রীঃ ১৫ জুনের মধ্যে বহু সংখ্যক রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করে নিলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হবে।

*১৯২৪ খ্রীঃ সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সংজ্ঞাযুক্ত করে **'General Protocol'** নামে এক নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি।*

জেনেভা প্রোটোকল শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধর বাধ্যতামূলক সালিশী কমিটির বিচার ব্রিটেন মেনে নিতে অস্বীকার করে। ব্রিটেন তার নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তিত ছিল না। তাই সমষ্টিগত নিরাপত্তার বেড়াজালে ব্রিটেন বিশেষ জড়িত হতে চায়নি। তাছাড়া কানাড়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড অভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে জেনেভা প্রোটোকলের সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজী ছিল না।

জেনেভা প্রোটোকল প্রত্যাখ্যাত হলেও এই পরিকল্পনার মূল বিষয় কয়েকটি রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয়। এটি হল লোকার্ণ চুক্তি। জাতিসংঘের বাইরে কয়েকটি রাষ্ট্রের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অষ্টেন চেম্বারলেন জেনেভা প্রোটোকল সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় বলেছিলেন যে, আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ না দেওয়ায় জাতিসংঘের মাধ্যমে সাধারণভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন কার্যকরী চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ অনেক চেষ্টা করেও যেখানে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে পারেনি, সেখানে জাতিসংঘের বাইরে লোকার্ণ চুক্তি

অন্ততঃ আঞ্চলিকভাবে তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। লোকার্ণ চুক্তি স্দ্রত্রআক্ষরিত হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে কেলগব্রিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি 'জাতীয় নীতি হিসাবে যুদ্ধ বর্জনে' স্বীকৃত হয়। এর ফলে জাতিসংঘের মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রশ্ন

১। জেনেভা প্রোটোকল কত সালে গঠিত হয়?

২। জেনেভা প্রোটোকলের মূল বিষয় কি ছিল?

মাঞ্জুরিয়া সমস্যা

জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় সুদূর প্রাচ্যে। সেখানে জাপানের আগ্রাসী তৎপরতা থেকে সংকট সৃষ্টি হয় এবং তা প্রতিরোধ করতে জাতিসংঘের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়। মাঞ্চুরিয়াতে ক্ষমতা সম্প্রসারণ নিয়ে জাপান, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বহু বছর ধরেই বিরোধ ছিল জাপান সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে ১৮৯৫ খ্রীঃ চীনকে পরাজিত করে লিয়াওটাং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার অধিকার করে নেয় এবং চীনকে কোরিয়ার স্বাধীনতা মেে নিতে বাধ্য করে। কিন্তু জার্মানী, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধিতার ফলে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ পোর্ট আর্থারে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হলে জাপান অসন্তুষ্ট হয় এবং ১৯০৪ খ্রীঃ যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে লিয়াওটাং উপদ্বীপে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এর পরেও চীনের সঙ্গে জাপানের শত্রুতা অব্যাহত থাকে এবং ১৯১০ খ্রীঃ কোরিয়াতে জোপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে (১৯২১-২২ খ্রীঃ) জাপান প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চীনে যে সব অধিকার লাভ করে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেও জাপান আবার চীনে বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে। ১৯৩১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

লীগ কাউন্সিল জাপানকে তার সৈন্য বাহিনী রেলপথ অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলে জাপান তা উপেক্ষা করে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। জতিসংঘ তার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং লিটনকে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।

জাতিসংঘের ১১ নং ধারা অনুযায়ী চীন জাতিসংঘের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করে। ১১ নং ধারায় বলা হয়েছিল যে জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। উল্লেখ্য, এই ধারা অনুযায়ী লীগ কাউন্সিলের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঐক্যমত্য প্রয়োজন। প্রথমে লীগ কাউন্সিল জাপানকে তার সেনাবাহিনী রেলপথ অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলে জাপান এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। জাপান জাতিসংঘের প্রস্তাব উপেক্ষা করে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। বিজিত ভূখণ্ডের নাম রাখা হয় মাঞ্চুকুয়ো। মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাতিসংঘ তার ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে (ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালি) একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং ব্রিটেনের প্রতিনিধি লর্ড লিটন এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। এই কমিশনের ওপর সমস্যার প্রকৃতি অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে জাপান চীনের মূল ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়। ১৯৩২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে জাপান চীনের সাংহাই শহরে বোমাবর্ষণ করে। চীন জাতিসংঘের ১০ ও ১৫ ধারার প্রয়োগ দাবী করে কিন্তু জাতিসংঘ চীনের দাবীর প্রতি

নীরবতা দেখায়। ১৯৩২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে লিটন কমিশনের প্রতিবেদন লীগের সদর দপ্তরে পেশ করা হয়। এতে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানের সকল অজুহাত নাকচ করা হয় এবং স্বাধীন মাঞ্চুকুয়ো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে একটি সাজানো পদক্ষেপ বলা হয়। তবে লিটন কমিশনের প্রতিবেদনে জাপানকে আক্রমণকারী চিহ্নিত করা হলেও লীগ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারায় উল্লিখিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ সম্পর্কে কোন কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়নি। ১৯৩৩ খ্রীঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘের সংসদে লিটন কমিশন কনিয়ে ভোটাভুটি হয়। উপস্থিত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪২টি দেশ লিটন কমিশন রিপোর্ট মঞ্জুর করে। জাপান বিপক্ষে ভোট দেয় এবং শ্যামদেশ ভোটদানে বিরত থাকে। লিটন কমিশনের রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার পর জাপান জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

মাঞ্চুরিয়াতে জাতিসংঘের ব্যর্থতার ফলে সমষ্টিগত নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাস অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে যায়। মাঞ্চুরিয়াতেই প্রথম জাতিসংঘ একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে তার আক্রমণাত্মক নীতি থেকে প্রতিহত করার সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্যান্য বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। সমস্ত পৃথিবী তখন এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং কোন রাষ্ট্রই জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজী ছিল না। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু রাশিয়া তার নিজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে এত ব্যস্ত যে জাপানের বিরুদ্ধাচারণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সমর্থন করতে না পারলেও কোন বৃহৎ রাষ্ট্র কার্যকরীভাবে সেখানে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা তার নিজের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল মনে করেনি। তাই জাতিসংঘের সমস্ত কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের পররাষ্ট্রনীতি দ্বারাই বিশ্ব রাজনীতি পরিচালিত হত। সেইরকম কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে জাতিসংঘের পক্ষে কোন দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

প্রশ্ন

১। লিটন কোন দেশের প্রতিনিধি ছিল?
২। মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
৩। চীন জাপনের বিরোধ বেধে ছিল কেন?

ইথিওপিয়া সংকট

জাতিসংঘের মর্যাদা ও অস্তিত্বের ওপর বৃহত্তর আঘাত আসে ইতালীর কাছ থেকে। জাপান কর্তৃক সম্প্রসারণ নীতির অবতারণার ফলে যেমন সুদূর প্রাচ্যে শান্তি বিপন্ন হয়েছিল, ইতালীর ফ্যাসিস্ত নেতা মুসোলিনী আফ্রিকার ইতিওপিয়া রাজ্য আক্রমণ করায় পুনরায় জাতিসংঘের অকার্যকারিতা প্রমাণিত হল। ঊনিশ শতকের শেষদিকে ইতালী ইথিওপিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতার ফলে তা ফলপ্রসূ হয়নি। ইতালীতে মুসোলিনীর একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রবর্তনের ফলে ইতালী পুনরায় সম্প্রসারণশীল পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণে উদ্যত হয়। ত্রিশের দশকের শুরুতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জমান হয় এবং মূল শত্রু ফ্রান্স জার্মানীতে হিটলারের আগমনের ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে ইতালির প্রতি মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হয়। এইরকম অনুকূল

পরিবেশে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৯৩৪ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ওয়াল ওয়াল নামক স্থানে আবিসিনিয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইতালীর অধীনস্থ সোমালিল্যাণ্ড থেকে আগত টহলদারী সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। এতে কয়েকজন ইতালীর সৈন্য নিহত হয়। এই ঘটনায় ইতালী সরকার আবিসিনিয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবী করে। আবিসিনিয়া সরকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের নিকট আবেদন জানায় এবং চুক্তিপত্রে ১১ নং অনুযায়ী এই সমস্যাকে জাতিসংঘের বিচার্য বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানায়।

জাতিসংঘের ধারণা ছিল যে সালিশীর সাহায্যে ইতালী ও ইথিওপিয়া তাদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনিয়ার আবেদনক্রমে জাতিসংঘ আপোষ মীমাংসার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্য ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন, পোলান্ড, স্পেন ও তুরস্ক। ইতালী কোন প্রকার আপোষ মীমাংসায় যেতে রাজী হয়নি। ১৯৩৫ খ্রীঃ ৩রা অক্টোবর ইতালী প্রকাশ্যভাবে আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। এই অবস্থায় জাতিসংঘ কর্ত্তৃক নিযুক্ত আপোষ-মীমাংসার কমিটির সুপারিশক্রমে ৭ই অক্টোবর জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারা অনুসারে সর্বসম্মতভাবে ইতালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আক্রমণকারীরূপে সনাক্ত ইতালীর বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবে সকল সদস্যরাষ্ট্রকে ইতালীর সঙ্গে সর্বপ্রকার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স জাতিসংঘের নির্দেশ পালন করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিল না। তারা ইতালীর বিরাগভাজন হতে চায়নি। ব্রিটেন ইতালীর সঙ্গে তেল রপ্তানী অব্যাহত রাখে। এই সময় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালীর নীতির মধ্যে স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তারা একদিকে জাতিসংঘের অগ্রগণ্য সদস্য রূপে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি, অন্যদিকে তারা ইতালীর বিরাগভাজন হতে চায়নি। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়ের লাভাল ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামুয়েল হোর ১৯৩৫ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর ইতালীর সঙ্গে একটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুসারে আবিসিনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড ইতালীকে হস্তান্তর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ইতালীর আক্রমণের চাপে আবিসিনিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। আবিসিনিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের নেতা উইনস্টন চার্চিল ছিলেন একনায়কতন্ত্র বিরোধী প্রতিরোধমূলক শক্তি সংঘের প্রধান প্রবক্তা। ১৯৩৬ খ্রীঃ 'হাউস অব কমনস্'-এ এক ভাষণে জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সুদৃঢ় করতে আহ্বান জানান।

এইভাবে ১৯৩৬ খ্রীঃ থেকে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাপানের আঘাতে জাতিসংঘের ব্যর্থতা প্রথম প্রমাণিত হয়। ইতালীর আঘাতে দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠে। শেষে জার্মানীর সম্প্রসারণ নীতির ফলে যৌথ নিরাপত্তার শেষ রেশটুকু অবলুপ্ত হয়। ইতালীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হিটলার ভার্সাই চুক্তি ও লোকার্ণ চুক্তির ধারা অমান্য করে, রাইন অঞ্চলে সেনা সমবেশ করেন (৭ই মার্চ, ১৯৩৬ খ্রীঃ)। ব্রিটেন কোনরকম প্ররোচনা না দেওয়ার জন্য ফ্রান্সকে নির্দেশ দেওয়ায় ফ্রান্স কোনরকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস পেল না। এই অবস্থায় জাতিসংঘের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যৌথ নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে বিধিব্যবস্থা বলবৎ হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ.জে.পি. টেলর মন্তব্য করেন, 'The German re-occupation of the Rhineland marked the end of

devices for security which had been set up after the first world war.' জার্মান সম্প্রসারণের জয়যাত্রা শুর হওয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নৈরাজ্য নেমে এল। জার্মান আগ্রসনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকার্যকর, সেই সময় ব্রিটেন জার্মানীর প্রতি আত্মঘাতী তোষণ নীতি অনুসরণ করে। ১৯৩৯ খ্রীঃ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ পরিসমাপ্তি ঘটে।

যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় লীগের ব্যর্থতার জন্য জাতিসংঘ নয়; বরং এরজন্য দায়ী ছিল সমকালীন প্রতিকুল পরিবেশ ও সদস্য রাষ্ট্রদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা। ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের নেতা উইনস্টন চার্চিল ছিলেন একনায়কতন্ত্র বিরোধী প্রতিরোধমূলক শক্তিসংঘের প্রধান প্রবক্তা। ১৯৩৬ খ্রীঃ নভেম্বরে 'হাউস অব কমনস্'-এ প্রদত্ত এক বলিষ্ঠ ভাষণে তিনি জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সুদৃঢ় করতে আহ্বান জানান। কারণ তাঁর মতে একমাত্র এই পথেই শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চার্চিলের মতে ইংল্যাণ্ডকেই এই বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। কিন্তু চার্চিলের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদ ডেকে আনল।

জাতিসংঘের লক্ষ্য আগামী প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা হলেও জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে যুদধ বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়নি। চুক্তিপত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছিল। জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসূত হয়েছিল, তার ফলে জাতিসংঘের কার্যকারিতা বিপন্ন হয়। ৫(১) নং ধারা অনুসারে জাতিসংঘ কাউন্সিল বা পরিষদে কয়েকটি ৭ত্র ছাড়া অন্যত্র কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি দানের প্রয়োজন ছিল। কোন সদস্য রাষ্ট্র তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে আশঙ্কা করে কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে পরিষদের পক্ষে কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হত না। জাতিসংঘ আক্রমণ বন্ধের জন্য শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণের অধিকারী ছিল, কিন্তু প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য কোন তার নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী ছিল না। ফলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

প্রশ্ন

১। ফ্রান্স ও ব্রিটেন জাতিসংঘের ইতালীয় নীতি কার্যকর করতে চায়নি কেন?

২। ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের নেতা কে ছিলেন?

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখা জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সামঞ্জস্য স্থাপনে অনেক রাষ্ট্রই ব্যর্থ হয়। আবার জাতিসংঘের গাঠামোগত দুর্বলতা শুরু থেকেই সংগঠনকে সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের অগ্রগতির ফলে ঐ দুটি দেশ বিশ্বরাজনীতিতে প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। জাপানই ছিল ইউরোপ বহির্ভূত একমাত্র শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্র। অন্যদিকে ইউরোপের অভ্যন্তরে জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়নি। বলা যেতে পারে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যে অবিশ্বাস, ভয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা দ্বারা জাতিসংঘের আদর্শ ব্যাহত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথম জাতিসংঘে গ্রহণ না করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘকে

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথম জাতিসংঘে গ্রহণ না করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল না।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করে। তাই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা হলেও জাতিসংঘ প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল না। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তারা নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। জাতিসংঘের কাঠামোগত দুর্বলতার একটি দিক হলে সদস্যরাষ্ট্রদের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রত্যাহারের প্রবণতা। চুক্তিপত্রের ১(৩) নং ধারায় কোন সদস্য রাষ্ট্রকে দু-বছরের বিজ্ঞপ্তি মারফৎ সদস্যপদ নাকচের অধিকার দেওয়া হয়। ত্রিশের দশকে এই সুযোগে জাপান, জার্মানী, ইতালী জাতিসংঘ ত্যাগ করে এবং এরফলে জাতিসংঘের কার্যকারিতা ও মর্যাদাহানি ঘটে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এক সঙ্গে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত না থাকায় জাতিসংঘের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না। কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় সেই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হওয়া সম্ভব ছিল না। ইতালী-ইতিওপিয়া যুদ্ধে এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

একেনায়কতন্ত্রী ও সমরবাদী রাষ্ট্র জাপান, জার্মানী ও ইতালীর সংশোধনবাদী ও সম্প্রসারণশীল তৎপরতা ত্রিশের দশকে জাতিসংঘের অক্ষমতা প্রতিপন্ন করে। সামগ্রিকভাবে তারা শান্তি ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ হয়নি। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিশেষতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের ভেতরে ও বাইরে কোন সক্রিয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল না। একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির হিংসাত্মক আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ বিফল হয়েছিল। তবে যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব পালনে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল তা ঐতিহাসিক দিক থেকে অর্থহীন বলা চলে না। কারণ এর উপর ভিত্তি করেই বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীকে জাতিসংঘের সদস্য পদ দেওয়া হয়নি কেন?

২। আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতি সংঘের সম্ভব হয়নি কেন?

৪.৩.৫.২ ঃ পুঁজিবাদ/ধনতন্ত্রের সংকট ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়

বিংশ শতকের তিরএশর দশক পরিচিত সংকটের যুগ নামে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটে পাশ্চাত্য জগৎ আচ্ছন হয়ে পড়েছিল। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি — দুই ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হলেও ঐ দশকের শেষ বছরে এবং ত্রিশের দশকের শুরু থেকে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ সংকটের জালে নিমগ্ন হয়। সংকটের প্রথম অভিব্যক্তি হল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা বা বিপর্যয়।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। বিশের দশকে পাশ্চাত্য জগতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নেয়। ডয়েজ পরিকল্পনা, ইয়ং

ইউরোপে মার্কিন ঋণের সম্পূর্ণ স্থগিতকরণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের দিক নির্দেশ করে, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ক্রমক্ষমতা একেবারে শুকিয়ে যায় এবং সর্বনাশা মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়।

পরিকল্পনা — এই দুই ক্ষেত্রে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতামত চূড়ান্তভাবে বিবেচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধানতম উৎপাদক ও সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন দেশে পুঁজি বিনিয়োগে তাঁর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। মার্কিন ঋণের সুবাদে জার্মান ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও আন্তঃমিত্র ঋণ পরিশোধ সমস্যা প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলির কার্যকর মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে ইউরোপের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা মার্কিন পুঁজির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯২৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল পাশ্চাত্য অর্থনীতির এই মার্কিন কেন্দ্রিকতা কারণ মার্কিন অর্থনীতির গতিশীলতা ব্যাহত হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতের অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

১৯২৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে নিউইয়র্কে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারমূল্যের অবনমন দিয়ে ইউরোপে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক মন্দার সূত্রপাত ঘটে। ইউরোপে মার্কিন ঋণের সম্পূর্ণ স্থগিতকরণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের দিক নির্দেশ করে, সমগ্র বিশ্বজুড়ে ক্রয়ক্ষমতা একেবারে শুকিয়ে যায় এবং সর্বনাশা মুদ্রামূল্য হ্রাস হয়। ১৯২৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বিদেশে বে-সরকারী মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ রুদ্ধ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মন্দা শুরু হওয়ায় আমদানি বাণিজ্যের মাত্রা সংকুচিত হয়। মার্কিন বাণিজ্যের সংকোচন বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর চরম আঘাত হানে। কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা এ মন্দার ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল, মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, পুঁজিবাদ ধ্বংস হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রধান কারণ কি ছিল?

২। অর্থনৈতিক মহামন্দা কতবছর স্থায়ী হয়েছিল?

মহামন্দার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে ঋণদান স্থগিত করায় অর্থনৈতিক সমস্যার আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করে। জার্মানীতে সংকটের মাত্রা ছিল সবচেয়ে তীব্র, কেননা জার্মানী ছিল মার্কিন ঋণের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, ১৯২৪ খ্রীঃ ডয়েজ পরিকল্পনার পরবর্তী পাঁচ বছরে জার্মানী বিদেশ থেকে ৯০০ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করেছিল, ৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধ করেছিল। উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছিল, কিন্তু পুঁজি বৃদ্ধির দিকে কোন নজর দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় বিদেশীয় পুঁজির সমাগম বন্ধ হওয়ায় জার্মান অর্থনীতি সঙ্কটে নিমজ্জিত হল। জার্মানীর আমদানি ও রপ্তানী দুই ধরনের বাণিজ্য ধাক্কা খেল, কলকারখানা অচল হয়ে পড়ল, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। জার্মানী ক্ষতিপূরণের কিস্তি পরিশোধ করতে অস্বীকার করল। জাতিসংঘের উদ্যোগে হাঙ্গেরী, গ্রীস ও বুলগেরিয়া যে আর্থিক ঋণ পেয়েছিল সেগুলিও পরিশোধ করতে ব্যর্থ হল। আন্তর্জাতিক

১৯২৪ খ্রীঃ ডয়েজ পরিকল্পনার পরবর্তী পাঁচ বছরের জার্মানী বিদেশ থেকে ৯০০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করেছিল, ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধ করেছিল।

প্রশ্ন

১। ডয়েজ পরিকল্পনা কত সালে হয়?

২। অর্থনৈতিক মহামন্দায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ কোনটি?

৩। ব্রিটিশ মুদ্রার নাম কি?

বাণিজ্যিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় ব্রিটেন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ ব্রিটেন পরিবহন ও পণ্যের ব্যবসায়ে অর্থলগ্নী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। ১৯৩১ খ্রীঃ জুলাইয়ে ব্রিটিশ বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ান পাউণ্ড। ব্রিটিশ মুদ্রা স্টার্লিং-এর দ্রুত অবনমন শুরু হল।

মহামন্দার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। উদার পুঁজিবাদ, অবাধ অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের প্রচলিত মূল্যবোধের বিনষ্টি ইউরোপকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। অর্থনৈতিক সংকট যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছিল, পশ্চিমের নেতৃবর্গ বহুদিন পর্যন্ত তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একদিকে ইউরোপের সাধারণ মানুষের গরিষ্ঠ অংশ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক চরমপন্থার মধ্যে সমাধানের পথ খুঁজেছিল, অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তমহল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশ হয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পথ অবলম্বন করতে চেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দিকে আগ্রহের যুক্তি ছল সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতিতে। একমাত্র রাশিয়াই মহামন্দার গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে উন্নয়নের গতিব্যাহত রাখতে পেরেছিল। বলা যেতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে মহামন্দা সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। মহামন্দা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে অন্ধ রুশ-বিরোধী নীতি বর্জনে বাধ্য করেছিল। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া প্রাক্-বিপ্লব যুগে জারের গৃহীত বিদেশী ঋণ অস্বীকার করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখেনি। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীঃ ক্ষমতায় এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মহামন্দা কবলিত রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। রাশিয়া পশ্চিমী অর্থনৈতিক জগতে আর অস্পৃশ্য ছিল না। রাজনৈতিক ও আদর্শগত দিক থেকে বিরোধীগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দুর্দশা রাশিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল।

একদিকে ইউরোপের সাধারণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক চরমপন্থার মধ্যে এই অবস্থা সমাধানের উপায় খুঁজছিল। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত মহল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পথ অবলম্বন করতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন

১। ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তরা কেন সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল?

২। ১৯৩২ খ্রীঃ কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন?

জার্মানীর সাধারণ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, পেশাদার শ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজনৈতিক ক্ষোভের সদ্ব্যবহার করেছিল হিটলারের নেতৃত্বাধীন ন্যাৎসী দল। আর্থিক সংকটজনিত নৈরাশ্যের সময়ে নূতন অর্থব্যবস্থার লোভ দেখিয়েও জার্মান পুঁজিপতিদের কমিউনিস্ট ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ১৯৩২ খ্রীঃ হিটলার ক্ষমতা দখল করেছিলেন। মহামন্দার মোকাবিলা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ কিছু ব্যবসথা নিয়েছিল, সেগুলি ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় পণ্য যাতে সেদেশে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য বাধার প্রাচীর তুলে দিয়েছিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের অনীহা ছিল। বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ

আর্থিক সংকটজনিত সময়ে নতুন অর্থব্যবস্থার লোভ দেখিয়ে ও জার্মান পুঁজিপতিদের কমিউনিস্ট ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ১৯৩২ খ্রী হিটলার ক্ষমতা দখন করেছিলেন।

অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই স্বতন্ত্র জাতীয় সচেতনতা, এই ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোর সুযোগকে সদ্ব্যবহার করে হিটলার গোটা ইউরোপকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক ই. এইচ. কার মন্তব্য করেছেন, ১৯৩৩ খ্রীঃ যখন অর্থনৈতিক দুর্যোগের মেঘ কেটে যেতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজনৈতিক পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। বিভিন্ন দেশ যখন অর্থনৈতিক সংকটে নিমগ্ন, তখনই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করার সময় হিসেবে বেছে নেয় এবং জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে আসে। জার্মানী একইভাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নেয় এবং সমরসজ্জার দিকে দৃষ্টি দেয়। এইভাবে যৌথ নিরাপত্তা ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন

১। হিটলার কোন পরিস্থিতিতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন?

২। হিটলার কিভাবে জার্মানীর ক্ষমতা দখল করেছিলেন?

৪.৩.৫.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) David Thomson – *Europe Since Napoleon.*

(২) A.J.P. Tyalor – *Origins of the Second World War.*

(৩) E. H. Carr – *International Relations Between the Two World Wars.*

(৪) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।*

(৫) অলক কুমার ঘোষ — *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)।*

(৬) গৌরীপদ ভট্টাচার্য্য — *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।*

৪.৩.৫.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) উনবিংশ শতকে ত্রিশের দশকে জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পতন কিভাবে হয়েছিল?

(২) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের পিছনে কি কি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল? মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কি ভূমিকা পালন করেছিল?

(৩) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার উৎপত্তির কারণ কি? ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

WORLD BETWEEN THE TWO WARS

একক - ৬

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ

ইতালিতে মুসোলিনী ও জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.৩.৬.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৩.৬.১ ঃ ভূমিকা

৪.৩.৬.২ ঃ ইতালিতে মুসোলিনীর ক্ষমতালাভ ও ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা

৪.৩.৬.৩ ঃ ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব ও নানা লক্ষণ

৪.৩.৬.৪ ঃ মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতি

৪.৩.৬.৫ ঃ হিটলারের ক্ষমতালাভ ও জার্মানীতে নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা

৪.৩.৬.৬ ঃ হিটলারের ক্ষমতা দখলের এবং নাৎসি দলের সাফল্যের কারণ

৪.৩.৬.৭ ঃ নাৎসি মতবাদ

৪.৩.৬.৮ ঃ হিটলারের বৈদেশিক নীতি

৪.৩.৬.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৩.৬.১০ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৩.৬.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতালিতে কিভাবে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল।

(২) ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব, নানা বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ।

(৩) মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ধারা।

(৪) হিটলারের জার্মানীতে ক্ষমতালাভ এবং নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা।

(৫) নাৎসি দলের সাফল্যের নানাবিধ কারণ।

(৬) নাৎসি মতবাদ-এর বৈশিষ্ট্য।

(৭) হিটলারের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধারা।

৪.৩.৬.১ ঃ ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা পালাবদল চলতে থাকে। ত্রিশের দশকে ইউরোপে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সমাবেশই ঘটল না; একইসঙ্গে পরস্পর বিরোধী দুটি মতাদর্শেরও আবির্ভাব দেখা দিল। একদিকে গণতন্ত্র ও শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা চলল। আবার অন্যদিকে ভার্সাই চুক্তিকে নস্যাৎ করে একনায়কতন্ত্রের উন্মেষ ঘটল ও সম্প্রসারণ নীরি প্রয়োগ করা হল। এই একনায়কতন্ত্রের উন্মেষের ফলে ইতালিতে একনায়কতন্ত্রী ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা হল। ফ্যাসিস্ত দলের নেতা, হিসেবে বেনিটো মুসোলিনী হলেন ইতালির সর্বময় কর্তা। ঠিক একইভাবে জার্মানীতে গণতন্ত্র ও শান্তির বিকলপরূপে একনায়কতন্ত্র ও সমরবাদ জন্ম নিল। জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল নাৎসিবাদী একনায়কতন্ত্রী রাজনীতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে দুটি পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটে। একটি হল গণতন্ত্র ও শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা এবং অন্যটি হল একনায়কতন্ত্রের উন্মেষ ও তার সম্প্রসারণ নীতির প্রয়োগ।

প্রশ্ন

১। ইতালীর ফ্যাসিস্ত দলের নেতা কে ছিলেন?

২। ইউরোপে পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ দুটি কি ছিল?

৪.৩.৬.২ ঃ ইতালিতে মুসোলিনীর ক্ষমতালাভ ও ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে যে ভার্সাই সম্মেলন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ইতালির কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করা হয়নি। একেবারে শূন্য হাতে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। যে লাভের আশায় ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যেগদান করেছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। ইতালিবাসীর এই হতাশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইতালির শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কারণে। অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি, কম উৎপাদন, বন্ধ কল-কারখানা, শ্রমিক অসন্তোষ, দেশবাসীর আর্থিক অনটন, কৃষক বিক্ষোভ ইত্যাদি নানা ঘটনা ইতালিতে অশান্ত ডেকে আনে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর ইতালির রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর ফলে ইতালির জনগণ একটি সুদৃঢ় সরকার ও শাসনব্যবস্থা প্রতষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করতে লাগল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে এই অস্থিরতা ও দুর্বলতা ইতালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের আগমনের পথ সুগম করল। গণতন্ত্রের দুর্বলতা ও সেনাবাহিনী ও শাসকগোষ্ঠীর সাম্যবাদ বিরোধী মনোভাব মুসোলিনীকে ক্ষমতা দখলে সাহায্য করেছিল।

ভার্সাই সন্ধির পর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বলতা ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের আগমনের পথ সুগম করেছিল।

ক্ষমতা দখলের প্রথম পর্ব (১৯২২-২৬ খ্রীঃ) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ইতালিতে নানা সন্ত্রাস ও দমনমূলক কাজ চালিয়ে সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তার ফ্যাসিস্ত দলকে একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিলেন। অন্য সব উদারতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় করে

দিলেন। দ্বিতীয় পর্বে (১০২৭-৩৯ খ্রীঃ) তিনি ইতালিতে ফ্যাসিস্ত মতাদর্শকে সর্বাগ্রে স্থান দিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ইতালিতে কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ও শ্রমিক সংগঠনের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপন করা হল।

প্রশ্ন

১। ইতালীতে কেন একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

২। মুসোলিনী ইতালীতে কিভাবে ফ্যাসীবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৪.৩.৬.৩ ঃ ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব ও নানা লক্ষণ

ফ্যাসিবাদের মূল কথা হোল রাষ্ট্রের সর্বময় প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই মতাদর্শানুসারে রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা, রাষ্ট্রস্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের অনেক উপরে। ইতালিয়ান 'ফ্যাসিস্‌মো' (Fascismo) কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ফ্যাসিজম (Fascism)। বাংলায় একে বলা হয় ফ্যাসিবাদ। 'Fascism' (ফ্যাসিজিম্‌) শব্দটির সরাসরি উৎপত্তি ইতালিয়ান 'ফ্যাসিও' (Fascio) শব্দ থেকে। পরোক্ষভাবে শব্দটি লাতিন 'ফাসেস' (Fasces) এর সঙ্গে যুক্ত। ফ্যাসিজম্‌ এর অর্থ হল 'একগুচ্ছ' বা একসঙ্গে গ্রথিত।

ইতালিয়ান 'ফ্যাসিসমো' কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল ফ্যাসিজিম। বাংলায় একে বলা হয় 'ফ্যাসিবাদ'।

প্রশ্ন

১। ফ্যাসিজিম শব্দের অর্থ কি?

সাম্যবাদী তত্ত্বে ফ্যাসিস্ট শব্দটি নিন্দাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রাচীন রোমে এটি ছিল একতা, ক্ষমতা ও বাধ্যতার প্রতীক। যেসব ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, উদারতন্ত্র বিরোধী এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী তাই ফ্যাসিবাদের অন্তর্ভুক্ত। ফ্যাসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। ইতিহাসগতভাবে ফ্যাসিবাদ বলতে বোঝায় ইতালিতে মুসোলিনির ক্ষমতালাভের এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময়কাল অর্থাৎ ১৯২২ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কারণ এই সময়ে মুসোলিনী ইউরোপে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর নীতি, আদর্শ, আন্দোলন ও সম্প্রসারণ নীতির জাল বিস্তার করেছিলেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে কিভাবে ইতালিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল সম্ভব হয়েছিল। ফ্যাসিবাদী ভাবাদর্শের বেশ কিছু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট ছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ঃ (১) পুঁজিবাদী শোষণ এবং হিংসাত্মক সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ; (২) বিরুদ্ধ মতাদর্শের উপর আক্রমণ এবং নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতা; (৩) উগ্র জাতীয়তাবাদ, (৪) জাতি শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান বজায় রাখার সংকল্প, (৫) সমাজতন্ত্র বিরোধী চিন্তাভাবনা; (৬) ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালানো; (৭) "Elitism" আভিজাত্যকে) মেনে নেওয়া ও প্রশ্রয় দেওয়া; (৮) সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণে যে কোন পন্থা গ্রহণ যেমন যুদ্ধ, গণহত্যা, অত্যাচার এবং যে কোনো রকমের হিংসার আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি; (৯) মার্কসীয় সাম্যবাদের বিরোধিতা করে অপ্রতিহত, অহঙ্কারী,

ইতিহাসগতভাবে ফ্যাসিবাদ বলতে বোঝায় ইতালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভের এবং ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত সময়কালকে।

সর্বক্ষমতাময় একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্ব; (১০) সমাজবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের ঘোরতর বিরোধিতা করা। (১১) তত্ত্বগতভাবে সর্বক্ষমতাময় হেগেলিয় আদর্শবাদ গ্রহণ করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আদর্শবাদের পরিবর্তে নেতাভিত্তিক একনায়কতন্ত্রী শাসন চালানো। (১২) 'কর্পোরেট' (সমন্বয়ী) রাষ্ট্রে পরিণত করা। ফ্যাসিবাদকে তত্ত্বগতভাবে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল হবে। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মত একটি দীর্ঘ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে আসেনি। এই মতাদর্শ গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিতও নয়। এটি বহু রাজনৈতিক তত্ত্বের টুকরো টুকরো অংশের একটি সংকলন মাত্র। আসলে ফ্যাসিবাদ ছিল কর্মপ্রধান। তাই মুসোলিনী ইতালিতে তাঁর একনায়কতন্ত্রী শাসনের সমর্থনে একটি রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সে কারণেই তিনি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত "Doctrine of Fascism" নামক রচনায় তাঁর ফ্যাসিবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। হেগেলিয় দার্শনিক গিওভানি জেন্টিলে ফ্যাসিসমোর বা ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।

প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি কি কি?

২। "Doctrine of Fascism" কত সালে প্রকাশিত হয়?

ফ্যাসিবাদের তত্ত্বগত দিকটি বিচার করলে কতকগুলি লক্ষণ ধরা পড়ে। ফ্যাসিবাদের মূল কথা হল, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি স্বাধীন জৈবিক সত্তা। এর নিজস্ব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিত্ব আছে। রাষ্ট্রশক্তির সর্বব্যাপিতা (all-pervasivedness) আছে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় কথা। রাষ্ট্র হল সর্বগ্রাসী, কর্তৃত্বে ও সর্বরকম নিয়ন্ত্রণের কেমাত্র অধিকারী। যেহেতু রাষ্ট্রের উপরে আর কিছু থাকতে পারে না, সে কারণে সর্বরকম ব্যক্তিস্বার্থকে রাষ্ট্রের কল্যাণে বিসর্জন দিতে হয়। রাষ্ট্রই একমাত্র হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, 'সার্বজনীন বিবেক' ও নৈতিকতার পূর্ণ প্রতীক। রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে মুসোলিনীর বক্তব্য হল ঃ "রাষ্ট্রের মধ্যেই সমস্ত কিছু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু নয়, রাষ্ট্রের বাইরেও কিছু নয়।" রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে ওঠে এবং সেই জাতির ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রকাশলাভ করে। সর্বব্যাপী রাষ্ট্র মানুষের সামগ্রিক জীবনের নিয়ন্তা। ফ্যাসিবাদ সাম্যবাদীদের শ্রমিক-পুঁজিপতি শ্রেণী সংঘাতের বিরোধিতা করে শ্রেণী ঐক্য বা সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছিল। কারণ এই সহযোগিতার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি একমাত্র সম্ভবপর। ইতালিতে মুসোলিনীর আমলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমস্ত রকম কার্যকলাপ ও প্রচার বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের অনিবার্য প্রাধান্য বজায় রাখা হত এবং ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত নীতি নির্ধারিত হত। সমগ্র ইতালিতে ফ্যাস্টি মূল্যবোধ গড়ে তোলাই ছিল ফ্যাসিবাদি রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্র হল সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের ও সবরকম নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অধিকারী। এই রাষ্ট্রই হল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, 'সার্বজনীন' বিবেক ও নৈতিকতার একমাত্র পূর্ণ প্রতীক।

প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদের মূল কথা কি?

ফ্যাসিবাদ জনগণের সমস্ত যুক্তিবাদী প্রবণতার ঘোরতর বিরোধী ছিল। ফ্যাসিস্তদের মতে, মানুষ মূলতঃ যুক্তিহীন জীবন। ফ্যাসিবাদ তাই যুক্তিবাদের চেয়ে ভাবাবেগের উপর বেশি জোর দিয়েছিল। মুসোলিনী মনে করতেন যে ভয়ই সুদৃঢ় শাসন কায়েম করার কেমাত্র পথ। জনগণ যদি একনায়ককে ভয় পায় তবেই নেতৃত্বের কাজ সহজতর হয় এবং জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করা একনায়কের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে। এইভাবে ফ্যাসিবাদ বীরপূজার তত্ত্ব জনগণের মধ্যে প্রচার করেছিল।

ফ্যাসিবাদের আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ হোল গণতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ও সাম্যনীতির ঘোর বিরোধিতা। মুসোলিনী অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। পরে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

ফ্যাসিস্ত ধারণা হল, স্বাধীনতা ''জনগণের অধিকার নয়, কর্তব্য।'' ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগের পূর্বশর্ত হল রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের অখণ্ড আনুগত্য প্রকাশ।

ফ্যাসিস্তরা জনগণের সাম্য, স্বাধীনতা ও গণসার্বভৌমত্বের তত্ত্বে একেবারেই বিশ্বাসী ছিল না। ফ্যাসিস্ত ধারণা হল, স্বাধীনতা ''জনগণের অধিকার নয়, কর্তব্য।'' ব্যক্তিস্বাধীনতা ভেগের পূর্বশর্ত হল রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের অখণ্ড আনুগত্য প্রকাশ। মুসোলিনী মনে 'সাম্য দুর্বলতা বিধায়ক ধারণা। অন্যদিকে অসাম্য অনিবার্য, ফলপ্রসূ এবং শুভফ্রদ।' জনগণের মঙ্গলের জন্য একজন যোগ্য নেতা বা একনায়কের প্রয়োজন যিনি অযোগ্য আপামর জনসাধারণকে সঠিকপথে চালনা করতে পারবেন। যোগ্য, স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট অভিজাত বা 'এলিটদের' হাতে রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত।

এই অভিজাতদের মাথার উপরে থাকবেন দলের সর্ব্বোচ্চ নেতা। এই নেতাই রাষ্ট্রের ভাগ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ দেবেন। এই নেতার সব সিদ্ধান্ত এবং কার্যকলাপ অভ্রান্ত। এই কারণেই ফ্যাসিস্তদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল ''মুসোলিনী সব সময়ে অভ্রান্ত।'' এক কথায় বলতে গেলে, ফ্যাসিস্তরা এক জাতি, এক রাষ্ট্র এক দল এবং কে নেতা এই তত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিল।

প্রশ্ন ১। ফ্যাসিবাদ যুক্তি অপেক্ষা কিসের উপর বেসী জোর দিয়েছিল?

ফ্যাসিবাদ জাতীয় রাষ্ট্রের গৌরববৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ, সম্প্রসারণকে অনিবার্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসেলিনী এ সম্পর্কে বলেছিলেন, ''ইতালিকে অবশ্যই সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হবে, না হলে তার বিনাশ অনিবার্য।'' তাঁর ভাষায়, ''নারীদের কাছে মাতৃত্ব যেমন স্বাভাবিক, পুরুষদের কাছে যুদ্ধও তেমনি স্বাভাবিক।'' আন্তর্জাতিক শান্তিকে 'কাপুরুষের স্বপ্ন' বলে অভিহিত করে ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধকে জাতীয় জীবনীশক্তির 'সঞ্জীবনী সুধা' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসোলিনী তাই ক্ষমতালাভ করেই ফ্যাসিবাদী মতাদর্শকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেছিলেন।

রোমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতিমধুর ইতিহাস এবং রোম সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে জাত্যাভিমান এবং অহংবোধ থেকে জন্মলাভ করেছিল পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ।

ফ্যাসিবাদ ইউরোপের আধুনিক রাজনৈতিক মতবাদগুলির বিরোধিতা করলেও পুরনো ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনায় আগ্রহী ছিল না। তাই যন্ত্রযুগ এবং প্রাক্ ফরাসী বিপ্লব যুগের ধারণার সঙ্গে তাদের ধারণার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল। তাই প্রাক্-ফরাসী

বিপ্লবযুগের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে অভিজাত প্রথা, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের আধিপত্য, চার্চের প্রভুত্ব ও স্বাতন্ত্র্য, রাষ্ট্রের থেকে পৃথক কোন প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ইত্যাদি ফ্যাসিস্টদের কাছ কোনোভাবেই কাম্য ছিল না। তাই ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ফ্যাসিবাদি তত্ত্বের একটি মূল কথা হল উগ্রজাতীয়তাবাদ ও জাত্যভিমান। জাতিশ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনে ফ্যাসিস্তরা দ্বিধাবোধ করত না। রোমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতিমধুর ইতিহাস এবং রোম সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে জাত্যভিমান এবং অহংবোধ ফ্যাসিস্তদের উগ্র একজাতীয়তাবাদের ধারণাকে শক্তিশালী করেছিল। এই জাত্যভিমান এবং অহংবোধ থেকে জন্মলাভ করেছিল পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ। এই কারণেই ১৯৩৬-৩৭ সালের পর মুসোলিনীও ইহুদিবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য এর পেছনে যে শুধুমাত্র আদর্শগত কারণ কাজ করেছিল তা নয়, অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। একদিকে ইহুদি নিধনের মাধ্যমে মুসলমান জগতের সমর্থনলাভ এবং অন্যদিকে ইহুদিদের সম্পত্তির উপর পূর্ণ দখল স্থাপন করে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠা মুসোলিনীর লক্ষ্য ছিল।

প্রশ্ন ১। মুসোলিনী ইহুদী বিদ্বেষী হয়েছিলেন কেন?

৪.৩.৬.৪ ঃ মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতি

মুসোলিনী তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে উগ্র ফ্যাসিস্ত মতাদর্শকে বিশ্বের সর্বত্র প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে এই মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে এই মতবাদ কেবলমাত্র ইতালিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, স্পেন, চীন, জাপান, পর্তুগাল এবং লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে এই মতবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলো একে অপরের কাছে চলে এসেছিল এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে ত্রিশের দশকে বেশ কিছু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে জাপানও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। গড়ে উঠে রোম-বার্লিন, টোকিও অক্ষশক্তি (Axis Powers)। এইভাবে ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী শক্তি নিজেদের মধ্যে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি এক আন্তর্জাতিক সমঝোতা বজায় রাখতে সফল হয়েছিল।

ভার্সাই সম্মেলনে শূন্য হাতে ফিরে আসায় ফ্যাসিস্ট সরকারের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার। তাই তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে রোমান উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার। মুসোলিনীর এই প্রতিশোধ পর্বের সাথী হয়ে ছিল জার্মানী।

ভার্সাই সম্মেলনে শূন্য হাতে ফিরে আসায় মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত সরকারের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার। তাই তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ঃ ''ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে রোমান উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার।'' এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মুসোলিনী জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এই তিন বিভগের শক্তি বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন।

মুসোলিনী জঙ্গী বিস্তারধর্মী নীতি অনুসরণ করে ইতালিবাসীর হৃদয় জয় করতে চাইলেও প্রথম দিকে তিনি কিন্তু কিছুটা সাবধানী এবং 'ধীরে চলার' নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাই বিশের দশকে তিনি যুদ্ধ বা সংঘর্ষের পথ যতটা সম্ভব পরিহার করে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ইতালির স্বার্থপূরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য এর পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও কাজ করেছিল। বিশের দশকে ইতালির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বৈদেশিক কূটনৈতিক পরিবেশ জঙ্গী বিস্তারনীতির সহায়ক ছিল না বললেই চলে। প্রথমতঃই ঐ সময়কালে মুসোলিনী ইতালিতে ফ্যাসিস্ত দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক দিক দিয়ে ইতালি তখন দুর্বল ছিল। তাই ইতালির আর্থিক উন্নতির দিকে তাঁকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়েছিল। প্রয়োজনে বাইরে থেকে অর্থ এনে ইতালির অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তৃতীয়তঃ উপনিবেশের উপর দখল ও আধিপত্য বিস্তার করে ইতালির পুঁজির যোগান বৃদ্ধির দিকেও তাঁর নজর ছিল। তাছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতা সামরিক শক্তিবৃদ্ধির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে দশকের শেষে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রকোপে ইতালি অর্থনৈতিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সবশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিশের দশকে ইতালির পক্ষে প্রতিকূল ছিল। ইতালি তখনও তার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পায়নি। ফ্রান্স বিশের দশকের শুরু থেকেই ইতালির শত্রু ছিল। ভার্সাই সম্মেলনে ফ্রান্স ইতালির বিভিন্ন দাবির ঘোরতর বিরোধিতা করেছিল। বিশের দশকের শেষে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন ইউরোপের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। অন্যদিকে জার্মানি ছিল দুর্বল, আর সোভিয়েত রাশিয়া নিঃসঙ্গ। এমতাবস্থায় মুসোলিনীর পক্ষে ইউরোপের স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোন সংশোধনবাদী, জঙ্গী বিস্তারনীতি অনুসরণ করা বিজ্ঞের মত কাজ হত না। তাই মুসোলিনী পরিস্থিতির বিচারে নিজেকে অনেকটাই সংযত রেখেছিলেন।

তবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেই জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মুসোলিনী ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক দ্বীপ কর্ফু দখল করে নেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষের মধ্যস্থতায় তা তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বিনিময়ে তিনি পাঁচ কোটি লিরা আদায় করেছিলেন। এরপর আড্রিয়াটিক উপকুলে শক্তি বিস্তারের জন্য মুসোলিনী ফরাসি মিত্র যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে ইতালি অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গরিকে মিত্র হিসেবে পেয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে মুসোলিনী ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিউম শহর দবি করেন। ইতালির দাবি মেনে নিয়েই যুগোশ্লাভিয়া ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নেট্রিউনো (Nettuno Convention) অনুযায়ী একটি বোঝাপড়া ও মীমাংসাসূত্রে উপনীত হয়। তবে এতে উভয়ের সম্পর্কের বিশেষ কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ইতালির মনোমালিন্যের সম্পর্কই বজায় ছিল।

এরপর মুসোলিনী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। চারটি কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে তার বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছায়। প্রথমটি হল ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য প্রাধান্য স্থাপন; দ্বিতীয়টি ফ্রান্সে ইতালিয়দের স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যাপারে উৎসাহদান নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির দ্বন্দ্ব; তৃতীয় কারণ হল আদর্শগত বিরোধ অর্থাৎ ফ্রান্সের গণতন্ত্রের প্রতি মুসোলিনীর ঘৃণা এবং চতুর্থ কারণ হল ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়ার ইতালির বিরুদ্ধে পারস্পরিক মৈত্রীজোট গঠন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ফরাসী অধিকৃত স্যাভয়, নিস, কর্সিকা, টিউনিসিয়া প্রভৃতি স্থানগুলির উপর ইতালির জোরদার দাবী।

পূর্ব আফ্রিকার বিশেষতরঃ আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) উপর দীর্ঘকাল ধরেই ইতালির দৃষ্টি ছিল। তাই ১৯৩৬

খ্রীষ্টাব্দে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। ইতালি তার নানাবিধ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র হিসেবে আবিসিনিয়াকে বেছে নিয়েছিল। প্রথমতঃ আবিসিনিয়া দখলে এলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সেখান বসবাসের জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ ইরিট্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ড—এই দুটি উপনিবেশ ইতালির দখলে থাকর ফলে আবিসিনিয়া জয় করা মোটেই কষ্টকর ছিল না। তৃতীয়তঃ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আবিসিনিয়া দখল অর্থনৈতিক কারণে ইতালির কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। চতুর্থতঃ জার্মানীতে নাৎসী দরে উদ্ভবের পর থেকে ইতালি ও জার্মানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতিতে ইতালি ও ফ্রান্স ভয় পেয়ে যায়। সন্ত্রস্ত ইতালি ও ফ্রান্সের এর ফলে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। রেপর ১৯৩৫ সালে হিটলারের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ফরসী বিদেশ সচিব পিয়েরে লাভাল, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড মুসোলিনীর সঙ্গে সমঝোতা করে স্টেসা ফ্রন্ট গঠন করেছিলেন। এর ফলে মুসোলিনী স্পষ্টতঃই বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আবিসিনিয়াকর প্রশ্নে ইতয়ালির বিরুদ্ধে যাবে না এবং হিটলারের আগ্রাসী নীতি আটকানোর জন্য ইতালির সঙ্গে তোষণ নীতি চালিয়ে যাবে। পঞ্চমতঃ ইতিমধ্যে জাতিসংঘের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা প্রকট হয়ে পড়েছিল। ১৯৩১ সালে। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের সময় তারা নীরব দর্শকের বূমিকা পলন করেছিল। এতেও ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণে উৎসাহিত হয়েছিল। ষষ্ঠতঃ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি আবিসিনিয়ার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। আইমুসোলিনীর ধারণা পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসাবে যদি এমন আবিসিনিয়া দখল করা যায় তবে ইতালিবাসির মন জয় করা যাবে এবং হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এইসব নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করে তার রাজধানী আদ্দিস আবাবা দখল করে নেয়। জাতিসংঘ এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই ইতালি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে।

ইতালির এই আবিসিনিয়া দখলের পরিনীতি হিসাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কূটকৌশলের ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির সম্পর্কের এর ফলে অবনতি ঘটে। অন্যদিকে জার্মানী ও ইতালির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে রোম-বার্লিন যোগাযোগ দৃঢ় হয়েছিল। এই যোগাযোগ পূর্ণতা পেয়েছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-১৯৩৯)।

প্রশ্ন

১। ইতালী কত সালে জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে?

২। রোম, বার্লিন, টোকিও অক্ষশক্তি কত সালে স্থাপিত হয়?

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

স্পেনের গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯৩০-এর দশকের সূচনায়। ঐ সময়ে প্রজাতন্ত্রীরা স্পেনে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করায় স্পেনের রাজা আলফান্সো ভয়ে তাদের হাতেই ক্ষমংতা সমর্পণ করেন। এতে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীরা প্রমাদ গুণতে থাকে। কারণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারের যাজকবিরোধী নীতি এবং ভূমিসংস্কারের নীতি তাদের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। অবস্থা আরও ঘোরতর ও জটিল হয়ে ওঠে যখন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে সাম্যবাদী প্রভাবিত পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এর ফলে দেখা দেয় বামপন্থীদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদীদের সরাসরি লড়াই। ফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন মানুয়েল আথানিয়া ও লার্সো কাবালিয়েরো। অন্যদিকে

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া' হিসেবে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইতালী ও জার্মানী সমর্থিত জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করেন এবং রাশিয়ার সমর্থিত পপুলার ফ্রন্ট পরাজিত হয়।

ফ্যাসিবাদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রিমো দে রিভেরা। এদের বিরোধের ফলে স্পেনে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এই গৃহযুদ্ধ প্রায় স্পেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্পেনে দক্ষিণপন্থীদের দলে যোগ দেন সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো। ফ্যাসিস্তরা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে সামরিক অভুত্থান ঘটায় এবং ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই শুরু করে। এই লড়াই যখন প্রায় গোটা স্পেনে ছড়িয়ে যায় এক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায় ঠিক সে সময়ে স্পেনে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ঘটতে দেখা যায়। সাম্যবাদী প্রভাবিত পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে সোভিয়েত রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। অন্যদিকে দুই ফ্যাসিস্ত শক্তি — ইতালি ও জার্মানী সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে স্পেনের যুদ্ধে নেমে পড়ে। এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুটি শক্তি শিবিরে স্পষ্টতঃই বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে রোম — বার্লিন শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া' (Dressrehearsal of the Second World War) হিসাবে স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করেন এবং পপুলার ফ্রন্ট পরাজিত হয়। ফ্রাঙ্কোর এই জয়লাভে ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী শক্তি দ্বিগুণ উৎসাহে ইউরোপে তাদের আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন স্পেনের যুদ্ধে তথাকথিত নিরপেক্ষতা দেখিয়ে একদিকে যেমন স্পেনের পতনকে সুনিশ্চিত করে তুলেছিল; তেমনি অন্যদিকে নিজেদেরও বিপদ ডেকে এনেছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কটি শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে?

২। স্পেনের গৃহযুদ্ধ কত সালে শুরু হয়েছিল?

অক্ষশক্তি চুক্তি

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূত্র ধরে ইতালি ও জার্মানী পরস্পরের কাছ চলে এসেছিল। তাদের মধ্যে মনোমালিন্যেরও অবসান হয়েছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেন এবং তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হেস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর ফলে রোম-বার্লিন সম্পর্কের আরও উন্নতি হয়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠে রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি চুক্তি (১৯৩৬)। ঐ বৎসরই হিটলার জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদবিরোধী 'অ্যান্টিকমিন্টার্ন প্যাকট' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উভয়ের মধ্যে শর্ত ছিল যে কেউই রাশিয়ার সঙ্গে কোনরকম রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় যাবে না। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একই শর্তে জাপান ও জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ইতালি। গড়ে ওঠে এই তিনশক্তির রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি। (Rome-Barlin-Tokyo Axis) অক্ষচুক্তি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ভীতির কারণ হল। তারা হিটলার ও মুসোলিনীর প্রতি তাদের তোষণ নীতি চালিয়ে গেল। অন্যদিকে সোভিয়েত সাম্যবাদের ভয় তো ব্রিটেন-ফ্রান্সের ছিলই। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রস্তুত করল।

১৯৩৬ সালে হিটলার জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদ বিরোধী 'অ্যান্টিকমিন্টার্ন প্যাকটে' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় ইতালী।

প্রশ্ন

১। অস্ট্রিয়া কত সালে স্বাধীন হয়।

২। অ্যান্টিকমিন্টার্ন প্যাকট কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

৪.৩.৬.৫ ঃ হিটলারের ক্ষমতালাভ ও জার্মানীতে নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলারের জার্মানীতে ক্ষমতা লাভের নানা ধাপগুলির সবেমাত্র সূচনা হতে থাকে। তিনি প্রারম্ভিক পর্বে মিউনিখে 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক দল' নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলের কাজ ছিল বিভিন্ন জনসভায় ভার্সাই চুক্তি বিরোধী বক্তৃতা ও প্রচারের মাধ্যমে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের জনবিরোধী কাজগুলি জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা। একই সঙ্গে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসনকালে হিটলার নাৎসিশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মে'ই ক্যামফ' রচনা করে নাৎসি মতবাদ ও আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা শুরু করেন। তাঁর ক্ষমতালাভের প্রধান প্রধান ধাপগুলি দেখা যায় ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কারণ ১৯২৯ থেকে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন শুরু হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের দক্ষ প্রশাসক স্ট্রেসম্যানের মৃত্যু ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, জার্মানীতে রাজনৈতিক সঙ্কটয়, রাইখস্ট্যাগের ঘন ঘন নির্বাচন (১৯৩০-৩৩), কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নাৎসি দলের ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি, নাৎসি দলের কর্মসূচীর জনপ্রিয়তা, সমরবাদের উত্থান, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দাঙ্গা ইত্যাদি নানা ঘটনা হিটলারের অভ্যুত্থানর পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নাৎসিদলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল নির্বাচনগুলিতে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনগুলিতে রাইখস্ট্যাগে নাৎসিদের আসনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তারাই একক বৃহত্তম দল হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। তারা নির্বাচনে ২৩০টি আসন পেয়েছিল এবং সবথেকে বেশি ভোটও পেয়েছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ এমতাবস্থায় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিটলারকে চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করেন। হিটলার সংবিধানকে অবজ্ঞা করে চূড়ান্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হন। তিনি জার্মানীতে নাৎসি দল ছাড়া অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোণা করেন। এরপর ক্ষমতা দখলের জন্য একের পর এক অন্যায় কাজ চালিয়ে যান। অবশেষে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গের মৃত্যু হলে হিটলার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার এই উভয় ক্ষমতাই নিজের হাতে নিয়ে নেন। এর ফলে তিনি হলেন এক ধারে রাষ্ট্রের, শাসনব্যবস্থার এবং সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর উপাধি হল জার্মান ফ্যুহরার বা জার্মান সর্ব্বোচ্চ নেতা বা একনায়ক। এইভাবে হিটলার জার্মানীতে একনায়কতন্ত্রী নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, জার্মানীতে রাজনৈতিক সংকট রাইখস্ট্যাগের ঘন ঘন নির্বাচন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নাৎসী দলের ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা, সমরবাদের উত্থান প্রভৃতি ঘটনা হিটলারের অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল।

প্রশ্ন

১। হিটলার কত সালে জার্মানীর চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত হন?

২। হিটলারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কি?

৩। হিটলার কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?

৪.৩.৩.৬ ঃ হিটলারের ক্ষমতা দখলের এবং নাৎসি দলের সাফল্যের কারণ

হিটলারের জার্মানীতে ক্ষমতালাভের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। হিটলারের অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তিন ধরনের পরস্পর বিপরীত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ই.এইচ.কার প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা হিটলারের উত্থানকে নাৎসি বিপব হিসেবে (Nazi Revolution) চিহ্নিত করেছেন। জার্মান ঐতিহাসিক রিটার (Gerhard Ritter) ও মার্কিন ঐতিহাসিক কোপেল এস, পিনসন (Koppel S. Pinson) নাৎসি দলের উত্থানকে গণআন্দোলনের ফল হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাম্যবাদী ঐতিহাসিকেরা যেমন দানীল মেলনিকভ ও লিউদমিলা চেরনাইয়া নামক সোভিয়েত ঐতিহাসিকদ্বয় তাঁর আগমনকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী রাজনীতির জয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা হিটলারকে সমাজবিরোধী শক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার তৃতীয় একদল ঐতিহাসিক যেমন এ.জে.পি. টেলর, গর্ডন ক্রেইগ ও প্রখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক কে. ডি. ব্রেকার হিটলারের উত্থানকে জার্মান সংসদীয় রাজনীতির স্বাভাবিক গতিধারার প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন।

জার্মানীতে হিটলারের উভ্যুত্থান নিয়ে অনেক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ও ব্যাখ্যা দেখা যায়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এলান বুলক (Allan Bullock) ও জার্মান নাৎসিপন্থী ঐতিহাসিকরা হিটলারের উত্থানের পশ্চাতে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাক্‌পটুতা, রাজনৈতিক কূটকৌশল, জনমোহিনী শক্তি, অসম্ভব আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি চারিত্রিক গুণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক এ.জে.পি. টেলর মনে করেন ব্যক্তিত্বের যুক্তি হিটলারের উত্থানের কারণ হিসেবে গ্রহণীয় নয়। কারণ তাঁর মতে, যদি ব্যক্তিত্বই তাঁর উত্থানের একমাত্র কারণ হত তবে হিটলারকে কেন ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ক্ষমতা দখলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল? একমাত্র ক্ষমতা লাভের পরই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে বিসাল রূপ পেয়েছিল। আরো একটি প্রচলিত ধারণা হল, ভার্সাই চুক্তির অবমাননাকর শর্তগুলি জার্মানবাসীর মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে হিটলার ক্ষমতার চূড়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরাসী ঐতিহাসিক মরিস বুমন্ট (Maurice Baumont), অধ্যাপক ই. এইচ. কার (E. H. Carr) ভার্সাই চুক্তির কঠোরতা এবং জার্মানীকে পঙ্গু করার চেষ্টা এবং ভার্সাই চুক্তির পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতরি অন্তর্দ্বন্দ্ব কিভাবে জার্মানীতে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একনায়কতন্ত্রের আগমনের পথ প্রশস্ত করেছিল তা তুলে ধরেছেন। আবার জি. বারাক্লু (G. Baraclough) য়েমার প্রজাতন্ত্রের ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ এবং এর ফলে ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের ভাবমূর্তির নষ্টের উপর হিটলারের ক্ষমতালাভের কারণ খুঁজে পেয়েছেন। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর ভার্সাইচুক্তির কারণটিকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মতে, ভার্সাই চুক্তি সম্পাদন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের ক্ষমতালাভের মধ্যে ব্যবধান ছিল চৌদ্দ বছরের। এই সময়ের ব্যবধানে ভার্সাই চুক্তির অবিচারের প্রতিশোধস্পৃহা জার্মানবাসীর মধ্যে অনেকটাই ধূসর হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ভার্সাই চুক্তি অনেক শর্তই প্রয়োগ করা হয়নি বা কতকগুলি সংশোধিত হয়েছে। তাই ১৯৩০ এর শুরুতে ভার্সাই-এর অন্যায় হিটলারের জনপ্রিয়তা লাভের কারণ হিসেবে গ্রহণ করা কষ্টকর।

জার্মানীর অভিজাত, সমরবাদী ও পুঁজিপতি-বিত্তবান গোষ্ঠী বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে হিটলারকে সমর্থন জানতে লাগলেন। ফলে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবকটি নির্বাচনে হিটলারের নাৎসিদল তাদের আসন সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে সফল হল।

হিটলারের ক্ষমতায় আসার প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এ. জে. পি. টেলরের বক্তব্য হল ঃ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ভয়াবহ প্রভাব শুরু পূর্বেই জার্মান রাজনীতিতে অস্থিরতা, স্থিতিশীলতার অভাব এবং সংকট দেখা দেয়। তাঁর মতে, ১৯২৯-৩৩ খ্রীঃ কালব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা প্রজাতন্ত্রকে নির্মূল করেনি, বরং প্রজাতন্ত্রের বিলুপ্তির পরিচায়ক ছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "The collapse of the republic" was accelerated but not caused by the economic crisis which swept the entire world between 1929 and 1933."

তবে জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের মূলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও সাংগঠনিক কারণ যে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বি,য়ে কোন সন্দেহ নেই। জার্মান রাজনীতিতে প্রজাতন্ত্রবিরোধীরা প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিল। তাছাড়া জনগণের কাছেও ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের ভাবমূর্তি বাল ছিল না। ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ছিল দুর্বল এবং জার্মানীতে এর ফলে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ পন্থী রাজনীতির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বোঝাপড়া ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর মনে করেন নাৎসি দলের উত্থানের মূলে ছিল বিত্তবান শ্রেণীর সঙেগ জনতাবাদী (Populist) নাৎসি দলের আপোষ। জার্মানীর অভিজাত, সমরবাদী ও পুঁজিপতি বিত্তবান গোষ্ঠী বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে হিটলারকে সমর্থন জানাতে লাগলেন। ফলে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবকটি নির্বাচনে হিটলারের নাৎসি দল তাদের আসন সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে সফল হল।

নাৎসি দলের সাফল্যের পশ্চাতে সামরিক বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এইসঙ্গে তাদের শক্তিশালী সংগঠন ও ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি তাদেরকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। তাছাড়া হিটলার ও তাঁর নাৎসি দলের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা। এর ফলে জার্মানীর কপালে নেমে আসে এক বিরাট অর্থনৈতিক সংকট। জার্মানবাসী প্রচণ্ড হতাশায় প্রজাতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারায় এবং একজন পরাক্রমশালী যোগ্য নেতার হাতে সর্বোচ্চ দায়িত্ব তুলে দিতে প্রস্তুত হয়।

তবে হিটলারের ক্ষমতায় অভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। সাংবিধানিক উপায়ে বৈধভাবেই হিটলার জার্মান রাজনীতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাই একদিকে যেমন তঁরত্রা অভ্যুত্থানকে ক্ষমতা দখল বলা যায় না, অন্যদিকে তা 'নাৎসি বিপ্লব' বলা চলে না। অধ্যাপক E. H. Carr অবশ্য তাঁর আগমনকে 'নাৎসি বিপ্লব' বলেছেন। কিন্তু গণ অভ্যুত্থানের পথ পরিত্যাগ করে প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করেই তিনি ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিলেন। তবে হিটলারের অভ্যুত্থান নিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর ভূমিকা এবং কম্যুনিস্টদের দায়-দায়িত্ব নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে।

এতসব বিতর্ক সত্ত্বেও হিটলারের ক্ষমতায় উত্থান সম্পর্কে দুটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ হিটলার সাংবিধানিক উপায়েই ক্ষমতায় এসেছিলেন। অবশ্য এর পেছনে একটি ক্ষুদ্র চক্রের জোরালো ভূমিকা ছিল। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদরা, অভিজাততন্ত্রী নেতা পাপেন এবং থাইসেনের মত পুঁজিপতি। দ্বিতীয়তঃ সাংবিধানিক ও বৈধ উপায়ে তিনি জার্মান গণতন্ত্রের অসান ঘটান এবং মুখোশধারী একনায়কতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। আর এ কাজ তিনি করেন ক্ষমতা দখলের পূর্বে নয়, বরং পরে। তাঁর ক্ষমতালাভের পরই নাৎসি দলের একনায়কতন্ত্র জার্মানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন

১। E.H. Carr হিটলারের অভ্যুত্থানকে কি বলেছেন?
২। হিটলারের অভ্যুত্থানে অভিজাত সম্প্রদায়ের কি প্রভাব ছিল?

৪.৩.৬.৭ ঃ নাৎসি মতবাদ

ফ্যাসিস্ত মতবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায় নাৎসি মতবাদে। এই মতবাদ ফ্যাসিবাদের ন্যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে গড়ে উঠেছে। তাই এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শের অভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই মতবাদের মূল কথাগুলি হিটলারের নেই ক্যাম্ফ নামে আত্মজীবনীমূলক রচনায় পাওয়া যায়। হিটলারের পূর্বে নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও মতবাদের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাঁরই সহকর্মী গট্‌ফ্রিড রচিত পঁচিশ দশা কর্মসূচীর মধ্যে (১৯২০ খ্রীঃ) 'নাৎসি' শদটির উৎপত্তি হিটলারের 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট দল' থেকে।

নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদের ন্যায় জঙ্গী ও সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করেছে। জার্মান নাৎসিদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বে। তারা মনে করত যে জার্মান শিরায় নর্ডিক রক্ত প্রবাহিত এবং জার্মান জাতিই পৃথিবীতে একমাত্র 'অর্থে' জাতির মর্যাদা লাভ করবার যোগ্যাধিকারী। জার্মান রাষ্ট্রে অ-জার্মানদের কোন স্থান থাকতে পারে না। এই জাত্যভিমান থেকে জন্ম নেয় তাদের মনে হিংস্র ইহুদিবিদ্বেষ। হিটলারের উগ্র ইহুদি বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত ইহুদি নিধনে পরিণত হয়েছিল। হিটলারের ইহুদিদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে নীচু ধারণা ছিল। আরো একটি কারণ হল, ইহুদিরা ছিল নাৎসিবিরোধী এবং হিটলারের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান কম্যুনিস্ট দলের নেতাদের অধিকাংশ ছিল ইহুদি। তাছাড়া জার্মানীর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইহুদিদের হাতেই চলে এসেছিল। তাই হিটলারের নাৎসি রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জার্মানী থেকে ইহুদি বিতাড়ন। হিটলার তাই তাঁর গ্রন্থ 'মেঁইই ক্যামফ'-এ জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন এং সমগ্র বিশ্বে জার্মান সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও সাধারণ জনসাধারণের কাছে তাঁর অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধের ডাক এবং কর্মসূচী অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল। সমরবাদীরা তাঁর বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করেছিল।

জার্মান নাৎসীরা মনে করত যে জার্মান শিরায় নর্ডিক রক্ত প্রবাহিত এবং জার্মান জাতিই পৃথিবীতে একমাত্র 'অর্থে' জাতির মর্যাদা লাভ করার যোগ্যাধিকারী। এই জাত্যভিমান থেকে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় ইহুতী বিদ্বেষ।

নাৎসিবাদ সমস্ত ক্ষমতার নাৎসিকরণের পক্ষপাতী ছিল। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের সর্বময় ক্ষমতা জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত করবার। জার্মানীতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়। ফ্যাসিবাদের ন্যায় নাৎসিবাদও রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল। চার্চ ও ধর্মাধিপ্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য খর্ব করা হয়। রাষ্ট্রের উপরে কিছু নয় এই মতবাদে নাৎসিবাদ জোর দিত। জার্মানরা নাৎসি দল ছাড়া জার্মানীতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিল না। ফ্যাসিস্তদের মতই তারা একদলের একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। ফ্যাসিবাদের ন্যায় নাৎসিবাদ মানুষের যুক্তিপ্রবণতার ঘোর বিরোধী ছিল। তারা বীরপূজার তত্ত্বে আস্থাশীল ছিল।

নাৎসিবাদ উগ্র এ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই কেবল সমর্থন করেনি, সেইসঙ্গে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণকে সবচেয়ে বড় করে দেখেছে। জার্মানরা যাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারে সেজন্য হিটলার পৃথিবীর যত অঞ্চলে জার্মানরা বসবাস করত সেইসব অঞ্চল নিজ দখলে আনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তিনি যুদ্ধকে নাৎসিবাদের মূল চালিকাশক্তি বলে মনে করতেন। যুদ্ধের মাধ্যমে পররাজ্যগ্রাসের ক্ষেত্রে জার্মানী কোন আন্তর্জাতিক আনি, সন্ধি বা বাধা নিষেধ মানবে না বলতে তিনি কোন দ্বিধাবোধ করেননি। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবিস্তার নাৎসিবাদের মূলমন্ত্র। হিটলারের ভাষায়, 'শাশ্বত যুদ্ধেই মানুষ মহান হয়ে উঠেছে, শাশ্বত শান্তিতে তার বিনাশ ঘটবে।" ফ্যাসিবাদের ন্যায় ন্যাৎসিবাদও শক্তি প্রয়োগের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিল।

নাৎসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের সাথে সাথে সমাজতন্ত্রকেও গ্রহণ করেছিল। তবে সাম্যবাদী আদর্শ ও কম্যুনিস্ট সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এদের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পার্থক্য ছিল। সমাজতান্ত্রিকদের মতই হিটলার রাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে নাৎসিবাদ ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী ছিল। তবে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলাই নাৎসিবাদের লক্ষ্য ছিল। এই পথেই তারা শ্রমিকদের 'সামাজিক মুক্তির' লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেয়েছিল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঠোর নিন্দা করলেও নাৎসিবাদ কিন্তু জার্মানীতে তাকে নানা ভাবে বজায় রেখেছিল। প্রকৃত সমাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাস করে না, বরং আন্তর্জাতিক শান্তিতে তারা অধিক আগ্রহী। কিন্তু নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদের ন্যায় ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল।

প্রশ্ন

১। গটফ্রিড কে ছিলেন?

২। হিটলারের মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল কেন?

৪.৩.৬.৮ ঃ হিটলারের বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে হিটলার ছিলেন সংশোধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী। তিনি জার্মানী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করার জন্য বিশ জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি লক্ষ্যই ছিল জার্মানীকে ইউরোপ তথা বিশ্বের প্রধান শক্তিতে পরিণত করা। অবস্য এ.জে.পি. টেলর তাঁর "The Origins of the Second World War" গ্রন্থে হিটলারের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার কথা যে সব ঐতিহাসিক বলেছেন তাদের মতামত যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য মনে করেন না। তাঁর মতে, তা হলে হিটলার মৌবাহিনীর উপর গুরুত্ব দিতেন। টেলরের মতে, পূর্ব ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করে উদ্বৃত্ত জার্মান অধিবাসীদের বসবাস ও খাদ্যের সুব্যবস্থা করাই ছিল তার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রকৃত লক্ষ্য।

ক্ষমতা দখলের পর হিটলার ভার্সাই সন্ধি নস্যাৎ করে দিয়ে জার্মানীর হৃত গৌরব ও রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের দিকে দৃষ্টি দিলেন। এর জন্য তিনি একদিকে যেমন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করলেন তেমনি অন্যদিকে ইউরোপে মিত্র খোঁজার কাজ শুরু করলেন। পূর্ব ইউরোপে উপনিবেশ বিস্তার এবং সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া বিজয়ের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। যেহেতু ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। সেহেতু তিনি প্রথমেই জাতিসংঘের

হিটলার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। যার ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ভার্সাই সন্ধির শর্তভঙ্গ করে সম্মেলন ত্যাগ করেন ও জাতিসংঘের সদস্যপদ ছেড়ে দেন।

সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। কারণ জাতিসংঘের সদস্য থাকলে তাঁর পক্ষে যুদ্ধনীতি অনুসরণ করার পথে বাধা সৃষ্টি হবে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে তিনি জার্মানীর জন্য যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র চেয়েছিলেন তাতে ফ্রান্সের কাছ থেকে বাধা এলে তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করেন এবং জাতিসংঘেরও সদস্যপদ ছেড়ে দেন। প্রত্যুত্তরে জার্মানীতে তিনি বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন এবং জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ সর্ববিভাগেই জার্মানীর সামরিক বিভাগকে আধুনিক করে তোলেন।

হিটলার তাঁর আক্রমণাত্মক নীতির প্রস্তুতি হিসেবে পোল জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৪ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ফলে ফ্রান্স ও পোলাণ্ডের মৈত্রীতে ফাটল ধরে, ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দূর্বল হয় এবং পোলাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে ভার্সাই চুক্তির পর যে মনোমালিন্য চলছিল তার তার সাময়িক অবসান ঘটে। এরপর বর্ধিত জার্মান জনসংখ্যার বাসভূমির সন্ধানে তিনি ফ্রান্সের কাছে আলসাস-লোরেন ও সার উপত্যকা দাবী করেন। পোলাণ্ডের সঙ্গে দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি সত্ত্বেও তিনি পোলাণ্ডের উর্ব্বর কৃষিজমি, ডানজিগ ও পোলিশ করিডর দাবী করে বসেন। রাশিয়ার কাছে দাবী করেন ইউক্রেন অঞ্চল। জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণে হিটলার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ঐক্যের সময়ে অস্ট্রিয়াকে সংযুক্ত না করে বিসমার্ক যে 'ঐতিহাসিক ভুল' করেছিলেন তার সংশোধনের জন্য জার্মান-অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণের (Anschlus) মাধ্যমে বৃহত্তর জার্মানী হিটলার গড়ে তুলতে চাইলেন। এর ফলে অস্ট্রিয়ার জার্মান ভাষাভাষী জনগণ হিটলারের সরাসরি শাসনাধীনে আসার সুফল পাবে। তবে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড বাধা আসে ইতালির মুসোলিনীর কাছ থেকে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নাৎসি সামরিক অভ্যুত্থান অস্ট্রিয়ায় ব্যর্থ হয়। এর পর প্রায় দু-বছর হিটলার অস্ট্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘের নির্দেশে এক গণভোটের মাধ্যমে সার উপত্যকা জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। শতকরা নব্বই জন জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে ভোট দেয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদন করে হিটলার কূটকৌশলের পরিচয় দেন। এর ফলে ফ্রান্সের কাছ থেকে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করতে হিটলার সক্ষম হন। জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড পরোক্ষে সমর্থন জানায়। এর ফলে হিটলার ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ করে জার্মান অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি সেখানে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো যুদ্ধ ঘোষণা করে। হিটলার এবং মুসোলিনী এই যুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যোগদান করে। স্পেনের যুদ্ধে ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করায় সেখানে হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তার অসান ঘটে। পরস্পর পরস্পরের খুব কাছে চলে আসে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে জার্মানীও ইতালি জাপানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে জার্মানীও ইতালি জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদবিরোধী (অ্যান্টিকমিনটার্ন প্যকট) চুক্তি গড়ে তোলে। ফলে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে ওঠে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি চুক্তি (Axis Powers).

প্রশ্ন

১। কিভাবে সার উপত্যকা জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়?
২। ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির পরোক্ষ ফল কি ছিল?

রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি হিটলারকে জার্মান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে অধিক উৎসাহী করে তোলে। ইতালির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় হিটলার অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর আনশ্লুস নীতি কার্যকর করতে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স হিটলারের ক্ষেত্রে কোনো সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। এই উভয় শক্তি হিটলারের বিরুদ্ধে যে নীতি অনুসরণ করছিল তাকে 'তোষণ নীতি' (Policy of Appeasement) বলা যায়। নাৎসি জার্মানীর ভার্সাই চুক্তিকে অবজ্ঞা করে একের পর এক আগ্রাসী নীতির পশ্চাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই তোষণ নীতি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া বারবার ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করলেও ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কোনোরকম বোঝাপড়ায় আগ্রহী ছিল না। বরং তাদের হিসেব ছিল যে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর বিরোধ বা সংঘর্ষের সব সুবিধা তারা লাভ করতে পারবে। কিন্তু তাদের এই চিন্তা-ভাবনা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ নীতির ফলশ্রুতি হল জার্মানীর সঙ্গে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিখ্ চুক্তি সম্পাদন। এই চুক্তির মাধ্যমে হিটলারের দৃষ্টি তারা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি নিবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হল বিপরীত। মিউনিখ্ চুক্তি রাশিয়ার চোখ আরও খুলে দিল। রাশিয়া স্পষ্টতঃই বুঝতে পারল যে নাৎসি বিরোধী জোটে ইঙ্গ-ফরাসী গোষ্ঠী তার সঙ্গে কিছুতেই যোগদান করবে না। ইতিমধ্যে মিউনিখ চুক্তির পুরস্কার হিসেবে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতাল্যানন্ড জায়গাটি পেয়ে যান। এতেই হিটলার ক্ষান্ত হলেন না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের 'সসম্মানে শান্তি স্থাপন'-এর উক্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে তিনি উইনস্টন চার্চিলের 'প্রথম সারির বিপর্যয়ের' ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করলেন তাঁর আগ্রাসী নীতির মধ্য দিয়ে। মিউনিখ্ চুক্তির মাত্র সাত মাস পরেই ১৯৩৯ এ হিটলার সমগ্র চেকোশ্লোভোকিয়া জার্মানীর দখলে নিয়ে এলেন। মিউনিখ চুক্তি ছিল হিটলারের কূটনীতির এক বিরাট সাফল্য। এই চুক্তির মাধ্যমেই তিনি সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের দুই প্রধান শত্রুকে তার দলে টেনে আনতে পেরেছিলেন। সেই সঙ্গে ভার্সাই চুক্তির সমাধিও রচনা করতে পেরেছিলেন। এর পরের ঘটনা একের পর এক দ্রুত ঘটতে লাগল। হিটলার ভার্সাই চুক্তি ভঙ্গ করে পোল্যাণ্ডের ডানজিগ বন্দরটি দখল করে নেয়। এর প্রত্যুত্তরে হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিরোধের জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং পোল্যাণ্ড পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্থাপন করে। এরপর ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার দিকে মিত্রতার হাত বাড়ালেও রাশিয়া মিউনিখ্ সম্মেলনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্রিটিশদের বিশ্বস্ততায় সন্দিহানবশতঃ তাদের ডাকে সাড়া দিল না। বরং হিটলার সাম্যবাদী রাশিয়ার সঙ্গে আদর্শগত সংঘাত ভুলে মিত্রতার হাত বাড়ালে রুশ সরকার তাদের মিত্রতার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। এর ফলে ১৯৩৯ খ্রীঃ ২৩শে আগস্ট উভয় দেশের মধ্যে দশ বছরের জন্য রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির ফলে উভয় দেশ দশ বছরের জন্য পারস্পরিক অনাক্রমণ এবং পারস্পরিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই চুক্তির গোপন শর্ত ছিল, প্রভাবের আন্তর্জাতিক

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের তোষণ নীতির সুযোগে হিটলার একের পর এক আগ্রাসী নীতির মধ্য দিয়ে চেম্বার লিগের সসম্মানে শান্তি স্থাপনের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে উইনস্টন চার্চিলের প্রথম সারির বিপর্যয়ের ধারণাকে প্রমাণিত করেন।

ভাগাভাগি (spheres of influence)। আর্নস্ট নিয়েখ্ (Ernst Niekisch) এই চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'সোভিয়েত স্বার্থ বিরোধী ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক নষ্ট করা ছিল সোভিয়েতের অপরিহার্য প্রয়োজন, সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ছিল নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ বেপরোয়া অঙ্গীকার।" এই চুক্তি করে হিটলার পশ্চিম ফ্রন্টকে বাগে আনতে চেয়েছিলেন। এই চুক্তির কিছুদিনের মধ্যেই (১লা সেপ্টেম্বর), হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। (১৯৩৯ খ্রীঃ-১৯৪৫ খ্রীঃ)।

প্রশ্ন

১। রুশ-রার্মান অনাক্রমণ চুক্তি কবে হয়?

২। মিউনিখ চুক্তি কাদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল?

৪.৩.৬.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

(২) অলক কুমার ঘোষ — আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৪)

(৩) নীরারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা (১৭৮৯-১৯৩৯)

(৪) E.H. Carr — International Relations between Two World War.
(বঙ্গানুবাদ-প্রণব কুমার চটেআপাধ্যায়)

(৫) A.J.P. Taylor — The Course of German History.

(৬) Roger Eatwell — Fascism, A History.

(৭) Philip Morgan — Italian Fascism

(৮) Robert Boyce — The origins of World War Two.

৪.৩.৬.১০ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ কর।

(২) ইতালিতে কিভাবে মুসোলিনী ক্ষমতা দখল করেন?

(৩) ফ্যাসিবাদ বলতে কি বোঝায়? এর মূল নীতিগুলি আলোচনা কর।

(৪) দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইতালির পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর।

(৫) মুসোলিনী কেন আবিসিনিয়া আক্রমণ করেন? এর ফলাফল কি হয়েছিল?

(৬) জার্মানীতে নাৎসি আন্দোলনের উদ্ভব ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(৭) হিটলার জার্মানীতে কিভাবে ক্ষমতা দখল করেন? এই ক্ষমতা দখলের পাশ্চাতের উপাদান বা কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

(৮) নাৎসি মতবাদরে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(৯) হিটলারের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল? কিভাবে তিনি এই লক্ষ্য পূরণ করেন?

পর্যায় গ্রন্থ - ৪
SECOND WORLD WAR AND THE NEW POLITICAL ORDER

একক ৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ফলাফল
ORIGIN, NATURE AND RESULTS OF THE SECOND WORLD WAR

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.৪.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৪.৪.৭.১ ঃ উৎপত্তি (Origin)

৪.৪.৭.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের মূল কারণ (Imperialism as the Root Cause of the War)

৪.৪.৭.১.২ ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এর শান্তিচুক্তি ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া (Long-term Reactions of the Peace Settlement of 1919)

৪.৪.৭.১.৩ ঃ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Conflict)

৪.৪.৭.১.৪ ঃ সোভিয়েত বিরোধিতা ও তোষণনীতি (Anti-Sovietism and Appeasement Policy)

৪.৪.৭.১.৫ ঃ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান (The Rise of Fascism and Nazism)

৪.৪.৭.২ ঃ যুদ্ধকালীন রাজনীতি (Politics During War-time)

৪.৪.৭.৩ ঃ যুদ্ধের ফলাফল (Results of the War)

৪.৪.৭.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

৪.৪.৭.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

৪.৪.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট

(২) যুদ্ধের প্রকৃতি ও মিত্রপক্ষীয় রাজনীতি

(৩) যুদ্ধের ফলাফল

(৪) জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন

৪.৪.৭.১ ঃ উৎপত্তি (Origin)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও দৃশ্যত পূর্ব ইউরেপে জার্মান জাতীয় সংখ্যালঘুদের (German National Minorities) সমস্যা ও বিবাদকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যা কখনই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল না। ডেভিড থমসন সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক যেরূপ একটি শিকারকে আক্রমণের জন্য ঢিলাঢালা করে তার ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করার ন্যায় বিদেশি নাৎসীদলগুলিকে লিভার হিসাবে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও উপনিবেশগুলির ও প্রভাবাধীন বৃত্তগুলির পুনর্বিভাজনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-এর চূড়ান্ত ফলাফলস্বরূপ হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও উপনিবেশগুলির ও প্রভাবাধীন বৃত্তগুলির (Spheres of influence) পুনর্বিভাজনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-এর চূড়ান্ত ফলাফলস্বরূপ হয়েছিল বলা যায়। উক্ত মূল কারণ ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষেত্রসমূহ এমন একটি প্রক্রিয়াকে উৎপাদন ও ত্বরান্বিত করার কাজে ব্যবহৃত করেছিল, যার পরিণতিক্রম যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলা যায়।

৪.৪.৭.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের মূল কারণ (Imperialism as the Root Cause of the War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎসের কারণ বিত্তবান ও বিত্তহীনদের (Haves & Have-nots) দ্বন্দ্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল বলে বলা যায়। ১৯১৯-এর ভার্সাই শান্তিচুক্তি ব্যবস্থা জার্মানীকে তার সকল ঔপনিবেশিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিসমূহ যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ন্যায় নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়। ১৯২০ সালের মধ্যে সমগ্র ঔপনিবেশিক জগৎকে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী ও জাপানের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়। উক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সকেই উপনিবেশসমূহের বৃহত্তম মালিকানা দেওয়া হয়। সুতরাং এর দরুন এটা স্বভাবিক ছিল যে একদিকে যখন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা (Political & territorial status quo) বজায় রাখতে চাইবে, তখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদীগণ উক্ত স্থিতাবস্তার একটি পরিবর্তন কামনা করবে। যেহেতু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক জগতের পুনর্বিভাজন সম্ভবপর ছিল না, সুতরাং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা তদানীন্তন ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের নিকট হতে লড়াই করে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন

১৯১৯ এর ভার্সাই শান্তি চুক্তির পর সর্বস্বহৃত জার্মানী লড়াই করে বিজয়ীশক্তির কাছ থেকে উপনিবেশ ও প্রবাবাধীন বৃত্তসমূহ ছিনিয়ে নেবার আশা করেছিল। এক্ষেত্রে ইটালী ও জাপন জার্মানী পাশে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন

১। ভার্সাই শান্তিচুক্তি করে স্থাপিত হয়?

২। ভার্সাই শান্তিচুক্তিতে জার্মানীর উপনিবেশগুলি কাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়?

বৃত্তসমূহ ছিনিয়ে নেবার আশা করেছিল। তার অর্থ ছিল প্রথম অবস্থায় তাদের (ঔপনিবেশিক শক্তিদের) ধ্বংস করা। এক্ষেত্রে ইটালী ও জাপান এইজন্যই জার্মানীর পাশে দাঁড়িয়েছিল কারণ তাদের খুব কমই ঔপনিবেশিক অধিকৃত অঞ্চল ছি?ল। সাম্রাজ্যবাদের যুক্তিবিদ্যা ছিল বিজয় অভিযানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদ যার অর্থ ছিল যুদ্ধ। অক্ষশক্তির (Axis Power) রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ও সমরযন্ত্র উক্ত লক্ষ্যেই ধাবিত হয়েছিল।

৪.৪.৭.১.২ ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এর শান্তিচুক্তি ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া (Long-term Reactions of the Peace Settlement of 1919)

ভার্সাই চুক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ রূপে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের দোষজনিত ধারা ও কঠোর ও শাস্তিমূলক অর্থনৈতিক ধারাসমূহ জার্মান জাতির জাতীয় গর্ব ও অনুভূতিকে আঘাত করেছিল, যাকে হিটলার জার্মান সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনমূলক লক্ষ্যসমূহকে অনুসরণ করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। অপরদিকে উক্ত চুক্তি জার্মানীর কাছ থেকে নিরাপত্তার যথোপযুক্ত সামরিক গ্যারান্টি আদায় করতে ব্যর্থ হয়। ফ্রান্স সঠিকভবেই ফরাসী নিরাপত্তার সামরিক গ্যারান্টিস্বরূপ রাইণল্যাণ্ডের উপর একটি অনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটব্রিটেন তাতে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করে, কারণ তারা ইউরোপে ফরাসী আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আশঙ্কিত ছিল এবং তাদের মনে সোভিয়েট কমিউনিজমন-এর বিরুদ্ধে জার্মানীকে নিজেদের নিরাপত্তার বা আত্মরক্ষার সম্ভাব্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার ধারণা বিদ্যমান ছিল। উক্ত চুক্তি জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীদের তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামরিক শক্তির পুনরুত্থান ঘটানোর সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সময়কাল প্রদান করেছিল। এতৎসত্ত্বেও ভার্সাই চুক্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ বলা যায় না। ইহা ছিল গৌণ কারণ। এর কারণ শান্ত বন্দোবস্তের শর্তসমূহ প্রয়োজনের সময় বলবৎ করা হয়নি।

১৯১৯ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধি জার্মান জাতির জাতীয় গর্ব ও অনুভতিকে আঘাত করেছিল। অপরদিকে এই চুক্তি জার্মানীর কাছ থেকে সামরিক গ্যারান্টি আদায়ে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ১। ভার্সাই সন্ধির প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

৪.৪.৭.১.৩ ঃ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Conflict)

ভার্সাই শান্তি চুক্তির বলবৎকরণের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বর্বরতম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে যে অন্যতম প্রধান একক ক্ষেত্রটি হিটলারের জার্মানী ব্যবহার করেছিল তা হচ্ছে শান্তিচুক্তি বলবৎকরমের বিষয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে অপরের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষই পৃথক পথ অনুসরণ করে নিজেদেরই সাহায্যে গড়ে তোলা স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিল। এরপর ব্রিটেন ও ফ্রান্স কূটনৈতিক দিক থেকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, জার্মানীর পক্ষে একটির পর একটি ভার্সাইর চুক্তিসমূহ লঙ্ঘন করা শাস্তির ভয় ছাড়া অনায়াস হয়ে ওঠে।

ভার্সাই শান্তিচুক্তির পর ফ্রান্স ও ব্রিটেন কূটনৈতিক দিক থেকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা শান্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তার একটি মাধ্যম হিসেবে জাতিপুঞ্জকে ধ্বংস করে দেয়।

ল্যাংসাম মন্তব্য করেছেন যে এইরূপে বহু নিকৃষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফরাসী-জার্মান বিবাদসমূহ ফরাসী-ব্রিটিশ বিবাদসমূহে পরিণত হয়, যা স্বভাবতই জার্মানীর পক্ষে আসে।

ফরাসী ও ব্রিটিশ নীতিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যৌথনিরাপত্তার একটি মাধ্যমে হিসাব জাতিপুঞ্জকে (League of Nations) ধ্বংস করে দেয়। ফ্রান্স এবং তার পূর্বদিকের মিত্ররাষ্ট্রগুলির নিকট আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা এবং ইউরোপে ফরাসী আধিপত্য বজায় রাখাই লীগের কভেনান্ট বা চুক্তিপত্রের প্রধান বিচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ফ্রান্সের নিকট যুদ্ধ করবার ক্ষেত্রে জার্মানীর চিরস্থায়ী অক্ষমতাই স্থিতাবস্থার ভিত্তি। অপরদিকে গ্রেট ব্রিটেনের নিকট একটি অত্যাবশ্যক, যেখানে গ্রেটব্রিটেন তার ধারক ও বাহকরূপে কাজ করবে। উক্ত দ্বন্দ্বই লীগের হামাগুড়ি দেওয়া পঙ্গুত্বকে সূচিত করে যা আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে তার অক্ষমতাকে প্রকাশ করে।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিরক্ষার জন্য কি গঠন করা হয়?

২। ১৯১৯-এর পর ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে ছিল কেন?

৪.৪.৭.১.৪ ঃ সোভিয়েত বিরোধিতা ও তোষণনীতি (Anti-Sovietism and Appeasement Policy)

গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারদ্বয় সোভিয়েত কমিউনিজম্-এর বিপদ সম্পর্কে এতটাই আশঙ্কিত ছিল যে, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য হিটলার তোষণনীতি গ্রহণ করে।

রাশিয়া তথা সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিবিদদের মনে জার্মান সমরতন্ত্রবাদের ভীতির পরিবর্তে সোভিয়েট কমিউনিজম্-এর অপচ্ছায়াকে উপস্থাপিত করে। গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারদ্বয় কমিউনিজম্-এর বিপদ সম্পর্কে এতটাই আশঙ্কিত ছিল যে তারা মনে করত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার মাধ্যম (bulwark) রূপে জার্মানীকে ব্যবহার করা যাবে, যা ডেভিড থমসন সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে নাৎসী জার্মানী বৃহৎ শক্তিদের কমিউনিজম্-এর আশঙ্কা বারা পীড়িত থাকার বিষয়টিকে সাফল্যের সহিত নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে ও লীগকে পঙ্গু করতে ব্যবহার করেছিল।

যখন নাৎসী জার্মানী একতরফাভাবে ভার্সাই চুক্তির অনুজ্ঞাসমূহকে বাতিল করে তার লুণ্ঠনকারী লক্ষ্যসমূহকে পরিস্ফুট করে তুলছিল, তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারদ্বয় হিটলারকে তোষণ করবার নীতি গ্রহণ করে, যার ফলে তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তঁকে (হিটলারকে) নিক্ষেপ করতে পারবে। উক্ত তোষণনীতি মিউনিক বন্দোবস্ত দ্বারা এর চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হয়। নাৎসীবাদের বিপদের আত্মপ্রকাশকাল থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন শান্তিকামী শক্তিগুলির একটি হিটলার বিরোধী জোট গঠনের জন্য আদেন জানাতে থকে। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স তা গঠনের জন্য ইচ্ছুক ছিল না। জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত তারা নিজেদের দিক থেকে জার্মানীর সম্প্রসারণকে কেবলমাত্র পূর্বদিকে ধাবিত করার দিকে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার লক্ষ্যেই ব্যস্ত ছিল। এইরূপে যে প্রস্তাবিত গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স বা বৃহৎ মৈত্রীজোট হিটলারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহকে রুখে দিতে পারত, তা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি।

প্রশ্ন

১। হিটলার কে ছিলেন?

২। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের অর্থ কি?

৪.৪.৭.১.৫ ঃ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান (The Rise of Fascism and Nazism)

এছাড়া ইটালী, জাপান ও জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের রাজনৈতিক দর্শনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিদ্যমান ছিল— যা বিশে নিজ নিজ 'প্রভু-জাতির' (master race) আধিপত্যবাদকে নির্দেশায়িত করে। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের অর্থই হচ্ছে যুদ্ধ।

৪.৪.৭.২ ঃ যুদ্ধকালীন রাজনীতি (Politics During War-time)

*১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এটিও ছিল **"mass war"** বা বহস্বমের কথানুযায়ী **"Totral War"**.*

রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (আগস্ট ২৩, ১৯৩৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায়। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করে তুলল। হিটলার এই চুক্তিতে উৎসাহিত হয়ে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন যার পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এটিও ছিল 'mass war' বা হবস্বমের কথানুযায়ী 'Total War'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভাবনীয় ও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যায়। যুদ্ধের সূচনায় যে সোভিয়েট রাশিয়া ছিল ব্রিটেন-ফ্রান্সের ঘোরতর শত্রু, সেই রাশিয়াই যুদ্ধের গতিবিধির ঘূর্ণিঝড়ে তার কূটনৈতিক অবস্থানের বিপরীত দিকে চলে আসতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ যে জার্মানী ছিল যুদ্ধের সূচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র, সেই রুশ-জার্মান সম্পর্কে যুদ্ধের দু-বছরের মধ্যেই ফাটল ধরল এবং সম্পর্কের ঘোরতর অনতি ঘটল। হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল কতকগুলি কারণে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক পরিহার করে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে অক্ষশক্তির (জার্মানী, ইতালি ও জাপান) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এইভাবে যুদ্ধের নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ মিত্রপক্ষীয় রণকৌশল ও কূটনৈতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাদের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রদ্বয় — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একই সূত্রে বেঁধে ফেলতে পারল। গঠিত হল চমক লাগানো মহাজোট (The Grand Alliance)। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকে যুদ্ধ ও কূটনীতি এই দুই পন্থার মাধ্যমে গ্র্যাণ্ড এ্যালায়েন্স (Grand Alliance) তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করল। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রশ্নে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন বা আমেরিকার ভুল বোঝাবুঝি ও মন কষাকষি চললেও অবশেষে সেই রণাঙ্গন খোলা হয় ১৯৪৪ সালের জুন মাসে। এর ফলে জার্মানীর পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায়।

যুদ্ধকালীন সময়ে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে তিনটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি হল — তেহেরান, ইয়াল্টা ও পটসডাম। যুদ্ধকালীন তিন রাষ্ট্র প্রধানের তিনটি শীর্ষ সম্মেলন পূর্ব-ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠে। তবে পটসডাম সম্মেলনে নানা প্রশ্নে সোভিয়েত পক্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ-মার্কিন পক্ষের তীব্র বাদানুবাদ ও মতানৈক্য দেখা দেয় যা পরের তিন দশকের ঠাণ্ডা-লড়াই এর ইঙ্গিত দিয়েছিল। অবশ্য আশার কথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত (U.N.O.) একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্তা যুদ্ধাবসানে গড়ে উঠতে পেরেছিল।

প্রশ্ন

১। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি কত সালে স্থাপিত হয়?
২। সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল কেন?
৩। কত সালে পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ হয়?

৪.৪.৭.৩ ঃ যুদ্ধের ফলাফল (Results of the War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ফলাফল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের Super Power বা অতিশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ। উক্ত দুটি দেশ বিশ্ব মানচিত্রে তাদের সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাবলী নিয়ে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বকে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। তারা জন্য কোন শক্তি অথবা সম্ভাব্য অপর শক্তিজোট অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী দেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তাদের অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন অবস্থানের জন্য তারা তাদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য (Balance of Power) নির্ধারণ করতে পেরেছিল।

*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ফলাফল ছিল একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের **"Super Power"** বা অতিশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ এবং অন্যদিকে তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যথা — জার্মানী, ইতালী ও জাপানের বিলুপ্তিসাধন।*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয় পক্ষকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা (isolation) থেকে বার করে আনবার উপলক্ষ্য প্রদান করেছিল, যে বিচ্ছিন্নতার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছিল এবং যাকে মূলত বলপূর্বক সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশের পর তার উপর চাপানো হয়। এ কথা সত্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে উক্ত দুটি দেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে জড়িত ছিল। কিন্তু তারা কখনই দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইউরোপীয় ও এশীয় দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মুখ্য অভিনেতারূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়নি।

প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ফলাফল কি ছিল?

উক্ত যুদ্ধ স্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যথা জার্মানী, ইটালী এবং জাপানের বিলুপ্তি সাধন করেছিল। এর মধ্যে জার্মানীর এমনকি বিভাজন করা হয়েছিল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সহ অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষতম পক্ষ হিসেবে হস্তক্ষেপ করে বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের সাম্রাজ্যগুলি সংকটে পড়ে, তাদের অর্থনৈতিক শক্তি দারুণভাবে হ্রাস পায় এবং তাদের সামরিক শক্তিরও ব্যাপক অবনতি ঘটে।

যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলি একে অপরকে রক্তাক্ত করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রধান শিল্পোন্নত শক্তিরূপে কোনরূপ ধ্বংসসাধন ব্যতীত আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার জনসংখ্যা প্রায় ক্ষয়ক্ষতিহীন ও অটুট ছিল, যার অর্থনীতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনশীল হয় এবং যার সামরিক শক্তির দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে বিস্তার ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় বিবাদমান দেশসমূহের মধ্যে শেষতম পক্ষ হিসাবে হস্তক্ষেপ করে যখন ন্যূনতম বোঝা নিয়ে সর্বাধিকতম লাভ করে, তখন অন্যান্য দেশগুলি ব্যাপকভবে ক্ষতিপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিমান আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন অক্ষত ছিল। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ব্যাপক মাত্রায় লাভ করেছিল যার সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সামগ্রিক পরিমাণ ছিল কর প্রদানের পর ৫২ বিলিয়ন ডলার অথবা ১৩,০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। তারা তাদের কলকারখানাগুলির উৎপাদনশক্তির অর্ধাংশ বৃদ্ধি করেছিল এবং ৮৫ বিলিয়ন ডলার অথবা ২১,২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূলধনী তহবিল সংরক্ষিত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে উক্ত যুদ্ধ মার্কিন অর্ধনীতির রূপান্তর সাধনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এর উৎপাদনশীলতা তিননম্বর শিল্পোন্নত দেশের (তখন গ্রেটব্রিটেন) তুলনায় পাঁচগুণ বেশি ছিল। (যদিও সোভিয়েট অর্থনীতি ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় তা দুর্বলতর হয়েছিল, তথাপি তখন সে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ গ্রেটব্রিটেন এর ন্যায় একইরকম শক্তিশালী ছিল। বৃহত্তম শক্তিদ্বয়ের সহিত পরবর্তী পর্যায়ভুক্ত শক্তিদের মধ্যস্থ ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায় যখন ইউরোপের প্রধান উপনিবেশগুলির সবগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। জাপান শিল্পোন্নত মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও তাইওয়ান এবং অন্যান্য মূল্যবান ঔপনিবেশিক অধিকারগুলিকে হারায়। অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের ব্যাপক অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে এমন কতকগুলি সরকার প্রতিষ্ঠা করে যা তার রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অনুকূল ছিল।

প্রশ্ন

১। জাপানের শিল্পোন্নত উপনিবেশগুলি কি কি ছিল?
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন শক্তি শিল্পোন্নত দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে?
৩। সোভিয়েত রাশিয়ার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল?

এছাড়া ঠিক যেরূপ সোভিয়েট সামরিক শকিত পুরাতন সীমান্তসমূহকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়েছিল, মার্কিন সামরিক শক্তিও পুরাতন সীমাকে অতিক্রম করে সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা ব্যাপকতর ভিত্তিতে ইউরোপ, এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে প্রবাহিত হয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রীঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা বিস্ফোরমের দ্বারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারকারী ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমা এবং ১৯৫৩ সালে থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

একটি প্রধান ক্ষেত্র যা দুটি ইউরোপীয় শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবস্থানের জন্য দায়ী ছিল তা হচ্ছে আণবিক শক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ দ্বারা আণবিক শক্তি

প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সাফল্য লাভ করে যার দরুন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন আধিপত্য বিস্তারকারী ক্ষমতা লাভ করে যা সম্ভবত পূর্বে অন্য কোন দেশ পারেনি। সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনমূলক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রাধান্যমূলক অবস্থান লাভ করে। কিন্তু ১৯৫০ সালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন উক্ত প্রাথমিক ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সফল পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার পর পারমাণবিক অস্ত্রের মার্কিন একচেটিয়া প্রাধান্য ভেঙ্গে যায়। এরপর সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৫৩ সালে একটি থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় যা মার্কিনদের অনুরূপ বিস্ফোরণের একবছর সময়কাল পূর্ণ হবার পূর্বেই ঘটেছিল। এছাড়া ১৯৫৭ সালে মহাকাশে প্রথম মহাকাশযান প্রেরণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করে দেয়। এটা ছিল এমন একটি সাফল্য যা তার পারমাণবিক অস্ত্র বহু দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করার ক্ষমতাকেও প্রমাণ করেছিল।

প্রশ্ন

১। সর্বপ্রথম কোন দেশ মহাকাশ যান প্রেরণ করে?

২। আণবিক বোমার প্রথম বিস্ফোরণ কত সালে কোন দেশ ঘটিয়েছিল?

এইরূপে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইুনিয়ন অবশিষ্ট জগতের উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় ওইরূপ শক্তিশালী দেশও মার্কিন অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও সোভিয়েট অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা ও শক্তির বন্টন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের হাতে সংরক্ষিত হতে থাকে।

৪.৪.৭.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. ডেভিড টমসন — বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইউরোপ (অনুবাদ — দীপক মুখোপাধ্যায়)
2. Yoyce, Robert — The Origins of World War Two.
3. Churchhill Winston, S. — The Second World War, Vol. VI.
4. Carr, E. H. — International Relations Between Two World Wars.
5. Horowitz, David — From Yalta to Vietnam.
6. Feis, Herbert — From Yalta to Vietnam.
7. Feis, Herbert — Churchill, Roosevelt and Stalin.
8. Deborin, G – Secrets of the Second World War.
9. মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড।
10. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

৪.৪.৭.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

1. How did the Second World War originate? What were its results?
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিভাবে উদ্ভব ঘটল? এর ফলাফল কি কি?)

2. Explain the diplomatic background of World War II. What were its root causes?
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যআজ্ঞ্যা কর। এর মূল কারণগুলি কি?)

3. Analyse the origin, nature and the results of the Second World War.
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ফলাফল বিশ্লেষণ কর।)

4. Give a brief history of the road to the Second World War.
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর।)

5. Explain the events leading to the drift towards World War II.
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে প্রবাহিত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা কর।)

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

Second World War and the New Political Order

একক - ৮

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন

Nationalist Movements and Decolonization

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.৪.৮.১ ঃ ভূমিকা (Introduction)

৪.৪.৮.২ ঃ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন (Nationalist Movement and Decolonization)

৪.৪.৮.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Suggested Readings)

৪.৪.৮.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

৪.৪.৮.১ ঃ ভূমিকা (Introduction)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অধিকাংশই কতকগুলি পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে অথবা অবশিষ্ট দেশগুলি অপ্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনের আওতায় এসেছিল। উক্ত 'ধনতান্ত্রিক উপনিবেশবাদ' বিশ্বের শিল্পায়িত রাষ্ট্রসমূহের এবং কৃষিভিত্তিক ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহের মধ্যস্থ বাণিজ্যিক শর্তাবলীর (terms of trade) উপর নির্ভরশীল ছিল, যার দ্বারা প্রথমোক্ত দেশসমূহ (শিল্পায়িত দেশসমূহ) তার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য শেষোক্ত অঞ্চলসমূহের স্বল্পমূল্যের খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ও খনিজসম্পদের সঙ্গে বিনিময় করত। এর বহিঃপ্রকাশ পাশ্চাত্য দেশসমূহে বসবাসকারী বিশ্বের সম্পদশালী এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয়ের সঙ্গে পূর্বের ও দক্ষিণের দেশগুলির দারিদ্র্যপীড়িত বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয়ের সঙ্গে পূর্বের ও দক্ষিণের দেশগুলির দারিদ্র্যপীড়িত বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানের দরুন ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠীর দাসত্বকরণকে চিরস্থায়ী করার আশায় তাদের কতকগুলি ক্ষুদ্র ও শ্লথগতিসম্পন্ন কনসেশন বা ছাড় প্রদান করেছিল যা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসমূহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'ধনতান্ত্রিক উপনিবেশবাদ' বিশ্বের শিল্পায়িত রাষ্ট্রসমূহের এবং কৃষিভিত্তিক উপনিবেশিক অঞ্চলগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

প্রশ্ন

১। শিল্পায়িত দেশ বলতে কি বোঝ?

২। ঔপনিবেশিক শাসন চিরস্থায়ী করতে সাম্রাজ্যবাদীরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজস্ব করব খোঁড়ার ভুমিকাও পালন করেছিল, কারণ ঔপনিবেশিক জগতে আগ্নেয়াস্ত্র, শাসকবর্গ ও পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণাসহ অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল। এশিয়ান ও আফ্রিকানগণ পাশ্চাত্যের সম্পদের বৈপরীত্যে তাদের নিজস্ব দরিদ্র্য সম্পর্কের সচেতন হয়ে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ও নিজেদেরে রাজনৈতিক ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার দাবি করেছিল। সেখানকার ঔপনিবেশিক সমাজগুলির উচ্চবর্গীয় শ্রেণীদের (এলিট শ্রেণীভুক্ত) পাশ্চাত্য শিক্ষিত সন্তানসমূহকে নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অসন্তুষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রথম ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। উপরোক্ত বাস্তব ও বাধ্যবাধকতাযুক্ত পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলিকে বর্বর দমনপীড়নমূলক পরিস্থতির সঙ্গে এবং কখনও অনিচ্ছানির্ভর অথবা কখনও সদয় কনসেশন বা ছাড় প্রদানপূর্বক মোকাবিলা করা হত। মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বসমূহকে বুলেট, ব্যালট ও উৎকোচ প্রদানপূর্বক মোকাবিলা করা হত। এছাড়া সেখানে বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমূহ জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার এলিট সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দাবী করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিল।

প্রশ্ন

১। 'এলিট' কাদের বলা হয়?

২। তৃতীয় বিশ্বের আন্দোলনগুলি কিভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল?

৪.৪.৮.২ ঃ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন (Nationalist Movement and Decolonization)

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনসমূহ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকে বিকাশশীল ছিল, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার অর্ধশতকের মধ্যে পাশ্চাত্যের ও জাপানী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহের প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্নকরণের আলোকে উক্ত আন্দোলনসমূহ যতটা উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করবে ভাবা হয়েছিল, ততটা সম্ভবপর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকতর জটিলতম ঔপনিবেশিক দেশসমূহে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনসমূহের বিকাশের সূচনা হয়, কিন্তু পারস্যের ন্যায় সে দেশগুলিতে শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত এলিট শ্রেণীভুক্তদের ও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকদের মধ্যে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্ধশতকের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন আশানুরূপ হয়নি। তথাপি ১৯১৪ সালের মধ্যে প্রাচীনতম ও ব্রিটেনকে শেতাঙ্গ অধ্যুষিত উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়। এ সময় ভারতে একটি প্রকৃত ঔপনিবেশিকবাদ বিরোধী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

রাজনৈতিক শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মৈত্রীজোট গড়ে তোলা যায়নি। বৃহৎ ঔপনিবেশিক শক্তিদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাচীনতম ও বৃহত্তম শক্তি ব্রিটেনকেই ১৯১৪ সালের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ বসতি অধ্যুষিত উপনিবেশসমূহ, যাদের ১৯০৭ সাল থেকে ডোমিনিয়ন আখ্যা দেওয়া হয়, যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা — এদের কার্যত স্বাধীনতা মেনে নিতে হয়। এদের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলেও শাসনক্ষমতা শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আয়ারল্যাণ্ড যা ইউরোপের একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গদের দেশ, যা সর্বদাই সমস্যা জর্জরিত ছিল। যাইহোক, ১৮৯০ পরবর্তীকালে ল্যাণ্ডলীগ ও পার্নেল এর বিস্ফোরক গোলযোগপূর্ণ বছরগুলি আইরিশদের রাজনৈতিক বিবাদজনিত কারণেও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর একই সঙ্গে গৃহীত নিষ্ঠুর দমনপীড়নমূলক পদ্ধতি ও সুদূরপ্রসারী কৃষিভিত্তিক ভুমিসংস্কার নীতির সমাহারের দরুন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল।

উক্ত সময়কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথাও দৃশ্যত বিপনন প্রতীয়মান হয়নি। যাইহোক, একটি প্রকৃত ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন ভারতে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়, যেখান একটি প্রভাবশালী বুর্জোয়াশ্রেণী (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাণিজ্যিক, আর্থিক, শিল্পকেন্দ্রিক ও পেশাদার শ্রেণী)— ভারতীয়দের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক ক্লীবত্ব ও সামাজিক হীনতার দরুন ক্রমবর্ধমান মাত্রায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। ওইরূপ অসন্তোষ ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কর্তৃক উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (১৮৮৫ সালে স্থাপিত) উদ্যোগে একটি স্বশাসনের আন্দোলনের সূচনা হয়, যে দল পরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দলে পরিণত হয়।

প্রশ্ন

১। ডোমিনিয়ন দেশগুলি কি কি?

২। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বের মধ্যে কংগ্রেস একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি হয়ে উঠলেও তা মূলত ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের জন্য আন্দোলনকারী একটি এলিট তথা উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যকর ছিল। ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উক্ত প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল, কারণ এলিট তথা উচ্চবর্গীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল ভাতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ যারা মূলত অশিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত, যারা চিরাচরিত বিস্বাস, মূল্যবোধ ও মতাদর্শকেন্দ্রিক সমাজের অঙ্গ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য ছিল কিরূপে এর আধুনিকতাবাদী কর্মসূচীকে ব্যাহত না করেও মূলত ঐতিহ্যবাদী ও আধুনিকতাবাদ বিরোধী জনগণকে গশীল করে তোলা যায়। বাংলাকে মূলত মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ (আসামসহ) ও হিন্দু অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ (আসামসহ) ও হিন্দুঅধ্যুষিত পশ্চিমবাংলায় (বিহার-উড়িষ্যাসহ) বিভক্ত করবার ব্রিটিশ পরিকল্পনার দরুন সর্বপ্রথম (১৯০৫-১৯০৯) সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন একটি ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যা এর সূচনাকাল থেকে কংগ্রেস আন্দোলনের বামদিকে অবস্থিত ছিল এবং যা কখনই এর সঙ্গে পুরোপুরি সংহতিসাধন করেনি, তা উক্ত পর্যায়ে গণসমর্থন আদায়ের জন্য ধর্মীয় মতাদর্শকেন্দ্রিক

১৯০৫-০৯ সালের মধ্যে কংগ্রেস ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের জন্য আন্দোলনকারী এলিট তথা উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ব্যাপক গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

আবেদন রাখে। উক্ত আন্দোলনে আইরিশ জাতীয়তাবাদী (মূলতঃ ক্যাথলিক) ও রাশিয়ান নারদনিক আন্দোলনের ন্যায় পাশ্চাত্য বিপ্লবী আন্দোলনগুলির অনুকরণপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত আন্দোলন ভারতের সর্বপ্রথম বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়, যা পরে জনপ্রিয় আন্দোলনের সুতিকাগারে পরিণত হয়।

পশ্চিমভারতে ইতিমধ্যেই চিরাচরিত ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মকেন্দ্রিক আবেদনসম্ভূত আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল অশিক্ষিত নিরক্ষর জনগণকে এর অঙ্গীভূত করা। সেখানে বালগঙ্গাধর তিলক গো-জাতির পবিত্রতারক্ষা, দশমবর্ষীয়া বালিকাবিবাহের বিরুদ্ধে বিদেশি মনোভাবাপন্নদের আক্রমণের বিরোধিথা করে বেশ কিছুটা জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এর ফলে ভারতের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণকে নাড়া না দেওয়া গেলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রকগণ সর্বপ্রথম ভারতীয়দের কিছুটা পরিমাণে স্বায়ত্বশাসন দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই সময়েই কংগ্রেস সর্বপ্রথম ১৯০৬ সালে স্বশাসনের (স্বরাজ) দাবি তোলে।

প্রশ্ন

১। কত সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়।

২। স্বায়ত্বশাসন বলতে কি বোঝায়?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ অনুসৃত বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা (The Great Depression) বং রুশ অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) প্রভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিশাল প্রবাহ দেখা দেয় যা ঔপনিবেখি পদ্ধতিকে আন্দোলিত করবার সূচনা করে। মিশরে ওয়াফদ (Wafd) নামে পরিচিত স্বশাসনের আন্দোলন/প্রতিষ্ঠান/দল ব্রিটিশ শান থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। সেখানে তিন বছরের সংগ্রামের দরুন ব্রিটিশ শক্তি প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন পরিত্যাগ করে কম মাত্রায় প্রত্যক্ষ পরিচালন পদ্ধতি গ্রহণ করে, যার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল প্রশাসনের কিছু পরিমাণ মিশরীয়করণ।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা ও রুশ অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে মিশরের ওয়াফদ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে।

প্রশ্ন

১। মিশরের মুক্তি আন্দোলনের নাম কি?

২। ওয়াফদ আন্দোলন কত বছর ধরে চলেছিল?

ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গণ-জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ব্যাপক রূপান্তরসাধন অনুষ্ঠিত হয়। যার আংশিক কারণ ছিল রক্তপানকারী ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের নৃশংসতা, যিনি জালিয়ান ওয়ালাবাগের বাহিরপথহীন বেষ্টিত মাঠে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিচালনাপূর্বক গণহত্যা করেন, কিন্তু এর মূল কারণ শ্রমিক আন্দোলনের প্রবাহ, গান্ধী আহুত গণ অসহযোগ আন্দোলন ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী কংগ্রেস প্রভৃতির একত্র সমাহার। মুহূর্তের জন্য সেখানে মুক্তি আন্দোলন গগনচুম্বী উচ্চতায় পৌঁছেছিল। গান্ধীজি ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯২১ সালের মধ্যে স্বরাজ অর্জন করা সম্ভবপর হবে। আন্দোলন শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেইসময় থেকে ভারতে প্রায়ই সাময়িক বিরতিপূর্ণ অশাসনযোগ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ব্রিটেনের শাসকশ্রেণী উপলব্ধি করে

গান্ধীজি ঘোষণা করেন ১৯২১ সালের মধ্যে স্বরাজ অর্জন করা হবে। সেই সময় থেকে প্রায়ই --- সাময়িক বিরতিপূর্ণ অশাসনযোগ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদীসহ ভারতীয় এলিট শ্রেণীর সহিত বোঝাপড়ার মধ্যে নিহিত আছে। ১৯৩০-এর প্রথমার্ধে আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রবাহ, ব্রিটিশ কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৩৫ সালের বোঝাপড়ামূলক ভারত শাসন আইন—যার ফলাফলস্বরূপ ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের দেশব্যাপী সমর্থন পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের রূপক কে ছিলেন?

২। কত সালে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়?

গণ বিপ্লববী আন্দোলনসমূহ ঔপনিবেশিক জগতের অন্যান্য অঞ্চলেও আত্মপ্রকাশ করে। আফ্রিকার ফরাসী ইসলমিক উপনিবেশসমূহ যথা টিউনিশিয়া, আলজিরিয়া এবং এমনকি মরক্কোতে আধুনিকতাবাদী ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। এছাড়া সর্বপ্রথম ফরাসী ইন্দোচীন অর্থাৎ বর্তমানকালের ভিয়েতনাম, লাওস এবং কাম্বোডিয়াতে গণপ্রতিবাদী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণ ইন্দোনেশিয়াতে মূলত এইজন্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল; কারণ সেখানে ইসলামিক, কম্যুনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত ছিল ও একে অপরের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তখনও পর্যন্ত অস্বীকৃত গণঅসন্তোষ ট্রিনিদাদ-এর তেলের খনিতে ও জামাইকার আবাদী (plantation) খামারগুলিতে কতকগুলি ধর্মঘটের মাধ্যমে ১৯৩৫ ও ৩৮ সালের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে যা শেষপর্যন্ত দাঙ্গায় ও দ্বীপব্যাপী সংঘাতে পর্যবসিত হয়।

গণ বিপ্লবী আন্দোলনগুলি ১৯৩৫ ও ৩৮ সালের মধ্যে সুস্পষ্টরূপ আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র, সাব-সাহারান আফ্রিকা তখনও শান্ত ছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন', ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট ও কম্যুনিস্ট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ভবিষ্যত জাতীয়তাবাদী নেতাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

কেবলমাত্র সাব-সাহারান আফ্রিকা তখনও পর্যন্ত শান্ত ছিল যদিও ১৯৩৫-৪০ সালের মধ্যে শ্রমিকদের গণ-ধর্মঘট-এর প্রবাহ আফ্রিকাতে দেখা দেয়। তবে সেখানেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত আইফ্রকানদের অসন্তুষ্ট একটি শ্রেণী বিকাশশীল রাজনৈতিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রশাসন ও পুলিশ এর বিরুদ্ধে প্রচার চালা., সামাজিক পুনর্গঠনের দাবি করে ও অর্থনৈতিক সংকটদ্বারা পীড়িত বেকারশ্রেণী ও আফ্রিকান কৃষকশ্রেণীর স্বপক্ষে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যেই সেখানে কেনিয়ার জোমোকেনিয়াট্টা, নাইজিরিয়ার ডঃ নামদি আজিকিউয়ের ন্যায় আফ্রিকার ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদের নেতাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন, ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট আন্দোলন ও এমনকি কম্যুনিস্ট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তি কেন তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল?

২। ডঃ নামদি কে ছিলেন?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পূর্বেই ঔপনিবেশকতাবাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে নায়কদের নিকট দুটি মাত্র পথ উন্মুক্ত ছিল, প্রথমত স্বাধীনতার দাবিকে সম্মানজনকভাবে মেনে নিয়ে সেখানে কিছুটা প্রভাব বজায় রাখা অথা প্রচণ্ডভাবে লড়াই করে শেষপর্যন্ত চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়া।

ইরানে ডঃ মোহাম্মদ মোসাদেক-এর নেতৃত্বে জনপ্রিয় সরকার গঠন এবং মিশরে জামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব ব্রিটিশ ও ফরাসীদের পূর্বোক্ত রূপান্তরসাধন প্রক্রিয়াকে বানচাল করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে।

১৯৪০ ও '৫০ এর দশকে ব্রিটেন প্রথমোক্ত পথ অনুসরণ করে ও এইভাবে প্রাক্তন উপনিবেশগুলি বা বর্তমানে স্বাধীন, তার অধিকাংশ দেশকে কমনওয়েলথ-এর মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকা ও ফিলিপাইন্স-এ অনুরূপ পথ অনুসরণ করে। ওলন্দাজরা শক্তি প্রয়োগ করে ও ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ধরে রাখবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তি প্রথমে ব্রিটিশ ও পরে মার্কিন সমর্থনে হো-চি-মিন এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামে ইতিমধ্যেই মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলসমূহকে পুনরয়া অধিকার করে ধরে রাখবার মরীয়া প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের ঐক্যসাধনকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে ভিয়েতনামের দক্ষিণ প্রান্তে তাদের এক তাবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। শেষপর্যন্ত দীর্ঘ দুই দশকব্যাপী ব্যাপক যুদ্ধ চালিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১৯৭৫ সালে পরাজয় স্বীকার করে ভিয়েতনাম থেকে চলে যেতে হয় ও ভিয়েতনামের ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয়।

পারস্য থেকে মরক্কো পর্যন্ত পশ্চিমের ইসলামিক অঞ্চলভুক্ত দেশসমূহে কতকগুলি জনপ্রিয় আন্দোলনসমূহ, বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৫১ সালে ইরানে পাশ্চাত্যের তেল কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ, তৎকালীন শক্তিশালী তূদে কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনে ডাঃ মোহাম্মদ মোসাদেক এর জনপ্রিয় সরকার গঠন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা। এরপর মিশরে কর্নেল গামাল আবদেল নাসের এর নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব ও তারপর ইরাক ও সিরিয়ার পাশ্চাত্যের তাবেদার সরকারকে উৎখাত করে বিপ্লব সফল হলে তা ব্রিটিশ ও ফরাসীদের পূর্বোক্ত রূপান্তরসাধন প্রক্রিয়াকে বানচাল করবার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে।

প্রশ্ন

১। ইরাকে তেল কোম্পানীগুলির জাতীয়করণ কবে করা হয়?

২। মিশর বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন?

কেনিয়াতে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধ দেখা দিলেও তা মূলত সেখানকার একটি আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যার নাম ছিল মৌ মৌ / মাউমাউ আন্দোলন (১৯৫০-৫৬)। ব্রিটিশ আফ্রিকাতে পূর্বতন গোল্ড কোষ্ট এ (বর্তমান ঘানা) এক প্যান আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী কওয়ামে নক্রুমার নেতৃত্বে একটি গণ দলের অধীনে গণআন্দোলন দেখা দেয়।

১৯৬০ এর বছরটি ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গোধূলিলগ্ন। বর্তমানে ঔপনিবেশিকতাবাদ মৃত, কারণ এর প্রধান সম্পদ বর্তমানে অবলুপ্ত।

১৯৬০-এর বছরটি ঔরপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গোধূলিলগ্ন ছিল এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ তাদের বিশ্বজয়ের প্রচেষ্টায় জাতীয় উক্তি আন্দোলনের শক্তিসমূহ দ্বারা চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয়।

প্রশ্ন

১। কোন সময়কে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গোধুলিলগ্ন বলা হয়।

২। কোরিয়ার আঞ্চলিক আন্দোলনের নাম কি ছিল?

ঔপনিবেশিকতাবাদ বর্তমানে মৃত; কারণ এর প্রধান সম্পদ বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠীর আবার বিজিত হবার পর কতিপয় দখলদারগণ কর্তৃক নীরবে শাসিত হওয়ার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন জনিত কারণেই ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান ঘটেছে।

৪.৪.৮.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Suggested Readings)

1. McWilliams, W. C. and Piotrowski, Harry — The World Since 1945.
2. Calvocarresi, Peter — World Politics since 1945.
3. Eugeno Kim, C. I. and Ziring Lawrence — An Introduction to Asian Politics.
4. Kennedy, P. — The rise & Fall of the Great Powers.
5. Kedourie, Elie, (ed.) — Nationalism in Africa and Asia.
6. Thomas, C. — In search of security. The Third World in International Relation.
7. Vadney, T. E. — The World since 1945.

৪.৪.৮.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

1. How was the post-war bi-polar World politics affected by the rise of the decolonised Third World Countries?

   (তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অব-উপনিবেশায়নের উদ্ভব কিভাবে দ্বিমেরু বিশ্ব রাজনীতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছিল?)

2. How did the process of post-second world war decolonisation give rise to the 'Third World' in South and South East Asia?

   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের অব-উপনিবেশয়নের প্রক্রিয়া কিভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব ঘটিয়েছিল?)

3. How do you explain the end of Imperialism and Colonialism after the end of the second world war?

   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর তুমি সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?)

4. How do you account for the rise of the anti-colonial revolution and the process of decolonization in Asia, Africa and Latin America in the aftermath of the world War II?
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিকতা বিরোধী বিপ্লব এবং অব-উপনিবেশায়নের আন্দোলনের প্রক্রিয়া তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?)

5. Why and how national liberation movements emerged in he colonised countries of the third world leading to the twilight of the empires and the end of colonialism?
(তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কেন এবং কিভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল আর ফলে সাম্রাজ্যবাদের গোধুলি (সন্ধ্যালোক) এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান সূচিত হয়েছিল?)

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

Second World War and the New Political Order

একক - ৯

চীনে সাম্যবাদী বিপ্লব এং বিশ্ব রাজনীতির উপর এর প্রভাব

Communist Revolution in China and its impact on World Politics

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.৪.৯.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৪.৯.১ ঃ ভূমিকা

৪.৪.৯.২ ঃ চীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

৪.৪.৯.৩ ঃ সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্য এবং মাও-সে-তুং-এর ভূমিকা

৪.৪.৯.৪ ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে চীনা সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রভাব

৪.৪.৯.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

৪.৪.৯.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৪.৯.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) চীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

(২) এই বিপ্লবের সাফল্যের কারণ

(৩) মাও-সে-তুং-এর অবদান

(৪) বিশ্ব রাজনীতিতে চীনা বিপ্লবের প্রভাব

৪.৪.৯.১ ঃ ভূমিকা

অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে, কমিউনিস্ট নেতৃত্বে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তিরূপে চীনের আত্মপ্রকাশ সাম্প্রতিক বছরগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা। (According to Prof.Friedman, ‘‘The emergence of China as a unified national power under communist leadership is the most important

international event of recent years''.) প্রকৃতপক্ষেই বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে চীনের আবির্ভাব একটি বৈপ্লবিক যুগান্তকারী পরিণতি। ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে চীনকে সুদূর প্রাচ্যের পীড়িত মানবরূপে (The sick man of the far east) বর্ণনা করা হত। মাঞ্চু রাজবংশ যারা চীন সাম্রাজ্যের দীর্ঘ রাজবংশের তালিকায় শেষতম ছিল, তাদের শক্তি দ্রুত অবক্ষয়মান ছিল। এটা মনে করা হচ্ছিল যে চীন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের ক্ষুধার্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ চীনের পতনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে খণ্ডবিখণ্ড অংশগুলি তুলে নেবার ব্যগ্রতার ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছিল। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রথম অহিফেন যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে (১৮৩৯-৪২) চীনের যে দীর্ঘকালীন বিশৃংখলার সূচনা হয় এবং যা অব্যাহত থাকে তাইপিং বিদ্রোহের প্রবল উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে (১৮৪৮-৬৪) এবং ১৯০০ সালের বিখ্যাত বক্সার বিদ্রোহে, সে গুলিকে প্রথমে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ও পরে জাপানের চীন বিজয়ের অতবা ব্যবচ্ছেদের প্রচেষ্টাসমূহ প্রতিরোধার্থে চীনের রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বনের বিশৃঙ্খল অন্বেষণ বলে সঙ্গতভাবে অভিহিত করা যায়। চীনের উক্ত অন্বেষণ যা দীর্ঘকাল ধরে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল তার দরুণ একটি নতুন জাতীয়তাবাদী ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে যা শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ ভদ্রলোক শ্রেণীকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত করে—যার চূড়ান্ত পরিণতি পর্বে ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (Peoples Republic of China) বা কমিউনিষ্ট চীনের উদ্ভব ঘটে।

অধ্যাপক ফ্রিডম্যানের মতে, 'কমিউনিস্ট নেতৃত্বে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তিরূপে চীনের আত্মপ্রকাশ সাম্প্রতিক বছরগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা।

প্রশ্ন

১। চীনের শেষ রাজবংশের নাম কী?

২। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্থান আলোচনা কর।

৪.৪.৯.২ ঃ চীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

মাঞ্চু রাজবংশের অবসানের পর ১৯১১ সালে কুয়োমিন্টাং দলের নেতা ও প্রধান সংগঠক ডঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে বিশশক্তিবর্গের মধ্যে নিজের যথাযথ স্থান প্রতিষ্ঠার জন্য চীনের যাত্রা শুরু হয়। ডঃ সান ইয়াৎ সেন প্রজাতান্ত্রিক চীন Republic of China প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন যা সান-মিন-চু (The Sun-Min-Chu) নামক তিনটি নীতি যথা 'জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, জনগণের জীবনযাত্রার' উপর নির্ভরশীল ছিল। যাই হোক, সান বহু বছর পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব সমগ্র দেশের উপর স্থাপন করতে অসমর্থ হন। স্থানীয় সমরনায়কদের (War-lards) বিক্ষিপ্ত নিয়ন্ত্রণের কথা বাদ দিলে চীনের অধিকাংশ অঞ্চলেই একটি বিশৃংখল পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। উক্ত সমরনায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রাদেশিক রাজ্যপাল (Provincial governors) যাঁরা নিজেদের হাতে সকল ক্ষমতা অধিগ্রণ করেছিলেন।পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্রে সান-ইয়াৎ-সেন সোভিয়েট ইউনিয়নের সহায়তা লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে চীনা কমিউনিষ্টদের তিনি নিজ দলে (কুয়োমিন্টাং) যোগদানের অনুমোদন দান করে যান। এর দরুণ সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া উপাদানসমূহের (Reactionary

*কুয়োমিন্টাং দলের নেতা ডঃ সান ইয়াৎ সেন প্রজাতান্ত্রিক চীন বা **Republic China** প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন যা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবন যাত্রার ওপর নির্ভরশীল ছিল।*

bourgeois elements) সঙ্গে কৃষক সর্বহারা উপাদানসমূহের (Peasant Proletarial elements) আভ্যন্তরীণ সংঘাতের সূচনা হয়; যা পরবর্তীকালে কুয়োমিন্টাং কর্তৃক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়।

প্রশ্ন

১। প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

২। কত সালে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয়?

৪.৪.৯.৩ ঃ সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্য এবং মাও-সে-তুং-এর ভূমিকা

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াঁংকাইশেক কমিউনিষ্টদের সমর্থনের চীনের অধিকাংশ অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে সফল হন। এইরূপে যখন চীনের ঐক্যসাধন প্রক্রিয়া (unification process) সমাপ্তপ্রায়, তখন চিয়াং-কাইশেক দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ও সমরবাদী শক্তির (militarist elements) সহায়তায় কমিউনিষ্ট, শ্রমিক নেতৃবর্গ, কৃষক নেতৃবর্গ, ছাত্র, এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থীদের (radicals) উপর আক্রমণের সূচনা করেন। এরপর চিয়াং একটি ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র (Personal dictatorship) প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে কুয়োমিন্টাং দলের খণ্ডখণ্ড বিভাজন প্রক্রিয়ার (disintegration) এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের জাতীয়তাবাদী এবং সামাজিক সংস্কারমূলক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার (nationalist & social regeneration process) জন্য চীনা জনগণের দীর্ঘ ও তিক্ত সংগ্রামের (long & bitter struggle) সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির গণমুক্তি ফৌজ (People's Liberation army) কর্তৃক চিয়াং-কাই-শেক এর কুয়োমিন্টাং বাহিনী পরাজিত হয় এবং চিয়াং কাই সেক দলবলসহ চীনের মূল ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত হন। মার্কিন ডলার ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ চিয়াং-কাই শেক ও তাঁর দলবলকে রক্ষা করতে পারেনি ও তিনি তাঁর দলবলসহ তদানীন্তন ফরমোজায় (বর্তমান তাইওয়ান) পলায়ন করেন সেখানে মার্কিন সহায়তায় চীনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার (Govt. of the Republic of China) প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে চীনের মূল ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত People's Republic of China এবং তাইওয়ান মার্কিন সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত Republic of China-র মধ্যে বৈধতার প্রশ্নে দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। যদিও পরবর্তীকালে চীনের মূল ভূখণ্ডের People's Republic of China কে রাষ্ট্রসংঘসহ আন্তর্জাতিক জগৎ চীনের বৈধ সরকার এর স্বীকৃতি প্রদান করেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাইওয়ান এর প্রজাতন্ত্রী সরকার মার্কিন সহায়তায় তাইওয়ান এর উপর তার শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে।

সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাইশেক একটি ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির গণমুক্তি ফৌজ চিয়াং কাইশেককে পরাজিত ও বিতাড়িত করে।

প্রশ্ন

১। ফরমোজার বর্তমান নাম কী?

২। মাও-সে-তুং চিয়াং কাইশেককে কেন বিতাড়িত করেন?

৪.৪.৯.৪ ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে চীনা সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রভাব

১৯৪৯ সালের অক্টোবরে গণ প্রজাতন্ত্রী চীন (People's Republic of China) প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয় ও মাও-সে-তুং তার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী রাজধানী পিকিং (বর্তমান বেজিং)এর রাজধানী হয়। এর পূর্বে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন (Political Consultative Conference) এ তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে মাও-সে-তুং ঘোষণা করেন, ''আমাদের জাতি আর কখনই একটি অবমানিত/অপমানিত জাতি থাকবে না... যে যুগে চীনাদের অসভ্য বলে অভিহিত করা হত তার এখন অবসান হয়েছে।'' (Our nation will never be an insulted nation any more....the era in which the Chinese were regarded as uncivilised is now over'') সোভিয়েট ইউনিয়ন তার পূর্ণ সমর্থন গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারকে (Govt. of the People's Republic of China) জানায়। অন্যদিকে ভারত, ব্রিটেন ও বেশ কয়েকটি পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র উক্ত সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের নূনত শাসনব্যবস্থার প্রতি তার বৈরী মনোভাব বজায় রেখে তাইওয়ানের প্রজাতন্ত্রী চীন সরকারকেই চীনের ধৈ সরকারের স্বীকৃতি বহাল রাখে।

চীনের নূনতম শাসন ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ কর্মসূচীতে বিংশ শতাব্দীর চীনের সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পকেন্দ্রীক অর্থনীতি ও একটি শক্তি কাঠামো গড়ে তোলা হয়, যার মাধ্যমে চীন একটি বৃহৎ শক্তিরূপে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারে।

চীনের নূতন শাসনব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ কর্মসূচীতে বিংশশতাব্দীর চীনের সমস্যার সমাধানের জন্য একটি শিল্প-কেন্দ্রিক অর্থনীতির (Industrial economy) ভিত্তি স্থাপন ও এমন একটি শক্তি- কাঠামো (Structure of power) গড়ে তোলা হয় যার মাধ্যমে আধুনিক চীন একটি বৃহৎ শক্তি (great power) রূপে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারে। মাওর নব গণতন্ত্র (New Democracy) তে ঘোষিত লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সাম্যবাদের প্রতি অগ্রগতির (advance via socialism toward communism) জন্য ১৯৫০ এর দশকে সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৯২১-২৯ এর New Economic Policy র (নব অর্থনৈতিক নীতি)র সমতুল্য নীতি প্রস্তুত করবার কথা বলা হয়।

চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য সরবরাহ (Industrial supplies), অস্ত্রশস্ত্র (weapons) ও প্রযুক্তি পরামর্শদাতা (Technical Advisors) পায়। ১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারীতে স্বাক্ষরিত সোভিয়েট-চীন চুক্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনকে ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড ঋণদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এর পর ১৯৫৯ সালে স্বাক্ষরিত ঐক্যমতে বাড়তি ঋণদান মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি সামরিক মৈত্রী জোট গড়ে তোলা হয়। শুধু তাই নয়, চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়ার উপর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়। সুতরাং যদিও ১৯৬২ সালে চীন-সোভিয়েট সহযোগিতায় অবসান হয়, তবুও তা চীনকে একটি উচ্চাকাংক্ষাপূর্ণ বৃহৎ শক্তি (great power) রূপে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ১। আধুনিক চীনের আভ্যন্তরীণ কর্মসূচীগুলি কি ছিল?

চীন যে একটি বৃহৎ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে, সে বিষয়টি কোরিয়ার যুদ্ধের সময় প্রথম প্রকটিত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় যখন মার্কিনবাহিনী রাষ্ট্রসংঘের পতাকাতলে ইয়ালুনদীর দিকে চীনসীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন চীনা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। মার্কিনবাহিনীকে পরাজিত করে তাকে সংযত (contain) করার ক্ষেত্রে চীনাবাহিনীর যোগ্যতার বিষয়টি ছিল এমন একটি অভিজ্ঞতা যা বিগত শতাব্দীতে অজ্ঞাত ছিল এবং যা চীনের বিশালত্ব ও জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিসূচক প্রবল সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও রাজনৈতিক মর্যাদার অধিকারী শক্তিরূপে চীনের আত্মপ্রকাশের পূর্বাভাস প্রদান করেছিল। ১৯৫৯ সালে চীন তিব্বতের উপর তার সার্বভৌম অধিকার পোক্ত করেছিল। ১৯৬২ সালে সে দুটি স্থানে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করে ভারতীয় বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিল, যার দ্বারা ভারতীয় বাহিনীর উপর তার সামরিক উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়। ১৯৬৩ সালে সে পাকিস্তান ও বর্মার (মায়ানমার) সঙ্গে অ-আগ্রাসন চুক্তি(Non-Aggression Pacts) স্বাক্ষরিত করে, কাম্বোডিয়ার রাজতন্ত্রের সঙ্গে তার রাজনৈতিক বন্ধন শক্তিশালী করে এবং মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লাউসিয় (Laotian) ও ভিয়েৎনামীদের (Vietnamese) মুক্তি সংগ্রামের তার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে সম্প্রসারিত করে। ১৯৬০ এর দশকে সে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃরূপে সোভিয়েট কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায়। উপরোক্ত সব বিষয়সমূহ উক্ত দেশের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও শক্তির পরিচায়ক।

কোরিয়া যুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনীকে পরাস্ত করে বৃহৎ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তার শক্তির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল আর্থিক দুর্বলতা।

১৯৬৪ সালে চীন তার প্রথম আনবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি আধুনিক বৃহৎ শক্তিরূপে তার অগ্রগতির পথে আর একটি পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে। এরপর মহাকাশে তার প্রথম উপগ্রহ (Satelite) উৎক্ষেপণ করে চীন যে কেবলমাত্র Space Club বা মহাকাশযান সংঘে প্রবেশ করে শুধু তাই নয়, সে যে একটি অর্ন্তমহাদেশীয় উৎক্ষেপনকারী ক্ষেপণাস্ত্র (Intercontinental ballistic missile) নির্মাণ করেছে, সেই যিয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অর্থ ছিল যে সে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় অন্যান্য পারমানবিক শক্তিধর দেশগুলির তুলনায় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের (Nuclear missiles) ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যার জন্য তাকে অবশ্যই তৃতীয় পারমানবিক শক্তিরূপে গণ্য করা উচিৎ।

প্রশ্ন

১। কোরিয়ার যুদ্ধ কত সালে হয়?

২। চীনে প্রথম কবে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটে?

যে প্রধান বিষয়টি তখনও পর্যন্ত বৃহৎ তিনশক্তির অন্যতম হবার পথে চীনের বাধা ছিলতা হচ্ছে চীনের অর্থনৈতিক দুর্বলতা। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পুনর্গঠনের জন্য মাও-সে -তুং এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৫৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ভাঙ্গন শুরুর পর এমন একটি উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে একই সঙ্গে কৃষি

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর সমগ্র চীন মাও-আরাধনার পতাকাতলে স্থায়িত্ব ও একতা লাভ করে। ১৯৭৫ সালে চীনা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মাওকে ত্রিমুকুটে ভূষিত করা হয়।

ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেবার সঙ্গে প্রতিরক্ষা শিল্পের (defence industries) বিকাশেও অনুরূপ প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

যাই হোক, চীনের চরমনীতির (extreme policy)অসাফল্য, মহান অগ্রবর্তী উল্লম্ফন বা 'The great leap forward'এর শোচনীয় পরিণতি, তার এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান সোভিয়েট সমর্থন, ইন্দোনেশিয়ার ১৯৬৫ র অভ্যুত্থানের পর সেখানে ক্রমহ্রাসমান চীনা প্রভাব , বান্দুং পরবর্তী সম্মেলনে বিকাশশীল জগৎকে সামিল করার ব্যাপারে চীনাদের ব্যর্থতা, (যার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের চীনা আশঙ্কা)—ইত্যাদি সব বিষয়গুলি দরুণ পিকিং এ বিভিন্ন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যার ফলস্বরূপ চীনে ১৯৬৬ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লব (The Cultural Revolution of 1966) হয়, যাকে আধুনিককালের ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী আন্দোলন বলা হয়।

প্রশ্ন ১। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব কেন ঘটেছিল?

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বহুনায়ক সহ অংসখ্য দলীয় কর্মীদের উপর দমন নিপীড়ন চালানো হয়। (উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত কমিউনিষ্টনেতা দেং-শিয়াও-পিং এর কথা উল্লেখ করা যায়), এছাড়া বহুনায়ক ও অসংখ্য দলীয় কর্মীদের বিলোপ সাধন করা হয়। সামগ্রিকভাবে দলীয় প্রশাসন যন্ত্রের ভাঙ্গন ও সংহতিনাশ করা হয়। এরপরসমগ্র চীনা পাতদৃষ্টিতে মাও আরাধনার (Maocult) পতাকাতলে স্থায়িত্ব ওএকতা লাভ করে। কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং এর হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিষয়টি আইনসিদ্ধ করা হয় ১৯৭৫ সালে যখন চীনা সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে মাও কে ত্রিমুকুটে ভূষিত করা হয় যথা জনগণের নেতা (Leader of the people), রাষ্ট্রনায়ক (Chief of State), ও গণমুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the People's Liberation Army) ।

১৯৭৮ সালের মার্চ মাচে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস-এ সৈন্য বাহিনীর ভূমিকাকে পার্টির অধীনস্থকরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রত্যাবর্তন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রীভূতকরণ প্রভৃতি কর্মসূচীর পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, যাতে ২০০০ সালের মধ্যে চীনের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় চীনের জনগণের আরব্ধ কর্মকাণ্ডের কথা ঘোষিত হয়।

কিন্তু চরমপন্থী (Extremists) যাদের মধ্যে মাওয়ের পত্নী ম্যাডাম চিয়াং চিং-এর নেতৃত্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থীরাও (radicals) ছিল, ও যারা স্বয়ং মাওয়ের স্বয়ং মাওয়ের সমর্থন লাভ করেছিল তাদের সঙ্গে অন্যান্য নেতৃবর্গ যথা নরমপন্থীদের (যাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন চৌ-এন-লাই, দেং-শিয়াও-পিং এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ)—এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। উক্ত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে ও যার চূড়ান্ত পরিণতি ক্রমে ১৯৭৬ এর সেপ্টেম্বর মাসে মাওর মৃত্যুর পর Gang of Four বা 'চার দুষ্টচক্র' দ্বারা চিহ্নিত পূর্বোক্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর অবমাননাকর পতন হয়। চার দুষ্ট চক্রের নেতৃত্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থীদের পতনকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেস জনগণের দ্বিতীয় মুক্তি (a second liberation) বলে চিহ্নিত করেছে। উক্ত চার দুষ্টচক্র যারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন, তাদের ভাগ্য বিপর্যয়কে 'চীন বিপ্লব' এর প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি বলে চিহ্নিত করা হয়।

১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেস চীনের আধুনিক ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল দেং-শিয়াও-পিং সহ অন্যান্য অভিজ্ঞ পুরাতন নেতৃবর্গর প্রত্যাবর্তনের সময়কাল, যাঁরা ১৯৪৯সালে চীনা জনগণের বিপ্লবকে চূড়ান্ত বিজয়ে রূপান্তরিত করেন, কিন্তু যাঁদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অবাঞ্চিত ব্যক্তিরূপে বিশোধিত করা (purge) হয়েছিল। উক্ত পার্টি কংগ্রেস দেং-শিয়াও-পিং এর ধ্যান ধারণাসঞ্জাত পরিচালনায় একটি যৌথ নেতৃত্ব (collective leadership) গঠন করে, যাঁকে মাও ও তাঁর প্রকৃত অনুগামীরা পূর্বে 'ধনতান্ত্রিক পথগামী' (Capitalist roader) বলে চিহ্নিত করেছিলেন। উক্ত পার্টি কংগ্রেস সৈন্যাহিনীর ভূমিকাকে পার্টির অধীনস্তকরণ, নিয়ম শৃংখলায় প্রত্যাবর্তন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রীভূতকরণ, বৈপ্লবিক আলোড়নের যুগ থেকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ওবিকাশের পথে প্রত্যাবর্তন— প্রভৃতি কর্মসুচীর উপর জোর দেয়। ১৯৭৮ এর মার্চে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস (Fifth National people's Congress) এ পূর্বোক্ত কর্মসূচিসমূহের পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (people's Republic of China) একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হয় যাতে অন্যান্য বিষয়বলীর সঙ্গে ২০০০ সালের মধ্যে চীনের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় চীনের জনগণের আরব্ধ কর্মকাণ্ডের কথা ঘোষিত হয়।

প্রশ্ন

১। চার দুষ্টচক্র কি?

২। ম্যাডাম চিয়াং চিং কে ছিলেন?

৩। চীনের দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের উপজীব্য বিষয় কি ছিল?

পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি অব্যাহত ছিল এবং ১৯৮১ সালের ২৭ শে জুন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির একাদশতম সেন্ট্রাল কমিটি '১৯৪৯ সাল হতে, পার্টির ইতিহাস সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব' (Momentous 'Resolution on Questions in Party History since 1949) গ্রহণ করে। উক্ত প্রস্তাবে কঠোরভাবে বলা হয় যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রবর্তন ও তার অব্যাহতকরণে মাওর সকল প্রধান গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ একদিকে যেমন মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিষয়সমূহ ও অপরদিকে চীনের বাস্তব পরিস্থিতি—এর কোনটিরই সঙ্গে সঙ্গতি সূচক ছিল না। সুতরাং ১৯৮২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত চীন সরকার ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান পদমসূহ কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত চীনের বৈপ্লবিক প্রজন্মের হাতে ন্যস্ত ছিল যার মধ্যে চীনের সার্বভৌ ও নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দেং শিয়াও পিং।

এরপর যখন দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে বসে, তখন প্রতিনিধিবর্গ 'যে কোন পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ সংক্রান্ত বিষয় এবং সাংবিধানিক ও সাংগঠনিক পরিবর্তনসমূহ যেগুলি মৌলিক দিক থেকে চীন রাজনীতির ভবিষ্যৎ দিকগুলিকে পরিবর্তিত করবে—সেগুলিকে অনুমোদিত করেন। দেং কর্তৃক প্রবর্তিত উক্ত পরিবর্তনসমূহের মূলে ছিল বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দর স্থলে নূতন তরুণ প্রজন্মকে ক্ষমতায় প্রবেশাধিকার প্রদান। প্রকৃতপক্ষে দেং এর বাস্তববাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক নীতিসমূহ রূপায়নের পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যেই উক্ত পদক্ষেপ নির্দ্ধারিত হয়েছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে দেং এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসকে পুরাতন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের স্থলে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রযুক্তিবিদদের প্রজন্মকে সংস্থাপনের প্রক্রিয়ার সূচনা করবার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৮২ সালেকর ডিসেম্বরে চীনের ন্যাশনাল পিপল্‌স্ কংগ্রেস (National People's Congress) চীনের একটি নূতন সংবিধানকে গ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগসমূহ ঔ বৈদেশিক বিনিয়োগসমূহকে উৎসাহদানপূর্বক চীনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সমাজতন্ত্র' (Socialism with Chinese Characteristics) রূপায়নের জন্য দেং এর আধুনিকীকরম নীতিসমূহকে (Deng's policy of Modernisation) সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

৪.৪.৯.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

1. Snow, Edgar -- China's Long Revolution
2. Meisner, Maurice -- Mao's China and After.
3. Segal, G-Defending China.
4. Simmonds,J.D --China's World : The Foreign Policy of a Developing State.
5. Evans, Richard --Deng Xiaoping and the Making of Modern China.
6. Hinton Harold, C --China's Turbulent Quest.
7. Hinton, Harold, C -- The Sino-Soviet Confrontation : Implications for the future.
8. Clubb, Edmund, O.-- China and Russia-the great game.
9. চট্টোপাধ্যায়, প্রণব — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস
10. চক্রবর্তী, রাধারমণ (সম্পাদিত)— সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
11. ভট্টাচার্য, গৌরীপদ — আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

৪.৪.৯.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১. চীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

২. সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্যবাদী চীনের উত্থানের প্রভাবের মূল্যায়ন তুমি কিভাবে করবে?

৩. চীনা বিপ্লবে মাও-সে-তুং এর অবদান আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

একক ১০

ঠাণ্ডা লড়াই-এর আদর্শগত এবং রাজনৈতিক ভিত্তি ঃ সন্ধি এবং চুক্তিসমূহ ঃ উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দিতা

Ideological And Political Basis of War; Pacts and Treaties; Tensions and Rivalries

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.৫.১০.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

৪.৫.১০.১ ঃ ভূমিকা (Introduction)

৪.৫.১০.১.১ ঃ ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁড়া মনোভাব (Traditional Orthodox View)

৪.৫.১০.১.২ ঃ সংশোধন মতামত (Revisionist View)

৪.৫.১০.১.৩ ঃ তৃতীয় মতামত (Thirs View)

৪.৫.১০.১.৪ ঃ বিভিন্ন মতামতের মূল্যায়ণ (Assessment of different views)

৪.৫.১০.২ ঃ ঠাণ্ডা লড়াই-এর উদ্ভব ও প্রসারের বিভিন্ন পর্যায় (Origin of Cold War and different phases of Development)

৪.৫.১০.৩ ঃ উপসংহার (Conclusion)

৪.৫.১০.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (References)

৪.৫.১০.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

৪.৫.১০.০ ঃ ভূমিকা (Introduction)

১৯৪৫ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ব্যাপর দ্বন্দ ও সংঘাত যা সাধারণত Cold Wer বা ঠাণ্ডা লড়াই বলে অভিহিত হয়ে থাকে, তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। মার্কিন পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক জগতে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক যে বৈরিতাপূর্ণ নীতি দ্বারা চিহ্নিত, তার কারণসমূহের বহুবিধ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। উক্ত ব্যাখ্যাসমূহকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—যথা Traditional বা ঐতিহ্যবাদী এবং Revisionist বা সংশোধনবাদী।

৪.৫.১০.১.১ ঃ ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁড়া মনোভাব (Traditional Orthodox View)

ঐতিহ্যমণ্ডিত অথবা গোঁড়া মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি যা মূলতঃ মার্কিন সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছিল এবং সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অধিকাংশ মার্কিন পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক যার যাথার্থ্য পুনসমর্থিত হয়েছে, তা ছিল এই যে, ঠামডা লড়াই কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্ত জনগণের (Free men) সাহসিকতাপূর্ণ অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া। উক্ত মতে সোভিয়েট ইউনিয়ম এবং বিশেষতঃ তার রাষ্ট্রনায়ক স্টালিনের অনুসৃত নীতিসমূহ যা তিনি যদ্ধের শেষ মাসগুলিতে ও যুদ্ধ পরবর্তী অব্যবহিত পর্বে গ্রহণ করেছিলেন তাকে প্রধানত অথবা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির সহযোগিতার ভাঙ্গন ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব এর জন্য দায়ী করা হয়েছে। গোঁড়া লেখকগণের অভিমতে কমিউনিস্ট মতাদর্শ যা ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস করতে চায়, তার মহান প্রবক্তা জোসেফ স্টালিন ইয়াল্টা সম্মেলনে (১৯৪৫) তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গপূর্বক কমিনফর্ম (Cominform) স্থাপন করে পূর্ব ইয়োরোপে সোভিয়েটের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, চেকোস্লোভাকিয়াতে অভ্যুত্থান ঘটনা এবং ফ্রান্স ও ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টিদের তাদের সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপে প্ররোচিত করেন। ইয়োরোপ জুড়ে সোভিয়েট সম্প্রসারণের উক্ত পরিকল্পনা, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্খাসমূহ—এই সকলের সম্মিলিত ফলাফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল।

ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁড়া মনোভাব মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বিশেষতঃ তার রাষ্ট্রনায়ক স্টালিনের অনুসৃত নীতিসমূহকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব-এর জন্য দায়ী করেছেন।

প্রশ্ন ১। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবের পিছনে Traditionalist ঐতিহাসিকদের মতবাদ কি?

৪.৫.১০.১.২ ঃ সংশোধন মতামত (Revisionist View)

গোঁড়া (Orthodox) মতামতের বিরোধিতা করে সংশোধনবাদী (Revisionist) লেখকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূল কারণ। এছাড়া তাঁরা বলেন যে ১৯৪৫-৪৭ সালের মধ্যে অবাস্তব এবং কিছু সময়কালব্যাপী অতীব দুর্দমনীয় মার্কিন কূটনীতিই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিকল্প নীতি (hardline policies) গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ সকল পূর্ব ইউরোপের অনুগতকরণ/উপগ্রহকরণ (Satellisation), যা হয়ত সে অন্য অবস্থায় গ্রহণ করত না। কেনেথ ডব্লিউ থমসন (Kenneth W. Thomson) কে অনুসরণ করে সংশোধনবাদী লেখকদের দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়, নরমপন্থী (soft) এবং কঠোর (hard) সংশোধনবাদী (Revisionist).

প্রথমোক্ত মতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবকে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি.রুজভেল্ট-এর (Francklin d.Roosevelt) নীতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truman) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন। নরমপন্থী সংশোধনবাদী লেখকদের মতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত যুদ্ধকালীন সহযোগীতার নীতি পরিত্যাগ করেন এবং আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকার উল্লাসিত হয়ে

পূর্ব ইউরোপ থেকে সকল সোভিয়েট প্রভাব মুক্ত করার ও সোভিয়েট ইউনিয়েনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে কমিউনিস্ট বিরোধী পাশ্চাত্যপন্থী সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কঠোরনীতি গ্রহণ করেন। উক্ত আমূল পরিবর্তন নূতন মার্কিন নীতি অর্থাৎ কমিউনিজম বিরোধী নীতি সোভিয়েট সীমান্তসমূহ রক্ষার বিষয়ে কোন বিকল্প পথ খোলা না পেয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্যকরে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে বিশেষতঃ পোল্যাণ্ডে বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক ছিল এবং উক্ত সোভিয়েত স্বার্থকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ স্বীকৃতি দিতে পারেনি। এইরূপে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের অধীনে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন স্তালিনের ১৯৪৭-৪৮ সালে গৃহীত নীতিসমূহের কারণ ছিল—যথা মার্শাল পরিকল্পনার বাতিলকরণ, কমিনফর্ম (Cominform) এর প্রতিষ্ঠা, চেকোস্লোভাকিয়ার অভ্যুত্থান এবং বার্লিন (পশ্চিম) অবরোধ।

সংশোধনবাদীদের মতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি ট্রম্যান সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত যুদ্ধকালীন সহযোগিতার নীতি পরিত্যাগ করেন এবং আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকার উল্লসিত হয়ে পূর্ব ইউরোপ থেকে সকল সোভিয়েট প্রভাব মুক্ত করার যে নীতি নিয়েছিলেন তাঁরই ফলশ্রুতি হল ঠাণ্ডা লড়াই।

কঠোর সংশোধনবাদীরা (hardline revisionists) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণকে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও বর্ধিত উৎপাদন সুনিসিচত করার উদ্দেশ্য বিদেশিবাজার ধরার জন্য মার্কিন পুঁজিবাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ব্যাখ্যা করেছেন। জয়েস্ ও গ্যাব্রিয়েল কোলকো (Joyce & Gabriel Kolko) লিখেছেন রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্বস্ত ও স্থিতিশীল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা গঠিত আন্তর্জাতিক জগৎ যেখানে অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের অবাধ সরবরাহ থাকবে, কেবলমাত্র সেখানেই মার্কিন বাণিজ্যকে পরিচালনা করা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ পরিবর্তন, অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের শক্তিসমূহ দ্বার প্রবাহিত বিশ্বে উক্ত অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণার্থে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে স্থতাবস্তার পুনঃস্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের যে কোন জায়গায় যে কোন আন্দোলন যা মার্কিন সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমূল পরির্বনকামী তাকে ধ্বংস করবার প্রতি-বিপ্লবীনীতে (Counter-Revolutionary Policy) গ্রহণ করে। ওইরূপ আমূল পরিবর্তন প্রতিরোধ করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে কমিউনিজমের সংযতকরণ নীতি (Containment of Communism policy) ও এশিয়া ও ল্যাটিন অ্যামেরিকায় মার্কিন শক্তি ও দায়বদ্ধতা সম্প্রসারিত করবার প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং কঠোর সংশোধনবাদী (hard Revisionist)-দের মতে ঠাণ্ডা লড়াই ততটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ ছিল না, যতটা সামগ্রিক জগতে মার্কিন সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ছিল— যে জগৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করেনি ও সৃষ্টিও করেনি।

প্রশ্ন ১। ঠাণ্ডা লড়াই সম্বন্ধে সংশোধনবাদীদের মতবাদ কি?

৪.৫.১০.১.৩ ঃ তৃতীয় মতামত (Third View)

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উপর কয়েকজন লেখক গোঁড়া অথবা সংশোধনবাদী (Orthodox or revisionist) মতের কোনটাই পুরোটাই পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে নেতৃত্বের ব্যক্তিত্ব (Personalities of

leaders) অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতিসমূহ —এর কোনটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বন্দের জন্য দায়ী ছিল না। তাঁরা দ্বন্দের কারণসমূহকে মূলত পদ্ধতির প্রকৃতি (Nature of the state system) এবং যুদ্ধপরবর্তী দুটি অতি-শক্তির (two Super-powers) বিষয়গত বাস্তব পরিস্থিতি (Objective sitution) অর্থাৎ দ্বি-মেরুবিশিষ্ট শক্তির-বণ্টনের আত্মপ্রকাশ (Emergent bi-polar distributionof power)-এর মধ্যে এবং সোভিয়েত ও মার্কিন রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির কিছু ঐতিহাসিক পদ্ধতি, আদর্শ ও পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রত্যেকেই অর্ধ পৃথিবার উপর আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তিরূপে একে অপরের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক যেরূপ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির ইতিহাসে সব সময় অন্যান্য প্রতিযোগী শক্তিকেন্দ্রসমূহ একে অপরের সঙ্গে সংঘাত লিপ্ত হত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্বতন রাশিয়া যা ইয়োরোপ থেকে ক্রমাগত আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই একটি রক্ষামূলক বলয় প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে অগ্রসর হয়ে নিরাপত্তার অন্বেষণ করেছিল। অন্যদিতে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র যা উক্ত শতাব্দীতে ইয়োরোপের প্রতিরক্ষার জন্য দুবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা পশ্চিম ইয়োরোপের দিকে (পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপের মাধ্যমে) সোভিয়েট অগ্রগতিকে নিজ নিরাপত্তার প্রতি বিঘ্নস্বরূপ দেখেছিল। এইরূপে ইয়োরোপেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়। একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দেখলে বলা যায় দ্বন্দই ছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ। একথা সত্য যে দ্বন্দ কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও মার্কিন জাতীয়নীতির দ্বারা গতিশীল ও প্রবলতর হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির প্রকৃতি (Nature of the state system) ও যে ভীতিপূর্ণ ও সন্দেহজনক পথে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়পক্ষই একে অপরের পদক্ষেপকে ব্যাখ্যা করত, তার মধ্যেই দ্বন্দ অন্তনিহিত ছিল। কেনেথ ডব্লিউ থমসন বলেছেন যে ওইরূপ ধারণাই বিকল্প মতেক (alternative view) গোঁড়া ও সংশোধনবাদী, এই উভয়শ্রেণীর মতামত থেকে পৃথক করেছে।

বিপ্লবোত্তর সেভিয়েট রাশিয়াতে ১৯১৮-১৯ সালে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপে মার্কিন অংশগ্রহণের পীড়িত স্মৃতি ও ১৯৩৩-এর পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানে মার্কিন ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সোভিয়েট সন্দেহ দূরীকরণ যুদ্ধকালীন সহযোগিতার অভিজ্ঞতা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন দীর্ঘসূত্রিতা, আণবিক বোমা তৈরির পরিকল্পনা সোভিয়েটদের অবহিত করার ক্ষেত্রে মার্কিন অস্বীকৃতি, প্রতিশ্রুত লেণ্ড-লীজ সরবরাহ প্রেরণে দেরী, দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে মার্কিন ব্যর্থতা, জাপানের বিরুদ্ধে আণবিক বোমার ব্যবহার প্রভৃতি মার্কিন অভিসন্ধি সম্পর্কে সোভিয়েটদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলসমূহে বিশেষতঃ ইটালীতে প্রাক্তন নাৎসী সহযোগীদের সমর্থনের মার্কিন ইচ্ছা সোভিয়েট জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে 'অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন' (Free

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতিসমূহ –এর কোনোটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী ছিল না। বিকল্প মতামত অনুসারে ঠাণ্ডা লড়াই ছিল উভয়পক্ষের অভিসন্ধিসমূহের পারস্পরিক অবিশ্বাসজনিত ফলাফল।

elections) অনুষ্ঠানের বিষয়ে পূর্ব প্রদত্ত সোভিয়েট প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য মার্কিন চাপ, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য মার্কিন প্রতিশ্রুত লেণ্ড-লীজ সহায়তা যা সোভিয়েট ইউনিয়নের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তার আকস্মিক বাতিলকরণ—প্রভৃতি কারণে সোভিয়েট সন্দেহ ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি মার্কিন বৈরিতা বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সোভিয়েটদের মার্কিন-বিরোধী প্রচার ও ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ থেকে লাল ফৌজ প্রত্যাহারে সোভিয়েট অনিচ্ছুকতা প্রভৃতি। মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণে বদ্ধপরিকর একটি সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা হয়। উক্ত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, অবিশ্বাস ও তার ফলাফলস্বরূপ আশঙ্কা—দ্বন্দ্বের মূল ভিত্তি ছিল।

১৯৫২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনান (George Kennan) উল্লেখ করেছেন যে ভ্রান্ত পাঠকৃত সঙ্কেতসমূহের (misread signals) বিষয়টি উভয়পক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মার্শাল পরিকল্পনা যা এমনভাবে চরিত হয়েছিল যে তা সোভিয়েট ইউনিয়নের তাতে অংশগ্রহণ না করাকে (non-participation) সুনিশ্চিত করে, এছাড়া পশ্চিম জার্মান সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি এবং ন্যাটো (NATO, North Atlantic Treaty Organisation) প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপদ্বমূহ প্রভৃতিকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘিরে ফেলবার (encircle) প্রচেষ্টার সূচনাসমূহ বলে সোভিয়েটরা ব্যাখ্যা করে। অপরদিকে ১৯৪৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার উপর সোভিয়েট দৃঢ় হস্তক্ষেপ, (প:) বার্লিন অবরোধ (Berlin Blockade), উভয় পদক্ষেপই মূলতঃ পাশ্চাত্য পদক্ষেপের আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া মাত্র ছিল, তাকে তখন অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য দিক থেকে ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর ঠিক অল্প সময় পরে কোরিয়া যুদ্ধজনিত সংকট উপস্থিত হয়, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য বিশ্ববিজয়ের আনুমানিক সোভিয়েট অগ্রগতিকে ব্যর্থ করার জন্য সামরিক দিক থেকে হস্তক্ষেপ করে; এবং উত্তর মার্কিন পদক্ষেপ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব সাইবেরিয়াতে সোভিয়েট অবস্থানের উপর আপাতদৃষ্টিতে একটি বিপদ বলে মস্কোতে ধরে নেওয়া হয়। অতএব সংক্ষেপ বলা যায় যে, বিকল্প মতামত (alternative view) অনুসারে ঠাণ্ডা লড়াই উভয়পক্ষের অভিসন্ধিসমূহের পারস্পরিক অবিশ্বাসজনিত ফলাল ছিল।

প্রশ্ন ১। ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে বিকল্প মতবাদটি কী?

৪.৫.১০.১.৪ ঃ বিভিন্ন মতামতের মূল্যায়ণ (Assessment of different views)

যাই হোক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব সম্পর্কে উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যা অংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। এর কারণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব বা উৎসসমূহ অত্যন্ত জটিল ছিল। যাকে কোন একটি একক মতামত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বন্দ্বের সূত্রসমূহ বিভিন্ন ধরনের ও জটিল ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা লড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইইনিয়নের বর্হিবিষয়ক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিসমূহের জটিল মিথষ্ক্রিয়ার (Complicated interaction) ফলাফল ছিল বলা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কালে একটি অসম্ভাব্য স্বপ্ন (an impossible dream) আপাতদৃষ্টিতে সম্ভবপর বলে মনে হয়েছিল। নাৎসী অভিযানের মোকাবিলা করতে গিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের মিত্র হয়েছিল। তাদের উক্ত সহযোগিতা অস্বাভাবিক বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ছিল, যা জার্মানীর পরাজয়ের পরে আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। হিটলারের শাসনাধীন জার্মানী তাদের সহযোগিতার ভিত্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিল, এবং তৃতীয় রাইখ্ (Third Reich) এর পতন উক্ত অস্তিত্বের (সহযোগিতার) কারণকেই অপসারিত করে। এইরূপে দেখা যায় যেদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বানে লাল ফৌজ ও মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সেনাবাহিনী পদানত ইউরোপ জুড়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। ওটা ছিল এমন একটি পরিস্থিতি যা উভয় শক্তির কোনটিরই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ প্রভাব- পরিস্থিতিসমূহ—যথা মুক্ত পূর্ব ইউরোপে বন্ধুত্বপূর্ণ সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপত্তার অন্বেষণ, মতাদর্শের ভূমিকা (the role of indeology), দেশে যুদ্ধোত্তর প্যাপক পুনগঠনের প্রয়োজনীয়তা সমূহ, জোসেফ স্টালিনের ব্যক্তিত্ব— প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রভাব-পরিস্থিতিসমূহ যথা— কমিউনিজম্-এর ভীতি, মার্কিন স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি আন্তজার্তিক উন্মুক্ত দ্বার নীতি (international open door policy) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তি ও আণবিক বোমা আবিষ্কারের দরুন আণবিক অস্ত্রের উপর একচেটিয়া প্রাধান্যজনিত কারণে মার্কিন সর্বশক্তিমত্তার (Omnipotence) বিভ্রান্তি— প্রভৃতি কারণসমূহের ফলাফল ছিল উভয়পক্ষের মধ্যে বৈরিতাপূর্ণ দ্বন্দ ও সংঘাত। উভয় অতিশক্তির (Super-Powers) নেতৃবৃন্দ শান্তির অন্বেষণ করলেও এবং তাদের কার্যবলী যুদ্ধ অনিবার্য না করে তুললেও উভয়পক্ষের মতপার্থক্যসমূহের মীমাংসা অসম্ভব করে তুলেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ প্রভাব পরিস্থিতি সমূহ জোসেফ স্টালিনের ব্যক্তিত্ব, কমিউনিজম্ ভীতি মার্কিন স্বার্থসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কারণ সমূহের ফলাফল ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে বৈরাতিপূর্ণ দ্বন্দ ও সংঘাত।

৪.৫.১০.২ ঃ ঠাণ্ডা লড়াই-এর উদ্ভব ও প্রসারের নানা পর্যায় (Origin of Cold War and different phases of development)

কিভাবে এবং কখন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশের মধ্য দিয়ে হয়েছিল বলা যায়। ১৯১৭ সালের ২রা এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি উইলিসনের ঘোষণা যে ''শান্তি'' রাজনৈতিক মক্তির পরীক্ষিত ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে— তা বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় সোভিয়েত কংগ্রেসে লিওন ট্রটস্কীর ঘোষণা যে ''হয় রুশ বিপ্লব ইয়োরোপে বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করবে অথবা ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি রুশ বিপ্লবকে ধ্বংস করবে— এই উভয় ঘোষণার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ১৯১৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাশ্চাচ্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সূচনা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল উইনস্টন চার্চিল এর বিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী 'তার জন্মস্থানে, কমিউনিজমকে শ্বসরোধ করে হত্যা করা।' অন্যান্য ঐতিহাসিকরা ১৯৩৯-৪০ সালের উপর জোর দিয়েছেন, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে ও যাতে আসন্ন পূর্ব-পশ্চিম সংকটের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রথম পর্যায় (First Phase) ঃ যাইহোক সকল খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের মতে ১৯৪৫ সালটিই ছিল বৃহৎ বিভাজিকা যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য পদ্ধতির নির্ধারক রূপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে হাতাহাতি, লড়াই বা দাঙ্গা বাঁধে। এর মধ্যে ইয়োরোপের বিভাজন মূলক নির্ধারিত হয়েছে। পূর্ব ইয়োরোপে সোভিয়েট ইউনিয়নের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী লক্ষ্যসমূহের বিষয়টি এই সময়ই সরাসরিভাবে প্রকাশ্যে আসে।

১৯৪৪এর শেষের দিকে সোভিয়েত লাল ফৌজ পশ্চাৎগামী নাৎসীবাহিনীকে ধাওয়া করে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে প্রবেশ করে এবং প্রায় সময় ১৯৪৪ এর মাঝামাঝি যে মার্কিন বাহিনী ইউরোপ অভিযান করেচিল তা রাইন নদী অতিক্রম করে। ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সোভিয়ট ও মার্কিন বাহিনী জার্মান শহর টোর্গান (Torgan) এর নিকটে লেব নদীর ধারে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। মিত্র শক্তির তিন যুদ্ধকালীন নেতৃবর্গ রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্টালিন যখন ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইয়াল্টাতে সম্মেলন করছিলেন তখন ইয়োরোপ বিভাজন একটি বাস্তব ঘটনা। পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপ সোভিয়েট অথবা কমিউনিস্ট আধিপত্যাধীন হয়। রুজভেল্ট ও চার্চিল উক্ত অবিসম্বাদিত বাস্তবের সম্মুখীন হন যা তাঁরা ইয়াল্টায় পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন ও যেখানে পোলিশ প্রশ্নটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন মূলতঃ তার নিরাপত্তার স্বার্থে পোল্যাণ্ডে একটি সোভিয়েট ঘেঁষা সরকার চাইলে অন্য দুই শক্তি সেখানে কমিউনিষ্ট বিরোধী পাশ্চাত্য ঘেঁষা সরকার চায়। এইরূপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় পোল্যাণ্ডের 'রক্ত ও মাংস' (Flesh & Blood)-কে নিয়ে হয়। কেনেথ ডব্লিউ থমসন (Keneth W. Thomson)-ও মন্তব্য করেছেন, মূলতঃ কিন্তু কেবলমাত্র পোলিশ প্রশ্নটিকে নিয়ে না হলেও ইয়াল্টা সম্মেলন যুদ্ধকালীন সহযোগিতার যুগ এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম অবরোধকালীন অভিযানের (first sorties) মধ্যে জল বিভাজিকার (watershed) ন্যায় ছিল।

১৯৪৫ সালটিই ছিল বৃহৎ বিভাজিকা যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য পদ্ধতির নির্ধারকরূপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে হাতাহাতি, লড়াই বা দাঙ্গা বাঁধে। এর মধ্যে ইয়োরোপের বিভাজন মূলত নিধারিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মনে করেছিল যে ইয়াল্টায় অর্থ ছিল পূর্ব ইয়োরোপে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্রে সোভিয়ট অনুমোদন, অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন উক্ত ঐক্য মতকে সোভিয়ট ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠায় তাদের দাবির স্বীকৃতি প্রদান বলে মনে করে।

এইরূপে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সাতটি পূর্ব ইয়োরোরপীয় দেশসমূহ যথা আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, পূর্বজার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সকল ইয়োরোপকে কমিউনিস্ট করার একটি চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তখন সোভিয়েট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য দুটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, প্রথমতঃ লোহার পর্দাকে (Iron curtain, চার্চিলের ভাষায়) তার পুরাতন সীমান্তসমূহে গোটানো (roll back) এবং দ্বিতীয়তঃ কমিউনিস আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সামরিক পুনঃসশস্ত্রকরণ (military rearmament) ।

১৯৪৭ এর মার্চে ট্রুম্যান মতবাদ (Truman Doctrine)-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীস ও তুরস্ককে কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ব্রিটেন-এর নিকট হতে গ্রহণ করে। ১৯৪৭-এর জুনে মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall plan) ঘোষিত হয়। ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকরণের সহায়তা কর্মসূচী সোভিয়েট ইউনিয়নকেও দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুক্তি দেখিয়ে তা প্রত্যাখান করে যে মার্শাল পরিকল্পনা

অনুযায়ী কেবলমাত্র সহায়তা কর্মসূচীর বাবহার করবার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিদর্শনের অধিকার গ্রহণ করা সহায়তাপ্রাপক দেশগুলির উপর বাধ্যতামূলক ছিল শুধু তাই নয়, এছাড়া সাধারণভাবে তাদের অর্থনৈতিক নীতিসমূহের উপরও উক্ত পরিদর্শনের অধিকার গ্রহণ করা বাধ্যাতমূলক ছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়ন উক্ত মার্কিন পদক্ষেপ মোকাবিলা করবার উদ্দেশ্য ফ্রান্স ও ইটালীসহ পূর্ব ইয়োরোপের সকল কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে কমিনফর্ম বা কমিউনিস্ট ইনফর্মেশান ব্যুরো (Cominform or Communist Information Bureau) গঠন করে। কমিনফর্ম গঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পুনগঠনের পরিকল্পনাকে সহায়তা করা ও মার্শাল পরিকল্পনা যা ধনতন্ত্রবাদী ইয়োরোপের পুনজীবন সঞ্চার করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল, তার বিরোধিতা করা। এর অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে চেকোস্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিশ্বাস করে যে উক্ত সোভিয়েট পদক্ষেপসমূহ বিশ্ববিপ্লবের জন্য সোভিয়েট লক্ষ্যের নির্দেশক ছিল। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯ সালে ইউরোপে সোভিয়াট সম্প্রসারণবাদ-রে গতিরোধ করার জন্য নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশান বা ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organisation or NATO) গঠন করে।

এরপর উভয় অতি-শক্তির (both the Super powers) শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে উঠে জার্মানী। প্রাক্তন জার্মান রাজধানী বার্লিনে ঠাণ্ডা লড়াই কঠোরতম বিন্দুতে পৌঁছায়। ১৯৪৮ এর ৭ই জুন একটি পশ্চিম জার্মানরাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ঘোষণার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জার্মানীর পূর্বঞ্চলের সোভিয়েটে প্রশাসন পশ্চিম বার্লিন, যা সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানী দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম জার্মানীর মধে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। উক্ত বিষয়টি বার্লিন অবরোধ (Berlin Blockade) রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে খ্যাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রশক্তিবর্গ উক্ত অবরোধকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বার্লিন-এ বিমানপথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক সরবরাহ প্রেরণ করতে থাকে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অবরোধ ব্যর্থ করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে ১৯৪৯ এর ১২ই মে সোভিয়েট ইউইনয়ন শেষপর্যন্ত অবরোধ তুলে নেয়। এইভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ের (First phase of the cold war)-অবসান ঘটে।

এইরূপ দেখা যায় যে ঠাণ্ডা লড়াই, যার সূচনা ইউরোপে হয়েছিল, ফ্র্যাঙ্কেল(Frankel)-এর ভাষায় তা ছি/ দুটি দৈত্যাকার রাষ্ট্রের মধ্যে একটি মুষ্টিযুদ্ধের খেলা বা ম্যাচ এবং তাদের মধ্যে পদক্ষেপসমূহ এবং পাল্টা পদক্ষেপসমূহের সমাহার। উক্ত দ্বন্দে প্রত্যেক পক্ষই এমন নীতিসমূহ গ্রহণে বাধ্য হয় যা অন্য পক্ষ পারত না, কিন্তু তাকে নিজস্ব নিরাপত্তা এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে করত। তারপর প্রত্যেক পক্ষই প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপসমূহে গ্রহণে বাধ্য হত। এর ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাচে পূর্ব ইয়োরোপে তার নিরাপত্তা শক্তিশালী করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইয়োরোপকে পশ্চিম ইয়োরোপের পক্ষে পদক্ষেপরূপে বর্ণনা করে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে সমস্ত এলাকাসমূহ সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজ নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করত সেগুলিতে নিজ স্বার্থসমূহ দাবি করে। এর ফলে সোভিয়েটরা এই সিদ্ধাএন্ত উপনীত হয় যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তার চার পাশে ধনতান্ত্রিক বেষ্টনীর (Capitalist encirclement) পুরাতন পথ গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে এবং সোভিয়েটদের টিকে থাকবার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ এলাকাসমূহে সোভিয়েটবিরোধী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্টার জন্য

উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। প্রত্যেক পক্ষই একান্তভাবেই বিশ্বাস করত যে ভবিষ্যৎ আন্তজাতিক স্থিতিশীলতা, বিশ্বব্যবস্থা (world Order) সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া প্রত্যেক পক্ষই নিজ উদ্দেশ্য এবং তীব্রভাবে আকাঙ্কত নীতিসমূহ অনুসরণ করতে গিয়ে কেবলমাত্র অপর পক্ষের এই আশঙ্কাকে প্রতিপন্ন করতে যে সে আগ্রাসনে বদ্ধপরিকর। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এমন একটি প্রবল সংগ্রামে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যা প্রথমে ইয়োরোপে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ যথা এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন **প্রশ্ন ১**। এ ঠাণ্ডা লড়াইয়ে প্রথম পর্যায়টি কি আলোচনা কর?

দ্বিতীয় পর্যায় (Second phase) ঃ ১৯৪৯ সালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয় যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সফলতার সঙ্গে আণবিক বোমার ক্ষেত্রে মার্কিন একচেটিয়া প্রাধান্য ভেঙ্গে ফেলে আণিবিক বোমা তৈরি করে মার্কিন পরমাণুশক্তির সঙ্গে সমতা স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়াতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়-এর সূচনা হয়। ১৯৫০-এর ২৫শে জুন যখন কোরিয়াতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে রাষ্ট্রসংঘকে (United Nations) কোরিয়া আক্রমণ করে। এরপর যখন মার্কিন বাহিনী ইয়ালু নদী অতিক্রম করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বা কমিউনিসচ চীনের (Peoples Republic of China) নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তখন শেষোক্ত পক্ষ (চীন) কোরিয়ার পক্ষে হস্তক্ষেপ করে। এইরূপে কোরিয়ার পরিস্থিতি অত্যন্ত বিস্ফোরক হয়ে ওঠে। যাইহোক শেষপর্যন্ত কোরিয়ার যুদ্ধ একটি যুদ্ধ বিরতির দ্বারা অবসান হয় ও কোরিয়ার পুনঃঐক্যসাধনের (reunification) সমস্যা অমীমাংসিত থাকে।

যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সফলতার সঙ্গে আনবিক বোমার ক্ষেত্রে মার্কিন একচেটিয়া প্রাধান্য ভেঙ্গে ফেলে মার্কিন পরমানু শক্তির সঙ্গে সমতা স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়, তখন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় এর সূচনা হয়।

তৃতীয় পর্যায় (Third phase) ঃ এরপর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ের (third phase) সূচনা হয় যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার (Eisenhower) এবং তাঁর পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস ট্রুম্যানের 'Containment of Communism'-এর বা 'কমিউনিজম এর সংযতকরণ'-এর মরম নীতি (soft policy) বাতিল করে পূব ইয়োরোপে কমিউনিজমকে গোটানোর (rolling back) নীতি গ্রহণ করে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৪র ফ্রেব্রুয়ারিতে সিয়াটো (SEATO or South-East Asia Treaty Organization) এবং ১৯৫৫র ফেব্রুয়ারিতে 'মিডল ইস্ট ডিফেন্স ট্রিটি অর্গানাইজেশন' (Middle East Defence Treaty Organisation) গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনসমূহ (National liberation movements) দমন করা। উক্ত পর্যায়েই ভিয়েৎনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা রচিত হয়।

এরপর যখন পশ্চিম জার্মানী ন্যাটো (Nato)-এর সদস্য হয় তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশগুলিকে বেষ্টনী দেবার (encircle) মার্কিন চক্রান্তসমূহের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপরূপে ১৯৫৫ সালের ১৪ই মে পূর্ব ইয়োরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ চুক্তি ব্যবস্থা (Warsaw

Treaty System) গঠন করে। এছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপের অখণ্ডতাকরণের আন্দোলন (Integration movement)-এর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব ইয়োরোপের অখণ্ডতাকরণের (Integration) জন্য ১৯৫৯-এর ১৪ই ডিসেম্বর 'চার্টার অফ দি কাউন্সিল অফ মিউচুয়াল ইকনমিক অ্যাসিসট্যান্স' বা 'কোমেকন' (Charter of the Council of Mutual Economic Assistance, COMECON) গঠন করে, যার মধ্যে অন্তভুক্ত হয়— পূর্ব জার্মানী বা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (German Democratic Republic or G.D.R)। এইরূপে জার্মানীর বিভাজন চূড়ান্ত হয়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয় যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেন-হাওয়ার এবং তাঁর পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস ট্রুম্যানের 'কমিউনিজম এর সংযতকরণ' -এর নরম নীতি গ্রহণ করে পূর্ব ইয়োরোপে কমিউনিজমকে গোটানোর নীতি গ্রহণ করে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায় কঠোর বক্তব্য (Tough Talk) কিন্তু সমন্বয়বিধায়ক (accommodative) কার্যকলাপ দ্বারা চিহ্নিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনভাবে বক্তব্য রাখছিল যেন যুদ্ধ আসন্ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ কোরিয়ার যুদ্ধের পর অত্যন্ত সতর্কতা ও সংযমের পরিচয় দেয়। এছাড়া পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করবার প্রচেষ্টাজনিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, কারণ উভয় পক্ষই উপলব্ধি করে যে ঠাণ্ডা লড়াই একটি বিপদজনক অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছে যাকে মিটিয়ে ফেলতে হবে। এইরূপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বরফ গলতে শুরু করে।

চতুর্থ পর্যায় (Fourth phase) ঃ এরপর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ (Khruschev) ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার (Eisenhower) এর মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড বৈঠক (Camp David meeting)-এর পর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চতুর্থ পর্যায়-এর সূচনা হয়। উক্ত পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিবর্গ প্রেরণ এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ও সোভিয়েট ইউনিয়ন-এর সরকারসমূহের প্রধানদের পারস্পরিক পরিদর্শন (Mutual Visits) প্রভৃতির সূচনা হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই পুনরায় নতুন করে শুরু হয় যখন ইউ-টু-ঘটনা (U-2 Incident) দ্বারা ১৯৬০-এর প্যারিস সম্মেলনের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির আশা শেষ হয়ে যায়। এরপর পুনরুত্থিত ঠাণ্ডা লড়াই ১৯৬২ সালের কিউবায় মিসাইল সংকট (Cuban Missile Crisis) জনিত কারণে উত্তেজক হয়ে ওঠে। যাইহোক শেষপর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ঐক্যমত দ্বারা বিশ্ব একটি পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কামুক্ত হয়। উক্ত ঐক্যমত অনুযায়ী কিউবাকে কখনই আক্রমণ না করবার মার্কিন গ্যারান্টী প্রদানের বিনিময়ে কিউবা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসাইল ঘাঁটি প্রত্যাহার করেনেয়। এইরূপে দুটি অতি-শক্তির (two Super Powers) মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গঠনের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, যা ২০শে জুন, ১৯৬৩-র জেনিভা হইলাইন ঐক্যমত (Geneva Hotline Agreement), জুলাই ১৯৬৩র পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (Partial Nuclear Test Ban Treaty) এবং ১৯৬৮ সালের নিউক্লিয়ার নন-প্রেলিফারেশান ট্রিটি (Nuclear Non-Proliferation Treaty) প্রভৃতির মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়।

১৯৬২ সালের কিউবায় মিসাইল সংকটজনিত কারণে উভয় পক্ষই উত্তেজক হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যায় (Last phase) ঃ এরপর আন্তর্জাতিক জগৎ ঠাণ্ডা লড়াই থেকে দ্যাঁতাত (Detente)-এর যুগে বা সমঝোতার যুগে প্রবেশ করে। —এই যুগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন 'একটি সংঘাতের যুগ' (an era of confrontation)-এর পরিবর্তে আলাপ আলোচনার নূতন যুগ (A New era of Negotiations) ঘোষণা করেন।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শেষ পর্বকে বেশীরভাগ লেখকই দ্যঁতাত-এর পর্ব বলে থাকেন। ফরাসী শব্দ দ্যঁতাত (Detente) বলতে বোঝায় উত্তেজনা কমিয়ে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলা। ১৯৫০-এর দশকে তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গল (DeGaul) প্রথম কূটনৈতিক অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করেন। সোভিয়েট-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার শুরু করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরী কিনিঞ্জার (Henry Kissinger) সত্তরের দশকে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি নিক্সন ও সোভিয়েট নেতা ব্রেজনেভ এর মধ্যে মস্কো বৈঠক (Moscow Summit) অনুষ্ঠিত হয়। এটা একটি রাজনৈতিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করে যা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মূলনীতিগুলি নির্ধারিত হয়। এছাড়া সামরিক ঐক্যমত যার নাম ছিল SALTI-(Strategic Arms Limitation Treaty) প্রতিষ্ঠিত হয় ও বাণিজ্যসংক্রান্ত চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ১৯৭৩ এ নিক্সন ওব্রজনেভ পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধ করবার জন্য ঐক্যমত (Agreement on the Prevention of Nuclear War) স্বাক্ষর করেন, যাতে উভয় অতি-শক্তি (Super-powers) উস্কানিমূলক ভীতি প্রদর্শন (threat) অথবা শক্তির-ব্যবহার (Use of force) করা থেকে বিরত থাকতে রাজী হয়। ১৯৭৪ সালের শীর্ষবৈঠকে তাঁরা ABM sites (Atomic Ballistic Missiles Sites) বা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রগুলির অনুমোদনযোগ্য সংখ্যা সঙ্কুচিক করেন।

দুটি অতি-শক্তির (Tow Super Powers) মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ ১৯৭৫ সালে ৩৩টি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র নিরাপত্তা ও সহযোগিতার উপর হেলসিঙ্কি সম্মেলনে (Helsinki Conference on Security and Co-operation) -এ স্বাক্ষরদান করেন। উক্ত সম্মেসনে স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহ ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রের অঞ্চলগত অখণ্ডতাকে (territorial integrity) তাঁদের বর্তমান সীমান্ত অনুযায়ী মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দান করে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (different social and political syatem) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

যাইহোক দ্যঁতাত (Detente) এ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ঠিক বিপরীতধর্মী কোন বিষয় ছিল না। অতি-শক্তিদের মধ্যে উত্তেজনা ও স্বার্থসমূহের দ্বন্দ এর পরেও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অতি-শক্তিদ্বয় পারস্পরিক সাধারণ স্বার্থসমূহের ব্যাপক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনার দরুন সংঘাতের পরিবর্তে আলাপ আলোচনা ও ঐক্যসমূহের ভিত্তিতে মতপার্থক্যগুলি মেটাবার চেষ্টা করত। তা সত্ত্বেও দ্যঁতাত স্বল্পস্থায়ী ছিল। ১৯৮০ সালের মধ্যে অতিশক্তিদ্বয় নূতন ঠাণ্ডা লড়াই বা New Cold War যাকে দ্বিতীয় ঠাণ্ডা লড়াই বা Second Cold War-ও বলা হয় তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। দ্বন্দের উক্ত তৃতীয় বিশ্বে আঞ্চলিক সংঘাত ও যুদ্ধসমূহের সমাহার দ্বারা সূচিত হয়েছিল।

এরপর ১৯৭৮-৮০ সাল নাগাদ সোভিয়েত মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ১৯৮০ সালে আফগানিস্থানে সোভিয়েত সামরিক অভিযান, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গ্র্যানাডায় মার্কিন আগ্রাসন, ১৯৮৬ সালে লিবিয়ার উপর মার্কিন নৌ ও বিমান বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ, ১৯৮৯ তে পানামার উপর অধিকতর ব্যাপক ও উদ্দেশ্যহীন মার্কিন অভিযান প্রভৃতি এর উদাহরণ। রিগ্যানের নতুন ঠাণ্ডা লড়াই নিকারাগুয়া ও এল স্যানভাডোর-এর বামপন্থী শাসনব্যবস্থার উপর ধাবিত হয়। কিন্তু রিগ্যান কখনই ব্রেডনেভ-এর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে অবতীর্ণ হননি।

১৯৮০-৮১ সালের পোলিশ সংকট (The Polish Crisis) ১৯৬৮র চেক সংকট অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হলেও কোন সময়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট শাসনাধীন বৃত্তকে (Soviet spheres of influence)-কে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। এছাড়া ইরান-ইরাক যুদ্ধ যার সূচনা ১৯৮০ সাল থেকে হয়েছিল তাতেও অতিশক্তিধ্বয় যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছিল। সুতরাং নতুন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তিক্ততা ছিল সাময়িক।

১৯৮৩ সালে ' ইন্টার মিডিয়েট নিউক্লিয়ার ফোর্স টক্স্' 'আই. এন. এফ. টি', এবং 'স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশান টক্স্,' 'স্টার্ট' (Intermediate Nuclear Force Talks (INFT), & Strategic Arms Reduction Talks, Start) থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বেরিয়ে এলেও ১৯৮৫ সালে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপস রপায় এগিয়ে আসে। মিখাইল গর্বাচেভ ১৯৮৫ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই প্রক্রিয়া নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। গ্লাসনস্ট ও পেরেস্ত্রৈকার প্রবক্তা গর্বচেভ কট্টের সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা করে বিশ্বব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের সাথে আপসের ইঙ্গিত দেওয়ায় আমেরিকা স্বস্তি বোধকরে। তার আরও সুবিধা হয়ে যায় সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্তদ্বন্দ, জাতিসমস্যা প্রভৃতি সেই দেশের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া?। ১৯৮৫তে জেনিভায় গর্বাচেভ ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিগানের বৈঠক, ১৯৮৬ তে রিকজাভিকে, ১৯৮৭তে ওয়াশিংটনে, ১৯৮৮ তে মস্কোয় গর্বচেভ ও মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (সিনিয়র)-এর বৈঠক, ১৯৮৯তে মাল্টায়, ১৯৯০-৯১ তে ওয়াশিংটনে গর্বাচভের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশের (সিনিয়র) বোঝাপড়া নয়া দ্যাঁতাত-এর পটভূমি তৈরি করে দেয়।

মার্কিন কুটনৈতিক বিগনিউ ব্রেজিনস্কি (Bigniew Brezinski) অবশ্য দ্যাঁতাত-এর ব্যাপারে আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল মার্কিন প্রতিপত্তি কমে গিয়ে সোবিয়েট প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ব্রেজেনস্কির ধারণা যে ঠিক ছিলনা, পরের কয়েক দশকে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। ১৯৯০-৯১ তে ইরাকে মার্কিন আক্রমণের সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। পূর্ব জার্মানীর ন্যাটোর সদস্যপদ মেনে নিয়েছিল। ১৯৯১তে ওয়ারশ চুক্তিব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং কোমেকন (Comecon) -রে অবলুপ্তি ঘোষণা করেছিল। এছাড়া এর আগেই সরে এসেছিল আফগানিস্থান থেকে। এসব সোভিয়েট অবক্ষয়েরই প্রমাণ। এর চুড়ান্ত পরিণতি ছিল ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে-গর্বাচেভের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি। যার ফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে এবং বিশ্বব্যবস্থায় একমেরুকরণের (Unipolarisation) মার্কিন সর্বাধিনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

৪.৫.১০.৩ ঃ উপসংহার (Conclusion)

উপসংহারে বলা যায় যে ঠামডা লড়াইয়ের যুগকে 'ঠাণ্ডা শান্তির যুগ' (an era of cold peace)বলে বর্ণনা করা যায়। এটা ঠিক যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের ইতিহাস চিরাচরিত অর্থে রাজনৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দিতার ন্যায় ছিল না ঠাণ্ডা লড়াই। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্যে মতাদর্শগত উপাদানের তীব্রতা অন্তভুক্ত ছিল। উভয়পক্ষই একে

অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিশাল বাহিনী তৈরি করে রেখেছিল, যদিও পারমাণবিক নিবৃত্তির কারণে (Nucler Deterrence)তা কখনই ব্যবহৃত হয়নি।

৪.৫.১০.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (References)

1. Fleming, D.F- The Cold War & its Origins, 1917-1960, New York, 1961.
2. Feis, Herbert- From Trust to Terror-The Onset of the cold War, 1945-50.
3. Ulam, Adam, The Rivals, America & Russia Since World War II.
4. Sherwin, Martin-A World Destroyed.
5. Calvocorresi, Peter-World Politices since 1945.
6. La Faber, W.-America, Russia & the cold War.
7. Halle, L,J.-The Cold War as History.
8. Horowitz, David-From Yalta to Vietnam.
9. Gaddis, John, The Long peace, Inquiries into the History of Cold War.
10. Ross, Robert, S. & Changbin, Jiang-Reexamining the Cold War.
11 প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—আন্তজার্তিক সম্পর্কের ইতিহাস।
12. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ গুহরায়—আন্তজার্তিক সম্পর্কের ইতিহাস।

৪.৫.১০.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

১। দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উত্তেজনাসমূহ কেন প্রসার লাভ করেছিল? ঠাণ্ডা লড়াই কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?

২। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবে ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁড়া এবং আধুনিক ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর। এটি কি 'সমাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র' এবং 'পশ্চিমী গণতন্ত্র'র মধ্যে সংঘাত?

৩। তুমি কি মনে কর যে ঠাণ্ডা লড়াই এর পেছনে আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্রান্ত মূল্যায়ণ প্রাথমিক ভাবে দায়ী ছিল?

৪। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আগমন কতখানি আমেরিকার ডলার কুটনীতির ফল? ঠাণ্ডা লড়াই কি 'দীর্ঘ শান্তি' নিশ্চিত করেছিল?

৫। 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' এবং দ্যঁতাতের দ্বারা প্রভাবিত নীতিসমূহ বজায় থাকা সত্ত্বেও ১৯৭০ এর দশকের পর ঠাণ্ডা লড়াই চলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

একক-১১

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও তৃতীয় বিশ্ব
Non-Aligned Movement and the Third World

বিন্যাস ক্রম ঃ

৪.৫.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৫.১১.১ ঃ ভূমিকা

৪.৫.১১.২ ঃ জোটনিরপেক্ষতার অর্থ ও উদ্ভব

৪.৫.১১.৩ ঃ বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলন

- ৪.৫.১১.৩.১ ঃ কায়রোর প্রস্তুতি সম্মেলন (১৯৬১)
- ৪.৫.১১.৩.২ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৬১)
- ৪.৫.১১.৩.৩ ঃ কায়রো সম্মেলন (১৯৬৪)
- ৪.৫.১১.৩.৪ ঃ লুসাকা সম্মেলন (১৯৭০)
- ৪.৫.১১.৩.৫ ঃ আলজিয়ার্স সম্মেলন (১৯৭৩)
- ৪.৫.১১.৩.৬ ঃ কলম্বো সম্মেলন (১৯৭৮)
- ৪.৫.১১.৩.৭ ঃ হাভানা সম্মেলন (১৯৭৯)
- ৪.৫.১১.৩.৮ ঃ নতুন দিল্লী সম্মেলন (১৯৮২)
- ৪.৫.১১.৩.৯ ঃ হারারে সম্মেলন (১৯৮৬)
- ৪.৫.১১.৩.১০ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৮৯)
- ৪.৫.১১.৩.১১ ঃ জাকার্তা সম্মেলন (১৯৯২)
- ৪.৫.১১.৩.১২ ঃ কার্টাজেনা সম্মেলন (১৯৯৫)
- ৪.৫.১১.৩.১৩ ঃ ডারবান সম্মেলন (১৯৯৮)
- ৪.৫.১১.৩.১৪ ঃ কুয়ালালামপুর সম্মেলন (২০০৩)

৪.৫.১১.৪ ঃ অবদান

৪.৫.১১.৫ ঃ দুর্বলতা

৪.৫.১১.৬ ঃ উপসংহার

৪.৫.১১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

৪.৫.১১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্ন

৪.৫.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। তৃতীয় বিশ্ব বলতে কি বোঝায়।

২। জোটনিরপেক্ষতা কথাটির অর্থ কি?

৩। জোটনিরপেক্ষতা ধারণার উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল।

৪। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সাধারণ সমস্যা কি ছিল।

৫। কারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

৬। তৃতীয় বিশ্বের কোথায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৭। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং বর্তমান এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।

৪.৫.১১.১ ঃ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই, প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ এবং দুই বৃহৎশক্তির দুটি শিবির বিভক্তির ফলে উদ্ভুত বিশ্বপরিস্থিতির ফলশ্রুতি হল জোটনিরপেক্ষ নীতির উদ্ভব। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই নীতি গ্রহণ করেছে। তৃতীয় বিশ্ব বলতে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বোঝায় না। সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের বাইরে অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত। কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে একত্রিত হতে সাহায্য করেছে। সেগুলি হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্র, জনসংখ্যার আধিক্য, জীবনযাত্রার নিম্নমান, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, সাংস্কৃতিক সংকট, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তার দুর্বলতা, নয়া উপনিবেশবাদের চাপ ইত্যাদি। তবে অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নের স্তরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে এটি তৃতীয় বিশ্বের একটি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের বাইরে অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত।

প্রশ্ন ১। তৃতীয় বিশ্ব কি এবং কাদের নিয়ে গঠিত?

৪.৫.১১.২ ঃ জোটনিরপেক্ষতার অর্থ ও উদ্ভব

জোটনিরপেক্ষ কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। অনেকে মনে করেন ভারতের কৃষ্ণ মেনন প্রথম কথাটি ব্যবহার করেন। তবে তার জোটনিরপেক্ষতা নীতির প্রকৃত উদ্ভাবক হলেন পণ্ডিত

জওহরলাল নেহরু। এই মৌলিক নীতি তীরই চিন্তাধারা প্রসূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রবল ক্ষমতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রর উপর প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী মানুষের অবস্থান নির্দিষ্ট করার চিন্তাভাবনা থেকেই নেহরুর মনে জোটনিরপেক্ষতা ধারনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বিখ্যাত বেতার ভাষণের মাধ্যমে এই নীতির আবাস পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, যতদূর সম্ভব পৃথিবীর দুই শক্তিশিবির থেকে দূরে থাকতে হবে। ১৯৪৮ সালে তিনি আবার বলেছিলেন, অল্প কিছু সুবিধার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলির কোনো একটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে ক্ষতিকারক ভারতের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।

জোটনিরপেক্ষতা শব্দটি একাধিক অর্থ বহন করে। নেহেরু একে একটি গতিশীল ও ইতিবাচক নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, জোটনিরপেক্ষতা বলতে কেবলমাত্র দুই শক্তিশালী জোট থেকে সমদূরত্বে থাকা বা কোনো সুবিধাবাদী অবস্থান নয়। এর অর্থ আত্মনির্ভর ও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিত দ্বারা পরিচালিত হওয়া। অনেকে মনে করেন, জোটনিরপেক্ষতা হল বৃহৎ শক্তিবর্গের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষার উপায় ও তৃতীয় বিশ্বের মতামত প্রকাশের নৈতিক অধিকার। জোটনিরপেক্ষতার কেবলমাত্র নিরপেক্ষতার নামান্তর নয়। বস্তুতপক্ষে এর প্রকৃত অর্থ হল জাতীয় আত্মনিভরশীলতা ও স্বাধীনতা রক্ষার কর্মসূচী। জোটনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য কোনো তৃতীয়-শিবির তৈরি করা নয়। এর উদ্দেশ্য হল নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করবে।

১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকের কয়েকটি ঘটনা জোটনিরপেক্ষতা নীতির গঠনে সাহায্য করেছিল। প্রথমতঃ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে ভারতকে সামরিক বা অন্য কোনো জোটবদ্ধ রাজনীতি তেকে মুক্ত রাখার নীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারত ও চীনের 'পঞ্চশীলা' নীতি গ্রহণ। চৌ এন লাই-এর ভারত ভ্রমনকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

> *জোটনিরপেক্ষতা নীতির প্রকৃত উদ্ভাবক হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। জোট নিরপেক্ষতা বলতে কেবলমাত্র দুই শক্তিশালী জোট থেকে সমদূরত্বে থাকা বা কোনো সুবিধাবাদী অবস্থান নয়। এর উদ্দেশ্য হল নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করবে।*

পঞ্চশীল-এর প্রধান নীতিগুলি হল : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক আগ্রাসন থেকে বিরত থাকা, সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ। তৃতীয়তঃ, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নেহরু ও যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো দিল্লীতে এক যৌথ বিবৃতিতে জোট-নিরপেক্ষ নীতির আস্থা ঘোষণা করেন। চতুর্থতঃ, ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ ১৯৫৫ সালে যে আফ্রো-এশিয়া সম্মেলন হয়েছিল তা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছিল। এই সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ নীতির পরিস্কার ব্যাখ্যা করা হয়। এই সম্মেলনে ঠিক হয় যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কোনো তৃতীয় শিবির তৈরি করা নয়। এই সম্মেলনে নেহরুর বিখ্যাত পঞ্চশীল নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। বান্দুং সম্মেলনের পরই বহুদেশ পঞ্চশীলা তথা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই সময় জওহরলাল নেহরু, প্রেসিডেন্ট নাসের ও প্রেসিডেন্ট টিটো—এই তিনজন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন এবং এই আন্দোলনকে এক উন্নততর পর্যায়ে পৌছে দেন। এই তিন নেতা পৃথিবীতে শান্তির সীমানা বৃদ্ধি করার

জন্য যেমন সেচষ্ট হন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করে যান। এই তিন উদ্যোগে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ক্রমশ: পড়তে থাকে। স্থির হয় যে সকল দেশ কতগুলি নীতি অনসরণ করে চলবে তাদের জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। নীতিগুলি হল : (ক) যে দেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী হবে এবং স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করবে। (খ) যে দেশ জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানাবে। (গ) যে দেশ কোন শক্তিশালী সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করার কতকগুলি সাধারণ কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন, নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্ভভৌমত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি, অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণের চেষ্টা, ব্যবসা ও বাণিজ্যকে নয়া উপনিবেশবাদীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। এছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব ছিল। অবশ্য এইসব সাধারণ কারণগুলি ছাড়াও প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব কতকগুলি কারণ ছিল যার জন্য তারা এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া, চীন, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশগুলির জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদানের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কতকগুলি কারণ ছিল।

১৯৫৬ সালে ব্রাইয়োনিতে নেহরু, নাসের ও টিটো—এই তিন প্রধান সিদ্ধান্ত নেন যে জোটনিরপেক্ষতাকে দেশভিত্তিক বিদেশনীতির ঊর্ধ্বে তুলে এক বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সাল থেকে অনেকগুলি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন

১। জোটনিরপেক্ষ কথাটির প্রকৃত অর্থ কি?

২। কোন কোন ঘটনা জেটনিরপেক্ষতা নীতি গঠনে সাহায্য করেছিল?

৪.৫.১১.৩ ঃ বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলন

৪.৫.১১.৩.১ ঃ কায়রোর প্রস্তুতি সম্মেলন (১৯৬১)

১৯৬০ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুগামীদের একটি সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে নেহেরু, নাসের, টিটো প্রমুখ নেতারা আলোচনা করেন। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ২১টি দেশ কায়রোতে মিলিত হয় এবং ভবিষ্যত সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

৪.৫.১১.৩.২ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৬১)

যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্লেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও সামরিক জোটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করেছিল।

৪.৫.১১.৩.৩ ঃ কায়রো সম্মেলন (১৯৬৪)

কায়রোতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৭টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবিদ্বেষনীতি ও বিদেশী সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। কায়রোতে নিরাপত্তা, সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের সীমাংসা এবং নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়।

৪.৫.১১.৩.৪ ঃ লুসাকা সম্মেলন (১৯৭০)

জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকাতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন এক নতুন পদক্ষেপের সূচনা করেছিল। আমন্ত্রিত ৭০টি দেশের মধ্যে ৫৪টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, জিম্বাবোয়ে, ইন্দোচীন, লেবানন প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দাবী জানান। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৪.৫.১১.৩.৫ ঃ আলজিয়ার্স সম্মেলন (১৯৭৩)

আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন আন্দোলনকে আরো গতিশীল করে তুলেছিল। এই সম্মেলনে ৭৫টি দেশ যোগদান করেছিল। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ার মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। একই সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকায় নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়। সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৪.৫.১১.৩.৬ ঃ কলম্বো সম্মেলন (১৯৭৮)

কলম্বোতে পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৮৬টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মেলনে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধর কথা বলা হয়। এছাড়া এই সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধনের দাবী জানানো হয়।

৪.৫.১১.৩.৭ ঃ হাভানা সম্মেলন (১৯৭৯)

হাভানার ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে ৯৫টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। তবে এই সম্লেমনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়। মার্শাল টিটো জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে, নামিবিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৪.৫.১১.৩.৮ ঃ নতুন দিল্লী সম্মেলন (১৯৮২)

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লীতে। সম্মেলনে ৯৯টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। এই সম্মেলনে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল সেগুলি হল শান্তি, নিরাপত্তা, ঔপনিবেশিকতা, নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন। এই সম্মেলনে আনবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর কাছে আনবিক যুদ্ধ প্রতিরোধের দাবী জানানো হয়।

৪.৫.১১.৩.৯ ঃ হারারে সম্মেলন (১৯৮৬)

জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারেতে অষ্টম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০২টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলনে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী জোট, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, কাম্পুটিয়া, আফগানিস্তান সংকটের সমাধান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাকাশ যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শান্তির প্রয়াসকে সংহত করা।

৪.৫.১১.৩.১০ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৮৯)

বেলগ্রেডে নবম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০২ সদস্য রাষ্ট্র এতে যোগদান করে। এছাড়া ৮টি অতিথি দেশ এতে যোগ দেয়। এই সম্মেলন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে আন্দোলনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। বিশ্বের অসম অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্শণ করা হয়। কাম্পুচিয়া, নামিবিয়া ও প্যালেস্তাইন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানানো হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে একটি তহবিল গঠন করার আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৪.৫.১১.৩.১১ ঃ জার্তাতা সম্মেলন (১৯৯২)

জাকার্তার দশম সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে স্তিমিত পরিস্থিতি কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সম্মেলনে সদস্য সংখ্যা ছিল ১০৮। চীনকে পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মায়ানমারে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভরতার কথা বলা হয়। জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। তাছাড়া পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, আধিপত্য ও জাতিগত সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

৪.৫.১১.৩.১২ ঃ কার্টাজেনা সম্মেলন (১৯৯৫)

একাদশ শীর্ষ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় কলম্বিয়ার রাজধানী কার্টাজেনাতে। এই সম্মেলনে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে। এই সম্মেলনে পরিবেশ বিপর্যয়, জীব বৈচিত্র্য বিনাশ ও জৈব সন্ত্রাস সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বেনজির ভুট্টো কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।

৪.৫.১১.৩.১৩ ঃ ডারবান সম্মেলন (১৯৯৮)

দ্বাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে। ১১৩টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ, নারীদের অধিকার ও মর্যাদারক্ষা, সন্ত্রাসবাদ, উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর বিশ্বায়নের চাপ, HIV, AIDS আন্তর্জাতিক মাদক চালান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৪.৫.১১.৩.১৪ ঃ কায়ালালামপুর সম্মেলন (২০০৩)

ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মারায়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে। ১১৬টি দেশে এতে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের হুমকি, আতঙ্কবাদের প্রসার ও বিশ্ববাণিজ্যে বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৪.৫.১১.৪ ঃ অবদান

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের একটি বড় কৃতিত্ব হল এই যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র এই সংগঠনের সদস্য হয়েছে। এই সংস্থার স্বচ্ছতা ও নমনীয়তা লক্ষ্যণীয়। অহেতুক কঠোরতা না থাকার ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ তথা উপনিবেশবাদ ও কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদ উচ্ছেদের ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশগুলির বিরুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি অনেকাংশে সফল। একসময়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রায় সমার্থক বলে মনে হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষবাদ, বৃহৎশক্তি কর্তৃক অনুসৃত প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংঘর্ষ রোধ করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের ফলে পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয়নি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। বর্ণবিদ্বেষ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সরব প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই বর্তমানে বহু আলোচিত মানবাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। তাছাড়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এখন তৃতীয় বিশ্বের একটি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছে। এই সংস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জে অনেক ঐক্যবদ্ধ একক গোষ্ঠী হিসাবে মতামত প্রকাশ করে। এমনকি ঠাণ্ডা লড়াই চলার সময়ে কোরিয়া ও ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে দুই শিবিরের মধ্যে মধ্যস্থাতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষবাদ, বৃহৎশক্তি কর্তৃক অনুসৃত প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংঘর্ষ রোধ করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতির অবদান কি ছিল?

৪.৫.১১.৫ ঃ দুর্বলতা

তবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের এই সাফল্য বা অগ্রগতি ত্রুটিবিহীন নয়। অনেক উন্নতশীল দেশ এখনও এই আন্দোলনের বাইরে আছে। তবে নতুন সদস্য গ্রহণ করার আগে আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের খুব ভালোভাবে বিচারবিবেচনা করা দরকার। কারণ ইদানিং গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি থেকেও এই আন্দোলনে যোগ দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলনের নেতাদের মধ্যেও ধ্যান ধারণারও পার্থক্য দেখা যায়। যেমন টিটো সোভিয়েত বিরোধিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন; কিন্তু নাসের চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিরোধী অবস্থান থেকে আরব জগতে নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করা। অন্যদিকে নেহরুর কাছে এই আন্দোলন ছিল একটি নৈতিক ধারণা ও শান্তিকে জয় করার একটি পথ। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাদের মধ্যে সঠিক সমঝোতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ১। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ত্রুটিগুলি কী কী?

৪.৫.১১.৬ ঃ উপসংহার

বর্তমানে ঠাণ্ডা লড়াই-এর উপশমের পর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। অর্থাৎ এই আন্দোলনের আর প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা আপাতদৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লড়াই-এর শেষে এর যৌক্তিকতা নেই বলে মনে হলেও আন্দোলনের পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। দুটি সামরিক জোটের একটি ভেঙ্গে গেলেও এপরটির প্রভাব থেকে রাষ্ট্রগুলির নিরাপদ ভাবার কোনো কারণ নেই। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কেবলমাত্র ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিরোধী নয়; এই আন্দোলন স্বাতন্ত্র্যের কথাও বলে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার বোঝায়। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল মানুষের আন্দোলন বোঝায়। ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানের পর এগুলির প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তাছাড়া বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্ত হবার জন্যও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। তবে এই আন্দোলনের সাফল্যের সব কিছুই নির্ভর করছে সদস্যরাষ্ট্রগুলির ঐক্য ও আন্তরিক প্রয়াসের উপর।

৪.৫.১১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।
২। অমিত কুমার সেন : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।
৩। রাধারমন চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী : সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।
৪। V.P. Dutta : India and the World
৫। B.R. Nanda : (ed) Indian Foreign Policy : The Nehru Years.এ

৪.৫.১১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। তৃতীয় বিশ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
২। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কী বোঝ?
৩। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন সম্মেলনগুলির সমালোচনামূলক বিবরণ দাও।
৪। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন গুণাবলী ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো।

একক ১২

রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বশান্তির ধারণা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা

UNO and the Concept of World Peace and Regioal Tensions

বিন্যাস ক্রম ঃ

৪.৫.১২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৫.১২.১ ঃ কোরিয়া সমস্যা

৪.৫.১২.২ ঃ কিউবা সংকট

৪.৫.১২.৩ ঃ কাশ্মীর সমস্যা

৪.৫.১২.৪ ঃ প্যালেস্টাইন সমস্যা

৪.৫.১২.৫ ঃ ভিয়েতনাম সমস্যা

৪.৫.১২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৪.৫.১২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৫.১২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

(২) আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে কিভাবে কোরিয়ার সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং তার কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল।

(৩) ঠাণ্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে কিভাবে কিউবা সংকট-এর সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার সমাধান কিভাবে করা হয়েছিল।

(৪) ভারত বিভাগের পর কাশ্মীর রাজ্যটিতে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধে কিভাবে বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল।

(৫) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার সাম্যবাদ বিরোধী নীতি কিভাবে ভিয়েতনাম সংকটের সৃষ্টি করেছিল এবং আমেরিকার পরাজয়ের ফলে কিভাবে ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

(৬) মধ্যপ্রাচ্যে আরব ও ইজরাইল এর মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে কিভাবে প্যালেস্টাইন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কি ছিল।

৪.৫.১২.১ ঃ কোরিয়া সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম বড় যুদ্ধ হল কোরিয়ার যুদ্ধ। ঠাণ্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই সর্বপ্রথম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মহাযুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে রাশিয়া উত্তর কোরিয়া দখল করে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অধীনে আসে। কিন্তু কিছুদিন পর সিংগম্যান রী এর নেতৃত্ব দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি 'গণতান্ত্রিক' দেশ-এ পরিণত করে আমেরিকানরা দক্ষিণ কোরিয়া ত্যাগ করে। অন্যদিকে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার 'পিপলস ডোমোক্র্যাটিক রিপাবলিক' গঠন করে। ৩৮ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখাকে দুই কোরিয়ার মধ্যে বিভাজন রেখা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই বছরে দুই কোরিয়ার মধ্যে হাঠৎই সংঘর্ষ শুরু হয়। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল তা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। কোন্ দেশ প্রকৃত আক্রমণকারী তাও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক শেষপর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাম্যবাদী উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী হিসাবে সাব্যস্ত করে। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া দাবী করে যে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রথম ৩৮ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখা লঙ্ঘন বা অতিক্রম করে। সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী বলেন যে, এই ঘটনা হল জনগণতান্ত্রিক কোরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ।

যাইহোক ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল-এর কাছে ঘটনাটি জানায়। আমেরিকা অভিযোগ করে যে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করেছে এবং এর মাধ্যমে শান্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। সেই দিনই নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনায় বসে। প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে এবং উত্তর কোরিয়ার সেনাবাগিনীকে পশ্চাদ অপসরণ করে ৩৮ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখায় ফিরে আসতে হবে। পরের দিন কোরিয়া সংক্রান্ত জাতিপুঞ্জ কমিশন জানায় যে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর অগ্রগমন এক বিপজ্জনক অবস্থান সৃষ্টি করেছে। ২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদ একটি প্রস্তাবে উত্তর কোরিয়া কর্তৃক জাতিপুঞ্জেক প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উত্তর কোরিয়ার আক্রমণকে বাধা দেবার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানায়।

বস্তুত পক্ষে আমেরিকা দূর প্রাচ্যে কমিউনিস্ট প্রগতি রোধ কররা জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার সিংগম্যান রী-র সংকারকে সাহায্য করার জন্য আমেরিকা বিমান ও নৌবাহিনী পাঠায়। ফরমোজাকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা তার সপ্তম নৌবহরকে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে ৭ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ খ্যাত মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাক আর্থারকে এই বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমেরিকা ছাড়া আরও পনেরটি রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের বাহিনীতে যোগ দেয়।

চীন তৎক্ষণাৎ তার 'স্বচ্ছাসেবক' বাহিনী উত্তর কোরিয়ায় পাঠায়। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাত লক্ষ। এরা উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করে। এই চীনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল যার অধিকাংশই রাশিয়া কর্তৃক পাঠানো হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য রাশিয়ার বিমান পাঠানো হয়। সুতরাং দুপক্ষই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। দুবছর ধরে যুদ্ধ চলার পরও কিন্তু যুদ্ধের কোন নিষ্পত্তি হয়নি। উভয়েই একে অপরের এলাকায় বারবার প্রবেশ করতে থাকে। চীনাবাহিনী রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীতে পর্যদস্ত করে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল

অধিকার করে। জাতিপুঞ্জ বাহিনী আবার তা পুনরুদ্ধার করে। জেনারেল ম্যাক আর্থার চীনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার হুমকি দেন। আমেরিকা তাকে সরিয়ে নেন। যাই হোক ১৯৫১ সালের ১১ই জানুয়ারী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার প্রস্তাব করে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সমগ্র কোরিয়ার ঐক্য ও কমিউনিস্ট বিরোধী সরকার গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা কমিউনিস্ট আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব নিলে তিনি যুদ্ধ বিরতিকে সম্মতি দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম বড় যুদ্ধ হল কোরিয়ার যুদ্ধ। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন রাশিয়া অধিকৃত উত্তর কোরিয়া ও আমেরিকা অধিকৃত দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যেও এই যুদ্ধ শুরু হয়। দু বছর ধরে যুদ্ধ চলার পরেও কিন্তু যুদ্ধের কোন নিস্পত্তি হয়নি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ সত্বেও শেষ পর্যন্ত দুই কোরিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, উত্তর কোরিয়া ও চীনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠকের পর পান্‌মুন্‌জন নামক স্থানে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩৮ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখা বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হল। উভয় পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে নিতে রাজী হন এবং তা ৬০ দিনের মধ্যে কার্যকরী হবে বলে স্থির হয়। ভারতের সভাপতিত্বে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দী বিনিময়ের ভার দেওয়া হল। এই কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিল পোল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া। তবে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে পারস্পরিক বিবাদে কমিসনের কাজে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। কিন্তু ভারত ও অন্যান্য সদস্যদের ধৈর্য ও উদারতার ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বিনিময়ের কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অনুযায়ী উক্ষয়পক্ষের প্রতিনিধিরা বিদেশী সৈন্য অপসরণ ও কোরীয় সমস্যার সমাধানের জন্য একটি অধিবেশনে বসবে। এই অধিবেশন ১৯৫৪ সালে জেনেভা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতে কোরিয়ার ঐ কোর প্রশ্নের কোন মীমাংসা করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ ছিল ফলাফল শূন্য। দুই কোরিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। চীনেরও লাভ কিছু হয়নি। বরং জাতিপুঞ্জের সদস্যলাভে তারা বঞ্চিত হয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সীমানা ইউরোপ ছাড়িয়ে এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। যুদ্ধে চীনের যোগদানের ফলে আমেরিকার সোভিয়েত বিরোধিতা সাম্যবাদ বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়। আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে শুরু করে।

প্রশ্ন

১। কোরিয়া যুদ্ধ কবে শুরু হয়?

২। কোরিয়া যুদ্ধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল?

৪.৫.১২.২ ঃ কিউবা সংকট

কিউবা দ্বীপটি ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত। স্পেন যখন ল্যাটিন আমেরিকা থেকে তার উপনিবেশগুলি ত্যাগ করতে থাকে সেই সময় কিউবাও স্পেনের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু কিউবা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হতে পারেনি। কিউবার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করে। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কিউবাতে আমেরিকার প্রভাব বলবৎ ছিল।

কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভল্টে ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি 'Good Neighbour Policy' অনুসরণ করার ফলে কিউবা ও আমেরিকার সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। কিউবায় মার্কিন প্রভাব হ্রাস পায়। ১৯৪৭ সালে আমেরিকা ও ম্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে দুটি পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিউবা এতে স্বাক্ষর করে। কিউবা ও আমেরিকা পরস্পর নিরাপত্তার ব্যাপারে সংযুক্ত হয়। ১৯৫২ সালে বাতিস্তা আমেরিকার সহায়তায় এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিউবার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কিউবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অর্থনৈতিক অস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিউবায় সাম্যবাদী বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবায় আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটে। কাস্ত্রো কিউবায় শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা কারণে কাস্ত্রোর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিউবায় সাম্যবাদী প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবায় আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটে। বাতিস্তা পরিচালিত সরকারের পতন ঘটে। কাস্ত্রো কিউবার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা কারণে কাস্ত্রোর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণগুলি হল ঃ (১) সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কাস্ত্রোর মৈত্রী নীতি, (২) কিউবার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, (৩) বৈদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যের জাতীয়করণ, (৪) কিউবার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে মার্কিন নির্ভরতা কমানো; (৫) সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থপন, (৬) রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক ও সামরিক নির্ভরতা স্থাপন ইত্যাদি। এইসব কারণে আমেরিকা কাস্ত্রোর উপর অসন্তুষ্ট হয়। আমেরিকা নানাভাবে কিউবার অর্থনীতি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কিন্তু কাস্ত্রো তা ব্যর্থ করে দেন। ১৯৬০ সাল থেকে আমেরিকা কিউবায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ১৯৬১ সালে দেশত্যাগী কাস্ত্রো-বিরোধীরা আমেরিকার সাহায্যে কিউবা আক্রমণ করে। কিন্তু কাস্ত্রো তা ব্যর্থ করে দেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমেরিকা কিউবাকে আগের দুটি চুক্তি এবং O.A.S. (Organisation of American States) থেকে বহিষ্কার করে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিউবা নিজের নিরাপত্তা ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিউবা আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়ার দ্বারস্থ হয়। কিউবার ভয় ছিল Rio Pact এর অন্যান্য ল্যাটিন আমেরিকার সদস্যরা কিউবা আক্রমণ করতে পারে। সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভ কিউবাকে অস্ত্র সাহায্য করেন। কিউবা রাশিয়ার সাহায্যে তার বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে।

এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর দেড় লক্ষ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। ক্রুশ্চেভ আমেরিকার নিন্দা করেন এবং সোভিয়েত বাহিনীও প্রস্তুত থাকবে বলে ঘোষণা করেন। কেনেডি ঘোষণা করেন যে কিউবা থেকে কোন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হলে তার জন্য রাশিয়া দায়ী থাকবে। তাছাড়া তিনি ক্রুশ্চেভকে কিউবা থেকে আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র অপসারণ করার জন্য অনুরোধ করেন। কেনেডি কিউবার চারদিকে নৌ-অবরোধ সৃষ্টি করেন এবং ঘোষণা করেন যে কিউবা গামী সমস্ত জাহাজগুলিতে অনুসন্ধান করা হবে। ১৯৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর কেনেডি মার্কিন বাহিনীকে নির্দেশ দেন যে রাশিয়া কর্তৃক কিউবায় প্রেরণ করা অস্ত্রশস্ত্র রাস্তায় আটক করা হবে। সোভিয়েত রাশিয়া একটি পাল্টা ঘোষণায় জানায় যে কিউবাগামী কোন জাহাজ বাধাপ্রাপ্ত হলে গুলিবর্ষণ করা হবে। ২৫শে অক্টোবর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। আমেরিকা রাশিয়ার একটি তৈলবাহী জাহাজ ও লেবাননের একটি সামগ্রীবাহী জাহাজ তল্লাসী করে। কিন্তু কোনটিতেই আক্রমণাত্মক অস্ত্র ছিল না। জাহাজ দুটি ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে কিউবা, রাশিয়া ও আমেরিকা তিন পক্ষই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ও জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি শান্তিরক্ষার জন্য কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের কাছ আবেদন করেন। উ থান্ট দু'পক্ষকে যুদ্ধাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য উ থান্ট আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে দুটি প্রস্তাব পাঠান। প্রথমতঃ উ থান্ট ক্রুশ্চেভকে অনুরোধ করেন যে সোভিয়েত জাহাজ যেন মার্কিন প্রহরারত জাহাজ থেকে দূরে থাকে। দ্বিতীয়তঃ উ থান্ট আমেরিকাকে জানান যে রাশিয়া কিউবা থেকে আক্রমণাত্মক সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরিয়ে নেবে। তবে আমেরিকাকেও তুরস্ক থেকে অনুরূপ জিনিস সরাতে হবে। কেনেডি জানন যে আমেরিকা কিউবা থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নেবেন। কিন্তু একই সঙ্গে রাশিয়াকেও কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলিকে তুলে নিতে হবে। ১৯৬২ সালের ২৮শে অক্টোবর ক্রুশ্চেভ কিউবা থেকে সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সরিয়ে নেবার আদেশ দেন এবং কেনেডিকে তা জানানো হয়। রাশিয়া প্রকৃতই কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলি তুলে নেয়। ১৯৬২ সালের ২০শে নভেম্বর আমেরিকা ও কিউবা থেকে নৌ অবরোধ তুলে নেয়। এইভাবে বিশ্বের দুটি শক্তিশালী নেতা কেনেডি ও ক্রুশ্চেবের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হওয়ার ফলেই কিউবা সমস্যার আপাতত সমাধন হয় এবং ১৯৬২ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়।

রাষ্ট্রসংঘ কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের দূরদর্শিতার প্রশংসা করে। পৃথিবী আসন্ন মানবিক যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পায়। ক্রুশ্চেভ যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির পক্ষপাতী তা প্রমাণিত হয়। কেনেডি ক্রুশ্চেভের এই দূরদর্শিতার প্রশংসা করেন। এরপর রুশ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ১৯৬৩ সালে মস্কোয় আনবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করণের জন্য উভয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আলবানিয়া ও চীন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তুলে নেবার জন্য ক্রুশ্চেভের নিন্দা করে। চীন আমেরিকাকে 'Paper Tiger' নামে অভিহিত করে। ক্রুশ্চেভ এর উত্তরে বলেন যে, এই বাঘের 'মানবিক দন্ত' আছে। যা হোক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত সংঘাত দেখা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। তবে কিউবা সংকটের সময়ে লাতিন আমেরিকার কিছু রাষ্ট্র মার্কিন নীতি সমর্থন করলেও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি বাধ্য হয়েই আমেরিকাকে সমর্থন করতে সম্মত হয়। তারা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল। তারা কিউবা অবরোধের প্রস্তাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে আমেরিকা লাতিন আমেরিকাকে সাম্যবাদী প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। তবে লাতিন আমেরিকায় কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে শক্তিশালী করতে গিয়ে আমেরিকা যে সব প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করেছিল, তার ফলে এই অঞ্চলের জনগণ আরও বেশী মাত্রায় মার্কিন বিরোধী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১। কিউবা সংকট কি? কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়?

৪.৫.১২.৩ ঃ কাশ্মীর সমস্যা

১৯৪৭ সালের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উদ্ভুত কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘ উদ্যোগী হয়। ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই উভয়ের মধ্যে যে তিক্ত ও বৈরী সম্পর্ক তৈরী হয় তার মূলে ছিল কাশ্মীর সমস্যা। ভারত বিভাগের আগে কাশ্মীরের শাসক ছিলেন রাজপুত রাজা হরি সিং। তিনি ছিলেন হিন্দু। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল মুসলমান। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় হরি সিং

ভারত বা পাকিস্তান কোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়নি। দুই দেশের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান মনে করেছিল কাশ্মীরের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ ভারত বিভাগ ধর্মের ভিত্তিতেই হয়েছিল। অন্যদিকে ভারত হিন্দু রাজা হরি সিংকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আবেদন জানায়। যাই হোক ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কাশ্মীরকে ভারত বা পাকিস্তান কারও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কিন্তু কিছুদিন পর উত্তর পশ্চিম সীমান্তের জঙ্গী উপজাতিরা কাশ্মীর আক্রমণ করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আক্রমণকারীরা দুদিক থেকে সোহায্য পায়। প্রথমতঃ পুঞ্চ অঞ্চলের হরি সিং বিরোধী মুসলমানরা তাদের সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ ছুটিতে থাকা পাক সৈন্যরা আক্রমণকারীদের সাহায্য করে। হরি সিং ভারতের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। ভারত সম্মত হয়। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশের আগে হরি সিং-এর সঙ্গে ভারতের একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এটি ছিল অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত দলিল। এই দলিল অনুযায়ী কাশ্মীর সরকার পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ এই তিনটি ক্ষেত্রে ভারতের কর্তৃত্ব মেনে চলতে রাজী হয়। ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরে পৌঁছানোর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই উভয়ের মধ্যে যে তিক্ত ও বৈরী সম্পর্ক তৈরী হয় তার মূলে ছিল কাশ্মীর সমস্যা। ১৯৪৮-১৯৫৭ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে চাইলেও তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে বর্তমানেও কাশ্মীর নিয় ভারত-পাক সম্পর্কের মাঝখানে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটায় পরিণত হয়ে রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ২রা নভেম্বর নেহরু এক এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে কাশ্মীর বারতের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা কাশ্মীরের মানুষদের গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হবে। তারপর ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী নেহরু কাশ্মীর সমস্যাটি রাষ্ট্রসংঘের এক্তিয়ারে নিয়ে আসেন। তিনি সমগ্র বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষরে কাছে পাঠান। নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। যুদ্ধ বিরতি ও গণভোটের উদ্দেশ্যে কমিশনের সস্যরা ভারতে আসেন। কমিশন কতকগুলি প্রস্তাব দেয়। সেগুলি হলঃ (ক) পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে উপজাতি আক্রমণকারীদের সরিয়ে নেবে ও যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে। (খ) একটি চুক্তির মাধ্যমে ভারত কাশ্মীর থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেবে। (গ) কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কাশ্মীরের জনগণই নির্ধারণ করবে। (ঘ) গণভোটের জন্য দুই দেশের প্রতিনিধিরা কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসবে।

রাষ্ট্রসংঘের কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। গণভোট পরিচালনা করার জন্য কমশন একজন প্রশাসক নিযুক্ত করে। তবে যুদ্ধবিরতির পর কাশ্মীর পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাক বহির্ভূত কাশ্মীর এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কমিশন গণভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পুনরায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় রাষ্ট্র উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কাশ্মীর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়নি। এই উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে গণভেটের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। কিন্তু কমিশন তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। রাষ্ট্রসংঘ আরও একজন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠায়। তিন ঘুরে এসে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে তাঁর সুপারিশ পেশ করেন ও কাশ্মীরকে যেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান কেউই এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এরপর রাষ্ট্রসংঘ আরও একজন প্রতিনিধিকে পাঠায় গণভোটে বাস্তবায়িত করার জন্য। কিন্তু তিনিও সফল হয়নি। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ গণভোট কার্যকরী করার জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি।

ভারত গণভোটের প্রস্তাবে রাজী হয়নি এই কারণে যে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য

পাচ্ছে। ভারত কাশ্মীরে সৈন্য রাখার দাবী জানায়। ভারত সরকার জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। গণভোটের বিষয়টি আরও দূরে চলে যায়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর কাশ্মীর সমস্যা ঠাণ্ডা লড়াই-এর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তা পরিষদ গণভোট সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করলে রাশিয়া প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভেটো প্রয়োগ করে তা বন্ধ করে দেয়। রাশিয়ার এই ভূমিকায় ভারত খুশী হয়। ১৯৬৪ সালে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি জানান যে ভারত কোন অবস্থাতেই কাশ্মীরে গণভোটে রাজী হবে না। অন্যদিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরে গণভোটকে সমর্থন করে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কচ্ছ সীমান্তে কয়েকটি জায়গা দখল করলে দুই দেশের মধ্যে আবার বিরোধ দেখা দেয়। পাক-বাহিনী কাশ্মীরের ছাম্ব এলাকায় প্রবেশ করে। দু'পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়। নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষকেই যুদ্ধ বিরতি পালন করার জন্য নির্দেশ দেয়। ১৯৬৬ সালে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারত-পাক বিরোধের সাময়িক অবসান ঘটে। ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে রাজী হয়। তবে পাক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গীরা ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করার ফলে কাশ্মীর সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে।

তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রসংঘ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগণের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার ও প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিল, তা ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্বের আবর্তে দূরে সরে যায়। কাশ্মীর ভারত-পাক সম্পর্কের মাঝখানে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটায় পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ১। কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল?

৪.৫.১২.৪ ঃ প্যালেস্টাইন সমস্যা

প্যালেস্টাইন হল মধ্যপ্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক আবর্তের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। ইজরাইল রাষ্ট্রের উদ্ভব প্যালেস্টাইন সমস্যাকে জটিল করেছে। আরব ও ইজরাইলের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল হল প্যালেস্টাইন। রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করার জন্য সবসময় উদ্যোগী হয়েছে। আরব ও ইহুদী উভয়েই সেমিটিক জাতির অন্তর্গত। সেজন্য উভয়েরই ইজরাইলের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও আবেগ রয়েছে। প্যালেস্টাইনের একই এলাকার উপর এই দুটি জাতির দাবির ফলেই প্যালেস্টাইন সমস্যার উদ্ভব হয়। প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ জনগণই ছিল আরবীয় মুসলমান। তা সত্ত্বেও ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে একটি স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করার দাবী জানায় ও সচেষ্ট হয়। তারা জিওনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯২০ সালের পর থেকে প্রচুর সংখ্যক ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে শুরু করলে প্যালেস্টইনবাসী আরবরা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইন সমস্যা কিছুটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। হিটলারের ইহুদি-ঘৃণার জন্য ইহুদিরা মিত্র পক্ষকে হিটলারের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। তবে নাৎসী অত্যাচারের ফলে বহু ইহুদি উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে থাকে। এর আরবরা

আরও ক্ষুব্ধ হয়। সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। প্যালেস্টাইন দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ম্যানডেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ব্রিটেনের মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন সমস্যাটিকে রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপিত করে। এগারোজন সদস্যবিশিষ্ট রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশেষ কমিটি প্যালেস্টাইনকে দু'ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। সাধারণ সভা তা পাশ করে। ইজরাইল খুশী হয়। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিছুদিন পর আরব লীগের সঙ্গে ইহুদিদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন থেকে তার ম্যানডেট প্রত্যাহার করে নেয়। সেদিনই নতুন ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইল জন্মলাভ করে। ফলে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। আরবরা পরাস্ত হয়। প্যালেস্টাইনে ইহুদি এলাকার সীমানা বর্ধিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। প্যালেস্টাইন বিভাগের জন্য নিযুক্ত কমিশন রাষ্ট্রসংঘের কাছে সামরিক সাহায্য চায়। রাশিয়া ও আমেরিকা এই সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের ভেটোতে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে কমিশন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনি।

আরব ও ইজরাইলের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল হল প্যালেস্টাইন। প্যালেস্টাইনের একই এলাকার উপর এই দুটি জাতির দাবির ফলেই প্যালেস্টাইনের সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। রাষ্ট্রসংঘ এই সমস্যা সমাধানের এগিয়ে আসলেও তারা এর কোন সঠিক মীমাংসা করতে সমক্ষম হয়নি। অবশেষে ১৯৬৪ সালে P.L.O. বা প্যালেস্টাইন সংঘের উৎপত্তি প্যালেস্টাইন সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল।

১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা হলে ক্রুদ্ধ ইজরাইল মিশর আক্রমণ করে। ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য মিশরে অবতরণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে আবার ইজরাইল-সিরিয়া সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে পুনরায় যুদ্ধবিরতি হয়। তবে রাষ্ট্রসংঘ ইজরাইলকে বিজিত এলাকা ফিরিয়ে দেবার জন্য রাজী করাতে পারেনি। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রসংঘ নতুন যুদ্ধবিরতি রেখার ব্যবস্থা করে। কিন্তু আরবরা ইজরাইলের কাছ থেকে হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৭৩ সালে মিশর ও সিরিয়ার সঙ্গে ইজরাইলের সংঘর্ষ শুরু হয়। রাষ্ট্রসংঘ আবার যুদ্ধ বিরতিতে রাজী করায়।

১৯৬৪ সালে P.L.O. বা প্যালেস্টাইন মুক্তিসংঘের উৎপত্তি প্যালেস্টাইন সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। প্যালেস্টাইনবাসী আরব গেরিলাদের এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনকে ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। আরব নেতাদের সম্মতি নিয়েই এই সংগঠন তৈরী করা হয়। ১৯৭৩ সালে আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন দারুণ বিপর্যয়ের সামনে পড়ে। তবে ১৯৭৪ সালের ১৪ই অক্টোবর এই সংগঠন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। রাষ্ট্রসংঘ একটি বক্তৃতায় যোগদানের জন্য সংগঠনটিকে আমন্ত্রণ জানায়। সংগঠনের নেতা আরাফত সাধারণ সভায় ভাষণ দেন। সাধারণ সভা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে প্যালেস্টাইনবাসীদের প্যালেস্টাইনে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। ইজরাইল মুক্তি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে রাজী হয়নি। P.L.O.র সঙ্গে ইজরায়েলের ক্রমাগত সংঘর্ষ মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতিকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করেছে।

প্রশ্ন ১। প্যালেস্টাইন সমস্যা কি? এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কি ছিল?

৪.৫.১২.৫ ঃ ভিয়েতনাম সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস ভিয়েতনাম সমস্যা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও ঠাণ্ডা লড়াই-এই দুইয়ের সংমিশ্রণে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল।

ফরাসীদের অধিগৃহীত ইন্দো-চীনে উপদ্বীপে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোচীন তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল — (১) আন্নাম, (২) টংকিং, (৩) কোচিন চীন। ইন্দোচীনে ধীরে ধীরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হো-চি-মিন। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন। হো-চি-মিন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে তার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি যে জাতীয়তাবাদী সংগঠন গড়ে তোলেন তার নাম হয় ভিয়েতমিন। আমেরিকা ভিয়েতনামের জাতীয় আন্দোলনকে সুনজরে দেখেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তখন ভিয়েতনাম হো চি মিনের নেতৃত্বে জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম মুক্তিবাহিনী হ্যানয়ে প্রবেশ করে। তার নেতৃত্বে কটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর ভিয়েতনাম থেকে ব্রিটিশবাহিনী চলে যাবার পর ফ্রান্স পুনরায় ভিয়েতনামে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ভিয়েতনামের জনগণ তার বিরোধিতা করে। ১৯৪৬ সালে ফ্রান্স ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করলে ভিয়েতনামী জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। গ্রামাঞ্চলে ভিয়েতমিন বাহিনীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স এর সামরিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ফ্রান্স কূটনীতির মাধ্যমে এগিয়ে আসে। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ভিয়েতমিন বাহিনীর দিয়েন বিয়েন ফুর বিখ্যাত যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ফরাসী সেনাপতি ভিয়েতনামের সেনাপতি জেনারেল গিয়াপের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফ্রান্সের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সপ্তদশ সমাক্ষরেখার উত্তরে ভিয়েতনাম বাহিনী এবং দক্ষিণে ফরাসী বাহিনী থাকবে। উত্তর ভিয়েতনামে 'ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনাম' নামে একটি নতুন সরকার গঠিত হবে এবং দক্ষিণে অকমিউনিস্ট সরকার আগের মতই থাকবে। রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে দু'বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়। ভারত তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।

ফরাসীদের অধিগৃহীত ইন্দো-চীন উপনিবেশ বিস্তারকে কেন্দ্র করে ভিয়েতনামে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তখন ভিয়েতনাম হো-চি-মিনের নেতৃত্বে জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু ফ্রান্স পুনরায় কূটনীতির মাধ্যমে ভিয়েতনামে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলে, আমেরিকা ফ্রান্সের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ভিয়েতমিন বাহিনীর দিয়েন বিয়েন ফুর বিখ্যাত যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ফরাসী সেনাপতি জেনারেল গিয়াপের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফ্রান্সের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বস্তুতপক্ষে জেনেভা সম্মেলন ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই সম্মেলনে দীর্ঘদিনের ফরাসী আধিপত্যের অধ্যায় শেষ হয়েছিল মাত্র। আর একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয় — যার কেন্দ্রস্থলে ছিল আমেরিকা। আমেরিকা ভিয়েতনাম তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সাম্যবাদের প্রসারে উদ্বিগ্ন ছিল। ভিয়েতনাম সাম্যবাদ

প্রতিহত করার জন্য আমেরিকা বেষ্টনীনীতি চালু করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারের নেতৃত্বে বসানো হয় নগোদিন দিয়েমকে। আমেরিকা এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। দিয়েম জেনেভা চুক্তির শর্ত মানতে রাজি ছিলেন না। এরফলে ১৯৫৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমেরিকা দিয়েম সরকারকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিতে থাকে। এই সময় ভিয়েতনাম কার্যত রাজনৈতিক দিক থেকে ১৭°তে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সাল আমেরিকা SEATO নামে এক সামরিক গোষ্ঠী গঠন করে। এই গোষ্ঠী ভিয়েতনামকে এর আওতার মধ্যে নিয়ে আসে।

ভিয়েতনাম দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলেও দক্ষিণ ভিয়েতনামে অসংখ্য ভিয়েনমিন গেরিলা রয়ে গিয়েছি। তারা দিয়েমের দুর্নীতিপরায়ণ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে উঠে। এই মুক্তি সেনাদের বলা হত ভিয়েতকং বা ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট। ১৯৬২ সালে মার্কিন বিমানবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রবেশ করে। দিয়েম সরকারের পতন ঘটিয়ে জেনারেল দং ভ্যান মিন থিউ-এর উপর দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভার দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে আমেরিকা তার পরোক্ষ ভূমিকা থেকে এগিয়ে এসে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকা সরাসরি ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামে ৫০৪২০০ মার্কিন সৈন্য ছিল। ১৯৬৮ সালে ভিয়েত কং ও উত্তর ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী যৌথভাবে ৪৪টি রাজধানীর উপর আক্রমণ চালায়। আমেরিকা ক্রমশঃ পিছু হঠতে থাকে। ১৯৭৩ সালে আমেরিকান ও ভিয়েতমিন বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম-এর উপর জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯৭৫ সালে জেনারেল ভ্যান মিন সায়গনে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকার শোচনীয় বিপর্যয় বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এবং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুদ্ধে ৫৮০০০ মার্কিন সেনা নিহত হয় এবং ২০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। আমেরিকা ভিয়েতনামে অজস্র বোমাবর্ষণ করেও তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। ভিয়েতনামে সাম্যবাদ প্রতিহত করার আমেরিকার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হল ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি ছিল স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ। আমেরিকার নীতি ছিল ভ্রান্ত। আমেরিকার পক্ষে এই যুদ্ধ নিষ্ফলতারই নামান্তর। সমগ্র পৃথিবীতে আমেরিকার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। সাম্যবাদ প্রতিহত করার জন্য আমেরিকার বেষ্টনী নীতির শোচনীয় পরিণতি ঘটে। যুদ্ধে ভিয়েতনামের জয় এশিয়া তথা পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

প্রশ্ন

১। ভিয়েতনাম সমস্যা বলতে কি বোঝ?

২। এই যুদ্ধে আমেরিকা কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

৪.৫.১২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

1. A Columbus & J. Walfe — Introductin to International Relations.

2. C. Kegley & E. Wittkopf — World Politics : Trends and Transformations.

3. David Horowitz — From Yalta to Vietnam.
4. Peter Calvocoressi — World Politics since 1945.
5. David A Kay — The U. N. Political System.
6. George Lenchowski — The Middle East in World Affairs.
7. Radharaman Chakraborti — The UNO : A Study in Essentials.
8. Russel D. Buhite — Major Crisis in Contemporary American Foreign Policies.
9. Maxim Rodinson — Israel and the Arabs.
10. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।
11. অসিত কুমার সেন — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।
12. রাধারমন চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী — সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

৪.৫.১২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়ার সমস্যার উদ্ভব কি হয়েছিল? এই সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রসংঘ কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

২। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই কিভাবে কিউবার সংকটের সৃষ্টি করেছিল? কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়?

৩। কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল? এই সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘ কি কি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল?

৪। আরব-ইজরায়েল বিরোধ কিভাবে প্যালেস্তাইন সংকটের সৃষ্টি করেছিল? এই সংকটের সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। ভিয়েতনাম সমস্যা বলতে কি বোঝ? কিভাবে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল?

৬। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা আলোচনা কর। আমেরিকা কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

৪। W.C. McWilliams and H. Piotrowski : The World Since 1945.

৫। C.F.J. Muller (ed.) : Five Hundred Years : A History of South Africa.

৬। Rinita Mazumder : A Short Introduction to Feminist Theory

৭। McGeorge Bundy : Danger and Survival.

৪.৬.১৪.১৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কুড়ি শতকের সাংস্কৃতিক চর্চার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন। উত্তর-আধুনিকতা বলতে কী বোঝায়?

২। মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

৩। বর্ণবৈষম্যবাদ বলতে কী বোঝায়? দক্ষিণ আফ্রিকায় কীভাবে এর অবসান ঘটেছিল?

৪। কুড়ি শতকে মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠেছিল, ব্যাখ্যা করুন। 'Womanism'-এর তাৎপর্য কি?

একটি স্বতন্ত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ''National Institute for Women of Color'' (NIWC) এই সংগঠনের নাম 'Color' কথাটির প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শেতাঙ্গ সমাজের নারীবাদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এখানে। Alice Walker নারীবাদের একটি বিকল্প শব্দও চয়ন করেছিলেন। তিনি 'Womanism' কথাটি ব্যবহার করেন এবং কথাটি বর্জন করেন নারী নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্য। Alice Walker-এর মতে, Womanism-এর অর্থ অনেক গভীর এবং সমাজ থেকে মেয়েদের বিছিন্ন করে তাদের অধিকার অর্জনের কোন উদ্দেশ্য 'Womanism'-এর নেই। Walker-এর এই বক্তব্যে মেয়েদের মানবিক স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে এবং মাতৃত্বের ভ্রান্তধারণার অবসানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

Alice Walker-নারী নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নারীদের একটি বিকল্প শব্দ হিসেবে ***Womanism*** *কথাটি ব্যবহার করেন।*

উনিশ শতকের শেষভাগে প্রধানত নিপীড়িত সমাজগুলিতেই এই আন্দোলনের ধারাটি ছড়িয়ে পড়েছে। এরই সূত্রে Sherley Anne Williams একটি বই লেখেন। তার নাম 'Some Implications of Womenist Theory'। এই রচনার Sherley দেখিয়েছেন যে Womanist Movement-এর লক্ষ্য বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের অধিকার অর্জন নয়, সার্বিকভাবে অধিকারহীন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মেয়েদের তার সঙ্গে যুক্ত করাই Womanist Movement-এর উদ্দেশ্য। Sherley-র মন্তব্যটি এক্ষেত্রে খুবই গুরত্বপূর্ণ ''Womanist Enquires assume that it can talk both effectively and productively about men''।

প্রশ্ন

১। 'Womanism' আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?
২। 'Womanism'-এর প্রবক্তা কে?

৪.৬.১৪.১৪ ঃ সারকথা

কুড়ি শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অকল্পনীয় দ্রুতগতি থেকে একটা জিনিস পরিস্কার। তা হল, শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে এমন বিজ্ঞানের সন্ধান যদি পাওয়া যায়, বিজ্ঞানের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োগ যদি সম্ভব হয়, তাহলে গবেষণা ও প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থনের অভাব হয় না, বৈজ্ঞানিক ধারণার বাস্তবায়নের জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষাও করতে হয় না। তবে যে কোন ঘটনারই প্রতিক্রিয়া থাকে। যুদ্ধে বিজ্ঞানের ভয়াবহ প্রয়োগের পর সেই প্রতিক্রিয়াই দেখা গিয়েছিল সংস্কৃতি ও অধিকারের আন্দোলনে।

৪.৬.১৪.১৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ পৃথিবীর ইতিহাস
২। Ference Feher *et al.* : Dictatorship Over Needs
৩। Stein Ringer : The Possibility of Politics.

এবং ১৯১৯ সালে সুইডেন, নেদারল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ায় মেয়েদের ভোটাধিকার মেনে নেওয়া হয়। স্পেনে এই অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯৩১ সালে। ব্রিটেনে এ সময় একটি সংগঠন গড়ে ওঠে যার নাম দেওয়া হয় 'National Organization for Women'. এই সমগঠনটির কর্মসূচির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেয়েদের রাজনৈতিক অধকারকে সুনিশ্চিত করা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নটিকে মেয়েদের পক্ষে নিয়ে আসা।

বুদ্ধিজীবী মহলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মেয়েদের জাতীয়তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন তুলেছিল Virginia Woolf-এর 'A Room of One's Own' বইটি। ভার্জিনিয়া ওলফ প্রধানত মেয়েদের জাতীয়তার সমস্যাটিকেই তুলে ধরেছিলেন এবং কিভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা থেকে সে বিযুক্ত হয়ে যেতে পারে তা দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রথম বিশ্বে নারীবাদ বিষয়ে অসংখ্য বইলেখা হয়। এই বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Simonede-Beauvoir-এর ''The Second Sex'' (১৯৪৯), Millet-এর ''Sexual Polities'' (১৯৬৯), Moars-এর ''Literary Women'' (১৯৭৩), Patricia Maire-এর ''The Female Imagination'' (১৯৭৫) এবং Toril-এর ''Feminist Literary Theory'' (১৯৮৫)।

কুড়ি শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৃতীয় বিশ্বে গড়ে ওঠা নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে কখনো কখানো একটি স্বতন্ত্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এপ্রসঙ্গে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন Toni Morrison এবং অন্যজন হলেন Alice Walker, Morrison বলেন যে, গোটা বিশ্বেই উপনিবেশিকতার চাপে নারীবাদী আন্দোলন একটি বিকৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। যেহেতু নারীবাদের প্রথম আবির্ভাব ইউরোপে হয়েছিল এবং যেহেতু ইউরোপীয়রাই ঔপনিবেশিকতার পথিকৃত, সেই কারণে নির্যাতিত নারীশ্রেণীকে জাগিয়ে তোলার কথা বলা হলেও তাদের নেতৃত্বাধীন নারীবাদী আন্দোলনে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের সামাজিক ভেদের বিষয়টি অবলুপ্ত হয়নি। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীরা কৃষ্ণকায়দের যে নিম্নবর্গীয় অনিবার্যতার চোখে দেখতে সেই একই চোখে শ্বেত নারীবাদীরাও কৃষ্ণকায় মহিলাদের দেখেছিল এবং তাদের সেই মনোভাবটি ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী নেতৃত্বের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সেই কারণে Morrison গোটা বিশ্বের Feminist Movement-কে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রচলিত নারীবাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—''I always missed some intimacy, some direction, some voice'' মরিসন তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ ''The Bluest Eye'' (১৯৭০)-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন, ''I wrote my first novel because I wanted to read it.''

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল?
২। Virginia Woolf-এর বইটির নাম লেখ।
৩। মেয়েদের ভোটাধিকারের কথা প্রথম কারা বলেছিলেন?

মরিসন-এর রচনা প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপে প্রচলিত নারীবাদী আন্দোলনের একটি বিকল্প ধারা গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, নারীবাদের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটানো, এবং তাতে সামগ্রিক মানববাদের সঙ্গে যুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, নারীবাদী আন্দোলনের ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনা করা এবং তৃতীয়ত, মেয়েদের

উনিশ শতকে এই প্রবণতার একটি বিপরীতমুখী প্রবণতাও দেখা যায়। তার প্রধান কারণ ছিল শিল্পায়ন। শিপ্রবিপ্লবের পর পুরুষ এবং মহিলা উভয়শ্রেণীর শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনে এই সমান অংশগ্রহণ বহু সমাজেই আতঙ্কের কারণ হয় এবং সেই কারণে শ্রমিকের মধ্যেই নারীবাদ বিরোধীতা দেখা যায়। সম্ভবত এর ফলেই সমাজবাদী চিন্তা মেয়েদের বিশেষ কোনো স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। মার্কস তার সমাজতত্ত্বে নারী শ্রমিক হিসেবে কোন পৃথকবর্গের কথা হলেননি। মার্কসবাদ ঘোষণা করেছিল যে, শ্রমজীবীজের আন্দোলনের নেতৃত্বে অবশ্যই পুরুষ শ্রমিকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্র পরিচালনায় মেয়েদের অধিকারের কথা লেনিন ঘোষণা করেন এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাই আবার মেয়েদের ইতিহাসের আলোয় ফিরিয়ে আনে। এঙ্গেলস তার পরিবার ব্যক্তিমালিকানা এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রকাশিত রচনায় স্পষ্টভাবে দেখিয়ে ছিলেন যে, আধুনিক সমাজের পরিবার মেয়েদের গোপন ও প্রকাশ্যে দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এঙ্গেলসের মতে, প্রতিটি পরিবারেই পুরুষ বুর্জোয়া এবং মেয়েরা প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিত্ব করে। রুশ বিপ্লবের আগেই লেনিন বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়নে মেয়েরা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্র পরিচালনায় মেয়েদের অর্ধেক অধিকারের কথা লেনিন ঘোষণা করেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের প্রতি আহ্বান জানান। লেনিনই প্রথম মেয়েদের হাতে রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার তুলে দেন। এরপর 'Inosa Armando'-র নেতৃত্বে নারী কমিশন গঠিত হয়। ইতিমধ্যে দুটি বিখ্যাত বই, যথা—Margaret fuller এর "Women in the Nineteenth Century" এবং John Stuart Mill- এর'The Subjection of Women'মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে ইউরোপে আলোড়ন তোলে। এই বই দুটি ইউরোপে বিশেষভাবে প্রচারিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পব। কিন্তু এগুলি রচিত হয়েছিল ১৮৪০ ও ১৮৬০-এর দশকে।

কুড়ি শতকে গোটা বিশ্বেই মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে এই আন্দোলনের তিনটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি ধারা লক্ষ করা যায় পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্বে, দ্বিতীয় ধারাটি সমাজতান্ত্রিক দ্বিতীয় বিশ্বে এবং তৃতীয় ধারাটি গড়ে ওঠে অনুন্নত ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বে। পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্বের ধারাটি মূলত ছিল রাজনৈতিক অধিকারকেন্দ্রিক। যেসব রাষ্ট্রে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেইসব রাষ্ট্রে এই ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, অর্থনৈতিক অধকারের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। এবং এই রাজনৈতিক অধিকার অনেকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কাঠামোর স্বীকৃত ভোটাধিকারের ওপর। যদিও এই ভোটাধিকারের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেই এবং লেনিন ও জার্মানীর ক্লারা জেটকিন মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন, তবুও কুড়ি শতকে এই বিষয়টি গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দুনিয়াতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল। এর প্রধান কারণ অবশ্যই বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধে মেয়েদের নাগরিকত্ব, রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের একান্ততা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হয়ে দিয়েছিল। কেননা এর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক জড়িয়ে ছিল। ফলে ইংল্যাণ্ড বা জার্মানির মতো রাষ্ট্রের কাছে এই সমস্যার সমাধান করা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। ১৯১৮ সালে ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল

যায় যে, মোট শ্রম সময়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মত পুরুষ শ্রম ব্যবহার করা সত্ত্বেও মোট উপার্জনের ৯০ শাতংশের ওপর পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই রিপোর্ট সমাজবিজ্ঞানীদের তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সেসূত্রে নারীবাদ বিষয়টি রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এবং আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ বা আন্তজাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে মেয়েদের অবস্থান সংক্রান্ত প্রতিবাদী রচনার প্রচার শুরু হয়। ১৯৩১-৩২ সালে দুটি বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়। একটি হল 'Mary Baird'এর 'on Understandding Women' অন্যটি হল Oswald Spengler-এর 'The Decline of the West'মেরী বেয়ার্ড যুক্তি দিয়ে দেখান যে, দাস সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ পর্যন্ত ইতিহাসের অর্ধেক স্রষ্টা মেয়েরা, কিন্তু ইতিহাসে তার স্বীকৃতি বা উল্লেখ নেই বললেন চলে। Spenglerমন্তব্য করেন যে, এই অবস্থায় স্বাভাবিক কারণ বিবর্তনের ব্যাখ্যায় পুরুষকেন্দ্রিকতা। Spengler-এর মতে, নারী হল পৃথিবীর ইতিহাস, আর পুরুষ পৃথিবার ইতিহাসের নির্মাতা। এি বক্তব্য সমাজবিজ্ঞনের ধারণাগত দিক থেকে অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার এই ব্যক্তব্যটি ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যায় যে ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেলও মন্তব্যটি আসলে নারী বিরোধী পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ বিকাশের ধারণার সমালোচনা হিসেবেই প্রযোজ্য।

ইতিহাসগতভাবে এই সমালোচনা একেবারে নতুন ছিল না। ইউরোপ-এর সূত্রপাত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে। দার্শনিক দিদেরো স্পষ্টভাষায় ইউরোপীয় সমাজের নারীবিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করেছিলেন। পরে দিদিরোর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের 'The Subjection of Women'বইতে। মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে দার্শনিকদের সচেতনতার প্রতিফলন ঘটে ফরাসী বিপ্লবে। এর একটি আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমিও লক্ষণীয়। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে যখন অভিজাতদের বিরুদ্ধে ফরাসী সমাজের পতিবাদ দেখা দেয় তখন সেই প্রতিবাদে মেয়েরাও সামিল হতে বাধ্য হয়। ফলে বাস্তিল দুর্গের ধ্বংসে যেভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, ঠিক একইভাবে ফ্রান্সের বিভিন্ন খাদ্য দাঙ্গা (Food Riot)-এর সময় তারা পথে নেমেছিল। স্বভাবতই বিপ্লবী সংগঠনগুলি মেয়েদের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেনি। এরই পরিণতি ছিল মেয়েদের নেতৃত্ব একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, যার নাম ছিল "Societe-des Revolutionaries Republicaines."

এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন Rose Claire. ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় মেরি ওলস্টোনক্রাফটের "A Vindication of the Rights of Women." এই বইটিতে ফরাসী বিপ্লবে মেয়েদের যে ভূমিকা দেকা গিয়েছিল, সেই সূত্রেই মেয়েদের প্রাপ্য অথচ অস্বীকৃত স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে তুলে ধরা হয়। বলা যায়, ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের এটাই প্রকৃত সূচনা।

প্রশ্ন ১। 'The Decline of the Act' কার লেখা?

১৯৬৪-তে ম্যাণ্ডেলা গ্রেফতার হয়েছিলেন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল তার, নিষিদ্ধ হয়েছিল আফ্রিকান ন্যাশানাল কংগ্রেস। এরপর প্রায় দু'দশক ছিল উত্তেজনার স্থিতাবস্থা, যদিও আন্তর্জার্তিক চাপ ছিল অব্যাহত। ১৯৮৫-তে প্রেসিডেন্ট বোথা সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন, কালোদের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি নিয়েছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন 'Adapt or die',কিন্তু কট্টরদের চাপে কিছু করে উঠতে পারেননি, ১৯৮৯-তে নিজের দলেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, ক্ষমতা চলে গিয়েছিল Frederik W. De Klerk-এর হাতে। ক্লার্ক রক্ষণশীলদের চাপ কাটিয়ে উঠে মনোভাব পরিবর্তনের কথা বলতে পেরেছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন নতুন আফ্রিকার,"a totally changed South Africa...Free of domination or oppression in whatever form".

১৯৯০-এর ফ্রেব্রুয়ারিতে নিঃশর্তে মুক্তি পেয়েছিলেন ম্যাণ্ডেলা, ১৯৯৪-এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তার দল, ম্যাণেডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন ২৭মে। সেই সঙ্গে শেষ হয়েছিল বর্ণবৈষম্যের অধ্যায়। ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সমঝোতাপত্র। ইতিমধ্যে ডেসমণ্ড টুটুর সভাপতিত্বে স্থাপিত হয়েছিল "Truth and Reconcilation Commission"। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক হিংসাশ্রয়ীদের সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন

১। ব্ল্যাক কনসাসনেস আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
২। কৃষ্ণাঙ্গ শেতাঙ্গ সমঝোতা পত্র কবে স্বাক্ষরিত হয়?

৪.৬.১৪.১৩ ঃ মেয়েদের অধিকারের কথা ঃ নারীবাদ তথা মানবাতাবাদ

বর্ণবৈষম্যের মতো লিঙ্গবৈষম্যও ছিল কুড়ি শতকের সূচনাপর্বের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানুষ হিসেবে নূন্যতম অধিকারটুকুও দেয়নি। তাই মানবাধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন, ইতিহাস স্থান করে নিয়েছিল বিষয়টি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মেয়েদের অবস্থান সংক্রান্ত ইতিহাসে চর্চা সমাজবিদ্যার একটি গুরুত্বহীন অংশ হিসেবেই ছিল। এ পর্বে সমাজ-রাষ্ট্র এবং উৎপাদনের বিকাশ এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হত। সমাজবিদ্যার চর্চা ছিল মূলত পুরুষকেন্দ্রিক। কিন্তু কুড়ি শতকের তৃতীয় দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মেয়েদের রাজনৈতিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদার দাবি জোরালো হয়। ফলে নারীবাদী ইতিহাস চর্চাও সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

মেয়েদের রাজনৈতিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদার দাবি জোরালো হয়। ফলে নারীবাদী ইতিহাস চর্চাও সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে এবিষয়ে জন সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০-এর দশকে রাষ্টপুঞ্জ একটি রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়, গোটা বিশ্বে মোট শ্রমসময়ের দুই তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে মেয়েরা, অথচ মোট উপার্জনের মাত্র (দশ) ১০ শতাংশের ওপর তাদের অধিকার স্বীকার কার হয়। গোটাবিশ্বের উৎপাদনের মোট উপকরণের মাত্র ১ শতাংশ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দেখানো হয়। রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে

কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৯৫৯-এ বাণ্টুস্তান আইনের মাধ্যমে বান্টুদের জন্য দশটি এলাকা 'Bantu Homeland'বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার বাইরে কোনো অধিকার ছিল না তাদের, অথচ বাণ্টু এলাকা ছিল তাদের কাছে 'archipelago of misery'। বান্টু বসতির এই নিয়ম দ্বিতীয়বার সাংবিধানিক চেহারা পেয়েছিল ১৯৭০ সালে, পাশ হয়েছিল 'The Bantu Homeland Citizenship Act'। বান্টুদের বসতি-শহরকে বলা হত ঘেটো।

প্রশ্ন

১। 'Population Registration Act' কবে চালু হয়?

২। বর্ণের নিরিখে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদের কয় ভাগে ভাগ করা হয় ও কি কি?

১৯৬০ সালে সাপভিল আর জোহানেসবার্গের কাছে সোয়েটোতে পুলিশী হাঙ্গামায় অনেক কালো মানুষের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের আসল লড়াই শুরু হয়। ১৯১২ সালের পর থেকেই এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। ১৯৬০-এ সেই প্রতিবাদ জঙ্গী হয়ে ওঠে। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস'।১৯৬০-এ সেই প্রতিবাদ জঙ্গী হয়ে ওঠে। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস নেলসন ম্যাণ্ডেলার তত্ত্বাবধানে তার সশস্তর ইউনিট তৈরি করে, নাম দেয় 'উমখণ্ডো উয়ে সিজম্বে' অর্থাৎ 'জাতির বর্শাফলক'। নেলসন ম্যাণ্ডেলা সেই সময়ে বলেছিলেন, 'fifty years of non-violence had brought the African people nothing but more reperssive legislation, and fewer and fewer rights'. সুতরাং অহিংসার পথে আর নয়।

১৯৬৪-তে ম্যাণ্ডেলা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি নিষিদ্ধ হয়েছিল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসয এরপর প্রায় দু'দশক ছিল উত্তেজনার স্থিতাবস্থা, যদিও আন্তর্জাতিক চাপ ছিল অব্যাহত।

কিন্তু ম্যাণ্ডেলার আন্দোলনও নিরুপদ্রব ছিলনা। একদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মার্কিন মানবাধিকার আন্দোলনের আদলে গড়ে ওঠা 'ব্ল্যাক কনসাসনেস' আন্দোলনের নেতা স্টিভ বিকো (Biko) ও তার দল। অন্যদিকে জুলু জাতীয়তাবাদীরা। "Whites must be made realize that they are only human, not superior, (and), black must be made mealize that they are also human, not inferior'-এই ছিল 'ব্ল্যাক কনসাসনেস'-এর কথা। ১৯৭৭-এ বিকো-র মৃত্যুর পর তার আদর্শকেই গ্রহণ করেছিল Azanina peoples Organisation (AZAPO)। তবে তারা অনেক বেশি উগ্র ছিল, কোনো শ্বেতাঙ্গকেই সহ্য করতে রাজি ছিলনা তারা, তাদের স্লোগানই ছিল 'One settle one bullet'।কিন্তু ঐক্যবদ্ধ 'প্যান আফ্রিকান' আন্দোলনে আস্থা ছিল না জুলু জাতীয়তাবাদী নেতা বুথেলজি-র (Buthelezi)। তার Inkatha Freedom Partyনাটাল প্রদেশে 'জুলু হোমল্যাণ্ড' চেয়েছিল। বিকো এবং ম্যাণ্ডেলা দুজনেই সন্দেহ করেছিলেন, বুথেলজি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের মদতেই কালোদের আন্দোলনে বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন, তাকে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ শাসকরা 'divide and rule'নীতির প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। বিকো মৃত্যুর আগে বলেই গিয়েছিলেন, "We oppose Gatsha(Buthelezi). He dilutes the cause by operating on a governmental platform. Becuuse of this I see the danger of division among blacks."

৪.৬.১৪.১১ ঃ মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

কিন্তু ঘোষণা মানেই যে মানবাধিকার সম্পূর্ণ রক্ষিত হবে এমন কোন কথা নেই। বিভিন্ন দেশের মতাদর্শগত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিরোধ, ধর্মীয় মৌলবাদ বা সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার অবশেষ পদে পদেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে ওঠে, ফলে ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এর বাস্তব প্রকার সম্ভব হয় না। আবার রাষ্ট্রসংঘ এ ব্যাপারে কিছু করতে গেলেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু তবুও, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন এখন একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যের অধিকারী। জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার বিভাগের অধীন উদ্ধাস্ত কমিশন (UNHCR) অনেক বেশি কার্যক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ১৯৯২ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলন।

আবার রাষ্ট্র সংঘ এ ব্যাপরে কিছু করতে গেলেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে।

প্রশ্ন

১। মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কোথায়?

৪.৬.১৪.১২ ঃ বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী লড়াই ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা

অব-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে মানবাদিকারের সীমাবদ্ধতার জ্বলন্ত প্রমাম ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদ। আফ্রিকার অব-ঔপনিবেশিকতা বহুদিন পর্যন্ত হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের কারণে। ১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু সেই স্বাধীনতার কোনো অর্থ ছিল না কালো মানুষদের কাছে, কেননা দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন থেকে গিয়েছিল আফ্রিকায় বাস করা সংখ্যালঘু ইংরেজদের হাতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের (বুয়র) উত্তরপুরুষরা নিজেদের বলত 'আফ্রিকানর,' আর আফ্রিকার কালো মানুষদের 'ধর্ম ও জাতি'র নিরিখে 'মনুষ্যেতর' বর্গে রাখত। সেই থেকে জন্ম নিয়েছিল বর্ণবৈষম্যবাদ (Apartheid),যার অর্থ আপ্রিকায় কালো মানুষদের আলাদাভাবে বাস করতে বলা। ইংরেজরা এই জাতিদর্শনই মেনে নিয়ে ১৯৫০ সালে Population Registration Act চালু করেছিল। এই আইন দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদের চারভাগে ভাগ করে, (ক) সাদা, (খ) মিশ্রবর্ণ (Colourd), (গ) ভারত থেকে যাওয়া কালে মানুষও (ঘ) বান্টু (আফ্রিকার কালো মানুষ)।

দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের উত্তর পুরুষেরা নিজেদের বলত 'আফ্রিকনর', আর আফ্রিকার কালো মানুষদের 'ধর্ম ও জাতির' নিরিখে 'মনুষ্যেতর' বর্গে রাখত।

১৯৪৮-এ আপ্রিকার ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বর্ণবৈষম্য তীব্র রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছিল। শিক্ষা, যাতায়াত, বাসস্থান, চাকরি— সবক্ষেত্রেই আফ্রিকার কালোদের আলাদা করে রাখা হত। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রসংঘের নিন্দাপ্রস্তাব ও আন্তর্জাতিক চাপকে কোনো আমল দেয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ শাসক। ভারত ও অন্য বহুদেশ তার সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক রাখেনি, অর্থনৈতিক সম্পর্কের সংকোচন করেছিল, কিন্তু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অপুরণীয় ক্ষতি, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের দুঃসহ স্মৃতি আর সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রেরণা গোটা পৃথিবীর মানুষকে মানবাধিকার প্রসঙ্গে সর্বসম্মত কর্মসূচী গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী সমাজও এই দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেনি, কেননা একে অবহেলা করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে তাই গৃহীত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ। এই পর্বেই একশোটিরও বেশি দেশ ঔপনিবেশিক শাসকের শেকল ছিঁড়ে স্বাধীনতার পথে পা বাড়িয়েছিল। ফলে মানবাধিকারের তাৎপর্য নতুন করে ধরা পড়েছিল সকলে চোখে।

১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র রচনার উদ্যোগ নেয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য দেশগুলোর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক এবং অব-উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে আপত্তি জানিয়েছিল, তবে অন্য সব বিষয়ে তাদের সায় ছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো চুক্তিপত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোকে ঢোকাতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে সায় ছিল না মার্কিন পক্ষের। ফলে দুটো আলাদা চুক্তিপত্র রচিত হয়েছিল। একটিতে ছিল তাজের অধিকার, খাওয়া-পরা-থাকা ও চিকিৎসার অধিকারের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি, অন্যটিতে ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উল্লেখ। চুক্তিদুটি কার্যকর হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৬৬ ও ১৯৭৬ সালে। এর দশ বছর পর ১৯৮৬ সালে তৃতীয় বিশ্বের চাপে বিকাশের অধিকারকে ও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার সনদে অন্তভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের তেহ্‌রান ঘোষণায় (১৯৮৬) বলা হয়েছিল ঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জন না করে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে পাওয়া যায় না।" এই ঘোষণাই আরও স্পষ্ট ১৯৮৭ সালের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে ঃ ''মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্য জাতিবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদ, বিদেশী আগ্রাসন, দখলদারী ও আধিপত্য যাতে কোন সার্বভৌম দেশের মানুষকে বিপর্যস্ত না করে এবং সেই দেশের সম্পদ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ওপর যাতে সেই দেশের নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত হয়, সেদিকে রাষ্ট্রসংঘ সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেবে।"

প্রশ্ন

১। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ কিভাবে হয়?
২। কে কত সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন?

৪.৬.১৪.১০ ঃ মানবাধিকার ঘোষণা

রাষ্ট্রসংঘ এ পর্যন্ত মানবাধিকারের যে সমস্ত ঘোষণা করেছে, সেগুলো হল ঃ মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮), গণহত্যাবিরোধী ঘোষণা (১৯৪৮), শিশুদের অধিকার ঘোষণা (১৯৫৯ ও ১৯৯১), জাতিগত বৈষম্যবিরোধী ঘোষণা (১৯৬৩), উপনিবেশকে স্বাধীনতাদান বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬৭), নৃশংসতা বিরোধী ঘোষণা (১৯৭৮), ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য বিরোধী ঘোষণা (১৯৮১) এবং নারী-অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৯২)।

প্রশ্ন

১। ২০ শতকের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র সংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাগুলি কি ছিল?

৪.৬.১৪.৭ ঃ উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতি

সংস্কৃতিচর্চার শেষ কুড়ি শতকীয় বাঁকটি এসেছিল উত্তর আধুনিকতা (Postmodernism)তত্ত্বের হাত ধরে। আধুনিকতার যুক্তিকেই আক্রমণ করে উত্তর-আধুনিকতা, তাকে ভাঙতে চায়, আবার গড়তে চায়। উত্তর-আধুনিক মতে, আধুনিকতারও অনেক অন্ধকার দিক আছে, শুধু পুঁজিবাদী আধুনিক সংস্কৃতি নয়, সমাজতান্ত্রিক আধুনিকতা সম্পর্কেও এটা সত্য। সোভিয়েত সংস্কৃতির অবক্ষয়, পূর্ব ইউরোপের ভাঙ্গন, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্রবের বিপর্যয় উত্তর আধুনিক সংস্কৃতি চর্চাকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতা যুগিয়েছে। উত্তর আধুনিকরা দেখিয়েছেন কীভাবে সাংস্কৃতিক জগতে আধুনিকতার ক্ষমতা প্রযুক্তি হয়। চিন্তাভাবনায়, দর্শনে, শিল্পে চেপে বসে আধুনিকতার বিকৃতি। পরনির্ভর পশ্চিমমুখী সমাজদর্শন আর তাত্ত্বিক ভাবনা চেপে বসে উত্তর-ঔপনিবেশিক বৌদ্ধিক জগতে। এই উত্তর আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার রথী মহারথীদের মধ্যে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁরা হলেন মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা, লিওতার, বদ্রিলার, লাঁকা, দ্যলুজ এবং গুয়াত্তারি।

উত্তর আধুনিক মতে, আধুনিকতারও অনেক অন্ধকার শুরু পুঁজিবাদী আধুনিক সংস্কৃতি নয় সমাজতান্ত্রিক আধুনিকতা সম্পর্কে ও এটা সত্য।

প্রশ্ন

১। উত্তর আধুনিক তত্ত্বের দুজন দার্শনিকের নাম কর?

৪.৬.১৪.৮ ঃ সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঃ অধিকারের সংস্কৃতি

উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চা শুধু বুদ্ধির জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। মানুষের বাস্তব জীবনচর্চাতেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। তবে এই প্রতিফলনের বিধেয় ছিল ভিন্নরকমের। বৌদ্ধিক চর্চার বিষয়ীরা ছিলেন উচ্চবর্গের মানুষ। বাস্তব জীবনের বিষয়ীরা প্রধানত ছিলেন নিম্নবর্গের। ফলে তাদের লড়াই হয়ে দাঁড়ায়েছিল মানবাধিকারের লড়াই। কখনো তা প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে, কখনো বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, আবার কখনো বা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, নারীবাদের পক্ষে।

৪.৬.১৪.৯ ঃ অধিকারের লড়াই ঃ মানবাধিকার আন্দোলন ঃ রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা

সামাজিক অধিকার (Civil Rights) বা মানবাধিকার (Human Right) বলতে বোঝায় মানুষ হিসেবে মানুষের স্বীকৃতি আর সামাজিক জীবনের বিকাশমুখীনতা ও নিরাপত্তী। এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ষোল-সতেরো শতকে ইউরোপে ইরাসমাস ও ক্যাম্পানেলার খ্রীষ্টীয় মানবতাবদের ধারণায়, আর পেত্রার্ক, দাঁতে ব্রুনো, দা-ভিঞ্চি, বেকন, সেক্সপিয়রের ধর্মোত্তর মানবতাবাদে। যুদ্ধোত্তর কুড়ি শতকীয় বিশ্বে এই মানবতাবাদই সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা আর পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার আদায় ও রক্ষার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৯৪৮-এ রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে গৃহীত হয়েছিল আন্তর্জার্তিক মানবাধিকার সনদ। এই পর্বে একশোটিরও বেশি দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেকল ছিঁড়ে স্বাধীনতার পথে পা বাড়িয়েছিল।

না। তফাৎ ধরা পড়ে মায়াকভ্স্কি ার এভ্তুশেস্কোর রচনায়। ১৯৬৬মনন-গঠনের জন্য চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দেন মাও সে তুং। শতপুষ্প তবুও মঞ্জুরিত হয় না, বরং অনেক ফুলই ফোটার আগেই ঝরে পড়ে।

৪.৬.১৪.৫ ঃ তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি

তৃতীয় বিশ্বে এই সময়ের মনছবিটি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। একদিকে উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের বিলম্বিত প্রভাবে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্দে জেগে ওঠা, আর অন্যদিকে রুশ বিপ্লব, আর পরে চীন বিপ্লবের দুরাগত আবেগে যুদ্ধগ্লানিকে অতিক্রম করে 'শুভ্র মানবিকতা'র আবাহন— এই ছিল সেই ছবির দুটো রং। ১৯২৭ সালে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'তখন...অগৌরবের ইতিহাসমরুতে... বীরত্বকাহিনীর ওয়েসেস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভ তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত"।

কুড়ি শতকের মধ্যভাগে অব-ঔপনিবেশিকতার (de-colonisation) যুগে ঔপনিবেশিক রেশ সম্পূর্ণ কেটেছিল, তা নয়। তবে চর্চার ধরন বদলে গিয়েছিল তখন। একদা পরাধীন দেশগুলোর জীবনভঙ্গি, সাহিত্যকলা, মূল্যবোধ ও অর্থনীতির ওপর উপনিবেশের ছাপ বিশ্লেষণ করা শুরু হয়েছিল। এই থেকে গড়ে উঠেছিল উত্তর-উপনিবেশবাদ (postcolonialism)। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিশাস্ত্র—এই সব কিছুর মধ্যে যোগসূত্ররক্ষা উত্তর-উপনিবেশবাদের লক্ষণ। কারণ এই পরম্পরা দিয়েই একমাত্র উপনিবেশের ছাপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য অবশ্যই ঔপনিবেশিক পিছুটান কাটিয়ে ওঠা।

প্রশ্ন ১। উত্তর উপনিবেশবাদের প্রাথমিক কার্যকলাপ কি ছিল?

৪.৬.১৪.৬ ঃ সাংস্কৃতিক স্ট্রাকচারালিজম

কুড়ি শতকের শেষ তিন দশকে 'সংস্কৃতি'-চর্চা নতুন মোড় নিয়েছে। ই.পি.থম্প্সন, এরিক হবস্বম বা রেনল্ড উইলিয়মস্ 'কালচারকে লড়াই টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আন্তোনিও গ্রামশির 'প্লিজন নোটস্' ছড়িয়ে পর অনেকের মনেই প্রশ্ন ওঠে, শুধুই কি লড়াই, বোঝাপড়াও কি নেই? শাসিত কি কেবল শাসকের বিরোধিতাই করে, শাসকের জীবনদর্শন নিম্নবর্গের চেতনাতেও কি নিশব্দে ঢুকে পড়ে না? অণু-ইতিহাস (Micro-history) চর্চা গ্রামশি-জাত এই সংশয়কে জোরালো করেছে, আলথুসারকে অগ্রাহ্য করে গুরুত্ব পেয়ে গেছে রোল বার্থের মিথ্যাচেতনার তত্ত্ব।

এদিকে আলথুসারের স্ট্রাকচারিলাজমকে ভাঙতে শুরু করেছিলেন বার্মিংহামের স্টুয়ার্ট হল, রিচার্ড জনসন আর টেকেন্স হক্স, তাঁদের 'সাব-কালচার'-এর তত্ত্ব দিয়ে। এক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি সাড়া ফেলেছিলেন জেমস ক্লিফোর্ড তাঁর The Predicament of Culture'বইটি লিখে।

ইউরোপ-আমেরিকায় যুদ্ধ নতুন-নতুন অর্থনৈতিক আর সামাজিক সমস্যা ডেকে এনেছিল। রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল বটে, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের বুদ্ধিজীবীদের তা ততটা আকর্ষণ করেনি, যুদ্ধ আসলে তাদের মননে পঙ্গুত্বের বেদনা সঞ্চার করেছিল। ইয়েট্‌স্ তাই ১৯১৯-এ একটি কবিতায় লেখেন, "Things fall apart, the centre cantre cannot hold/Mere anarchy is loosed upon the world,/ the blood dimmed tide is loosed, and everywhere/The ceremony of innocence is drowned,/ The best lack all conviction, while the worst/Are full of passionate intensity."

প্রশ্ন

১। কয়েকজন ২০ শতকীয় সাহিত্যিকের নাম কর।

২। সাহিত্যিকের প্রযুক্তির অপসারণ চেয়েছিলেন কেন?

৪.৬.১৪.৩ ঃ সংস্কৃতির সংকট

যুদ্ধ ঘটেছিল পুঁজিবাদী জগতের সংকট থেকে। আঠারো শতকের সাংস্কৃতিক সংকট যেমন ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছিল, উনিশ শতকের সংকট উত্তরিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদের উল্লম্ফনে, কুড়ি শতকের সংকট কিন্তু তেমন কোনো সুযোগ পায়নি। রুশ বিপ্লব পুঁজিবাদের ''ধ্বংস'' চেয়েছিল বলে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা জীবনের পরিণতি সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারননি, অনিশ্চয়তারয় ভুগেছিলেন। একদিকে পুঁজিবাদের সমস্যা, আর অন্যদিক অজানা সমাজতন্ত্রের ভয় সংস্কৃতিতে নানা অবৈজ্ঞানিকতা বা পিছুটানের জন্ম দেয়, নিজের প্রতি অনাস্থার রূপান্তর ঘটে কল্পনার কোন বীরের প্রতি আস্থায়, ফলে সহজতর হয় ফ্যাসিবাদের লালন। জীবনের চাইতে, বাস্তবের চাইতে কল্পনার শিল্প বড় হয়ে ওঠে, বৃহৎ ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয় 'শিল্পের জন্য শিল্প', 'সংস্কৃতির জন্য সংস্কৃতি'—এই সামন্তিক বিশ্বাসগুলো।

৪.৬.১৪.৪ ঃ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি

এর ছিক বিপরীত মেরুতে সমাদতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবস্থান। রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লএবর হাত ধরে তার বিকাশ। পুঁজিবাদী আধুনিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ধনতন্ত্রের নির্মম উদ্ভব প্রক্রিয়া, দুনিয়াজোড়া ঔপনিবেশিকতা, ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস আর নারকীয় যুদ্ধযন্ত্রণা। এর থেকে মুক্তি খোঁজে মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য। পুঁজিবাদী বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতির উদ্ধার খোঁজেন বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পস্রষ্টা তার সন্ধান পান সমষ্রি মধ্যে, গোর্কির ব্যক্তি বা লু-সুনের অস্তিত্ব তাৎপর্য অর্জন করে ব্যষ্টির স্পর্শে। কিন্তু বিপদ সেখানেও আসে। প্রাচুর্যে ভরা, শিল্পোন্নত, শোষণমুক্ত যে সুষম সময়ের আধুনিকতার কথা বলে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, তাও কখনো কখনো অন্ধ বিশ্বাসে কুসংস্কৃত, ''সমূহের মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণ নিমজ্জন হয়ে যায়'' ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিসর্জন। সেই কারণেই ব্যক্তিগত লিরিক্যাল লেখা লিখে দণ্ডিত হন আখ্‌মাতোভা, সোভিয়েত দেশে, ধিক্কৃত হয় কসমোপলিটানিজম বা অ্যাপলিটিসিজম। কিন্তু রূপান্তর থেমে থাকে

পুজিবাদী বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতির উদ্ধার খোঁজেন বিশেষ মানুষের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পস্রষ্টা তার সন্ধান পান সমষ্টির মধ্যে, লু-সুনের অস্তিত্ব তাৎপর্য অর্জন করে ব্যক্তির স্পর্শে।

৪.৬.১৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি থেকে আপনি জানতে পারবেন ঃ-

(১) প্রসঙ্গ সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির দিক বদল

(২) সংস্কৃতির সংকট

(৩) সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি

(৪) সংস্কৃতিক স্ট্রাকচারালিজম

(৫) মানবাধিকার আন্দোলন

(৬) বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী আন্দোলন

(৭) মেয়েদের অধিকার নারীবাদ তথা মানবতাবাদ

৪.৬.১৪.১ ঃ প্রসঙ্গ সংস্কৃতি

শুধু বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি নয়, কুড়ি শতকের আর একটি বিভাজক দিকচিহ্ন হল সংস্কৃতির ভোলবদল। যদি ভৌগলিক দিক থেকে বিচার করা যায়, তাহলে কুড়ি শতকের সংস্কৃতি হল ত্রিমাত্রিক। একদিকে যাদ্ধোত্তর ইউরোপ আমেরিকার সংশয়বাদ, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি, আর তৃতীয় পক্ষে দরিদ্র বিশ্বের জাতীয়তাবাদ।

৪.৬.১৪.২ ঃ সংস্কৃতির দিকবদল ঃ ইউরোপ-আমেরিকা

দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ- আমেরিকার সংস্কৃতিকে দুটো বৈরী শিবিরে ভাগ করে দিয়েছিল। একদিকে ছিলেন শিল্পী সাহিত্যিকরা, আর অন্যদিকে বিজ্ঞানী ও প্রয়োগকুশলীরা। যুদ্ধের ভয়াবহতা শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনে এমন বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল যে, তারা ভুল বুঝতে শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানীদের, বিজ্ঞানকেই অভিশার মনে করেছিলেন, তাই উত্তরোত্তর হয়ে পড়ছিলেন বিজ্ঞান-বিরোধী। ডব্লু. বি. ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩০), এজরা পাউণ্ড (১৮৮৫-১৯৭২), যোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪), টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) বা ডি.এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০)—এঁরা প্রত্যেকেই ভয় পেয়েছিলেন বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ, তাই প্রযুক্তিকে সরে যেতে বলেছিলেন, আক্রান্ত হয়েছিলেন দুরপনের নস্টালজিয়া বা স্মৃতিমেদুরতায়। যুধবিধ্বস্ত জীবনের গ্লানি এঁদের এবসন্ন করেছিল। এঁরা দেখেছিলেন শিল্প বিপ্লবের কদর্য দিকগুলো, তার ছাই ও ধোঁয়া, তার নিষ্পেষণ ও যান্ত্রিকতা, তার 'boredom' ও 'horror'। ম্যাথু আর্নল্ডের 'স্কলার জিপসি' তবু অক্সফোর্ড ছেড়ে প্রকৃতির রাজ্যে জিপসিদের সঙ্গে জীবনযাপনে আনন্দের খোঁজ পেয়েছিলেন, কিন্তু এলিয়টের 'হলো মেন'-দের ভাগ্য তেমন নয়, তাদের ভেতরে অসীম শূন্যতা, দুঃসহ অর্থহীনতা।

যুদ্ধের ভয়াবহতা শিল্প-সাহিত্যিকদের মনে এমন বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল যে, তারা বিজ্ঞানকে অভিশাপ মনে করেছিলেন, তাই উত্তরোত্তর হয়ে পড়ছিলেন বিজ্ঞান-বিরোধী।

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

Age of progress : Economic and Social

একক ১৪

Cultural Revolution, Civil Rights Movement, Apartheid and Feminism

বিন্যাসক্রম ঃ

একক - ২

৪.৬.১৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৬.১৪.১ঃ প্রসঙ্গ সংস্কৃতি

৪.৬.১৪.২ঃ সংস্কৃতির দিকবদল ঃ ইউরোপ আমেরিকা

৪.৬.১৪.৩ ঃ সংস্কৃতির সংকট

৪.৬.১৪.৪ ঃ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি

৪.৬.১৪.৫ ঃ তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি

৪.৬.১৪.৬ ঃ সাংস্কৃতিক স্ট্রাকচারালিজম

৪.৬.১৪.৭ ঃ উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতি

৪.৬.১৪.৮ ঃ সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঃ অধিকারের সংস্কৃতি

৪.৬.১৪.৯ ঃ অধিকারের লড়াই ঃ মানবাধিকার আন্দোলন ঃ রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা

৪.৬.১৪.১০ ঃ মানবাধিকার ঘোষণা

৪.৬.১৪.১১ ঃ মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৪.৬.১৪.১২ ঃ বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী লড়াই ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা

৪.৬.১৪.১৩ ঃ মেয়েদের অধিকারের কথা ঃ নারীবাদ তথা মানবতাবাদ

৪.৬.১৪.১৪ ঃ সারকথা

৪.৬.১৪.১৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৪.৬.১৪.১৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

পণ্য ঐ দেশগুলোর বাজার দখল করতে পারবে না। এইভাবে অনুন্নত দেশ মুক্ত বাণিজ্যের দুনিয়ায় আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

বিশ্বায়নের অর্থনীতি, প্রযুক্তির হাতবদল এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার রিকার্ডোর এই ভাবনাটাকে অচল করে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে মুশকিলে ফেলে দিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজির দ্রুত চলাচল নিচু মজুরির দেশের শ্রমকে উন্নত অর্থনীতির দেশে আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে উন্নত দেশেই নিচু মজুরির সমান্তরাল উৎপাদন কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। মুক্ত বাণিজ্যের আপেক্ষিক সুবিদার তত্ত্ব এইভাবেই উন্নত দেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশেষে ডিজিটাল ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব রাকার্ডোর তত্ত্বকেই বিপরীত মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আডটসোর্সিং-এর কায়দায় এখন শ্রম-প্রতুল দেশে বসেই যোগাযোগ-বিপ্লবের (Information Revolution)সুযোগে উন্নত দেশের উৎপাদনের কাজ সেরে ফেলা যায়। এ এক নতুন ধরনের পুঁজির উপনিবেশায়ন।

প্রশ্ন

১। পুঁজির উপনিবেশায়ন বলতে কি বোঝ?
২। রিকার্ডো তত্ত্ব কি?
৩। আকাশের আলেকজাণ্ডার কাকে বলা হয়?

৪.৬.১৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ পৃথিবীর ইতিহাস

Ference Feher *et.al*. :Dictatorship Over Needs.

Stein Ringer : The Possibility of Politics.

W.C. Mcwilliams and H.Piotrowski : The world Since 1945.

C.F.J. Muller (ed) : Five Hundred Years : A Hitory of South Africa.

Rinita Mazumder : A Short Introduction to Feminist Theory

McGeorge Bundy : Danger and Survival.

৪.৬.১৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কুড়ি শতকে যুদ্ধের পরিবেশ বিজ্ঞান গবেষণার ওপর কী প্রভাভ ফেলেছিল? এর সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্ক ছিল?

২। কুড়ি শতকের শেষদিকে তথ্যপ্রযুক্তিতে যে বিপ্লব আসে, তার স্বরূপ কী ছিল?

এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তির নতুন অবয়বকে এভার্ট রজার্স পুরোনো কাঠামোর ওপর নতুন ব্যবস্থার প্রসারিত প্রভাব হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, আর মার্শাল ম্যাকলুহান একে বলেছেন নাটকীয় বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এই তথ্যপ্রযুক্তির মূল্যায়ন তিনদিক থেকে করা যেতে পারে। এক, তথ্যসঞ্চয়ন, তথ্যসঞ্চালন ও তথ্যবাজারের সংরক্ষণ ও প্রসারণ। দুই, তথ্যমাধ্যমিক পণ্যায়ন এবং তিন, উদ্বৃত্ত মূল্যজনক প্রযুক্তি।

প্রথম দিকটির ভিত্তি হল সাংখ্য-বৈদ্যুতিন (digital) পদ্ধতির প্রয়োগ। ১৯৮০-র দশক থেকে উন্নতি বিশ্বের অর্থনৈতিক এজেন্টগুলো স্যাটেলাইট কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা (Computer Synthesized Satellite Raceiver) চালু করেছে। তার ফলে গোটা বিশ্বের সম্পদ, চাহিদা, জনসংখ্যা, সাচ্ছল্য বা দারিদ্র্য, সমাজের ক্রয়ক্ষমতা, আঞ্চলিক সৃজনশীলতা, এই সব তথ্যই দ্রুত বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলে যায়, প্রয়োজনমতো পুঁজির বিশ্বায়নে বা একরূপীকরণে ব্যস্ত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট'-এর বা টেকনোক্রাটদের কাজে লেগে যায়। ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থায় দরকারি তথ্য জমিয়েও রাখা যায়, সময়মতো কাজে লাগবে বলে, বা সেই তথ্য মোটা দামে বিক্রি করা যাবে বলে। এইভাবেই তথ্য নিজেই পণ্যয়িত (Commoditised) হয়ে যায়, প্রসারিত হয় তথ্যবাজার। সাধারণ অবস্থায় এই তথ্যবাজারের সবচাইতে দরকারি যোগাযোগ প্রযুক্তি হল ইন্টারনেট এবং ইন্ট্রানেট। এদের দৌলতেই পৃথিবীর ভোক্তারা আজ কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের 'সিটিজেন' বা নাগরিক নন, তারা সকলেই হয়ে পড়েন 'নেটিজেন'।

এই তথ্যপ্রযুক্তি মূল্যায়ন তিনদিক থেকে করা যেতে পারে। এক, তথ্যসঞ্চয়ন, তথ্যসঞ্চালন ও তথ্য বাজারের সংরক্ষণ ও প্রসারণ। দুই, তথ্যমাধ্যমিক পণ্যায়ণ এবং তিন উদ্বৃত্ত মূল্যজনক প্রযুক্তি। এই উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজির দ্রুত চলাচল নিচু মজুরির দেশের শ্রমকে উন্নত অর্থনীতির দেশে আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই তথ্যপ্রযুক্তিই এখন গোটা পৃথিবীর পণ্য বাণিজ্যের সবচাইতে বড় হাতিয়ার। এর মাধ্যমেই তৈরি হয় ক্রেতা, গড়ে ওঠে তার চাহিদা আর তার যোগাযোগ হয় বিক্রেতা বা উৎপাদকের সঙ্গে। ১৯৯০-এর দশকে স্যাটেলাইট সম্প্রচারে ছাড়পত্র দিয়ে ভারতে এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং, যে মনমোহন এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মানুষের খাওয়া-পরা-প্রসাধন বা শরীরচর্চা সবই ঠিক করে দেয় এই স্যাটেলাইট পণ্যায়ন। রূপার্ট মাডোর্ক নিউক কর্পোরেশনের কর্ণধার রূপার্ট মার্ডোককে এখন বলা হয় 'আকাশের আলেকজাণ্ডার'। তার একমাত্র কাজ হল সংবাদ, খেলাধূলা, বিনোদন এবং মানুষের শৈশবকেও স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা। এই দিয়েই যেন তিনি পৃথিবীকে পণ্যসংস্কৃতিতে ছেয়ে দেবেন, জয় করে নেবেন গোটা বিশ্বকে।

তৃতীয়ত, তথ্য সংগ্রহ আর তার উৎপাদনমুখী ব্যবহারের নানা কৌশল উদ্ভাবন করে উদ্বৃত্ত মূল্যও সৃষ্টি করতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি। বিভিন্ন রকমের সফ্টওয়্যারই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সারা বিশ্বে যে নেটভিত্তিক বাণিজ্য চলে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং বা ই-শপিং এর হাত ধরে তার মূলেও এই সফ্ট্ওয়্যার।

অর্থনীতি ও পুঁজিশাস্ত্রের একটি দরকারি বিষয়ের আলেচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকে রিকার্ডো 'Theory of Comparative Advantage'শীর্ষক একটি আলোচনা করেছিলেন। তিনি এমন একটি বাণিজ্য ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন, যেখানে নিচু হারে থাকা মজুরির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রম-নিবিড় দেশগুলোকে উৎপাদনের ব্যাপারে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage)দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ঐসব দেশে পণ্যের মূল্যমান কম থাকবে এবং মুক্তি বাণিজ্যের আবহাওয়ায় উঁচু হারে বাঁধা মজুরির যন্ত্র-নিবিড় উৎপাদনের বিদেশী

উত্তরপুরুষের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে, তা এখনকার একটি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক আলোচনার বিষয়। এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎকর্ষের ওপরই নির্ভর করে পশুপালন, কৃষি, পরিবেশ ও মানবসম্পদ বিকাশের মতো দরকারি বিষয়গুলো। শুধু তাই নয়, ডি এন এ পরীক্ষা যে কোন জৈব গোষ্ঠীর ইতিহাস নির্ণয়েরও অন্যতম হাতিয়ার।

প্রশ্ন

১। 'Quantum theory'-এর প্রবক্তা কে?
২। সোভিয়েত রাশিয়ার একজন বিজ্ঞানীর নাম কর?
৩। মহাকাশ বাণী নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব কে ব্যাখ্যা করেন?
৪। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বংশগতির মূল কি?

৪.৬.১৩.৪ ঃ প্রগতির ধরন

কুড়ি শতকের বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট বোঝা যায়, তা হল, বিজ্ঞানের গবেষণা দ্রুত বেড়েছে হয় যুদ্ধের সময়ে, নয়তো সেই সময়ে যখন শিল্পোদ্যোগীরা পুঁজিসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে। যুদ্ধের সময়ে সামরিক বিজ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়ে এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য দ্রুত বেরিয়ে আসে, যেসব তত্ত্ব ও তথ্য হয়তো শান্তির সময়ে পাওয়া যেত অনেক ঢিমে তালে। ১৯২৯-এ আলেকস্যানডার ফ্লেমিং পেনিসিলিনের গুণ আবিষ্কার করেছিলেন , কিন্তু তখন এটা নিয়ে তেমন হৈ চৈ হয়নি। অথচ যুদ্ধের সময়ে যখন সেনাদের চিকিৎসার ব্যাপারটি জরুরি হয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে গুরুত্ব পেয়েছিল ঐ পেনিসিলিন। অন্যদিকে বিজ্ঞানের ব্যবসায়িক প্রেরণার লক্ষণীয় উদাহরণ হল টেলিভিশন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই পাওয়া গিয়েছিল এর আভাস। তখন কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বোঝা গেল যে, উনিশ শতকীয় উৎপাদন-প্রযুক্তি আর কুড়ি শতকীয় শক্তি প্রযুক্তির মিশ্রণে গণব্যবহার্য পণ্যউৎপাদনের (Mass Production) বাজার-সম্ভাবনা (Market Potential) অসীম এবং তার জন্য চাই গণমাধ্যমের উন্নতি, কেননা গণমাধ্যমই ভোগ্যপণ্যবাদের (Consumerism) প্রচার করে বাজার সৃষ্টি করবে আর পুঁজির সম্ভাবনা বাড়াবে, তখন আর টেলিভিশনের ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে রইল না, তার থেকেই এল তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব আর ভোগ্যপণ্যের বিশ্বায়ন।

বিজ্ঞানের গবেষণা দ্রুত বেড়েছে হয় যুদ্ধের সময়ে, নয়তো সেই সময় যখন শিল্পোদ্যোগীরা পুঁজিসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পেনিসিলিন ও টেলিভিশনের উল্লেখ করা হয়।

প্রশ্ন

১। পেনিসিলিন কে ও কবে আবিষ্কার করেন?
২। টেলিভিশন আবিষ্কালের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

৪.৬.১৩.৫ ঃ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়িত ভোগ্যপণ্য সংস্কৃতি এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি। বিশ্বায়ন গতি পেয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি (Information Technology)হাত ধরে New International Information Order-

যুগিয়েছিল quamtum mechanics। এর স্রষ্টা ছিলেন চারজন, জার্মান গবেষক হাইসেনবার্গ ও শ্রোডিঙার (Schrodinger), ইংরেজ গবেষক ডিরাক্ ও ফরাসী গবেষক দ্য ব্রয়ি (De Broglie)। এর কিছুদিনের মধ্যেই নির্ণীত হয়েছিল ইলেকট্রন ও প্রোটনের অস্তিত্ব, তৈরি হয়েছিল পরমাণু ভাঙার হাতিয়ার সাইক্লোট্রন (Cycloyron)। তবে আসল বিপ্লবটি ঘটেছিল ১৯৩২ সালে যখন চ্যাডউইক বস্তুর ভেতরের সুপ্ত শক্তিকে মুগ্ধ করবার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন নিউট্রন। কিন্তু ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা যে এর অপপ্রয়োগ করতে পারেন, এই ভয় তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে ছিল। ফরীসী বিজ্ঞানী লাঁজভ্যাঁ-র (Langevin) কথাতেই তা পরিষ্কার ঃ ''যে কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের মতোই হিটলারের পতন অবশ্যম্ভাবী, কাজেই তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত নিউট্রনকে নিয়ে, খারাপ লোকের হাতে পড়ে তা অনর্থ ঘটাতে পারে।'' বিজ্ঞানীদের এই আশঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে যখন জার্মানীতে অটো হান (Hahn) ও স্ট্রাসমান (Strassmann) সত্যি সত্যিই নিউট্রন দিয়ে পরমাণুকে ভেঙ্গে ফেলতে পেয়েছিলেন। ইহুদী বিজ্ঞানীদের হিটলার জার্মানী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাগে আমেরিকায় আশ্রয় পাওয়া বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, কুরাণ্ট (Courant) মার্কিন সরকারকে অ্যাচমবোমা বানানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ১৯৪৫-এর আগষ্টে জাপানের শহরদুটোতে ফেলা হয়েছিল সেই বোমা। ফলাফল লকলেরই জানা।

কিন্তু এরপরই আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাই আইনস্টাইন আর সোভিয়েত বিজ্ঞানী কাপিৎসা শান্তির জন্য পরমাণু আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৪২-এ ফাণির বানানো 'ইউরেনিয়াম্ রিঅ্যাকটরকে হাইডোজেন বোমার কাজে না লাগিয়ে শক্তিভাণ্ডার গড়ার কাজে লাগাতে বলেছিলেন গবেষকরা। ভি-১ এবং ভি-২ প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করতে বলেছিলেন উড়োজাহাজ ও মহাকাশগামী রকেট তৈরির ব্যাপারে। তেমনি যুদ্ধের সময়ে জার্মানে বিমানের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য ইংল্যাণ্ডে তৈরি রাডারকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে লাগাতে বলা হয়েছিল, উন্নত হয়েছিল জ্যোতিবির্দ্যা (Redioastronomy)। ১৯৪৮ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ভীনার্ (Wiener) ব্যাখ্যা করেন মহাকাশবাণী নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব (Cybernetics), তার উন্নত রূপটি একবিংশ শতকের যোগাযোগ বিপ্লবের ভিত্তি।

রোগের চিকিৎসা, কৃষি ও খাদ্যের নানা চাহিদা থেকে জীব বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হয়েছে কুড়ি শতকে। হপকিন্সের পুষ্টিতত্ব (Nutrituon) আর ভিটামিন অস্তিত্বপ্রমাণ এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া ছিল ডি.ডি.টি, সালফোনামাইড, পেনিসিলিন, প্যালউড্রিন—এইসব জীবাণুরোধক-রে আবিষ্কার। সেইসঙ্গে বেড়েছিল জৈবরাসায়নিক গবেষণা (Biochemical research)দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য তেজস্ক্রিয় সূত্র (radioactive tracer)আবিষ্কারের প্রয়াস, যেসব ভাইরাস অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না, সেই সব জীবাণুকে দেখার জন্য ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার, মস্তিষ্কের সঞ্চালন বোঝার জন্য ইলেকট্রোএন্সেফালোগ্রাফ্-এর নির্মাণ ইত্যাদি। এককথায়, এইভাবেই গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা, জৈব-পদার্থ-বিজ্ঞান বা Biophysics। এরই পাশাপাশি বিকশিত হয়েছিল কৃষি-প্রজনন-বিদ্যা বা Agricultural Genetics।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বংশগতির তত্ত্ব নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। তবে সাধারাণভাবে জীববিজ্ঞানীরা মেনে নেন যে, বংশগতির মূলে রয়েছে ডি এন্ এ ও আর্ এন্ এ নামক রাসায়নিক পদার্থ এবং এগুলিই ক্রোমোজম ও জিন্-এর উপাদান। কেমন করে এই উপাদানের সাহায্যে পূর্বপুরুষের বংশগতি

৪.৬.১৩.২ ঃ উদ্দেশ্য

কুড়ি শতকে দুই বিশ্বযুদ্ধের আবহে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও সংস্কৃতির রাজনীতিকরণ ঘটেছিল কীভাবে, তা ব্যাখ্যা করাই এই এককটির উদ্দেশ্য।

৪.৬.১৩.৩ ঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন—বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রযুক্তিতে

কুড়ি শতকের বিজ্ঞানের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই চলে আসে পদার্থবিজ্ঞানের কথা। এতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষণ উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে দেখা গিয়েছিল, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই শতকে। প্ল্যাংক'quantum theory' বা শক্তিকণাবাদ হাজির করে শক্তি বিকিরণের প্রচলিত তত্ত্বের খোলনলচে পাল্টে দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই আইনস্টাইন নিয়ে এসেছিলেন তার 'Theory of Relativity' বা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। নিউটনীয় গতিবিদ্যার সংশোধন ছিল অনিবার্য। আইনস্টাইন শক্তি ও বস্তুর আলাদা সত্তা মানেননি, বলেছিলেন যে, বস্তুকে ধ্বংস করে শিক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে, আবার শক্তিও জমাট বেঁধে বস্তুতে পরিণত হয়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব গাণিতিক আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছিল, তার ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ হয়েছিল ১৯৪৫সালে, জাপানের হিরোশিমা-নাগাশাকিতে মার্কিনী অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে এবং ১৯৫২ সালে হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শক্তিকণাবাদের ওপর ভিত্তি করে পরমাণুর গঠন (atomic structure) ব্যাখ্যা করেছিলেন কোপেনহেগেনের নীল্‌স্ বোর (Bohr)। সেই পরমাণুকে ভেঙ্গে, এক মৌলিক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করে বিজ্ঞানের দগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন কেম্ব্রিজের গবেষক রাদারফোর্ড (Rutherford)। বোর বা রাদারফোর্ড কেউই কিন্তু তখন কল্পনাও করতে পারেননি যে, তাদের আবিষ্কারের কতটা রাজনীতিকরণ ঘটতে পারে ভবিষ্যতে এবং যুদ্ধে তার কী বীভৎস প্রয়োগ হতে পারে।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের 'Theory of Relativity' গাণিতিক আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছিল, তার ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে অ্যাটক বোমার বিস্ফারণে এবং ১৯৫২ সালে হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টিতে। পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভুত উন্নতি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতা ও জ্ঞানের দেওয়া নেওয়ার এক চমৎকার পরিবেশ বজায় ছিল। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, সাহিত্যিকরাও অন্ধ জাতীয়তাবাদের মোহে যখন সংকীর্ণতা আচ্ছন্ন, তখনও কেম্ব্রিজের রাদারফোর্ড জার্মানীর হান্স গাইগারের সঙ্গে গবেষণার খবর বিনিময় করেছেন। জার্মানীতে বন্দী করা হয়েছিল ইংরেজ বিজ্ঞানী চ্যাডউইককে (Chadwick)। সঙ্গে সঙ্গে জার্মান অধ্যাপকরা বন্দী শিবিরেই তাঁর জন্য পরীক্ষাগার বানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের পর জার্মানীর গ্যোটিঙেন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র করে তুলেছিলেন তারই (গ্যেটিঙেন্-এর) প্রাক্তন ছাত্ররা, যেমন, ওপেনহাইমার (Oppenheimer), হাইসেনবার্গ (Heisenberg), ডিরাক্ (Dirac), ব্ল্যাকেট (Blackett), ফার্মি (Fermi), গামো (Gamov) এবং পাওলি (Pauli)। এই সমাবেশটিকে ছিল হিটলারের রাজত্ব শুরু হওয়া পর্যন্ত।

কুড়ি শতকের তৃতীয় দশকে নিউটনীয় চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখে পদার্থবিজ্ঞানেও সম্ভাবনা তত্ত্বকে (Probability Theory) মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই সময়েই পারমাণবিক ক্রিয়াবিক্রিয়া নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যার সূত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

Age of Progress : Economic and Social

একক ১৩

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি ও সংস্কৃতি

Industry, Agriculture, Science and Technology and Communication and Information

বিন্যাসক্রম ঃ

একক - ১

৪.৬.১৩.১ ঃ প্রস্তাবনা

৪.৬.১৩.২ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৬.১৩.৩ ঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঃ বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রযুক্তিতে

৪.৬.১৩.৪ ঃ প্রগতির ধরন

৪.৬.১৩.৫ ঃ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও বিশ্বায়ন

৪.৬.১৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৪.৬.১৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৬.১৩.১ ঃ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের শেষদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল, তা দ্রুতগতি লাভ করেছিল কুড়ি শতকের গোড়ায়। প্রযুক্তি চর্চায় বিপ্লব এনে দিয়েছিল ১৮৯৫-এর মোটরগাড়ি নির্মাণ আর ১৯০৩-এর এরোপ্লেন। মানুষের এই প্রযুক্তি-বিজ্ঞান। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর ঔপনিবেশিক শক্তির নির্মাণের স্বার্থে পুঁঝিবাদীরা এই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, আঘাত করেছিল সাধারণ নাগরিক সমাজকে। ফলে শুরু হয়েছিল মানুষের নতুন লড়াই, অধিকার আদায়ের লড়াই। গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ সংস্কৃতি চেতনা, মেয়েদের অধকারের ভাবনাটিও এসেছিল সেই অনুষঙ্গে। বিজ্ঞান থেকে মানবতায় ঐতিহাসিক উত্তরণের একটি ছবিই আঁকা হবে এই এককটিতে।

ইতিহাস কি? ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞাই বা কি? এই সব বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোন একটি একক লেখায় পাওয়া যায় না। কারণ এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে হলে ইতিহাস নিয়ে আরো অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রশ্ন ১। বিশ্বে প্রথম কবে মোটরগাড়ি ও এরোপ্লেন নির্মান করা হয়?

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান

Disintegration of Socialist Block and end of Cold War

একক ১৫

Genesis and Process of Disintegration

বিন্যাসক্রম ঃ

৪.৭.১৫.১ ঃ প্রস্তাবনা

৪.৭.১৫.২ ঃ উদ্দেশ্য

৪.৭.১৫.৩ ঃ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় ঃ সূচনা ও পরিণতি

৪.৭.১৫.৪ ঃ সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের পর্ব ঃ ভাঙ্গনের কারণ

৪.৭.১৫.৫ ঃ গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা

৪.৭.১৫.৬ ঃ গরবাচভের শেষ বছর

৪.৭.১৫.৭ ঃ রুশ ফেডারেশন

৪.৭.১৫.৮ ঃ সোভিয়েত ভাঙ্গন

৪.৭.১৫.৯ ঃ ভাঙনের পর ঃ পূর্ব ইউরোপ

৪.৭.১৫.১০ ঃ চীনা সমাজতন্ত্রের পতন

৪.৭.১৫.১১ ঃ অবক্ষয়ের কারণ

৪.৭.১৫.১২ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব

৪.৭.১৫.১৩ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমালোচনা

৪.৭.১৫.১৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবীল

৪.৭.১৫.১৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৭.১৫.১ ঃ প্রস্তাবনা

আগের পর্যায় গ্রন্থে যে ত্রিমাত্রিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে, যে মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে, তার একটি অন্যতম ধারক ছিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। কুড়ি শতকের শেষে সেই দুনিয়ারই পতন ঘটেছে। সেইসঙ্গে

দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদের পূর্ণশক্তি আর তার প্রশ্রয়ে লালিত ভোগ্যপণ্যবাদ, যার চূড়ান্ত আর্থ-রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছে বিশ্বায়নের মধ্যে। এই পর্যায় গ্রন্থে পর্বন্তরেরই একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

৪.৭.১৫.২ ঃ উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রের পতন ও তার ফলে একমেরু বিশ্বের একমাত্রিক সংস্কৃতি ও রাজনীতির উদ্ভবের সঙ্গে পরিচয় করানোই এই পর্যায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

৪.৭.১৫.৩ ঃ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় ঃ সূচনা ও পরিণতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যবস্থায় পর্বান্তরের সূচনা হয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। এই অবক্ষয় শুরু রুশ বিপ্লবকেই ব্যর্থ করেনি, সামগ্রিকভাবে সমাজতন্ত্রের পতন ডেকে এনেছিল। এর সঙ্গে সোভিয়েতের অভ্যন্তরীণ-রাজনৈতিক পরিবর্ত বা বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে তার টানাপোড়েন, কোন্‌টির সম্পর্ক ছিল বেশি, তা নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। বিতর্কটির সূত্রপাত করেছিলেন চার্লস বেট্‌লহেম এবং সুইজি 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকার পাতায়, ১৯৮৫ সালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যবস্থায় পর্বান্তরের সূচনা হয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের মধে দিয়ে।

চার্লস বেট্‌লহেম সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে, বিপ্লবের আগেও রুশ সম্প্রসারণবাদ বারবার ধাক্কা খেয়েছিল। স্তালিন পরবর্তী রাশিয়া সেভাবেই আবার পর্যুদস্ত হয়েছে। সেই বিপর্যয় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকেও ধ্বংস করেছে। পল সুইজি এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের যেটুকু সামরিক সম্প্রসারণশীলতা দেখা গিয়েছিল, তীর আসল উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর নিরাপত্তা অর্জন, পুঁজির রপ্তানি নয়। সুতরাং সোভিয়েত বিস্তারনীতি ছিল পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিপরীত প্রতিক্রিয়া, প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা নয়। সেই কারণে কোনভাবেই এটা ভাঙ্গনের জন্য দায়ী ছিল না।

কিন্তু চার্লস বেট্‌লহেমের বক্তব্যেরও যেমন অতিসরলীকরণের ঝোঁক আছে, তেমনি পল সুইজির পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতাও কম নয়। প্রুশেভের নিস্তালিনীকরণ (deStalinization) আর ব্রেজনেভের রাষ্ট্রীয় পুঁজির সম্প্রসারণবাদ অবশ্যই সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনভাবেই এই পতন শুরু পশ্চিমী ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় ঘটেনি, পশ্চিমী এবং মার্কিন চাপে বা পশ্চিমী পুঁজিবাদের সাফল্য ঘটেনি। তর্ক-বিতর্ক, তত্ত্ব-প্রতিতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে না ঢুকেও এই ঘটনার সহজবোধ্য একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ১। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাতটি কারা করেছিলেন?

৪.৭.১৫.৪ ঃ সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের পর্ব ঃ ভাঙ্গনের কারণ

সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিত তৈরি করেছিলেন লেনিন ও স্তালিন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কিন্তু শুধু সামন্তশোষণ নির্মুল করার বাইরে এবং আধুনিক অর্থনীতির দেওয়াল গড়া ছাড়া আর বেশি কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, লেনিন-স্তালিনের সামনে কোনো পূর্ব-দৃষ্টান্ত না থাকায় পথিকৃতের স্বাভাবিক দোষের হাত তাঁরা এড়াতে পারেনি। সাফল্য তাঁরা পেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থতার ধাক্কা কী করে রাষ্ট্র সামলাবে, তার ব্যবস্থা করে যাননি তাঁরা। দ্বিতীয়ত, অনবরত পুঁজিবাদের বাইরে থেকে দেওয়া চাপ ও অন্তর্ঘাত তেকে সোভিয়েতকে বাঁচানের জন্য অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ করতে হয়েছিল। সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়েছিল, ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়নি এবং পুঁজিবাদী জৌলুসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সাম্যবাদী কঠোরতায় স্থির থাকা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে, অথচ "communism was essentially an instrument of faith : the present having value as a mensure of reaching an undefined future." তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় স্তরে দলের অতিরিক্ত প্রাধান্য, ব্যক্তি-পুঁজির বদলে রাষ্ট্রীয় পুঁজির উদ্ভব ও তার ওপর দলের আমলা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের ফলে সামন্ত-শোষণের বদলে দলীয় আমলা শোষণের পও প্রস্তুত হয়েছিল এবং বিপ্লব পরবর্তী রুশ প্রজন্ম তা মেনে নিতে রাজি ছিল না। চতুর্থত, বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে রাষ্ট্রর ক্ষমতা কমেনি বরং বেড়েছিল, আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল সামরিক কতৃত্ব ও পুলিশি নজরদারি, যা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল অস্বাভাবিক। এই কারণেই, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের 'লৌহযবনিকা'র কথা বলেছিলেন বা 'বদ্ধ সোভিয়েত কাঠামোর' বিপরীতে 'মুক্ত জগৎ'! (Free Society) গড়ার ডাক দিয়েছিলেন, তখন তা অনেকের কাছেই যুক্তিসংগত মনে হয়েছিল। তাছাড়া ভোগ্যপণ্য বনাম সামাজিক পণ্যের দ্বন্দের সমাধান লেনিন-স্তালিন করে উঠতে পারেননি।

লেনিন ও স্তালিনের হাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিত তৈরী হলেও শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও সামরিক কারণে তা ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়, এবং পরবর্তী শাসক লিওনিদ ব্রেজনেভ এর আমলে প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সম্প্রসারণের সূচনা হলেও শেষে মুদ্রাস্ফীত, উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি কারণে আবার তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এর ওপর এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রের নিষ্পেষক অংশ, অর্থাৎ আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও সেনা, শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেনাবাহিনীর মধ্যে লালফৌজের রীতি ভেঙ্গে র‍্যাঙ্কিংপ্রথা চালু হয়ে যায়, যুদ্ধ ও গুপ্তহত্যার ফলে বেশিরভাগ কট্টর কমিউনিস্ট শহিদ হয়ে যান, সেনা ও আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নজরদারি শিথিল হয় এবং ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত পুঁজিবাদ একটু একটু করে গেড়ে বসতে শুরু করে।

স্তালিন-এর মৃত্যুর পর স্তালিনপন্থী ম্যালেনকভ ও মলোতভকে সরিয়ে ক্ষমতায় নির্বাধে আসেন ক্রুশ্চেভ। তিনি এইসব ত্রুটি দূর করতে পারেননি বা চানওনি, বরং ধামাচাপা দিয়েছিলেন এবং সবকিছুর দায় স্তালিনের ঘাড়ে চাপিয়ে শুরু করেছিলেন নিস্তালিনীকরণ (De-Stalinization)। সোভিয়েতকে তিনি শুধুই একটি জাতীয়তাবাদী দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, আর তার অভ্যন্তরীণ আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যার সামাধান করতে চেয়েছিলেন বাইরে 'উপনিবেশ' স্থাপন করে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদের বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন এইভাবেই।

ক্রুশ্চেভের পর ১৯৬৫ থেকে দু'দশক সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতায় ছিলেন লিওনিদ ব্রেজনেভ। তাঁর আমলই হল প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সম্প্রসারণের যুগ। কিন্তু ভেতরের অর্থনীতিকে না সামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক প্রতিযোগিতায় যাওয়ার অর্থ আর্থিক সংকট ডেকে আনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম সোভিয়েত রাশিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, ইস্পাতের উৎপাদন কমে, তেল-সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে, পুঁজি-শ্রম-প্রযুক্তির অভাবে সাইবেরিয়ার তেলখনি অব্যবহৃত পড়ে থাকে। প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্যের জন্য রাশিয়া ক্রমশ তারই প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, শুধু অস্ত্রশিল্পটি তার টিকে থাকে, আর তা যুদ্ধ-প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

১৯৮৩-৮৪ সালে আন্দ্রোপভ-শার্নেঙ্কোর জমানায় ব্রোজনেভপন্থীরা কিছুটা পিছু হঠায় অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল। শিল্পে অল্প উন্নতি হয়েছিল। আন্দোপভের 'Team Contract' নীতি আর শার্নেঙ্কোর কৃষি-প্রসার ও কৃষি-প্রযুক্তির নীতি কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়েছিল। উৎপন্ন হয়েছিল ১৯০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য। লক্ষ্য থেকে বহু দূরে হলেও ১৯৭৮-এর পর এটা ছিল একটা রেকর্ড। বিদেশনীতির ব্যাপারে এরা মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তবে আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য সরেনি।

১৯৮৫-তে ক্রেমলিনের সর্বোচ্চ পদে আসেন মিকাইল গরবাচভ। তিনি ছিলেন বিপ্লবোত্তর প্রজন্মের মানুষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁর কাছে বাল্যস্মৃতি মাত্র। আন্দ্রোপভ শার্নেঙ্কোর অর্থনীতি যেটুকু আলোর মুখ দেখিয়েছিল, তা ততদিনে আবার মিলিয়ে গেছে, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সমঝোতার নীতি নিতে হয়েছিল গরবাচভকে। তাছাড়া ক্রুশ্চেভের সময় থেকে একটু একটু করে পুঁজিমুখী অন্তকাঠামো তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে ততদিনে বিরোধ বেধেছে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর। ফলে গরবাচভকে ভাবতে হয় রাষ্ট্রনীতির সংস্কারের কথা। এই সংস্কারই ছিল তাঁর গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ট্রৈকা।

প্রশ্ন ১। সোভিয়েত রাষ্ট ভাঙনের কারণগুলি কি ছিল?

৪.৭.১৫.৫ ঃ গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ট্রৈকা

আর্থ-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ট্রৈকা সূত্রায়িত হয়, একথা সত্য। কিন্তু তবুও এর তাত্ত্বিক বিস্তারের প্রয়োজন ছিল। এই জায়গায় গরবাচভ অবশ্যই বুদ্ধিজীবীসুলভ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূলত গ্লসনস্ত-পেরেস্ট্রৈকা ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অপস্রিয়ক ব্যাখ্যা, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের অনাদর্শায়নের (deideologization) প্রয়াস, অথচ গরবাচভ এই কাজটিকে করতে চেয়েছিলেন লেনিনের দর্শনের কালানুক্রমণের (updating) নামে। লেনিনের জীবনের শেষ বছরগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যেই নিজের তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন, এমনটাই গরাবাচভ বলেছিলেন অথচ শেষ পর্যন্ত যে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, তার সঙ্গে না ছিল মার্কসীয় দর্শনের মিল, না তাতে ছিল লেনিনের

রাজনীতির আদল। পুঁজিবাদকে তিনি প্রায় অপরাজেয় বলেই ধরে নিয়েছিলেন, আর সমাজতন্ত্র তার কাছে ছিল এক ব্যর্থ প্রত্যাশা, তাই পশ্চিমের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর মতে, Present day Capitalism differs in many respects from what it was. Contrary to Marx's most fundamental precept, Capitalism is not expected to decline anytime in the near future, nor should socialists necessarily seek to accelerate that decline." প্রাভদা পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে গরবাচভ জানিয়েছিলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার একমাত্র 'universal solution' হিসেবে সমাজতন্ত্র তাঁর কাছে আর বরণীয় নয়, পুঁজিবাদী জগতের সঙ্গে বিরোধিতার সম্পর্ক বজায় রাখার কোনো অর্থও তিনি দেখতে পান না। গরবাচভের কথায়, "Confrontation is not an inborn defect in our relation. It is rather an anomaly. Its continuation is not inevitable at all. গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে বুঝতে গেলে আগে গরবাচভের এই তাত্ত্বিক অবস্তানটি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার।

আর্থ সামাজিক বাধ্যবাধকতা থেকে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা সূত্রায়িত হয়। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে আলাদাভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কেননা দুটো একে অন্যের পরিপুরক এবং দুটোকে নিয়েই গরবাচভের সংস্কার। গ্রাসনস্ত বলতে বোঝায় 'মুক্তমান হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্র' আর পেরেস্ত্রৈকার অর্থ করা হয় 'পরিবর্তন, পুনগঠন ও নবসংস্কার।

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে আলাদা আলাদাভাবে বোঝা সম্ভব নয়, কেননা দুটো একে অন্যের পরিপূরক এবং দুটোকে নিয়েই গরবাচভের সংস্কার। ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাতাশতম অধিবেশনে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। গ্রাসনস্ত বলতে বোঝানো হয় 'মুক্তমনা হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্র'আর পেরেস্ত্রৈকার, অর্থ করা হয় 'পরিবর্তন, পুনগঠন ও নবসংস্কার'।

গ্লসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকার লক্ষ্য ও পদ্ধতি ছিল আরও বেশি গণতন্ত্রীকরণ। সোভিয়েত রাশিয়াকে বলা হয়েছিল 'আইনি রাষ্ট্র এবং স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ' (a law-governed state and a self-governing socialist society.) একটি শ্রেণির একনায়কতন্ত্র থাকবে না, নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং যে-কোনো রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হবার অধিকার স্বীকৃত হবে। দল গঠনের অধিকার দেওয়া হবে, কনিউনিস্ট পার্টি শাসক দল হিসেবে থাকবে কিন্তু কাজ করবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে (it will preserve its status as the ruling party within the framework of a democration process. It will seek to win votes atthe election...the party does not assume full state powers.)

একই সঙ্গে চলবে দল-কাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পুনর্বিবেচিত হবে, দলের মধ্যে বিতর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং সংখ্যালঘুদের মত মানতে বাধ্য করা হবে না। (We should rethink the principle of democratic centralism and no longer treat it in such a way that it can be used to implement barrack-type hierarchical discipline. The CPSU needs genuine democratization in intra-party debates...)

পেরেস্ত্রৈকার মূল কথা ছিল অর্থনৈতিক সংস্কার। বাজার অর্থনীতি (market economy) চালু হবে, প্রতিযোগিতার পরিবেশে রাষ্ট্রক্ষেত্র ও বেসরকারি ক্ষেত্র পাশাপাশি চলবে, আবার নতুন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে

রচিত হবে কেন্দ্রীয় অর্থনৈকি পরিকল্পনা (central management)। অর্থাৎ পেরেস্ত্রৈকা 'Commuand Economy'-সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল।

গরবাচভ ও রুশ নেতৃত্ব গ্রাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকাকে পুঁজির সঙ্গে আপোস বলে মানতে চাননি। গরবাচভের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আগানবেগিয়ান The Challenge : Economics of Perestroika বইটিতে স্বীকারই করেননি যে, বাজার পুঁজিবাদের চিহ্ন এবং বাজার ও কমাণ্ড ইকনামি পরস্পরবিরোধী। তাঁর মতে পুঁজিবাদের আগেও বাজার ছিল, যেমন প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে, এবং সমাজতন্ত্রেও বাজার অপরিহার্য। তবে সমাজতান্ত্রিক বাজারে পণ্যচরিত্র (Commodity Character) ভিন্ন ধরনের হবে। এই চরিত্র-অর্জনই পেরেস্ত্রৈকার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন আগানবেগিয়ান। আর একজন লেখক আনাতোলি বুতেনকো লিখেছেন, সমালোচনা -আত্মসমালোচনার সূত্রে গ্লাসনস্ত এবং উৎপাদনে যুক্তস্বত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে পেরেস্ত্রৈকা সমাজতান্ত্রিক নীতিকেই আরও কার্যকর করে তুলতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে এই কার্যকারিতা দেখা যায়নি। রুশদের মধ্যে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লক্ষণই দেখা গিয়েছিল এবং ১৯৯০-এ স্তানিস্লাভ শাতালিনের 'শাতালিন পরিকল্পনা' গ্রহণ করে গরবাচভ সেই প্রবণতাকে মেনে নিয়েছিলেন। গরবাচভ নিজেই তাঁর বইতে ইউরোপের জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিয়েচিলেন এবং খ্রিস্টধর্মের জয়গান গেয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রকে এইভাবে হেয় করার খুব অল্পদিনের মধ্যে গণতান্ত্রিকতার সুযোগ নিয়ে গরবাচভের নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সাইবেরিয়ার বরিস ইয়েলৎসিন।

প্রশ্ন ১। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা বলতে কি বোঝ?

৪.৭.১৫.৬ ঃ গরবাচভের শেষ বছর

ইয়েলৎসিনের মোকাপিলা করবার জন গরবাচভ প্রথমদিকে কট্টর গোঁড়া সদস্যদের সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন। এরা হলেন উপ-রাষ্ট্রপতি গেন্নাদি ইয়ানায়েভ, প্রধানমন্ত্রী ভালেন্তিন পাভলভ্ এবং বিদেশমন্ত্রী এদুয়ার্দ শেভার্দনাদকে। কিন্তু ১৯৯০-তেই শেভার্দনাদজে-র পদত্যাগ আর লিথুয়ানিয়ার সোভিয়েত বাহিনীর সংঘর্ষ গরবাচভকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তিনি ইয়েলৎসিনের সঙ্গে সমঝোতা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গণভোটের ডাক দেন। ১৯৯১-এর ১৭ই মার্চের গণভোটে ন'টি প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের পক্ষে সায় দেয়, কিন্তু মোলডাভিয়া, জার্জিয়া, কিরঘিজস্তান এবং তিনটি বাল্টিক রাজ্য, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া আর লিথুয়ানিয়া ভোট বয়কট করে ইউনিয়নের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। এপ্রিলের শেষে গরবাচভ ন'টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে 'Treaty of unio' সম্পাদর করে রুশ ফেডারেশন গঠন করেন, যুক্তরাজ্যের প্রধান হিসেবে

*ইয়েলৎসিনের মোকাবিলা করবার জন্য গরবাচভ প্রথমদিকে গোঁড়া সদস্যদের সঙ্গে রাখতে চাইলেও ১৯৯০-এ শেভার্দনাদজের পদত্যাগ আর লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত বাহিনীর সংঘর্ষ গরবাচভকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। ফলে শেষ পর্যন্ত ইয়েলৎসিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ১৯৯১-এ গণভোটের সূত্রে **Treaty of Union** করে রুশ ফেডারেশন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলেন গরবাচভ।*

তাঁর হাতে থাকে অর্থ, সেনা ও বিদেশনীতি। ঐ বছর জুন মাসে সাধারণ নির্বাচনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইয়েলৎসিন। কিন্তু ইতিমধ্যে গণভোট থেকে বিরত থাকা প্রজাতন্ত্রগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

প্রশ্ন ১। Treaty of Union কিভাবে গঠিত হয়?

৪.৭.১৫.৭ ঃ রুশ ফেডারেশন

১৯৯১-এর এপ্রিলে গরবাচভ যে ন'টি প্রজাতন্ত্রকে নিয়ে রুশ ফেডারেশন গড়েছিলেন, তা আসলে ছিল তাঁর এবং তাঁর গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা। জাতিগত বহুজনীনতার মধ্যে যে এতদিন সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘ টিকে ছিল, তার কারণ ছিল সমাজতান্ত্রির রাজনৈতিক সংহতি (political integration by socialism)। গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকা আর উসকোরিনি-র (uskarenie-বিকাশের গতিবৃদ্ধি) ঘোষণা সেই সমহতির গোড়ায় আঘাত হেনেছিল। ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জাতিসমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই সময়েই সমাজতান্ত্রিকতার বাইরে থেকে সংহতি রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন গরবাচভ ফেডারেশনের মাধ্যমে।

১৯৯১ এর এপ্রিল গরবাচভ যে নটি প্রজাতন্ত্রকে নিয়ে রুশ ফেডারেশন গড়ে ছিলেন, তা আসলে ছিল তাঁর এবং তাঁর গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা।

সোভিয়েত দেশের জাতিবৈচিত্র্য ছিল বিস্ময়কর। জার্মান, পোল-গ্রিক এবং কোরীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ২২। ১০৪টি জেলায় তারা ছড়িয়ে ছিল, এই তথ্য ১৯৭৯-র অদমশুমারিতে পাওয়া। স্লাভ সম্প্রদায়ের প্রধান গোষ্ঠী ছিল তিনটি, ১৪.৫২ কোটি রুশ, ৪.৪২ কোটি উক্রেনীয় আর ১ কোটি বেলারুস। এছাড়াও ছিল নানা-জাতি-উপজাতি। ককেশীয় এলাকার জর্জিয়ার সত্তর শতাংশ আদি বাসিন্দা, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্থান, উজবেকিস্তান বা কাজাখস্তানের মুসলিমরা তো ছিলই। সোভিয়েত গণরাজ্যে স্বেচ্ছাভুক্তি বা স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এইসব নানা জাতি-উপজাতিকে আশ্বস্ত করেছিলেন লেনিন, কিন্তু স্তালিনের রুশীকরণ বা স্তালিনাইজেশন প্রক্রিয়া তাদের পছন্দ হয়নি। তবু সমাজতান্ত্রির কাঠামো অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতায় তারা মোহগ্রস্ত ছিল, সেই মোহ কাটতে শুরু করে ক্রুশ্চেভের আমল থেকে, চূড়ান্ত স্বপ্নভঙ্গ হয় গরবাচভের সময়ে। ফলে একদলীয় বাধক রাষ্ট্র তাদের কাছে অসহ্য মনে হয়, গণপ্রতিনিধিসভার (Congress of Peoples Deputies) ক্ষমতা বাড়তে থাকে, উদার গণতান্ত্রীদের অনেক বেশি গ্রহণীয় মনে হতে থাকে, জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন পরিবর্তনপন্থী বরিস ইয়েলৎসিন। এই অবস্থায়, বিশেষত উক্রাইন, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, বেলারুস, মোলডাভয়া এবং জার্জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর, ইয়েলৎসিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ১৯৯১-এ গণভোটের সূত্রে Treaty of Union করে রুশ ফেডারেশন তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন গরবাচভ।

গরবাচভের পতনের পর আর ক্ষমতা ফিরে পাননি, ফলে রুশ ফেডারেশনের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন ইয়েলৎসিন।

৪.৭.১৫.৮ ঃ সোভিয়েতের ভাঙ্গন

কিন্তু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন ঠেকানোর কোনো পথ আর ছিল না। ১৯৯১-এর আগস্টে, প্রচণ্ড

অর্থসংকটের মধ্যে, গরবাচভ যখন ছুটি কাটাতে ক্রিমিয়ায়, মস্কোয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাশিয়ার ক্ষমতা কেড়েনেয় গরবাচভ-বিরোধী গোষ্ঠী, তা তুলে দেওয়া হয় ইয়ানায়েভের হাতে। ইয়েলৎসিন ইয়ানায়েভের বিরোধিতা করেন, অভ্যুত্থানের নিন্দা করেন এবং গরবাচভের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষার কথা বলেন। কিন্তু গরবাচভ আর ক্ষমতা ফিরে পাননি, রুশ ফেডারেশনের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন ইয়েলৎসিন। ২৪ অগস্ট গরবাচভ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানের পদ ত্যাগ করেন। বাল্টিক রাজ্যগুলোর মতো উক্রাইন (ইউক্রেন), বেলারুস স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এরপর অন্য সব প্রজাতন্ত্রই একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। ১৯৯১-এর একেবাসে শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন ইয়েলৎসিন। কাজাখস্তানের রাজধানী আলমা আটায় Commonwealth of Independent States প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়। এতে যোগ দেয় বারোটি সাবেক সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য ঃ রাশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুস, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্থান, মোলডাভিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উক্রাইন এবং উজবেকিস্তান। তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাতভিয়া এর বাইরে থেকে যায়। প্রাক-বিপ্লব রুশ পতাকা উড়তে থাকে ক্রেমলিনের সদর দপ্তর। শুধু পূর্বতন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো নয়, খোদ রাশিয়াও অর্থের জন্য হাত পাতে জার্মানির কাছে, আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিলের (IMF) কাছে। এক বিরক্ত রুশ বুদ্ধিজীবী মন্তব্য করেন 'as long as we pretend that we are carrying through reforms, the West will pretend to help us.'

প্রশ্ন

১। গরবাচভ কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত হন?

৪.৭.১৫.৯ ঃ ভাঙ্গনের পর ঃ পূর্ব ইউরোপ

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাখ্যান আর পূর্ব জার্মানিতে কমিউনিস্ট কর্তৃত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির দ্বিতীয় ঐক্যায়ন— এসবই প্রায়-সমান্তরাল ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই একে সোভিয়েতের ভাঙ্গনের প্রভাব বা ফল হিসেবে দেখানোর একটা ঝোঁক অনেকের আছে। কিন্তু ব্যাপারটা এতটা সরলরৈখিক নয়। পূর্ব-ইউরোপের পরিবর্তন ছিল একটি বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক পালাবদলের ফল, সোভিয়েত রাশিয়া নিজেও সেই ফলই ভুগেছিল।

সোভিয়েতের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তন ছিল একটি বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক পালাবদলের ফল, সোভিয়েত রাশিয়া নিজেও সেই ফলই ভুগেছিল। পাশাপাশি পচন ধরেছিল চীন সমাজতন্ত্রেও।

স্তালিনের আমলে পূর্ব ইউরোপের যে সোভিয়েতীকরণ হয়েছিল, তার কার্যকর সূত্র তিনটি। এক, সোভিয়েতের তরফে পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য। দুই, ঐ সব রাজ্যের সরকারি কাঠামোয় সোভিয়েত অনুগত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য অর্জন এবং তিন ওয়ারশ চুক্তি। এমন নয় যে, কমিউনিসচ আদর্শের কোনো শক্ত বাস্তব ভিত্তি এখানে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং যতদিন সোভিয়েতের অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল, ততদিন পূর্ব ইউরোপ ছিল সোভিয়েতমুখী। এই রুশমুখীনতায় ভাটা পড়েছিল সোভিয়েতের ভাঙ্গনের অনেক আগে থেকেই। সোভিয়েতের ভাঙ্গনের পর তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়।

ক্রাসেচভের নিস্তালিনীকরণ আর ব্রেজনেভের সম্প্রসারণের সময় থেকেই খোদ রাশিয়াতে যেমন একটু একটু করে সমাজতন্ত্রে ধস নামছিল, তেমনি পূর্ব ইউরোপেও জারি হয়েছিল প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়া। ১৯৮০-র দশকে রাশিয়া নিজেই অর্থসংকটে জর্জরিত ছিল। তার কাছে পূর্ব ইউরোপের আর কিছু পাওয়ার ছিল না। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সহযোগিতাই তখন ছিল একমাত্র বাস্তব বিকল্প। ফলে মার্কিন মদতপুষ্ট পশ্চিমী সংস্থাগুলো তেকে কোটি কোটি ডলার ধরা করেছিল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো। এরপরে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা আশা করা কঠিন।

প্রশ্ন ১। সোভিয়েতের ভাঙনের পর পূর্ব ইউরোপে কী প্রভাব পড়েছিল?

৪.৭.১৫.১০ ঃ চীনা সমাজতন্ত্রের পতন

পতন যে শুধু সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের হয়েছিল, তা নয়। পচন ধরেছিল চীনা সমাজতন্তেও। এটা ঠিক যে, ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাও-তুং-এর নেতৃত্বাধীন চীন প্রায় দু-দশক পর্যন্ত নির্দিষ্ট মার্কসবাদী পথেই স্থির ছিল। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে চীনের সমাজতন্ত্রেও কয়েকটি জাটিল সমস্যা দেখা দেয়, যার ফলে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অবক্ষয় শুরু হয়। কিন্তু এই অবক্ষয়ের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পার্থক্য ছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নানা সমস্যা সত্ত্বেও তুলনায় বেশিদিন টিকে ছিল। কিন্তু চীনা সমাজতন্ত্রের কার্যকাল ততদিন ছিল না। সে চীন ১৯৫৫-৫৬ সালের নিস্তালিনীকরণকে তীব্র ভাষায় আক্তমণ করেছিল এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী আখ্যা দিয়েছিল, সেই চীন নিজেই এক দশকের মধ্যে তার পথ পরিবর্তন করেছিল। তবে সোভিয়েতরাষ্ট্র যেমন প্রকাশ্যে পুঁজিবাদী পথ ধরে ভাঙনের পথে এগিয়ে গিয়েছিল এবং তার প্রভাব পড়েছিল ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির উপর, চীনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃত।

তবে বাহ্যত যতই সমাজতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন, চীনা সমাজতন্ত্রেও যে পতন ঘটেছে তা এখন একটা সম্পূর্ণ স্বীকৃত ঘটনা। মাও-সে-তুং-এর পরবর্তী সময়ে দেং জিয়াও পিং-এর সংস্কারের হাতে ধরেই যে চীনা সমাজতন্ত্রের পতনের শুরু তা নয়, মাও-সে-তুং-এর বেঁচে থাকার সময়েই-এর সূচনা হয়েছিল এবং তার গতিরোধ করা মাও-সে-তুং-এর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সুতরাং সমাজতন্ত্রের পথ থেকে চীনের বিচ্যুতির একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন পররাষ্ট্রীয় প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, চীনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পররাষ্ট্রীয় প্রভাব তত গুরুত্ব পূর্ণ ছিল না। বরং বলা যেতে পারে চীনা কমিউনিস্ট পাটির অর্ন্তদ্বন্দ্ব এই সমাজতান্ত্রিক বিচ্যুতির জন্য প্রধানত দায়ী ছিল।

৪.৭.১৫.১১ ঃ অবক্ষয়ের কারণ

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯৫২ সালের মধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনের ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ করে সামন্ত কাঠামোর অবসান ঘটাতে পেরেছিল। মাও-সে-তুং ১৯৬০ সালের মধ্যে শিল্প এবং কৃষিতে তাঁর "Great Leap forward" আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ করতে পেরেছিলেন, সমবায় ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল, গণকমিউনিস্ট এবং গণ ফৌজ নির্মাঁ শেষ হয়েছিল এবং যে চীন ইস্পাত ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেই চীন শিল্পে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অনেক দুর এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও মাও-সে-তুং সমাজতন্ত্রকে নিরাপদ জায়গায় পৌ্ছে দিতে পারেননি।

মাও-সে-তুং -এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ভূমি-সংস্কার ও শিল্পকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেও তারা সমাজতন্ত্রকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারেনি।

এর জন্য প্রধানত দায়ী ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর আর্বিভাব। একটি লিও-শাও-চির পথ বদল করা দক্ষিণ পন্থী গোষ্ঠী, এবং আর একটি হল লিন পিয়াও এর বামপন্থী সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। প্রথম গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল পুঁজি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন কার। এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লক্ষ ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের ব্যবহার। মাও-সে-তুংকে ১৯৬০-এর দশক থেকেই এই দুই গোষ্ঠীর সমাজতান্ত্রিক বিচ্যুতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হননি।

৪.৭.১৫.১২ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব

১৯৬০-এর দশকে মাও-সে-তুং সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল ''অব্যাহত বিপ্লবের তত্ত্ব''। মাও-সে-তুং-এর মনে হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক সংস্কারের সূত্রে যে গোষ্ঠীটি নেতৃত্বে অভিষিক্ত হয়েছিল— সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই শোষক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখা দেওয়া সম্ভবনয়, সুতরাং এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্যেই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখা দরকার। অব্যাহত বিপ্লব বলতে মাও-সে-তুং এই প্রক্রিয়াটিকেই বুঝিয়েছিলেন। তিনি যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল চারটি। প্রথমতঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণবিরোধী দিকগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করা। দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদী প্রবমতার পুনরাবির্ভাবকে ঠেকানো। তৃতীয়তঃ সমাজের নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং চতুর্থতঃ বামপন্থী সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সংকীর্ণতাকে ধ্বংস করা। কিন্তু যে যুবগোষ্ঠীর সাহায্যে মাও-সে-তুং এই সব কাজ সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, সেই যুবগোষ্ঠীই ক্রমশঃ নৈরাজ্যবাদী হয়ে ওঠায় মাও-সে-তুং আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রম হারিয়ে ফেলেন এবং তার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে রাশিয়ার মতো চীনেও সংশোধনবাদী এবং মাও বিরোধী নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চীনা সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয়।

প্রশ্ন

১। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মাও-সে-তুং-এর প্রধান লক্ষ্য কি ছিল?

৪.৭.১৫.১৩ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমালোচনা

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কুফলের সুযোগে মাও পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব মাও-সে-তুংকে ক্ষমতাহীন করে দেয়, এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দশ বছরকে ''বিপর্যয়কর দশক'' হিসেবে চিহ্নিত করে। মাও পরবর্তী নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক নীতির ব্যাখ্যা পরিবর্তন করেন। লেনিন একসময় বলেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও পুঁজিবাদী প্রবণতা থাকে এবং সেই কারণে বিপ্লবের পরেও পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। কিন্তু মাও পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব ঘোষণা করেন যে, লেনিনেল এই বক্তব্য প্রস্তুত হয়েছিল রুশ বিপ্লবেরও আগে। সুতরাং বিপ্লব পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই বক্তব্য আর প্রযোজ্য নয়। পরবর্তী চীনা নেতৃত্বের মতে, বিপ্লব পরবর্তী চীনে পুঁজিবাদী প্রবণতা থাকলেও পুঁজিবাদের সঙ্গে দ্বন্দই সমাজের প্রধান দ্বন্ধ নয়। কেননা বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনে শ্রেণি হিসেবে শোষকদের অবলুপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে নিস্তালিনীকরণের মতো কোন তত্ত্ব হাজির না করলেও চীনা নেতৃত্ব আসেল প্রকারান্তরে রাশিয়ার মতোই সমাজতান্ত্রিক পথ পরিবর্তন করতে শুরু করে। রুশ নিস্তালিনীকরণের আন্তর্জাতিক প্রভাব সম্পর্কে চীনা নেতৃস্ব অত্যন্ত সচেতন ছিল। সেই কারণে তত্ত্বগতভাবে মাও-সে-তুংকে অগ্রাহ্য করেনি। কিন্তু বাস্তব নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৭০-এর দশকেই মাও-সে-তুং-এর নীতিকে তারা অকার্যকর করে দিয়েছিল।

পরবর্তী চীনা নেতৃত্বের মতে, বিপ্লব পরবর্তী চীনে পুঁজিবাদী প্রবণতা থাকলেও পুঁজিবাদের সঙ্গে দ্বন্দেই সমাজের প্রধান দ্বন্দ ছিল না। অর্থাৎ প্রকাশ্য নিস্তালিনীকরণের মতো কোন তত্ত্ব হাজির না করলেও চীনা নেতৃত্ব আসলে প্রকারান্তরে রাশিয়ার মতোই সমাজতান্ত্রিক পথ পরিবর্তন করতে শুরু করে।

মাও-সে-তুং এর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়ির ফলে চীনা সমাজের বেশ কয়েকটি শ্রেণীর কাছে মাও-সে-তুং তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। তারই সুযোগ গ্রহণ করেছিল মাও বিরোধী চীনা নেতৃত্ব। ১৯৭৭ সালে একাদশতম চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যে দেং জিয়াও পিংকে একসময়ে মাও-সে-তুং তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য করেছিলেন, সেই দেং পিং-নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৭৯-১৯৮০ সালে নেতৃত্বে ফিরে এসে লিও শাও চি এ বছরেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পুনমূল্যায়নের দাবী তোলেন। ১৯৮১ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে একটি বুল এবং বিপদগামী আন্দোলন বলে সমালোচনা করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৫শে জানুয়ারি বেইজিং রিভু পত্রিকায় মাও-সে-তুং এর 'ইয়েনান' তত্ত্বকে খারিজ করা হয়। মাও-সে-তুং এই তত্ত্বে বলেছিলেন যে, বিপ্লবের পরেও মানুষের সামাজির শ্রেণিচরিত্র সম্পূর্ণ বদলায় না। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লএবর পরেও শ্রেণিচরিত্র অব্যহত থাকে। কিন্তু মাও পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব মাও-সে-তুং-এর এই বক্তব্যকে বর্জন করেন এবং শ্রেণিদ্বন্দকে প্রধান দ্বন্দ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে চীনে আবার সামন্ত ও পুঁজিবাদী প্রবণতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

মাও-সে-তুং- এর ঘনিষ্ঠ অনুগামী কমিউনিস্ট নেতা চৌ-এন-লাই-এর করা একটি সমীক্ষা থেকে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে চীনের শহরাঞ্চলে কয়েকটি মাত্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে প্রায় এক কোটি টাকা সুদ জমেছিল। এবং ঐ সময়ে চীনের গ্রামাঞ্চলে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য পুরানো অর্থনাতির সমস্ত জমিদার অথবা সামন্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উত্তরসূরিদের

হাতেই সঞ্চিত হয়েছিল এই অর্থ। এছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন ক্ষমতাশালী নেতা এবং গণ-কমিউনের নিয়ন্ত্রকদের মধ্যেও পুঁজিবাদী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল বলে চৌ-এন লাই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু মাও পরবর্তী নেতৃত্ব এই প্রবণতাগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। এবং মাও এর বিরোধী তাত্ত্বিকদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনে এমন ধরনের সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ক্রমশ দুর্বল করে দিয়েছিল।

প্রশ্ন ১। চীনের পুঁজিবাদী প্রবণতার সঙ্গে রাশিয়া বা পশ্চিমের পুঁজিবাদী প্রবণতার পার্থক্য কি ছিল?

অবশ্য চীনের এই পুঁজিবাদী প্রবণতার সঙ্গে রাশিয়া বা পশ্চিমের পুঁজিবাদী প্রবণতার পার্থক্য ছিল। ১৯৭০-এর দশকে চীনের অর্থনীতিকে উৎপাদনমুখী করে তোলার তাগিদে যেসব অর্থনৈতিক সংস্কার করা হয়েছিল সেগুলি গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকার সঙ্গে তুলনায় নয়, চীনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বজায় রেখেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম পর্বে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল চারটি ক্ষেত্রকে। যেমন, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে। সেইকারণে সংস্কার কর্মসূচীকে বলা হয়েছিল 'চুতমুখী আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা'। পরবর্তকালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এই সংস্কার কর্মসূচীর নামকরণ করা হয় 'সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ'। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্‌রা এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই মাও পরবর্তী চীন সম্পর্কে 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' বিশেষণটি প্রয়োগ 'করেছেন। চীনে এই সময়ে গণ কমিউনগুলির পরিবর্তে ব্যক্তি পরিবারকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের সর্বব্যাপিতা স্বীকার করেও কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

উইলিয়াম হিন্টন চীনের উৎপাদনমুখী এই সমস্কার কর্মসূচীতে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি বিশেষ রূপরেখা দেখতে পেয়েছেন। তবে একই সঙ্গে মনে রাকা প্রয়োজন যে রাশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় যে, বাজার অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়া মানেই পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষ নয় এবং তা সত্ত্বেও যেমন রাশিয়াতে পুঁজিবাদী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তেমনি চীনেই ক্ষেত্রেও বাজারের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের প্রভাব অনিবার্য। অবশ্য উনিশ শতকের এবং কুলি শতকের পশ্চিমী পুঁজিবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সমাজতন্ত্রের আঙ্গিক যেমন পরিবর্তিত হতে পারে, পুঁজিবাদের ধরণও তেমন অবস্থান ভেদে ভিন্ন রকমের হতে পারে। তাই যেভাবেই দেখানো হোক না কেন চীনে মাও পরবর্তাকালের সংস্কার যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে পুঁজিবাদী কাঠামোকে নিশ্চিত করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কুড়ি শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এশিয়ার রাজনীতিতে চীনা পুঁজির অনুপ্রবেশের জন্য চীন সরকারের তৎপরতা থেকেই তা স্পষ্ট।

৪.৭.১৫.১৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

অলক কুমার ঘোষ ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব, ১৮৭০-২০০৬

Eric Hobsbawm : The Age of Extremes

Archie Brown : The Gorbachev Factor

F.L. Allen : The Big Change

A.K. Ghosh : Globalization

৪.৭.১৫.১৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছিল কেন? পূর্ব ইউরোপে এর কী প্রভাব পড়েছিল?

২। চীনের 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা'র পরিণতি কী হয়েছিল?

৩। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪। রুশ ফেডারেশন কীভাবে গড়ে উঠেছিল? এর দুর্বলতা কোথায় ছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান
Disintegration of Socialist Block and end of Cold War

একক -১৬

Socialism in Decline, Globalization and its Economic and Political Impact

বিন্যাস ক্রম ঃ

৪.৭.১৬.১ ঃ এক মেরু পৃথিবী

৪.৭.১৬.২ ঃ বিশ্বায়ন

৪.৭.১৬.৩ ঃ বিশ্বায়নের প্রস্তুতি ও পরিণতি

৪.৭.১৬.৪ ঃ বিশ্বায়ন ও সমাজ-সংস্কৃতি

৪.৭.১৬.৫ ঃ সারসংক্ষেপ

৪.৭.১৬.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৭.১৬.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.৭.১৬.১ ঃ এক মেরু পৃথিবী

একদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আর অন্যদিকে চীনা রাষ্ট্রকাঠামো, এই দুইয়ের অবক্ষয় মার্কিন রাষ্ট্রের সামনে একক আধিপত্যের পথ খুলে দেয়। ফলে তৈরি হয় একমেরু বিশ্বব্যবস্থার সম্ভাবনা।

১৯৯১-এর জানুয়ারিতে মার্কিন হোয়াইট হাউস নয়া আন্তঃরাষ্ট্রব্যবস্থাব (New International Order) যে ছবি আঁকে, তা প্রথম ধাক্কাতেই আন্তর্জাতিক সমঝোতার সব সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। মার্কিন মুখপাত্রের কথায়, এই নতুন ব্যবস্থায় কোনো বোঝাপড়া নয়, স্বত্বক্ষমতাকামী ছোট কিম্বা বড় অথচ দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর নজরদারিই হবে মার্কিন নীতির মূল লক্ষ্য। এরপর রাষ্ট্রসংঘের সক্রিয়তায় কোনো প্রশ্নই আর ছিল না। বাঁধা গণ্ডির মধ্যে থেকে মার্কিন সিদ্ধান্তের বৈধতা নির্মানই যে তার একমাত্র কাজ, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় 'কুয়েত হন্তা' ইরাকের শাস্তিদান যজ্ঞে মার্কিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশের মধ্যে। সুতরাং বাকি থাকে শুধু এমেরুক্কের সম্ভাবনাটি।

একদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আর অন্যদিকে চীনা রাষ্ট্রকাঠামো, এই দুইয়ের অবক্ষয় মার্কিন রাষ্ট্রের সমান একক আধিপত্যের পথ খুলে দেয়। এর ফলে তৈরী হয় এক মেরু বিশ্বব্যবস্থায় সম্ভাবনা। কিন্তু সত্যি সত্যিই আমেরিকা স্বনিয়ন্ত্রিত একমেরু বিশ্ব গড়ে তুলতে পেরেছিল কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

সত্যি সত্যিই আমেরিকা স্বনিয়ন্ত্রিত একমেরু বিশ্ব গড়ে তুলতে পেরেছিল কিনা, এই বিতর্কে অবশ্য দুটো মত আছে। একদল পণ্ডিত মার্কিন একমেরুকরণকে স্বীকার করেন না। 'ক্ষমতা' ও 'আধিপত্য' তাদের কাছে দুটো বহুমাত্রিক শব্দ। শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না। কুড়ি শতকের শেষ দুই শতকের হিসেবে, আমেরিকা হল পৃথিবীর বৃহত্তম ঋণী রাষ্ট্র, তার বাজেট ঘাটতি আর বাণিজ্যিক সংকট তখন ভয়াবহ। বিল ক্লিন্টন ও জুনিয়র জর্জ বুশের জমানায় অবস্থার সামান্য গতিকফের ঘটলেও অর্থনীতিতে মার্কিনিরা জার্মান বা জাপানিদের থেকে অনেক পিছিয়ে, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর তুলনায় আমেরিকা অনেক দুর্বল। এমনকি চীনও তখন প্রায় তাকে ছাপিয়ে যায়। মার্কিন অর্থনীতিবিদ ফ্রেড বার্জস্টান (Fred Bergsten)-এর কথায়, তখন আমেরিকা "caught in a scissors movement between increasing dependence on external economic forces and a shrinking capacity to influence the factors."

বার্জস্টানের মন্তব্য অবহেলা করবার মতো নয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization) সভায় কৃষিপণ্যের ভর্তুকির প্রশ্নে তীব্র ইঙ্গ-মার্কিন বিবাদ মার্কিন একাধিপত্যের ধারণাকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করে। ভারতের মতো গরিব দেশও সম্প্রতি ওই প্রশ্নে মার্কিনিদের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। জাপান তার বাজার সবরকমের মার্কিন পণ্যের জন্য খুলে দেয়নি। চীনকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিন দ্বিধার উত্তরে চীনও তাকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। অনেকে একে বলেন অর্থনৈতিক যুদ্ধ (economic warfare).

এই যে মার্কিন রাষ্ট্রের দিকেও চোখ পাকানোর ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্র রাখে, এটাই তো একমেরুকরণের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেদেয়। 'Pentagon capitalism' এর অন্যতম ব্যক্তিত্ব হেনরি কিসিঞ্জারের মনেও এই প্রশ্ন ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "Peace requires hegemony or balance of power. We have neither the reaources nor the strength for the former." স্বাভাবিকভাবেই অনেকে দুই মেরুর অবসানের পর বহুমেরুত্বের উদ্ভবের ওপর জোর দেন। একদিকে সংযুক্ত জার্মানিকে নিয়ে ইউরো-মুদ্রার ইউরোপ, আর অন্যদিকে চীন-জাপানের প্রাচ্য-কর্তৃত্ব, এগুলোই বহুমেরুত্বের ভিত্তি বলে তাঁরা মনে করেন।

কিন্তু তবুও একমেরু রাষ্ট্রেব্যবস্থার পক্ষে একটা বড় যুক্তি থেকে যায়। সেটা হল সামরিক দৃষ্টিকোণের যুক্তি। অর্থনৈতিক দিক থেকে জার্মানি বা ইউরোপ এগিয়ে থাকলেও, মার্কিন সামরিক ক্ষমতার ধারে কাছে তারা আসতে পারে না, আসতে চেষ্টাও করে না। ভিয়েতনামের প্রসঙ্গ বাদ দিলে দাঁতাতের পর গোটা বিশ্বে একটানা সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার সাফল্য একমাত্র আমেরিকার, আর কারো নায়। বছরে গড়ে প্রায় ৩৭০০ কোটি ডলার মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৩.১ শতাংশ মার্কিনিরা সামরিক খাতে খরচ করে। পৃথিবীর সব গোলমেলে জায়গাতেই তাদের সেনা-ঘাঁটি। তার ওপর আমেরিকার উন্নত শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি, গোয়েন্দা বাহিনীর সর্বগামিতা, মেধাসম্পদ আকর্ষণের ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বড়ো অংশীদারত্ব। সমাজতন্ত্রচ্যুত রুশ নেতৃত্ব এখন মার্কিনদের কথাতেই চলে, জি-৭ রাষ্ট্রজোটে ঢোকার জন্য তার মার্কিন -খোসামোদের অন্ত ছিল না, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো তো ন্যাটোর সদস্য হতে পেরে কৃতার্থ বোধ করে।

সুতরাং, গ্রামশ্চি যাকে 'hegemony' বলেছেন, তা না থাকলেও, গোটা বিশ্বেই যে মার্কিন সুপার পাওয়ার-এর প্রতিষ্ঠা আছে, তা না মেনে উপায় নেই। সেদিন থেকে দ্যাঁতাতের পরের পৃথিবীতে একমেরুকরণ হয়েছিল, একথা নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে উঠে আসে আর একটি প্রশ্ন। তা হল, বহুমেরুত্বই যদি বিশ্বব্যবস্থায় না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রসংঘের মতো একটি বহুজাতিক সংগঠনের কার্যকরতা করটা থাকতে পারে বা থাকবে।

প্রশ্ন ১। একমেরু বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিতর্ক দুটি কি?

৪.৭.১৬.২ ঃ বিশ্বায়ন

মার্কিন একমেরুত্ব গড়ে উঠেছিল সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ওপর। কিন্তু কুড়ি শতকের শেষে একটি অর্থনৈতিক ভোগ্যপণ্যবাদী একমেরুত্বেরও আভির্ভাব ঘটেছিল। এর পোশাকী নাম দেওয়া হয়েছিল Globalization বা বিশ্বায়ন। ব্যাখ্যা করে একে বলা যায় 'Economic Integration of the World'.

প্রশ্ন ১। কিভাবে বিশ্বায়ন গড়ে উঠেছিল?

৪.৭.১৬.৩ ঃ বিশ্বায়নের প্রস্তুতি ও পরিণতি

একদিকে হঠাৎ এই বিশ্বায়নের প্রসঙ্গে আসেনি। একদিকে হায়েক তাঁর *The Road to Serfdom* বইতে যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন সর্বশক্তিমান অর্থনৈতিক সমাজের কথা বলেছিলেন, তার নমনীয়তা, অন্যদিকে পল সুইজি যে *বিপ্লবোত্তর সমাজ*-এর ছবি এঁকেছিলেন, তার নমনীয়তা, আর তৃতীয় পক্ষে নোময় চমস্কি *Deterring Democracy* বইতে যে সমাজতান্ত্রিক সমঝোতার কথা ভেবেছিলেন তার বাস্তবতা—এই তিন-এর পারস্পরিক লেনদেনই সম্ভবত বিশ্বায়নের ধারণাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছে। ১৯৬০-৮০-র দশক ছিল Convergence Theory বা 'বৈপরীত্যের মিলন' তত্ত্বের যুগ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলো তখন মিশ্র অর্থনীতি, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্ব আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পথে হেঁটেছে। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নজর রাখতে শুরু করেছে বাজার অর্থনীতির দিকে। *End of Ideology*-র লেখক ড্যানিয়েল বেল যে দুই বিরোধী শিবিরের নিঃশব্দ বোঝাপড়ার আভাস দিয়েছিলেন, তাই হয়তো ঘটেছে

*কুড়ি শতকের শেষে অর্থনৈতিক ভোগ্যপণ্যবাহী এক মেরুত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পোশাকী নাম দেওয়া হয়েছিল **Globalization** বা বিশ্বায়ন।*

তখন। দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ কার্ল ও মিনস-এর সমীক্ষার ভিত্তিতে বার্নহ্যাম তখন 'ম্যানেজেরিয়াল তত্ত্ব'-এর দিকে ঝুঁকেছিলেন। জাতীয় কোম্পানিগুলো 'ম্যানেজেরিয়াল এফিসিয়েন্সি'র ওপর ভর করে পুঁজির ঘনত্ব বাড়াবে, একই ভঙ্গিতে তা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরেই ঘটবে, এই ছিল পরিকল্পনা। 'ম্যানেজেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট'-এর অন্যতম হাতিয়ার হবে টেকনোক্রাটরা, যাদের গলব্রেথ বলেছিলেন 'Countervailing Power'। টেকনোক্র্যাটদের ভোগ্যপণ্যপ্রযুক্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণার ওপর ভর করে যখন জাতীয় সীমানা ভেঙে বহুজাতিকতায় অভিষিক্ত হয়, তখন ঘটে পুঁজির বিশ্বায়ন। ঘটে পুঁজির একরূপীকরণ। ইতিহাসের যে সমাপ্তির কথা ফুকুয়ামা বলেছিলেন, সম্ভবত সেই সমাপ্তিকে তিনি বিশ্বায়িত ভোগ্যপণ্য—সংস্কৃতির একরূপত্বের কাছে বহুমুখী অর্থনীতির নতিস্বীকারের সমার্থক বলে ভেবেছিলেন।

৪.৭.১৬.৪ ঃ বিশ্বায়ন ও সমাজ-সংস্কৃতি

কিন্তু শুধু বাণিজ্যের এর শেষ নয়। নিয়ন্ত্রিত জগতের সংস্কৃতির ওপরেও বিশ্বায়নের প্রভাব গভীর। একধরণীকরণ (uniformity), আত্তীকরণ (appropriation) আর বিনির্মাণ (deconstruction)—এই তিন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সেই প্রভাবটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একধরনীকরণের দিকচিহ্ন দুটি। একদিকে বাজার-দেশের (market country) লোকসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে একরকমের সমাজ মানসিকতা তৈরি করা হয়, যাতে দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একই ধরনের পণ্যের চাহিদা, তাতে সুবিধে হয় পণ্য উৎপাদক দেশের বা বহুজাতিক কোম্পানির। অন্যদিকে ধনতন্ত্রমুখী সাংস্কৃতিক স্রোতটা বয়ে চলে পশ্চিম থেকে পুবে, পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বা উন্নত জগৎ থেকে অনুন্নত বিকাশমান জগতে। গ্রহণের প্রান্তে পড়ে থাকে যে সমাজ সে সমাজ সহজেই এটা মেনে নেয়, কেননা, পণ্যভিত্তিক আধুনিকতার মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আধুনিকতার পণ্যরূপটির শেকড় অবশ্যই পশ্চিমী সংস্কৃতিতে, অনেকটা সেই কারণেও এই একধরনীকরণ, যাকে প্রচার করা হয় 'হোমোজেনাইজেশন' (homogenization) বলে।

তবে কিছু কিছু সামাজিক প্রবণতা থেকে যায়, যেগুলোকে এই একধরনীকরণ প্রক্রিয়ার ভেতরে আনা যায় না। বিশ্বায়নের উৎপাদন ব্যবস্থা সেই প্রবণতাকেও নিজের সঙ্গে জুড়ে নেয়। এইভাবেই বহুজাতিক উৎপাদক সংস্থাগুলো ভারতে আয়ুর্বেদকে ব্যবহার করে, কিংবা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগশাস্ত্রকে আধুনিক পণ্যের মোড়কে বিক্রি করে। এমনকি যে হিন্দুত্বের স্লোগান ভারতে একসময়ের দাঙ্গার কারণ হয়ে উঠেছিল, সেই হিন্দুত্বকেই পণ্য করে পুঁজি বাড়িয়ে নেয় বিশ্বায়িত চলচ্চিত্রশিল্প। বিশ্বায়নের ব্যাকরণে একেই বলে আত্তীকরণ।

বিশ্বায়নের তৃতীয় প্রভাবটিই সবচাইতে বেশি ধ্বংসাত্মক। যে সমাজ-এর লক্ষ্য, সেই সমাজের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ থেকেই এই ধ্বংসের শুরু। সামাজিক মূল্যবোধের স্থায়িত্ব বিশ্বায়ন সহ্য করে না, কেননা সেই মূল্যবোধ

একরূপী পণ্যকাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না। হিংস্রতা, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, অপহরণ, প্রেমহীন যৌনতা সবই বিশ্বায়নের পণ্য, তাই সে এমন মূল্যবোধের পক্ষে সাওয়াল করে যে মূল্যবোধে এগুলো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণাও বিশ্বায়নের ফলে বদলে যায়। আগে যে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর পরিবার দাঁড়িয়েছিল সেটা এর আগেই পারিবারিক শ্রম ও শ্রমবিভাজনের বদলের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধনতন্ত্রায়ন তার কাঠামোটিকে পুরো ভাঙতে পারেনি। সেই ভাঙনকেই সম্পূর্ণ করে বিশ্বায়ন। গড়ে তোলে পণ্যভোগী অচেতন কিংবা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিসত্ত্বা।

প্রশ্ন ১। সমাজ-সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের কি প্রভাব পড়েছিল?

বিশ্বায়ন যেমন পুঁজির সীমান্তহীন অবাধ চলাচলে চূড়ান্ত নমনীয়তা চায়, তেমনি দাবি করে জাতিরাষ্ট্রের সমঝোতার মানসিকতা, কূটনৈতিক কাঠামোর নম্রতা এবং সুশীল সমাজের (Civil Society) সৌজন্য-স্বীকৃতি। যেহেতু সুশীল সমাজের মানসিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্মতির প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে, তাই বিশ্বায়ন সেই সমাজের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধেরও নমনীয়তা চায়, সেই নমনীয়তা তৈরিও করে নেওয়া হয় সর্বত্রগামী গণমাধ্যমের (Media) সাহায্যে।

৪.৭.১৬.৫ ঃ সারসংক্ষেপ

আর্থ-রাজনৈতিক নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে কুড়ি শতকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ঘটেছিল। সেই সঙ্গে সম্ভাবিত হয়েছিল মার্কিন পুলিশরাজ এবং পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন। সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে অনুভূত হয়েছিল এর প্রভাব। কুড়ি শতকের গোড়ায় পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের যে দ্বান্দ্বিক বৈচিত্র্য ইতিহাসকে উত্তেজনাময় করে তুলেছিল, কুড়ি শতকের শেষে তার আর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

৪.৭.১৬.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। অলক কুমার ঘোষ ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব, ১৮৭০-২০০৬

২। Eric Hobsbawm : The Age of Extremes

৩। Archie Brown : The Gorbachev Factor

৪। F. L. Allen : The Big Change

৫। A. K. Ghosh : Globalization

৪.৭.১৬.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর এর কী প্রতিফলন ঘটেছিল?